ভূমিকা

বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। তবে তারও কিছুকাল আগে শুরু হয় এ দেশের সৃজনশীল শিল্প প্রচেষ্টা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী) ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই যাত্রা সূচিত হয়। কিন্তু শুরু থেকেই এই শিল্পযাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এ দেশের প্রথম প্রজন্মের জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমেদ, হবিবর রহমান, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পীর অদম্য উৎসাহ আর কর্মতৎপরতায় অপার সম্ভাবনার যে বীজ রোপিত হয়েছিল, পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষ, আধুনিকতর কৌশল ও নিরীক্ষাসমৃদ্ধ হয়ে তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেদিনের সেই শিল্প প্রচেষ্টা নানা মাধ্যমে ভাগ হয়ে এ দেশের শিল্পাঙ্গনকে আজ নিরন্তর সমৃদ্ধ করে চলেছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো 'প্রিন্টমেকিং' বা 'ছাপচিত্র'। ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটে শুরুতে শিল্পচর্চার যে মাধ্যম বা বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছিল প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্র তার একটি। সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশে চর্চিত দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে ছাপচিত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয়তম মাধ্যম। সাদা-কালো কাঠ খোদাই মাধ্যমে সূচিত মাধ্যমটির চর্চা আজ আধুনিকতর নানা করণকৌশল ও নিরীক্ষাসমৃদ্ধ হয়ে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশকে গুরুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সূচিত মাধ্যমটি পরিণত হয়েছে মূলধারার একটি মাধ্যমে এবং জন্ম হয়েছে অসংখ্য ছাপচিত্রীর। দেশের বেশ কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে এর চর্চার সুন্দর পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মধ্যে ছাপচিত্র এখন একটি অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন। কিন্তু এই শিল্পমাধ্যমটির আজকের পর্যায়ে আসার পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার বিস্তৃত ইতিহাস।

গুহাবাসী মানুষের জীবনে প্রচলিত ছাপ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষে ক্রমশ আধুনিকতর হয়ে মুদ্রণ প্রকৌশলের জন্ম। এই মুদ্রণ প্রকৌশলের অংশ হিসেবেই ছাপচিত্রের প্রাথমিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। উচ্চ রেনেসাঁ পর্ব (১৫০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ইউরোপীয় শিল্পীরা ছাপচিত্রকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত তা পুস্তক মুদ্রণের অনুবর্তী কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অবিভক্ত বাংলার ক্ষেত্রেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। সেখানে গ্রন্থ অলংকরণের প্রয়োজনে প্রথমে ছাপচিত্র মুদ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

হতে থাকলেও স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে এর যাত্রা বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষভাগে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্রের স্বীকৃতি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরুর পর। এর পূর্বের মুদ্রিত বই-পুস্তক, সংবাদ সাময়িকী চিঠিপত্র সবকিছুই মুদ্রণ প্রকৌশল সংক্রান্ত কলাকৌশল বলেই বিবেচিত। সে হিসেবে এই মাধ্যম এ দেশে প্রায় সাত দশক সময় অতিক্রম করেছে, যা শিল্পের ইতিহাসের তুলনায় খুব স্বল্প সময় হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা একটা মূল্যায়ন দাবি করতেই পারে। কারণ এ নাতিদীর্ঘ সময়ে এ দেশের কলাশিল্পের জগতে ছাপচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে যা একই সঙ্গে অর্জন করেছে বৈশ্বিক সম্মানও। আর সেই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই 'বাংলাদেশে প্রিন্টমেকিং চর্চার ছয় দশক – সামগ্রিক মূল্যায়ন' শীর্ষক গবেষণার অবতারণা। এই গবেষণার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শেষ থেকে নব্বইয়ের দশকের পুরো সময় এই গবেষণার মূল ব্যাপ্তি হিসেবে নির্ধারিত হলেও চল্লিশের পুরো দশকটাও এ প্রসঙ্গে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের মানস গঠনে এ (চল্লিশের) দশকের সামগ্রিক শিল্পপরিবেশ এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা তাঁদের সামগ্রিক শিল্প-আঙ্গিকে তো বটেই এ দেশের সামগ্রিক শিল্প পরিবেশ গড়ে ওঠা এবং এর বিকাশেও সুদূর-প্রসারী প্রভাব রেখেছে। তাই আমাদের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চল্লিশের দশকের শিল্পকর্ম এবং এর প্রেক্ষাপটও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে এতে। সেই অর্থে চল্লিশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত এই ছয় দশককেই এই গবেষণার শিরোনামে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাংলাদেশ বলতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তিত্তোর সময়ে পূর্ব-পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল।

এই ছয় দশকের পথ-পরিক্রমায় অসংখ্য শিল্পীর কর্মকুশলতা ছাপচিত্র মাধ্যমকে এ দেশে গুরুত্বের আসনে আসীন করেছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সাদা-কালো কাঠ খোদাই দিয়ে শুরু হলেও ক্রমশ তাতে যোগ হয়েছে নানা উৎকর্ষ। মাধ্যমগত উৎকর্ষ যেমন যোগ হয়েছে তেমনি উপকরণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও ঘটেছে নানা উত্তরণ। আর সেটা সম্ভব হয়েছে কারণ এ দেশের ছাপচিত্র শুরু থেকেই বিশ্ব পরিসরে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রতিক বিশ্বশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে নিজেকে সাম্প্রতিক রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ফলস্বরূপ এ দেশের অনেক শিল্পীই অর্জন করেছে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সম্মান এবং আমাদের ছাপচিত্র বিশ্ব আসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজস্ব পরিচয়ে। কিন্তু ছাপচিত্রের এই উত্তরণগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমটি চর্চার কোনো সুসংগঠিত প্রামাণ্য নথি সংগৃহীত হয়নি আজ পর্যন্ত। তা ছাড়া বাংলাদেশের সৃজনশীল ছাপচিত্র বা মুদ্রণশিল্পের অংশ হিসেবে চর্চিত ছাপচিত্রের উল্লেখপূর্বক কোনো পূর্ণাঙ্গ বই এ যাবৎকাল প্রকাশিত হয়নি। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা' বিষয়ে বই প্রকাশ করেছেন। তবে তাতে পুস্তক অলংকরণের সঙ্গে জড়িত কোনো শিল্পী বা প্রকাশনাগুলোর অলংকরণ সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি। আবার ফজলে রাব্বি

Dhaka University Institutional Repository

রচিত মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কিত ‘ছাপাখানার ইতিকথা’ বইটি মূলত ছাপাখানাকেন্দ্রিক মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস নিয়ে রচিত হলেও এতেও বাংলার পূর্ব অংশের মুদ্রণ ইতিহাস কার্যত অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে। এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ‘চারু ও কারু কলা’ শীর্ষক বইয়ে অন্তর্ভুক্ত রশীদ আমিনের ‘ছাপচিত্র’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রয়েছে যেটি কলেবরে খুব ছোট, যা পাঠকের আগ্রহ নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট নয় এবং দু-একটি তথ্যবিভ্রাট থাকায় এর শক্তিমত্তাও কিছুটা খর্ব হয়েছে। সম্প্রতি ড. হীরা সোবহান রচিত ‘ছাপচিত্রকলা’ শীর্ষক একটি বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যাতে ছাপচিত্রের শুরু থেকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বইটিতে অনেক মৌলিক তথ্যবিভ্রাট রয়েছে। সেই সাথে প্রচুর মুদ্রণপ্রমাদ, অসংগতি এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার অভাব একে সুখপাঠ্য করতে পারেনি। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ হিসেবেও কিছু আংশিক গবেষণা হয়েছে, তবে তার অধিকাংশই অপ্রকাশিত থেকে গেছে এবং পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় একটা নির্দিষ্ট আবর্তেই ঘুরপাক খেয়েছে। বস্তুত ছাপচিত্র মাধ্যমের ইতিহাস আর উত্তরণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবীণ শিল্পীদের মুখে উপকথার মতো প্রচলিত এবং ব্যক্তিভেদে তথ্যও সাংঘর্ষিক। এ ছাড়া বিভিন্ন সংবাদ সাময়িকীতেও এ সম্পর্কিত ছোট ছোট বেশ কিছু নিবন্ধের দেখা পাওয়া যায় যাতে নানা ধরনের তথ্যের অমিলও লক্ষ করা যায়, যা এ মাধ্যমের অতীতকে বিভ্রান্তিকর করে তুলেছে। এসব বিভ্রান্তি আর সন্দেহ দূর করে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে সৃজনশীল ছাপচিত্র চর্চার ধারাবাহিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং সঠিক রূপরেখা তৈরি করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। যা আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে এবং সঠিক ইতিহাস রচনা ও উত্তরণ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এ দেশে ছাপচিত্র মাধ্যমের চর্চাকে আরও বেগবান করতে উত্তর প্রজন্মের শিল্পীদের উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, আমাদের দেশে শিল্প মূল্যায়নের ব্যাপারে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) পশ্চিমের সাথে তুলনা করার একটি অলিখিত রীতির প্রচলন রয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সবকিছু পশ্চিমের দাঁড়িপাল্লায় মাপার সেই বহুল প্রচলিত পথে হাঁটা হয়নি; তবে পশ্চিম বা পূর্ব, উত্তর বা দক্ষিণ কোনো দিকের প্রভাব থাকলে সাধ্যমতো তা স্বীকার করা হয়েছে। কারণ এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে আমাদের শিল্প অনেকটাই পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত। তবে যেখান থেকে যেভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে থাকুক না কেন দিন শেষে রং, রেখা, বুনট আর বিষয়বাস্তবতায় এ শিল্প আমাদেরই। যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা শুধুই রবীন্দ্রনাথের। তাই এই মূল্যায়ন আত্মবিশ্লেষণমূলক এবং অতীতের সাথে বর্তমানের।

এই গবেষণার বিষয়টি একই সাথে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। ফলে পর্যবেক্ষণমূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কৌশল হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, মুদ্রিত-অমুদ্রিত বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্র, অডিও-ভিডিও, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

'বাংলাদেশে প্রিন্টমেকিং চর্চার ছয় দশক – সামগ্রিক মূল্যায়ন' শীর্ষক গবেষণাটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই নির্ধারণ করা হয়েছে ছাপচিত্রের পরিচয় জ্ঞাপক সংজ্ঞা। করণকৌশলের পার্থক্য অনুযায়ী ছাপাই মাধ্যমের সাধারণ প্রক্রিয়াগুলোর সাথে আলোচিত হয়েছে সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্রের স্বীকৃতির বিষয়টিও। কিন্তু সৃজনশীল শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্র স্বীকৃতি লাভের আগেও ছাপাই মাধ্যমের উত্তরণের রয়েছে বিস্তৃত ইতিহাস, সেই আদি গুহাবাসী মানুষের যুগ হতে। ছাপাই মাধ্যমের উন্মেষে গুহাবাসী মানুষের হাতের ছাপ হতে ধারাবাহিকভাবে মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন ও জাপানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের কারণে ইউরোপ ছাপাই ছবির বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইউরোপের ছাপচিত্রের সাথে এর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী, শিল্পান্দোলন ও সেগুলোতে ছাপচিত্রের ভূমিকা এবং নতুন নতুন মাধ্যমের উদ্ভব ও বিকাশের বিভিন্ন পর্বসমূহ ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে আমেরিকান প্রিন্টমেকিংয়ের ইতিহাসও। বিশেষ করে বিশ শতকের ছাপচিত্র এবং এ সময়কার আমেরিকান শিল্পান্দোলনে ছাপাই ছবির ভূমিকা। সবশেষে স্বল্পপরিসরে আলোচিত হয়েছে ছাপচিত্রের সাম্প্রতিক বিশ্বপ্রবণতা সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য, বাংলাও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলা বলতে কোন অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করার পর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা থেকে। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে প্রাচীন বাংলা মহেনজোদারো সভ্যতারই অংশীদার এবং এর ইতিহাস সিন্ধু সভ্যতার (৩৩০০-১৩০০) ইতিহাসের সমসাময়িক। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সিলমোহর ভারতীয় উপমহাদেশে ছাপার প্রথম নমুনা। বাংলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও পাওয়া গেছে ক্রিটিয় সভ্যতার সিল যা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক। এ ছাড়া বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল নানা ধরনের লোকজ ছাপপদ্ধতি। এরূপ লোকজ ও স্থানীয় নানা ছাপপদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও বাংলার মুদ্রণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের হাত ধরেই। এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গে মুদ্রণশিল্পের আগমন, বিস্তার ও বাজার নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে মুদ্রণশিল্প এবং সচিত্র বইপত্র ও পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কলকাতার তুলনায় ঢাকার পশ্চাৎপদতার কারণ। বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ এবং বাংলায় ছাপচিত্রের ধারণা বিকাশে এদের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব) প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্র তথা আধুনিক শিল্পচর্চার সূত্রপাত ঘটে একইসাথে। শুরু থেকে প্রায় নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ছাপচিত্র শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে হাত ধরাধরি করে চলেছে যা

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গিকগত দিক দিয়ে শিল্পের মূলধারা অনুবর্তী। তাই এ দেশের আধুনিক শিল্পের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করে পৃথকভাবে ছাপচিত্র মূল্যায়ন বা অনুধাবন সম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দেশে আধুনিক শিল্পের যাত্রা শুরু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে। কিন্তু এর শিকড় প্রোথিত আরও দূরে। বস্তুত ঔপনিবেশিক ভারতে গত শতকের চল্লিশের দশকে হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম অনিবার্য ছিল। এ সময় পাকিস্তানপন্থী নেতাদের দ্বারা ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর (নানা ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই বলা যায়, ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা যতটা না জয়নুল আবেদিন বা তাঁর সহকর্মীদের বিশেষ আবেগের বাস্তবায়ন; তার চাইতে অনেক বেশি রাজনৈতিক। কারণ একমাত্র জয়নুল আবেদিন ছাড়া আর কেউ পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। কিন্তু নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসার সিদ্ধান্ত তাঁদের অনেক ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিলেও জীবনের নিশ্চয়তাই তখন সবচেয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এ অধ্যায়ের শুরুতেই ভারতবিভাগের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে। এরপর নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা, ঢাকা আর্ট গ্রুপের জন্ম– এর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রদর্শনী, ঢাকার জনজীবনে এর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও উঠে এসেছে। চল্লিশ থেকে শুরু করে প্রতিটি দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, চর্চিত শিল্প-আঙ্গিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, এর উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রীতিপদ্ধতির প্রভাব ও কারণ, এগুলোর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, দর্শক ও সমালোচকের মতামত এবং প্রতিটি দশকে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের কাজের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে শিল্পীদের ভূমিকা, পরবর্তী সময়ে শিল্পকলায় এর প্রভাব ও প্রভাবহীনতার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়েই মূলত এ দেশের মূলধারার ছাপচিত্রশিল্পের আদ্যোপান্ত আলোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠায় গতি পায় ছাপচিত্র শাখা। প্রথম প্রজন্মের এই শিল্পীদের মধ্যে হবিবর রহমান, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দিন আহমেদের ছাপচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে জয়নুল আবেদিনের এমন দুটি কাঠ খোদাইচিত্রও আলোচিত হয়েছে, যার প্রতিলিপি আমাদের খুব পরিচিত নয়। পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে মো. কিবরিয়া, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, নিতুন কুন্ডুর ছাপচিত্র আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর সাতটি ছাপচিত্রের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যেগুলোও খুব পরিচিত নয়। ছবিগুলোর শিরোনাম ও সময়কাল সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠজন ও বিশেষজ্ঞের ধারণার উপর নির্ভর করা হয়েছে। আবার শিল্পী আবদুর রাজ্জাকেরও পাঁচ-ছয়টি ছাপাই ছবির প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, যেগুলোও বহুল প্রদর্শিত নয়। প্রায় অপ্রদর্শিত বা স্বল্প প্রদর্শিত এই ছাপচিত্রগুলোর প্রসঙ্গের অবতারণা এই অভিসন্দর্ভের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ষাটের দশকে নতুন কোনো উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্রী নেই। এ সময়ে ছাপছবির ক্ষেত্রে শুধু সফিউদ্দিন আহমেদ ও মো. কিবরিয়া সক্রিয় ছিলেন, যাঁদের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে তিনজন শিক্ষার্থী শিল্পী মো. হুসনে জামাল, রঞ্জিত নিয়োগী এবং নাসির বিশ্বাসের প্রসঙ্গ এ সময় আলোচিত হয়েছে। সত্তরের দশকে মনিরুল ইসলাম, রফিকুন নবী, মিজানুর রহিম, কালিদাস কর্মকার, মাহমুদুল হক, আবুল বারক্ আল্ভী, শহিদ কবির, আবদুস সাত্তারের ছাপচিত্র আলোচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে। আশির দশকে এ কে এম আলমগীর হক, রতন মজুমদার, রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, ওয়াকিলুর রহমান, মুসলিম মিয়ার কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে এসে আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী, লায়লা শার্মিন, আহমেদ নাজির, রফি হক, রশীদ আমিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, আবদুস সোবহান হীরা, আবদুস সালাম, আনিসুজ্জামানের ছবি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শিল্পীদের এই তালিকা স্বনির্বাচিত– যা আমার অভিসন্দর্ভের জন্য সহায়ক। এ ছাড়া প্রতিটি দশকে ছাপচিত্রের সাংগঠনিক চর্চা, নানা ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়াদি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে ছাপচিত্রের বিভিন্ন উত্তরণ সম্পর্কে প্রচলিত অনেক বিভ্রান্তিরও সমাধান করা হয়েছে, যা এই অভিসন্দর্ভের অন্যতম দৃষ্টিগ্রাহ্য দিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এই অভিসন্দর্ভের সময়কাল ছয় দশক (চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশক) অর্থাৎ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সত্তরের দশকের পরের শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) পরবর্তী এক দশকের শিল্পকর্মও সম্পর্কেও আলোচনা করতে হয়েছে। কারণ, বর্তমান শতকের শূন্য দশকে এই অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত অনেক শিল্পীরই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ ঘটেছে, বিশেষত নব্বইয়ের দশকের শিল্পীদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। এই উত্তরণকে চিহ্নিত না করে এই শিল্পীদের এবং এ দেশের ছাপচিত্রের প্রকৃত সামগ্রিক মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ বিবেচিত হবে।

প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত ছাপচিত্রের জন্ম ও বিকাশের ধারায় অবিভক্ত বাংলায় ছাপচিত্রের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ এবং তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ছাপচিত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশের সাথে মাধ্যম, উপকরণ, বিষয় এবং আঙ্গিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তরণগুলো এবং এর কারণসমূহ চিহ্নিত করে এই অভিসন্দর্ভের উপসংহার রচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, আশি এবং নব্বইয়ের দশকের আরও দু-একজন শিল্পীকে এই অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে হয়তো এই গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেত। তবে গবেষণার কলেবর বিবেচনা ও সময়ের সীমাবদ্ধতার সাথে, তাঁদের অনেকের ব্যক্তিগত অনাগ্রহ এবং বর্তমানে কেউ কেউ প্রবাস জীবন-যাপন করায় তা সম্ভবপর হয়নি। যা এই অভিসন্দর্ভের অনিচ্ছাকৃত

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধতা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ যে খুব গবেষণাবান্ধব তাও নয়। বিশেষ করে শিল্পকলাবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তা আরও প্রকট। কারণ এ বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজনীয় সংরক্ষণশালা সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো উদ্যোগেই আজ পর্যন্ত এ দেশে গড়ে ওঠেনি। আবার যেসব সাধারণ সংগ্রহশালা আছে তাতেও পৃথকভাবে শিল্পকলাবিষয়ক প্রকাশনাগুলো সংরক্ষিত হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতেও ধারাবাহিকতা না থাকার ফলে কোনো একক বিষয়কে বেশি দূর অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের শিল্পকর্ম সম্পর্কে যথাযথ, প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিল্পীর কাছেও সংগৃহীত হয়নি। যা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পীর ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এরূপ নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চার বছরেরও অধিক সময় ধরে নিরলস পরিশ্রমে এই অভিসন্দর্ভের কাজ শেষ করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রকলার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপনই এই গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ছাপচিত্রের জন্ম ও বিকাশ

সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমগুলোর মধ্যে ছাপচিত্র অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে স্বীকৃত। নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতা, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত নানামাত্রিক উদ্যোগ এবং নিরবচ্ছিন্ন চর্চা এই মাধ্যমকে গুরুত্বের আসনে আসীন করেছে। ফলশ্রুতিতে ছাপাই ছবির উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্জন করেছে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাও। কিন্তু শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্রের এই স্বীকৃতি এক দিনের অর্জন নয়। এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস। বহু বছরের যাত্রায় একটু একটু করে পরিশীলিত হয়ে তা আজকের অবস্থানে এসেছে। ছাপাই পদ্ধতিতে বিষয় নির্মাণের ধারণার উন্মেষ ঘটে মানবসভ্যতার উষালগ্নে। কিন্তু কীভাবে মানুষ প্রথম ছাপের ধারণা লাভ করেছিল সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানা যায় না। হয়তো মাটিতে পড়ে থাকা লতাপাতার ছাপ, কিংবা নরম মাটিতে পশুর পায়ের ছাপ অথবা নিজের হাত ও পায়ের ছাপ দেখে মানুষ মুদ্রণ বা ছাপ সম্পর্কে প্রথম ধারণা লাভ করে থাকবে। ক্রমে নিজের হাত, দড়ি, ঝিনুক কিংবা পোড়ামাটির ফলক বা খোদিত পাথর ফলকের ছাপ দিয়ে মৃৎপাত্র ও কাপড় অলংকরণ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় তারা। পোড়ামাটির তৈরি অথবা পাথরে খোদিত সিলমোহর দিয়ে কোনো কিছু চিহ্নিতকরণ এবং কাঠের ব্লকের দ্বারা কাপড় অলংকরণের প্রক্রিয়ার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও, মুদ্রণশিল্পের অংশ হিসেবেই 'ছাপচিত্র' বা 'প্রিন্টমেকিং' (printmaking) এর প্রাথমিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। ছাপানো চিঠিপত্র এবং বইয়ের অলংকরণের প্রয়োজনে ছাপচিত্রের চর্চা শুরু হয়। প্রথম দিকে শিল্পীরা মুদ্রিত বইয়ের বর্ণনামূলকচিত্র বা অলংকরণ হিসেবে ছবি আঁকতে থাকেন এবং পরবর্তীতে এই করণকৌশলটি গুণাগুণ বিচারে তাদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সাধারণভাবে ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং হলো কাগজে ছাপের মাধ্যমে তৈরি করা ছবি। পূর্বে নকশা করা কোনো ছাঁচ (matrix) এর উপর উপযুক্ত কালি লাগিয়ে এক টুকরো কাগজ বা অন্যকোনো পৃষ্ঠতলে প্রতিরূপকে (image) স্থানান্তরের মাধ্যমে ছাপ তৈরি হয়।

> Printmaking is an art form that involves transferring one image, from one surface to another. Most often this includes a "printing plate" or some kind of matrix being pressed onto paper.[১]

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায়,

---

[১] http://www.douglasetaylor.net/html/about_printmaking.htm প্রেক্ষিত ২০-১০-১৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

> A Print is in essence a pictorial image which has been produced by a process which enables it to be multiplied. It therefore requires the previous design and manufacturer of a printing surface.[২]

সুতরাং ছাপের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রই ছাপচিত্র, যা সংখ্যায় এক বা একাধিক হলেও মৌলিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। আর ছাঁচ তৈরির জন্য আলুর মতো সস্তা সাধারণ জিনিস থেকে শুরু করে কাঠ, ধাতব পাত, পলিমার, পাথর, লিনোলিয়াম, সিল্কস্ক্রিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মূলত আধুনিক ছাপচিত্র চর্চার সূচনাই হয়েছিল কোনো একটি প্রতিরূপ বা বিষয়বস্তুর বহু প্রতিলিপি তৈরির চেষ্টার ফলস্বরূপ। সাধারণ পাঠকগণ ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং বলতে যন্ত্র দিয়ে বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত দ্রব্য যেমন– বই, সংবাদপত্র, বস্ত্র ইত্যাদি বুঝে থাকতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং বাণিজ্যিক এবং চারুশিল্পের অংশ হিসেবে দুটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ছাপা সকল (বাণিজ্যিক ও চারুশিল্পের প্রয়োজনে) ছাপই গ্রাফিক আর্ট হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পরবর্তীকালে ছাপের দুটি ধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পার্থক্য সৃষ্টির নিমিত্তে 'প্রিন্ট কাউন্সিল অব আমেরিকা' ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে চারুশিল্পের অংশ হিসেবে চর্চিত ছাপের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয় এবং তখন থেকেই ক্রমে ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং শব্দটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তারা এটাও নির্দিষ্ট করে দেয় যে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত ছাপছবির ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য নয়।[৩] প্রিন্ট কাউন্সিল নির্ধারিত ছাপচিত্রের শর্তগুলো নিম্নরূপ–

1. The artist will creat the master image in or upon plate, wood, stone or other material for the purpose of creating the prints.
2. The print will be made from the said material by the artist or pursuant to this direction (Recently this was further restricted – that the artist will process the block and the print will also be taken by the artist).
3. The final print is approved by the artist and duly signed. The artist must mention the edition number and the nature of the edition. Unsigned prints will e considered less valuable than signed impressions.

---

[২] Antony Griffiths, *Prints and Printmaking An introduction to the history and techniques*, London, British Museum Press, 1996, p. 9

[৩] Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das, `Graphic Art in India : 1850 to 1950 (A Brief Background and History)', *Graphic Art in India Since 1850*, New Delhi, Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan, First edition- September 1985, p. 5

4. If the prints are made for an edition of more than for sale, the artist must produce one cancelled print by a cross mark on or upon the block to guard against further editions.[৪]

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য চারুশিল্পের অংশ হিসেবে চর্চিত ছাপচিত্র নিয়ে আলোচনা করা। যেখানে ছাপচিত্র শিল্পীর নিজের হাতে কিংবা সরাসরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে রচিত হয়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে শিল্পী যেমন সরাসরি রং দিয়ে তুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন, ছাপচিত্রে অভিব্যক্তির প্রকাশ প্রথমে অন্য পরিতলে এবং সেখান থেকে ছাপের মাধ্যমে কাগজ বা যেকোনো উপযুক্ত মাধ্যমের উপর প্রকাশিত হয়। সেজন্য ছাপচিত্রকে পরোক্ষ শিল্পমাধ্যমও বলা হয়ে থাকে।

করণকৌশলের পার্থক্য অনুযায়ী ছাপ তৈরির সাধারণ প্রক্রিয়াগুলো হলো– রিলিফ প্রসেস, ইন্টাগ্লিও প্রসেস, প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস এবং স্টেনসিল। রিলিফ পদ্ধতিতে কাঠ বা ধাতব তলে শুধু প্রতিরূপকে রেখে বাকি সাদা অংশ কেটে ফেলা হয়, ফলে প্রতিরূপের অংশ পৃষ্ঠতল থেকে উঁচু হয়ে যায়। এর উপরে কালি লাগিয়ে হাত অথবা রোলার দিয়ে চাপ দিয়ে ছাপ তৈরি করা হয়। ইন্টাগ্লিওর ক্ষেত্রে প্রতিরূপ কোনো একটি তলে আগে থেকে খোদাই করা থাকে। এই খোদিত রেখা বা গর্তগুলো ছাপার উপযোগী কালি ধরে রাখে এবং কাগজে তা স্থানান্তরের মাধ্যমে চিত্র তৈরি করে। এটি রিলিফ পদ্ধতির সরাসরি বিপরীত প্রক্রিয়া। লিথোগ্রফিতে প্রতিরূপকে সরাসরি কোনো পাথর বা ধাতব পাতের উপর এঁকে তেল ও জলের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে ছাপকর্ম সাধিত হয়। আর স্টেনসিলের ক্ষেত্রে রঙকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত কোনো প্রতিরূপযুক্ত স্ক্রিনের উপর দিয়ে চেপে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাপ তৈরি করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ছাপাই ছবির করণকৌশলেও অনেক পরিবর্তন যুক্ত হয়েছে। ছাপচিত্র হিসেবে এখন আমরা যা চর্চা করি তা অনেক উন্নত স্তরের। প্রাচীনতম ছাপ পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে আজকের রূপ ধারন করেছে এবং কালক্রমে শিল্পের একটি উচ্চাঙ্গের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৫]

ছাপার কালি ও কাগজের সংস্পর্শে ছাপচিত্র যে অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়, যে নান্দনিক সৌন্দর্যের অবতারণা করে অন্য কোনো মাধ্যমে তা অকল্পনীয়। তাই বলা যায়, বর্তমানে ছাপচিত্রকলা শিল্পের এমন একটি মৌলিক মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যার সৃজনশীলতা ও শিল্পোৎকৃষ্টতা আজ অনন্য স্তরে পৌঁছেছে। ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং পরিভাষা এবং এর পদ্ধতিসমূহ সাম্প্রতিক হলেও এটি শিল্পের একটি প্রাচীনতম রূপ এবং এর ইতিহাস মানবসভ্যতা ও শিল্পকলার ইতিহাসের সমান্তরাল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়–

---

[৪] Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das, 'Graphic Art in India : 1850 to 1950 (A Brief Background and History)', *Graphic Art in India Since 1850,* New Delhi, Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan, First edition- September 1985, p. 5

[৫] রশীদ আমিন,'ছাপচিত্র', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ১৪৯

> The foundations of the print were really laid in prehistory, with the first incised line, the first scratch on a rock wall, the first impression made with the point of a sharpened flint on a soft stone or a piece of bone or horn. Such was the work of the earliest engravers, our "Neolithographers," our first graphic artists and writers on stone. We are prevented from crediting them with the invention of printing only by their lack of motivation-the absence of large communities eager for communication through multiple images-and the nonexistence of printing materials to facilitate the supplying of such demands.[৬]

একদিন গুহাবাসী মানুষের শিকারের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পের। শিকার ও শিল্পের সে গল্পে অবিচ্ছেদ্য ছিল ছাপের প্রাথমিক নমুনা। পায়ের ছাপ দেখে গুহাবাসী মানুষ ধাওয়া করত সম্ভাব্য শিকারকে, আর এর পরিণতি ও সামর্থ্যের নমুনাস্বরূপ হয়তো গুহার দেয়ালে আঁকা হতো ছাপ। তাই গুহামানবের শিকার খোঁজার এই পদ্ধতি এবং হাতের ছাপ নিঃসন্দেহে প্রথম দিকের ছাপকর্ম হিসেবে অভিহিত হতে পারে যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার দ্বার উন্মোচন করেছিল।[৭] ফ্রান্স ও স্পেনে আবিষ্কৃত গুহায় এই ধরনের ছাপের প্রমাণ পাওয়া যায়। গুহামানবের হাতের ছাপের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সুলায়েসি দ্বীপের সুলায়েসি গুহাতে। যা প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে মানবসৃষ্ট ছাপের নিদর্শন। এল ক্যাসিলো গুহাতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় প্রাচীন ছাপকর্মের নিদর্শন। এ গুহাতে অন্যান্য বিভিন্ন প্রতীকের সাথে ৫৫টির মতো হাতের ছাপ রয়েছে। আবার ফয়িক্স অঞ্চলের কাছে গার্গাস গুহায়ও দেখা যায় লাল দেয়ালের পটভূমিতে হাতের সাদা ছাপ। এখানে প্রায় ১৫০টি হাতের স্টেনসিল ধরনের ছাপচিত্র দেখা গেছে।[৮] এ ছাড়া চাওভেট (চিত্র ১), পিচ্ মারলে, লাস্কো, আলতামিরা, কেভ অব হ্যান্ডসসহ পৃথিবীব্যাপি আরও অনেক প্রাচীন গুহাতেও এই একই ধরনের হাতের ছাপ দেখা যায়। হাতের এই ছাপগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, প্রিন্ট এবং স্টেনসিল। প্রথম ক্ষেত্রে হাতকে কোনো রঞ্জকে রঞ্জিত করে গুহার পাথুরে দেয়ালে সরাসরি ছাপ দেয়া হয়েছে। ফলে পজেটিভ ধরনের হাতের ছাপ ফুটে উঠেছে। আর অন্য ক্ষেত্রে, প্রথমে হাতকে গুহার পাথুরে দেয়ালের উপর রেখে বাঁশ বা হাড়ের চোঙের ভেতর রং ভরে মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে তার উপর রং ছিটিয়ে হাত সরিয়ে নেয়ার পর সেখানে হাতের একধরনের ছায়াচিত্র লক্ষ করা যায়। একে নেগেটিভ হ্যান্ড ইমপ্রিন্টস্ (negative hand imprints) বলে।

---

[৬] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 18

[৭] রশীদ আমিন, 'ছাপচিত্র', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ১৪৯

[৮] বুলবন ওসমান, *শিল্পকলা দেশে দেশে*, ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ২০০২, পৃ ১৪

আগে মনে করা হতো, গুহাচিত্রের এই বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার শুধু পুরুষ জাতির দ্বারা সৃষ্টি। কিন্তু পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির নৃ-তত্ত্ববিদ Prof. Dean R. Snow[৯]এর গবেষণা হতে জানা যায়, বিভিন্ন গুহাগাত্রে প্রাপ্ত এসব হাতের ছাপের অধিকাংশই (৭৫%) মহিলাদের এবং কিছুসংখ্যক বাচ্চা ও পুরুষদের।[১০] তা ছাড়া, ডান হাতের তুলনায় বাম হাতের ছাপের সংখ্যাও বেশি। কারণ ডান হাত ব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি শক্তি ধারণ করে ডান হাতে এবং অধিকাংশ কাজও সে ডান হাতেই সম্পন্ন করে। সেক্ষেত্রে বাম হাত পাথরে রেখে ডান হাত দিয়ে রং ভর্তি নল ধরে রং ছিটাতে সুবিধা হওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছে। হাতের এইসব ছাপ দেয়ার জন্য বিশেষত লাল, কালো এবং হলুদ রং ব্যবহার করা হয়েছে।[১১] প্রকৃতিতে সহজলভ্য এবং আহরণযোগ্য জৈব ও খনিজ বিভিন্ন উৎস থেকে তারা রং সংগ্রহ করেছে। যেমন– লোহার আকরিক থেকে লাল, চারকোল অথবা ম্যাঙ্গানিজ থেকে কালো, চক কিংবা পোড়ানো ঝিনুক অথবা হাড় থেকে সাদা ইত্যাদি। বাইন্ডার (bindar) হিসেবে রক্ত, পশুরচর্বি এবং নানা অজানা কৌশল অবলম্বন করেছে। কিছু গুহাতে অন্য একধরনের হাতের ছাপও পরিলক্ষিত হয়। একে ফিঙ্গার ট্রেসিং (finger traching) বলে। এ পদ্ধতিতে নরম মাটি বা গুহার গায়ে চুইয়ে জমা হওয়া নরম চুনাপাথরে হাতের ছাপ দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচ্চাদের হাতেরই ছাপ সেগুলো। গুহাগাত্রের অন্যান্য হাতের ছাপের মতোই এগুলোরও কোনো রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়নি।

গুহাচিত্রগুলো সাধারণত গুহার প্রবেশপথে বা সচরাচর চোখে পড়বে এমন জায়গায় করা হয়নি। কোথাও কোথাও সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া এবং চিত হয়ে শুয়ে দেখা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এই চিত্রমালা করা হয়েছে খুবই পবিত্র মনে করে।[১২] আসলে জাদুবিশ্বাসই হল গুহাচিত্রের মূল প্রেরণা।[১৩] অথবা মানুষ পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠার সময় আগামী প্রজন্মকে নিজেদের অস্থিত্ব, জীবনযাত্রার প্রণালি ইত্যাদি জানান দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়তো এরূপ করেছে। যেমন আধুনিককালের অনেক শিল্পীই কোথাও গেলে নিজের কোনো স্মারক রেখে আসতে চান, যাতে অনেক বছর পরে কেউ তা আবিষ্কার করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

---

[৯] Dean R. Snow Department of Anthropology, The Pennsylvania State University, 409 Carpenter Building, University Park, PA 16802 (drs17@psu.edu)

[১০] Dean R. Snow, 'Sexual Dimorphism in European Upper Paleolithic Cave Art', in *American Antiquity*, 2013, Vol-78, no-4, pp. 746-761 https://www.researchgate.net/publication/273042625_Sexual_Dimorphism_in_European_Upper_Paleolithic_Cave_Art প্রেক্ষিত ২০-১০-২০১৩ খ্রি.

[১১] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art,* Third edition, London, Laurence King, 1984, p. 23

[১২] বুলবন ওসমান, *শিল্পকলা দেশে দেশে*, ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ২০০২, পৃ ১৬

[১৩] এম, এ, কাইয়ুম, *আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি*, ঢাকা, মুক্তচিন্তা, ২০১২, পৃ ৭

> These handprints, too, may have had magical significance or may simply have been the "signatures" left by whole generations of visitors to these sacred places, much as modern tourists leave some memento of their presence.[১৪]

গুহাবাসী মানুষ গুহার পাথুরে দেয়ালে তাদের জীবনাভিজ্ঞতার প্রামাণ্য দলিল লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে ছাপের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি ছাপ স্মরণ করায় ব্যক্তিকে, এক একটা দেয়াল তুলে ধরে গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের এরূপ নিদর্শন সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো সব জায়গার নিদর্শনসমূহের মধ্যে মিলও রয়েছে প্রচুর। যদিও এর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠা এবং আলাদা আলাদা ভূ-প্রকৃতিগত কারণ দ্বারা পৃথকীকৃত। তবুও তাদের সৌন্দর্যবোধ ও করণকৌশলের দক্ষতা প্রশংসার দাবিদার। এমনকি ছাপ নেয়ার কৌশলের ভিন্নতা ও দক্ষতা কখনো কখনো শিল্প ঐতিহাসিকগণদের চমৎকৃত করেছে। বস্তুত এই আদিম গ্রাফিকের ধারণা থেকেই উত্তরকালে গ্রাফিকের উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয়েছে।[১৫]

বলা হয়ে থাকে যে, ইতিহাস শুরুই হয়েছিল সুমের থেকে। ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস অববাহিকায় সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রায় ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরীয়দের মালিকানা প্রকাশ করার জন্য সিলিন্ডার সিল (cylinder seal) ব্যবহার করার নমুনা পওয়া যায়। যা দিয়ে মোম বা নরম মাটিতে ঘূর্ণায়মান চাকা সদৃশ বস্তু দ্বারা আঘাত করলে যে রিলিফ ইম্প্রেশন তৈরি হতো তা রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী করা হতো।[১৬] এ ছাড়া তখন পাথর খোদাই করে নকশা উৎকীর্ণ করেও সিল তৈরি করা হতো। এই ছোট সিলের ব্যবহার থেকেই পরবর্তী সময়ে বড় ব্লক ব্যবহারের সূচনা এবং সিল থেকে ছাপ নেয়ার এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে প্যাপিরাস ও কাপড় অলংকরণের সূত্রপাত। আলংকারিক নকশাধর্মী কাঠের ব্লক ব্যবহার করে কাপড়ে ছাপ নেয়ার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মতামত নিম্নরূপ–

> Records show that wood block printing on fabrics had been practiced by the Egyptians at least two thousand years before the Christian era.[১৭]

আবার, Arthur M. Hind এর মতে–

---

[১৪] Horst De La Croix, Richard G. Tansey and Diane Kirkpatrick edited, *Art through the Ages*, Ninth edition, New York, Harcourt Brace College Publishers, 1991, p. 31

[১৫] নির্মাল্য নাগ, *শিল্প চেতনা*, কলকাতা, দীপায়ণ, ১৯৮৭, পৃ ১১০

[১৬] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art*, Third edition, London, Laurence King, 1984, p. 37

[১৭] Walter Chamberlain, *The Thames and Hudson Manual of Woodcut Printmaking and related techniques*, London, Thames and Hudson, 1978, p. 11

> The first use to which wood blocks appear to have been applied in Egypt was in the Printing of Textiles and the earliest examples at present known date from about the VI or VII centuries AD.[১৮]

তবে সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মতভেদ থাকলেও সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন কাপড় অথবা কাগজে কাঠের ব্লকযোগে ছাপার কাজের সূচনা পূর্ব দুনিয়ায়।[১৯] চতুর্থ শতকের প্রাপ্ত মিশরীয় অলংকৃত বস্ত্রের নিদর্শন থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে মিশরে কাপড়ের উপর উডব্লক প্রিন্ট উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এ ছাড়া প্রাথমিক সিল্কস্ক্রিন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার নমুনাও পাওয়া যায়।[২০]

হান রাজত্বকালের (২২০-২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সময় থেকে চায়নিজদের খোদিত পাথর অথবা কাঠের উপর কালি লাগিয়ে তা থেকে ছাপ নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ছিল।[২১] তৎকালীন সময়ের একটি সিল্ক কাপড়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাতে ফুলের মোটিফ ব্যবহার করে তিন রঙে নকশা করা হয়েছে।[২২] এ থেকে ধারণা করা হয় যে, মিশরের মতো চীনেও উডব্লক ব্যবহার করে কাপড় অলংকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। তবে ঠিক কত সাল নাগাদ তা শুরু হয়েছিল তা সুর্নিদিষ্টভাবে আজো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে কাগজ আবিষ্কারের কিছুকাল পূর্ব থেকেই কাঠের ব্লক থেকে কাপড় অলংকরণের ধারা প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এ সময় কাঠের ব্লক ব্যবহার করে সিল্ক কাপড়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছেপে শিষ্যদের মাঝে প্রচার করা হতো।

গাছের আঁশ, নেকড়া, তুঁতগাছের ছাল ইত্যাদি সহযোগে ১০৫ খ্রিস্টাব্দে টি সাই-লুন (৪৮-১২১) সফলভাবে ইতিহাসে প্রথম কাগজ উৎপাদন করতে সক্ষম হন।[২৩] তাঁর এই আবিষ্কার ছাপার জগতের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং ছাপার পদ্ধতি নিয়ে নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ফলে সিলকে প্রচণ্ড জোরে কাপড়ের উপর আঘাত করে ছাপ নেয়ার পরিবর্তে, চায়নিজরা (সপ্তম শতকের শুরুতে অথবা তারও কিছুকাল আগে) কাগজ এবং কালি ব্যবহার করে পাথরে খোদিত পুরনো সংরক্ষিত দলিলের অনেক প্রতিলিপি তৈরির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এ পদ্ধতিটি রাবিং (rubbing) নামে পরিচিত। উদ্দেশ্য ছিল রাবিং এর মাধ্যমে পাথরে খোদিত লিপির একটি যথাযথ প্রতিলিপি তৈরি করে সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকের মাঝে বিতরণ

---

[১৮] Arthur M. Hind, *An Introduction to a History of Woodcut*, NewYork, 1963, vol-1, p. 64

[১৯] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৭৩

[২০] http://www.villageprint.com/wood-blocks-3d-printg-brief-history-print/ প্রেক্ষিত ১২-০১-২০১৪ খ্রি.

[২১] Mosaku Ishida, *Japanese Buddhist Prints*, New York, Harry N. Abrams,1964, p. 11

[২২] http://www.chinatravel.com/facts/china-engraved-block-printing-technique.htm প্রেক্ষিত ১২-০১-২০১৪ খ্রি.

[২৩] Josep Asuncion, *The Complete Book of Papermaking*, NewYork, Lark Books, 2001, p. 14; Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 562

করা। স্টোন রাবিং হলো ছাপার এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পাথরের ফলকে চিত্র, লেখা বা নকশা খোদাই করে একটি পাতলা কাগজ ভাতের মাড় বা অন্য কোনো আঁঠা দিয়ে ভালোভাবে আটকে কালিভর্তি নরম কাপড়ের টুকরো, রোলার বা বার্নিশার দিয়ে কাগজের উপরিতলে ঘষা হয়। ফলে পাথরের সাথে লেপ্টে থাকা পুরোকাগজ কালি ধারন করে আর খোদাইকৃত অংশ সাদা থেকে যায়। এরপর কাগজটিকে সাবধানে পাথর থেকে আলাদা করে শুকিয়ে নিলে কালো কালির পশ্চাৎপটে সাদা রেখাগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

এই স্টোন রাবিং থেকে পরবর্তীতে উন্নততর 'উডব্লক' এর মতো আরও সুনিয়ন্ত্রিত ছাপপদ্ধতির উত্তরণ ঘটেছে। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ হতে তিব্বত হয়ে চীনে আগমনের ফলে বুদ্ধের বাণী, জীবনী এবং বিধিবদ্ধ আইন যথাযথ এবং মর্যাদাসম্পন্নভাবে প্রচার করার জন্য মন্ত্র এবং ছবিযুক্ত কাগজ ছাপার পরিধি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সুপরিকল্পিতভাবে ব্লক থেকে একরঙে কাগজে চিত্রের প্রতিরূপ ছাপার কৌশল আবিষ্কার হয় চীনে তাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৫)।[২৪] এই পদ্ধতির ব্যবহারিক যে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তার নাম 'হীরক সূত্র' (চিত্র ২)। ওয়াং চিহ্ মুদ্রিত ১৭ ফুট দীর্ঘ এই পুঁথিটি ছাপা হয়েছিল ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে।[২৫] এটিই তারিখযুক্ত প্রথম কোনো ছাপানো বস্তুর নিদর্শন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার মার্ক অরেল স্টেইন (১৮৬২-১৯৪৩) চীনের মূল ভূখন্ডের উত্তর পূর্বাঞ্চলের তুং হুয়াং শহরের নিকটে হাজার বুদ্ধের গুহা থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে এই পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি ছয়টি বড় উডব্লকের সাহায্যে তুতগাছের ছাল দিয়ে তৈরি কাগজের উপর মুদ্রিত হয়েছিল।[২৬] স্ক্রলটির (scroll) বিষয়বস্তু ছিল বুদ্ধের উপদেশাবলি সংগ্রহ। এর সামনের পৃষ্ঠায় অত্যন্ত সুন্দর একটি কাঠ খোদাই চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। হাতে ঘষে নেয়া এই প্রিন্টটি ছাপচিত্র শিল্পের প্রাথমিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। স্ক্রলটির ছাপা এবং নকশা বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিল্পীর পরিপক্বতা এবং দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ সময়ের ছবি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> These early woodcuts consist of images in broad outline; shading is absent and the line is typified by a graceful curvature. The folds and details of drapery tend to fall either into hairpin bends or loops.[২৭]

---

[২৪] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'ছাপাখানা: চীন থেকে চিনসুরা', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ১৩

[২৫] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 35 ; ফজলে রাব্বি, *ছাপাখানার ইতিকথা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ ২; Mosaku Ishida, *Japanese Buddhist Prints*, New York, Harry N. Abrams,1964, P. 19

[২৬] খান মাহাবুব, 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের পথচলা', 'দৈনিক ইত্তেফাক' ৩১ জানুয়ারি ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ, http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMzFfMTRfNF8yNF8xXzEwNTE3MQ== প্রেক্ষিত ৩১-০১-২০১৪ খ্রি.

[২৭] Michael Rothenstein, *Relief Printing*, New York, Watson-Guptill Publications, 1970, p. 17

এ ছাড়া রাজ আদেশ ছাপানো এবং সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে প্রথম কাগজের টাকা ছাপানোর জন্যও উডব্লক ব্যবহার করা হয়েছিল।[২৮] ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকার একচ্ছত্রভাবে সিল্ক অথবা কাগজে লোহা, তামা এবং ব্রোঞ্জের পাত থেকে ছাপ নিয়ে টাকা ছাপাত। টাকার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সিঁদুর বর্ণে টাকা ছাপা হতো।[২৯] চায়নিজ লোক-কাহিনিরও রঙিন অলংকরণ করা হতো। এবং এ ধরনের কয়েকটি পাতা একত্রে আঠা দিয়ে জুড়ে বইয়ের মতো তৈরি করা হতো। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছয় রঙে মুদ্রিত রঙিন অলংকরণযুক্ত বই প্রকাশিত হয়।

ধীরে ধীরে চায়নিজ মুদ্রণের আদি গৌরব তার ক্ষমতা এবং আকর্ষণ হারাতে থাকে। তবে তা প্রতিবেশী দেশ জাপানের জনপ্রিয় শিল্পরীতির উত্তরণের পথকে সুগম করে। চীন থেকে জাপানের দূরত্ব বেশি না হলেও ছাপানোর কলাকৌশল অনেক পরেই সেখানে বিস্তার লাভ করে। ছাপচিত্রের ইউরোপীয় যুগের সমসাময়িক বা তার কিছু আগে। জাপানি কাঠ খোদাই চিত্র মানে সরলতম আকৃতি, স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমান রেখা এবং নিখুঁত সমতল ক্ষেত্র। মূলত তাং রাজত্বকাল (৬১৮-৯০৬) থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং স্থাপনায় জাপানের উপর চীনের প্রভাব লক্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপান আসার মাধ্যমেই এখানে শিল্পচর্চার সূত্রপাত। যদিও কিছু আদিম চিত্রচর্চা আগে থেকেই ছিল। অষ্টম শতকে জাপানে প্রথম কাঠ খোদাই ব্যবহার করে ছাপা শুরু হয়। এ সময় বুদ্ধের বাণী লেখার জন্য পশ্চাৎপট অলংকরণে কাঠ খোদাই ব্যবহৃত হতো।[৩০] বাইরে থেকে আগত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই এই ধর্মীয় বাণী এবং ছাপার পদ্ধতি জাপানে আনেন। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে সাদা চামড়ার উপর কাঠ খোদাই পদ্ধতিতে ছাপা একটি সিংহের ছবি জাপানে ছাপার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।[৩১] ৭১০-৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নারা (nara) রাজধানী থাকার সময় চায়নিজ শিল্পধারা ও রীতিনীতির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় জাপানি শিল্পে। এ সময় নারার সম্রাজ্ঞী সোতোকু (৭১৮-৭৭০) জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের লক্ষ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে (দশ লক্ষ) বৌদ্ধসূত্র কাগজে কাঠ খোদাই মাধ্যমে ছেপে বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে বিতরণের নির্দেশ দেন। ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কাজটি শেষ হয়। ইতিহাসে এর মাধ্যমে সম্রাজ্ঞী সোতোকু শুধুমাত্র একজন নিবেদিতপ্রাণ বৌদ্ধই নন; বরং বৃহৎ আকারের ব্লকপ্রিন্টিং শিল্পের প্রথম পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩২]

---

[২৮] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art*, London, Laurence King, 1984, p. 243

[২৯] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 36

[৩০] Peter Swann, *Art of China Korea and Japan*, London, Thames and Hudson, 1963, p. 241

[৩১] Michael Rothenstein, *Relief Printing*, New York, Watson-Guptill Publications, 1970, p. 13; Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 42

[৩২] Mosaku Ishida, *Japanese Buddhist Prints*, New York, Harry N. Abrams, 1964, p. 11; Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 42

একাদশ শতকের শুরুতে শুধু বৌদ্ধ মঠগুলোতেই বুদ্ধের বাণী, ছবি এবং পরে পুঁথি ছাপানোর জন্য কাঠ খোদাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এ সময়ে ধর্মীয় বাণী অলংকরণের জন্য হাতে রং করা ছাপাই ছবিরও ব্যবহার দেখা যায়।[৩৩] হাইয়ান যুগের (৭৯৪-১১৮৫) প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে দেখা যায়, বুদ্ধের বাণী সংবলিত পাখাটির মুল ড্রইং তৈরি করা হয়েছে ব্লক ব্যবহার করে ছাপ নিয়ে। অর্থাৎ ছাপ দিয়ে ড্রইং তৈরি করে নিয়ে হাতে রং করা হয়েছে। সোনার মতো মূল্যবান ধাতুও ব্যবহার করা হয়েছে পাখাটি অলংকরণের উদ্দেশ্যে।[৩৪] এ থেকে সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রার আভিজাত্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রথম দিকের অধিকাংশ ছাপছবিই সাদা-কালো, সরল, রেখাপ্রধান এবং আলোছায়াহীন। এ সময়ের ছবি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> Until the end of the sixteenth century, the only printing works in Japan were those of the monasteries, and here the woodcut was mainly used for crude, stereotyped devotional pictures-outline images printed in black- made by buddist monks.[৩৫]

কিন্তু সপ্তদশ শতকের দিকে পরিস্থিতির দ্রুত বদল হতে থাকে। গৃহযুদ্ধের (civil war) পর ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে টোকুগাওয়া লেইজু (১৫৪৩-১৬১৬) তাঁর সেনাশাসিত সরকারের রাজধানী স্থাপন করেন ইডো-তে (edo), যা আজকের টোকিও। সমুদ্রবন্দর থাকার দরুন নতুন এই রাজধানীর ব্যবসায়িক গুরুত্ব খুব দ্রুতই বাড়তে থাকে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির সাথে আবির্ভাব হয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির। কিন্তু বিত্তসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এসব মানুষের সামাজিক মর্যদা ছিল একেবারে তলানিতে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কারণ সেখানে উঁচু সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সাথেও তারা সমানভাবে মিশতে পারত। ফলে থিয়েটার, সুমো এবং পতিতালয়গুলোতে ভিড় বাড়তে থাকল এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তখন শিল্পীরাও তাদের কাজে এই নতুন সময়কে উপস্থাপন করা শুরু করলেন। এই ছবিই হলো জনপ্রিয় *উকিও-ই* (ukiyo-e)। এ সময় জাপানি ছাপচিত্র ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করে মূলত উকিও-ইর মাধ্যমে। উকিও-ই একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় পরিভাষা; এর অর্থ হচ্ছে, ভাসমান পৃথিবীর ছবি। এ শিল্পধারা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে তৎকালীন ইডোর সামজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই শিল্পধারা সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক–

---

[৩৩] Walter Chamberlain, *The Thames and Hudson Manual of Woodcut Printmaking and related techniques*, London, Thames and Hudson , 1978, p. 33

[৩৪] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art*, London, Laurence King, 1984, p. 255

[৩৫] Michael Rothenstein, *Relief Printing*, New York, Watson-Guptill Publications, 1970, p. 19

> উকিয়োএ ছাপচিত্র জাপানে শুরু হয় মধ্য এদো যুগে (১৬০৩-১৮৬৮) বা তারও আগে মুরোমাচি যুগে (১৩৩৬-১৫৭৩)। চীনা যৌনচিত্র (পর্নোগ্রাফি বা অ্যারোটিক আর্ট) 'শুনকিউহিগিগা' বা কারা বিজিনগার প্রভাবে জাপানি শিল্পীরা 'শুনগা' নামে অভূতপূর্ব যৌনচিত্র মুদ্রণ করেন। সেই সময় চীন 'কারা' হিসেবে পরিচিত ছিল জাপানে। বলা যায় উকিয়োএর পূর্ববর্তী রূপ হচ্ছে এই এরোটিক আর্ট শুনগা। অবশ্য প্রাচীনকালে হেইয়ান যুগ (৭৯৪-১১৮৫) থেকেই জাপানি চিত্রকলার দুটি প্রধান ধারা বা ঘরানা 'কানোও হা' এবং 'তোসা হা' শিল্পীদের প্রভাব উকিয়োএ ছাপচিত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া আধুনিক মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) এসে 'য়োওফুউগা' বা 'পাশ্চাত্য চিত্রকলা' এবং 'শাসেইগা' বা 'বাস্তবচিত্র' শৈলীর প্রভাবও পড়েছে উকিয়োএ ছাপচিত্রে।[৩৬]

জাপানি ঐতিহ্যগত ধারণা আনুযায়ী এর অর্থ হলো মায়াময় বা ক্ষণস্থায়ী। সমাজের নিম্নবিত্তের লোকদের হাতে এর উদ্ভব, বিশেষত রাজধানী ইডোর মতো দ্রুতবর্ধিষ্ণু নগরের।[৩৭] সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে শিল্পী হিসিকাওয়া মরোনবু (১৬১৮-১৬৯৪) প্রথম একটি এক পাতার কাঠ খোদাই ছাপ তৈরি করার মাধ্যমে এর সূত্রপাত। তাঁর চিত্রশৈলী হলো কোমলতা এবং ভীষণ সরলতার এক ছন্দোময় সংগতি, যা পরবর্তীকালের জাপানি ছাপচিত্র আন্দোলনকে সুবিশাল মহত্ত্বে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা তাঁর ছাপাই ছবিগুলো সাদা মসৃণ কাগজের বিপরীতে কালো ও সূক্ষ্ম বহিঃরেখায় সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। জাপানি মাস্টারদের মধ্যে টোরি কিয়োনবু (১৬৬৪-১৭২৯) প্রচুর পরিমাণে একক ছাপচিত্র তৈরি করেন, যার অধিকাংশই অভিনয়শিল্পীদের প্রতিকৃতি এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে টোরিস্কুল জাপানি ছাপচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উকিও-ইর উৎপাদন এবং বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বিষয়বস্তুতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফুল, পাখি, খেলনা, ঘুড়ি, তাস খেলা, ঐতিহাসিক কাহিনি, ব্যঙ্গচিত্র, সুন্দরী নারী, পতিতা, গেইশা, কাবুকি অভিনেতা, যৌনতা, নদ-নদী, ভূ-দৃশ্য ইত্যাদি ছবির বিষয় হয়ে ওঠে। প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে করা সাধারণ জীবনযাত্রার এসব ছবি দামেও খুব সস্তা হওয়ার কারণে সাধারণের মাঝে ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু সামাজিক কাঠামোয় নিম্নস্তরের লোক এর প্রধান ক্রেতা হওয়ার কারণে নীচু জাতের শিল্প বলে একে হেয় করা হয়। তা ছাড়া এই উকিও-ই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অধিকাংশ শিল্পীই স্বশিক্ষিত। এই লোকশিল্পীরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি বরং গুরুর শিল্প উত্তরাধিকারকে পরম্পরায় বহন করেছেন। (যেমনটা আমরা কলকাতার কালীঘাট পট ও বটতলার ছাপচিত্রের ক্ষেত্রেও দেখেছি পরে)ফলে এ শিল্পধারা (উকিও-ই) চারুশিল্প হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বাণিজ্যিক শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ এই কাঠ খোদাই ছবিগুলোর অধিকাংশই কাবুকি, নোহ্-থিয়েটার এবং বিজ্ঞাপনের অভিনয়শিল্পীদের জন্য বানানো

---

[৩৬] প্রবীর বিকাশ সরকার, 'বিস্ময়কর জাপানের উকিয়োএ ছাপচিত্র', *ঢাকা টাইমস*, ০১ অক্টোবর ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ; http://old.dhakatimes24.com/2014/10/01/38902 প্রেক্ষিত ০১-০৩-২০১৭ খ্রি.

[৩৭] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art*, London, Laurence King, 1984, p. 594

হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কাবুকি জাপানি ছাপাই চিত্রের বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।[৩৮] এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বক্তব্যকে আরও সরল করবে বলে ধারণা করা যায়–

> মঞ্চের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে নতুন এক ধরনের দৃশ্যশিল্প তৈরি হয়--তা ছাপচিত্র। প্রথমে ছাপচিত্র হত শুধু সাদা-কালোয়। পরে আসে রঙিন ছাপচিত্র। এই ছাপচিত্র উকি-ও-ই নামে পরিচিত হয়--অর্থাৎ জীবনের চলমান দৃশ্যের চিত্র। এই ছাপচিত্রের সময়কাল হল ১৭৪০--১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। শিল্পীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাটকীয়তাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। অনেকে শুধু নাটকের পুরুষ চরিত্রের চিত্রণ করেছে। অনেকে আবার করেছে গেইশাদের চিত্র। এমনকি ভূত-প্রেত, দৈত্যদানোও চিত্রে স্থান পায়।[৩৯]

এসব ছাপচিত্রের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে চেরিগাছের কাঠের তক্তা, সুমি কালি, রঙিন করার জন্য ভাতের মাড়ের সাথে রঙের পিগমেন্ট এবং ওয়াশি নামের খসখসে পাতলা কাগজ। প্রথম দিকের উকিও-ইগুলো সরল, সাধারণ, রেখাপ্রধান এবং সাদা-কালোতে মুদ্রিত। পরে চাহিদা এবং শিল্পীর দক্ষতা দুটোই বাড়ার ফলে আস্তে আস্তে তা রঙিন করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। প্রথম দিকে ছাপা শেষ হওয়ার পর তুলি দিয়ে হাতে রং করা হতো। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে শিল্পী ওকোমুরা মাসানবু (১৬৮৬-১৭৬৪) এবং সুজুকি হারুনবু (১৭২৫-১৭৭০) চায়নিজদের উদ্ভাবিত রঙিন ছাপ তৈরির পদ্ধতি (১৭৪০)[৪০] কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকটা রঙের জন্য আলাদা আলাদা ব্লক ব্যবহার করে রঙিন ছাপচিত্র তৈরি করেন। জটিল এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হতো। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক–

> উকিয়োএ চিত্র যিনি সৃজন করতেন তাকে বলা হতো এ-শি। সেটাকে মুদ্রণাকারে বাস্তব রূপ দিতেন আরও দুইজন মিলে। এরা হলেন : যিনি ছবিটিকে কাঠের ওপর খোদাই করতেন তাকে বলা হতো হোরি-শি এবং যিনি ছাপতেন তাকে বলা হতো সুরি-শি। এই দুইজন কখনো কখনো এ-শি তথা শিল্পীর শিষ্য বা ছাত্র না হয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন স্টুডিওতে। শিল্পী তাঁদের নির্দেশ দিতেন কীভাবে ছাপতে হবে। অনেক সময় একই চিত্র কিছুটা পরিবর্তন করেও রং ভিন্ন ছাপা হতো।[৪১]

প্রথম দিকে দুই বা তিন রং ব্যবহার করে ছাপ নেয়া হতো, পরবর্তী কোনো কোনো শিল্পী ১৫টি পর্যন্ত বা আরও বেশি রঙের ব্লক ব্যবহার করে ছাপচিত্র তৈরি করেছেন। প্রাথমিক রঙিন ছাপপদ্ধতি তৈরির উল্লেখযোগ্য শিল্পী ওকোমুরা মাসানবু (১৬৮৬-১৭৬৪) গৃহস্থালির কর্মরত মহিলাদের নিয়ে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। এ ছাড়া কালি, বুটি দ্বারা চিত্র তৈরি এবং সোনা ও রুপার প্রলেপ দেয়ার পদ্ধতি

---

[৩৮] Walter Chamberlain, *The Thames and Hudson Manual of Woodcut Printmaking and related techniques*, London, Thames and Hudson, 1978, p. 38

[৩৯] বুলবন ওসমান, *শিল্পকলা দেশে দেশে*, ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ২০০২, পৃ ৭৭

[৪০] Walter Chamberlain, op. cit., p. 39; https://tokyoandjapan.wordpress.com/tag/okomura-masanobu-and-suzuki-harunobu/ প্রেক্ষিত ১৮-১০-২০১৩ খ্রি.; Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 48

[৪১] প্রবীর বিকাশ সরকার, 'বিস্ময়কর জাপানের উকিয়োএ ছাপচিত্র', *ঢাকা টাইমস*, ০১ অক্টোবর ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ; http://old.dhakatimes24.com/2014/10/01/38902 প্রেক্ষিত ০১-০৩-২০১৭ খ্রি.

নিয়েও গবেষণা করেন। আর শিল্পী সুজুকি হারুনবু-র (১৭২৫-১৭৭০) ছবিতে উঠে এসেছে অভিজাতদের জীবনচিত্র, সুন্দরী রমণী এবং ইডোর পতিতারা। এ ব্যাপারে তিনি কিতাগাওয়া উতামারোর (১৭৫৩-১৮০৬) প্রতিদ্বন্দ্বী। অতুলনীয় সূক্ষ্মতা এবং সাবলীলতা লক্ষণীয় তাঁর কাজে। তাঁর প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতির দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে–

> উকিয়োএর এগোয়োমি বা বর্ষপঞ্জিচিত্র (পিকচার ক্যালেন্ডার) আঁকার পথিকৃৎও তিনিই। বিরাট মাপের এই শিল্পী ১৭৬৫-৭০ মাত্র পাঁচ বছরে বিশটি চিত্রসংকলন, এক হাজারেরও বেশি রঙিন ছাপচিত্র, অন্যান্য চিত্র এবং শুনগা এঁকেছেন। সামুরাইদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন বলেই অসামান্য সব কাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বিজিনগা বা নারীচিত্রগুলোর তুলনা মেলা ভার। বিশেষ করে ওওকুবি-এগুলো, যেগুলোতে খাড়া-দীর্ঘ কলার-কিমোনো পরিহিতা পতিতা ছাড়াও সাধারণ নারীরা আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের চোখেমুখে অতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি এবং যৌনভঙ্গিমা সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।[৪২]

কাবুকি থিয়েটারের অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করেছেন তোশুসাই সারাকু (১৭৯৪-১৭৯৫)। সারাকু জাপানি ছাপচিত্র ইতিহাসে এক রহস্যময় চরিত্র। তিনি কি কোনো একক ব্যক্তি না কোনো সংঘবদ্ধ দল, এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া না গেলেও মাত্র এক বছরের মধ্যে করা কাজের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে ধারণা করা হয় সারাকু একটি প্রতিষ্ঠানই ছিল। কাবুকি থিয়েটারের অভিনেতা ছাড়া কিছু সুমোকুস্তিগীর এবং যোদ্ধাও দেখা যায় তাদের ছবিতে। তাদের শিল্পকর্ম খুব জনপ্রিয় না হলেও কাবুকি থিয়েটারের শিল্পীদের প্রতিকৃতি তারা ছন্দায়িত রেখায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছাপাই করেছেন। যা সমসাময়িক অনেক শিল্পীকে প্রভাবিত করেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে টোরি কিওনাগার (১৭৫২-১৮১৫) আধিপত্য লক্ষ করা যায়। একই সাথে মার্জিত ভাব এবং শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখা যায় তার কাজে। ২, ৩ বা ৫ টি প্যানেলের ব্যবহার লক্ষ করা যায় তার কাজে, যা সে সময়ের বিবেচনায় কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। ইডোর পতিতালয়ের সুন্দরী পতিতাদেরকে বিষয়বস্তু করে যে কয়জন ছবি এঁকেছেন কিতাগাওয়া উতামারো (১৭৫৩-১৮০৬) তাদের অন্যতম। তার নারী চরিত্রগুলো লম্বা এবং সরু, নাক লম্বা, চোখ এবং মুখ ছোট্ট সরু ফাটলের মতো করে চিত্রিত। এ শতকের শেষের দিকে এই শিল্পান্দোলন যাদের হাত ধরে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাৎসুসিকা হকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯)। উকিও-ইর সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী তিনি এবং তার অঙ্কিত ভূ-দৃশ্যগুলো (চিত্র ৩) এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। কাঠ খোদাই মাধ্যমে তিনি অসংখ্য কাজ করেছেন। ইডোর শেষ সময়ের দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে। ভূ-দৃশ্য অঙ্কনের আর এক পথিকৃৎ শিল্পী হলেন অ্যান্ডো হিরোশিগে (১৭৯৭-১৮৫৮)। অ্যান্ডো হিরোশিগের মৃত্যুর পর আরও কিছুকাল উকিও-ই ধারা বজায় রেখেছিলেন উতাগাওয়া কুনিসাদা (১৭৮৬-১৮৬৫) এবং উতাগাওয়া কুনিওসি-রা (১৭৯৭-১৮৬১)।

---

[৪২] প্রবীর বিকাশ সরকার, 'বিস্ময়কর জাপানের উকিয়োএ ছাপচিত্র', *ঢাকা টাইমস*, ০১ অক্টোবর ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ; http://old.dhakatimes24.com/2014/10/01/38902 প্রেক্ষিত ০১-০৩-২০১৭ খ্রি.

> ১৮৬৮ সালে জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে। রাজকীয় ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। প্রায় ৬০০ বছরের দীর্ঘ সামুরাই যোদ্ধা তথা সামরিক শাসনের যুগ শেষে রাজতন্ত্র-গণতন্ত্রমিশ্রিত মেইজি যুগের সূচনা হয়। জাপান গ্রাম্য খোলস ছেড়ে পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার পোশাকে সজ্জিত হতে থাকে। বেনোজলের অবাধে প্রবেশ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার জীবনধারা যা নিপ্পনবাসীকে বদলে দিতে থাকে। এই ব্যাপক এবং অকস্মাৎ পরিবর্তনের শিকার হয় উকিয়োএ সংস্কৃতি। নতুন ধারার আধুনিক শিল্পকলার প্রচলন, ক্যামেরার দৌরাত্ম্য এবং স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণশিল্পের কাছে মিলিয়ে যেতে থাকে এই ইউনিক ছাপচিত্রকলা। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে শিল্পীরাও হারিয়ে যেতে থাকেন, বিপুল সংখ্যক উকিয়োএ বহির্বিশ্বে চলে যায়, ইউরোপীয়রা এর কদর বুঝতে পেরে স্থান দেন জাদুঘরে। আর দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মূল্যবান উকিয়োএ চিত্রগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রীর 'মোড়ক' বা 'রেপিং পেপারে' পরিণত হয় এর আপন দেশ জাপানে।[৪৩]

সারাকুর কাবুকি থিয়েটারের অভিনেতা, উতামারোর পতিতা, হিরোশিগে এবং হকুশাইর ভূ-দৃশ্য, এগুলো জাপানি ছাপচিত্রকলার উজ্জ্বলতার কিয়ৎদাংশ মাত্র। তাদের দক্ষতা এবং শিল্পের প্রতি গভীর অনুরক্তিই এই শিল্পধারাকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় আধিষ্ঠিত করেছে। জাপানে ছাপচিত্রের সূচনা চায়নিজ এবং কোরিয়ানদের হাত ধরে হলেও বিষয়বস্তু, প্রায়োগিক কৌশল এবং দক্ষতা জাপানকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। ছন্দায়িত রেখা, সমতল রং বিন্যাস, সূক্ষ্ম ডিটেইলিং এবং কম্পোজিশনের অভিনবত্ব একে শিল্পের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক শিল্পান্দোলনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। জাপানি শিল্পের এইধারা শুধুমাত্র যে এশিয়ার শিল্প ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা-ই নয়, বরং উনিশ শতকের ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার শিল্পীদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

অষ্টম শতকে (৭৫১) সমরখন্দে চীনের সাথে আরবদের যুদ্ধের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর কাগজ তৈরি এবং মুদ্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে আরবীয়রা ধারণা লাভ করে। তাদের বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীরা এই পদ্ধতিসমূহের সুযোগ ভালোভাবেই গ্রহণ করে। নবম শতক থেকে তারা মোটামুটি নিয়মিতই কাগজ ব্যবহার করে *কোরান*এর প্রতিলিপি তৈরি করা শুরু করে। শুরু থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোরান শরিফ ছাপানোর কোনো অনুমতি ছিল না। বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কোরান পবিত্র গ্রন্থ, এটি সবসময় হস্তলিখিতই হতে হবে এবং এটি ছাপানার চেষ্টা করা ধর্মবিরুদ্ধ। তবে কিছু কিছু ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন লেখা বা নকশা ছাপানোর ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল না। পারস্যে মঙ্গলদের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে ছাপার কৌশলও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। তবুও নানা ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে মুদ্রণ পদ্ধতি চীন বা জাপান কিংবা ইউরোপে যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল আরবীয় মুসলিম সমাজে দীর্ঘকাল তা পারেনি। ছাপানোর পদ্ধতি চীন থেকে সিল্ক রুট হয়ে ইউরোপে আসে। আর কাগজও চীন থেকে আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে বিস্তার লাভ করে।[৪৪] কাগজের সহজলভ্যতা এবং ব্যাপকতা লাভের আগ

---

[৪৩] প্রবীর বিকাশ সরকার, 'বিস্ময়কর জাপানের উকিয়োএ ছাপচিত্র', *ঢাকা টাইমস*, ০১ অক্টোবর ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ; http://old.dhakatimes24.com/2014/10/01/38902 প্রেক্ষিত ০১-০৩-২০১৭ খ্রি.

[৪৪] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'ছাপাখানাঃ চীন থেকে চিনসুরা', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ১৪

পর্যন্ত ছাপার পদ্ধতি পুরোপুরি বিকাশ লাভ করতে পারেনি, কারণ তখন লেখা, ড্রইং বা ছবি আঁকায় পার্চমেন্ট ব্যবহার করা হত। চামড়া দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে পার্চমেন্ট ছাপার জন্য খুব কার্যকরী ছিল না এবং এর দামও ছিল খুব বেশি।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রাপ্ত 'Bois Protat' নামক একটি ব্লকের টুকরোকে ইউরোপে ছাপা সংক্রান্ত প্রাচীন নিদর্শন বলে মনে করা হয়।[৪৫] এতে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার দৃশ্য আঁকা আছে, ক্রুশের সামান্য অংশসহ যীশুর বাম হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে দুজন রোমান সেনা এবং একজন সেনানায়ককেও দেখা যাচ্ছে। এটি তৈরি করার সময়কাল ১৩৭০-১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ ।[৪৬] প্রাথমিকভাবে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং নেদারল্যান্ডে ছাপার কলাকৌশল বিস্তার লাভ করে এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের পরে ইংল্যান্ড এ তালিকায় যোগ হয়। প্রথম দিকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুযুক্ত ছবির আধিপত্য থাকলেও কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ছবিও লক্ষ করা যায় ফেরিওয়ালাদের বিক্রি করা তাসে (চিত্র ৪)। এই তাসই ইউরোপে প্রথম ব্যাপক পরিমাণে ছাপা হয়েছিল কাঠ খোদাই মাধ্যম ব্যবহার করে। প্রাথমিক পর্বে ১৪০২-১৪২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের ছবিগুলো কালো পশ্চাৎপটের বিপরীতে স্থুলরেখায় নির্মিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাতে রং করার জন্য এগুলো নির্মিত হতো। তবে পঞ্চাশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কাটাগুলো জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্থাপত্য এবং ভূ-দৃশ্য বিষয়ক উপাদান ব্যবহৃত হতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো একটি মোটা বহিঃরেখা দ্বারা ঘেরা থাকত। এ সময়ে ইউরোপের ছাপছবির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে 'ব্লকবুক' (block book) এর প্রকাশনা। এগুলো কখনো কখনো ছাপের মাধ্যমে অলংকৃত করে হাতে লেখা হতো। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাপা এবং ছবি দুটোই কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা হতো। কাঠ খোদাই ব্যবহার করে ছোট ছোট প্রচারপত্র, যাজকদের ছবি ও প্রার্থনার বাণী ছেপে তীর্থ যাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় আনুগত্য প্রকাশের জন্যও এগুলো ছাপা হতো। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কাঠ খোদাই চিত্র বা ছবির ছোট একটা সিরিজ একত্রে বাঁধাই করে বইয়ের মতো তৈরি করা হতো। উডব্লক থেকে ছাপা হতো বলে এগুলোকে একত্রে 'ব্লকবুক' বলা হতো।[৪৭] পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ছাপা প্রাচীনতম বাইবেলগুলো (Biblia Picta, Pau perum) যীশুর জীবনভিত্তিক পবিত্র 'ব্লকবুক' ই। জার্মানি এবং নেদারল্যান্ড থেকেই এগুলো বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তবে চলনশীল হরফের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর ব্লক থেকে ছাপার পদ্ধতিটি অচল হয়ে পড়লেও শিগগিরই তা আবার ফিরে আসে চলনশীল হরফের দ্বারা লিখিত বিষয়ের অলংকরণের মাধ্যম হিসেবে। অর্থাৎ টেক্সট চলনশীল হরফের মাধ্যমে ছেপে কাঠ

---

[৪৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Bois_Protat প্রেক্ষিত ০১-০৩-২০১৭ খ্রি.

[৪৬] তদেব

[৪৭] E. H. Gombrich, *The Story of Art*, Sixteenth edition, New York, Phaidon Press, 1995, p. 282

খোদাই দ্বারা তা অলংকরণ করা হতো। পনেরো শতকের শেষের দিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই এ পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল।

আরমোরিয়াসদের (armorers) ব্যবহৃত এনগ্রেভিং (মাধ্যমটি) শিল্পের মাধ্যম হয়ে ওঠে ইতালিয় স্বর্ণকার থমাসো ফিনিগুইরার (১৪২৬-১৪৬৪) হাতে। তবে এর অনেক আগেই নবম শতকের মাঝামাঝিতে (৮৪৭) জাপানি বৌদ্ধযাজক ইনিন (৭৯৩/৯৪-৮৬৪) চীন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা শেষে দেশে ফেরার সময় অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সাথে বুদ্ধের ১০০ চিত্রিত ছবিযুক্ত একটি তামার আয়না নিয়ে আসেন। এটা আসলে একটি তামার প্রিন্টিং প্লেট ছিল, যাতে ছবিগুলো ছিল খোদাই করা। সে অর্থে চীনেই প্রথম এনগ্রেভিংয়ের চর্চা শুরু হয়েছিল পঞ্চম রাজবংশের সময় (৯০৯-৯৬০)। কিন্তু প্রচুর প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে মুদ্রণজনিত জটিলতার জন্য সম্ভবত মাধ্যমটি একসময় আর ব্যবহার করা হয়নি।[৪৮] জর্জিও ভাসারি (১৫১১-১৫৭৪) থমাসো ফিনিগুইরাকে এনগ্রেভিং আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিলেও বর্তমানে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডেও একই সময়ে বেশ উন্নত স্তরের এনগ্রেভিং চর্চাই চলছিল। জার্মানিতে প্রাপ্ত *স্কাউরিং অব ক্রাইস্ট*কে অথবা *ক্রাইস্ট ক্রাউনড্ উইথ থর্ন*কে এনগ্রেভিংয়ের প্রাচীন নির্দশন বলে মনে করা হয়। (শিল্পীর নাম জানা যায় না, ১৪৪৬)।[৪৯] আবার ১৪৩০-১৪৫০ এর মধ্যে প্রচলিত 'মাস্টার অব দ্য প্লেইং কার্ডস্'ও উপরোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে। অজ্ঞাতপরিচয় এই এনগ্রেভারের কাজের রীতি সাধারণ, কিছুটা স্মারক ধরনের, স্বর্ণকারদের কাজ থেকে আলাদা এবং স্বল্প অলংকরণযুক্ত। আবার ১৪৪০-১৪৬৭-এর মধ্যে প্রচলিত মাস্টার ই. এস.ও একজন কৃতি ছাপচিত্রী। ধারণা করা হয়, তিনি মাস্টার অব দ্য প্লেইং কার্ডের ছাত্র। মাস্টার ই. এস.ই প্রথম প্লেটে স্বাক্ষর করা শুরু করেন। পরবর্তীতে এনগ্রেভিং মাধ্যমটির উন্নতি সাধন করেন মার্টিন সেহোনগার (১৪৪০-১৪৯১)। তিনি সামান্য কারুশিল্পের মাধ্যম থেকে একে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমে পরিণত করেন। তাঁর কাজের মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তী উত্তর-গথিক শিল্পধারা থেকে প্রাণোচ্ছল এবং প্রাচুর্যপূর্ণ রেনেসাঁ শিল্পরীতিতে উত্তরণের ধাপগুলো স্পষ্ট। বুরিন (burin) চালনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ মেলে তাঁর প্রস্তুত করা ছাপাই ছবিসমূহতে। তাঁর কাজ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> ...Schonogauer was anxious to convey every little homely detail of the scene, and to make us feel the very texture and surfaces of the objects he represents. That he should have succeeded in doing so with out the help of brush and colour, and without the medium of oil, borders on the miraculous. One can look at his engravings through a magnifying glass and study the way he characterizes

---

[৪৮] Mosaku Ishida, *Japanese Buddhist Prints*, New York, Harry N. Abrams, 1964, p. 13; Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 36)

[৪৯] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 171

> the broken stones and bricks, the flowers in the cargs, the ivy creeping along the vault, the fur of the animals and the stubbly chins of the shepherds. But it is not only his patience and craftsmanship we must admire. We can enjoy his tale of Christmas without any knowledge of the difficulties of working with the burin.[৫০]

বুরিন এনগ্রেভিংয়ের ক্ষেত্রে ইতালিতে এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন আন্দ্রে মানটেগ্না (১৪৩১-১৫০৬)। তিনি এনগ্রেভিং মাধ্যমে শক্তিশালী রেখা এবং আলোছায়ার যথার্থ বিন্যাসে ছাপচিত্রের ইতিহাসে নিজের অবস্থানকে সংহত করেছেন। বস্তুত এ সময় কাঠ খোদাই ও এনগ্রেভিংস্ মাধ্যমে করা শিল্প খুব দ্রুতই সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের ধারণা বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়। তখনকার দিনে একজন আরেকজনের কাজ থেকে ধারণা নেয়াটা আজকের মতো অসম্মানজনক ছিল না, ফলে মুদ্রণ প্রযুক্তি খুব দ্রুতই ইউরোপ এবং ইউরোপের বাইরে শিল্পের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে ছাপার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে জাহান্নেস্ গুডেনবার্গের (১৩৯৮-১৪৬৮) 'মুভেবল টাইপ' আবিষ্কারের মাধ্যমে। ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে বিখ্যাত ৪২ লাইনের বাইবেল (বা মাজারিন বাইবেল) ছাপান।[৫১] তাঁর এই আবিষ্কারের খবর খুব দ্রুতগতিতে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির এই আবিষ্কার শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছাপাই ছবি বিক্রির দোকান, প্রেস, টাইপ এবং চিত্র সহযোগে বই ছাপার উদ্দেশ্যে কাঠ খোদাই শিল্পীদের গুরুত্ব এবং চাহিদা বাড়তে থাকে। এর কিছুকাল পরে বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হয় অবিস্মরণীয় *ন্যুরেমবার্গ ক্রনিকেল* (১৪৯৩)। ৬৪৫টি কাঠ খোদাইয়ের দক্ষ ও উপর্যুপরি ব্যবহারে প্রায় ১৮০০ অলংকরণ নিয়ে এটি প্রকাশিত হয়। এতে শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন আলব্রেচ ডুরার (১৪৭১-১৫২৮), উইলহেম প্লেডেনউরফ্ (১৪৬০-১৪৯৪) প্রমুখ। আর এই শিল্পীদলের নেতৃত্বে ছিলেন মাইকেল ওলগেমুট (১৪৩৪-১৫১৯)।[৫২] এই শতকের শেষ থেকে অলব্রেচ ডুরার পশ্চিমা কাঠ খোদাই শিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় উপনীত করেন। একজন অসামান্য চিত্রকর, ড্রাফট্সম্যান এবং লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র হলো ছাপচিত্র। এক্ষেত্রে তিনি এক নতুন দিক উন্মোচন করেন এবং ছাপচিত্রকে একটি স্বাধীন শিল্পমাধ্যমে উন্নীত করেন। কাঠ খোদাই মাধ্যমের নাটকীয় উচ্চতার ধারণা তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর হাত ধরেই ইউরোপে ছাপচিত্রকলা সু-উচ্চমানে পদার্পণ করে। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু ধর্মীয়, যীশু এবং ভার্জিন মেরির

---

[৫০] E. H. Gombrich, *The Story of Art*, Sixteenth edition, New York, Phaidon Press, 1995, p. 284

[৫১] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 70

[৫২] ibid, p. 74

জীবনভিত্তিক হলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকেও তিনি অবলোকন করেছেন গভীর মমতায় এবং প্রচণ্ড ধৈর্য ও নিবিড় বিশ্বস্ততার সাথে তার প্রতিলিপি তৈরি করেছেন। ন্যুরেমবার্গ ক্রনিকেল প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পর ডুরার তাঁর বিখ্যাত তিনটি সিরিজ প্রকাশ করেন। এগুলো হলো *অ্যাপোক্লিপস্, দি গ্রেট প্যাশন, দি স্মল প্যাশন* এবং *লাইফ অব দ্য ভার্জিন মেরী*। এ সময়কার সাদামাটা সরল ছবির দুনিয়ায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে অ্যাপোক্লিপস্ (চিত্র ৫)। যা আগের তুলনায় অনেক পরিণত, জটিল এবং সূক্ষ্ম। এ ছাড়া ধাতু খোদাই মাধ্যমেও তিনি স্বতন্ত্র ছাপছবি তৈরি করে এ মাধ্যমেরও মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটান। ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম ধাতু খোদাই শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> His graver could roam freely over the copper plate and create the finest textures, dots, and lines crossing in any direction, without interrupting the flow of the line. Here the artist could surrender himself completely to his magnificent obsession by telling a story in terms of infinite detail- be it the skin of a woman, the fur of a cat, the bark of a tree, the glint of a helmet, or the soft folds of silk or velvet.[৫৩]

করণকৌশলগত দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্ফূর্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার দিক থেকে তাঁর ছাপাই ছবি পূর্বের থেকে একেবারে আলাদা। এর মাধ্যমে ডুরার নিজেকে এক অনতিক্রম্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ সময়কার আর একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী লুকাস ক্রান্স দ্য এল্ডার (১৪৭২-১৫৫৩)। তিনি কিছুসংখ্যক উড ও মেটাল এনগ্রেভিং করেছিলেন যেগুলো নিজস্ব পৌরুষে দীপ্যমান। এ ছাড়া নানামাত্রিক ব্যবহারে তিনি আলো-আঁধারির শিল্পকেও নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেন।[৫৪] অন্যদিকে ডুরারের সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডাচ্ শিল্পী লুকাস ভন লেইডেন (১৪৯৪-১৫৩৩)। তাঁর কাজের বিষয়বস্তু এবং করণকৌশলেও নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। তাঁর অধিকাংশ কাজ বাইবেল বিষয়ক হলেও কখনো কখনো তিনি চিরন্তন নারী নিয়তিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন তাঁর ধাতু খোদাইয়ের জন্য। এ মাধ্যমে তিনি অপার্থিব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। লুকাসের এনগ্রেভিংয়ের রেখাগুলো দীর্ঘ, প্রবহমান এবং আলতোভাবে বেঁকে গিয়ে অবয়বগুলোর স্বাভাবিক সৌষ্ঠব, ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে ছবিতে একীভূত করেছে। তিনি বেশির ভাগ কাজই কাঠ খোদাই মাধ্যমে করেছেন। তবে কিছু এচিংও করেছেন ধাতু খোদাইয়ের সহকারী মাধ্যম হিসেবে। এ সময়ের আরও দুইজন উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্রী হলেন হ্যান্স বার্গকমেইর (১৪৭৩-১৫৩১) এবং হ্যান্স হলবেইন দ্য ইউংগার (১৪৯৭-১৫৪৩)।

---

[৫৩] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 182

[৫৪] ibid, p. 80

কাঠ খোদাই এবং বুরিন এনগ্রেভিংয়ের সহজতম বিকল্প হিসেবে জার্মানি এবং ইতালিতে সমসাময়িক সময়ে এচিং মাধ্যমের সূত্রপাত। যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও সমসাময়িক শিল্পীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি উপর্যুক্ত মাধ্যম দুটি। কারণ এনগ্রেভিং বেশ কঠিন এবং কাঠ খোদাই ডিটেইলিং ও অবজারভেশনের চূড়ান্ত উপস্থাপনের জন্য অনুপযুক্ত ছিল। ফলে ধাতব পাতে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে এসিডের দ্বারা এচিং করে ছবি আঁকার সূত্রপাত হয়। জানা মতে তারিখযুক্ত প্রথম এচিং ছাপা হয়েছিল ১৫১৩তে সুইস্ শিল্পী উরস গ্রাফের (১৪৮৫-১৫২৭/৮) হাতে।[৫৫] তবে এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ উরস গ্রাফের সাথে ড্যানিয়েল হপারের (১৪৯৩-১৫৩৬) নামও উচ্চারণ করে থাকেন।[৫৬] প্রথম দিকে এচিং করা হতো লোহার পাতে। কিন্তু লোহার পাত এসিডে তক্ষণের সময় রেখার গভীরতা কম হয় ও রেখার বৈশিষ্ট্য সুন্দর থাকে না। এই অসুবিধা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এচিং করার ক্ষেত্রে কপার প্লেটের ব্যবহার শুরু হয়। ডাচ্ শিল্পী লুকাস ভন লেইডেন প্রথম এচিং করার জন্য কপার প্লেট ব্যবহার করা শুরু করেন।[৫৭] কপার পাতে এচিং শুরু হওয়ার কিছুকাল পর পর্যন্ত খুব কমসংখ্যক এচিংই উৎকর্ষে তৎকালীন এনগ্রেভিংয়ের সাথে তুলনীয়। তবে কপারের সহজলভ্যতা এচিং মাধ্যমের সম্ভাবতা এবং সূক্ষ্মতাকে আরও প্রসারিত এবং সহজতর করে। ফলে মাধ্যমটি নতুন শিল্পীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হতে থাকে। এচিংয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূক্ষ্ম রেখার ব্যবহার দেখা যায় আলব্রেচ অল্টডোয়ারফারের (১৪৮০-১৫৩৮) কাজে। তিনি ছিলেন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডস্কেপ এচার (landscape etcher), যিনি এচিং এবং কাঠ খোদাইয়ে বিষয়বস্তুর পশ্চাৎপট হিসেবে ভূ-দৃশ্যের ব্যবহার শুরু করেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগাস্টিন হিরেচভোগেল (১৫০৩-১৫৫৩) এবং হ্যান্স লুটেনসেক (১৫২৪-১৫৬০) ভূ-দৃশ্য চিত্রণ করেন। একই রকম সুচিন্তিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ রেখার ব্যবহার দেখা যায় ইতালিয় শিল্পী পারমিজিয়ানিনোর (১৫০৩-১৫৪০) কাজে। আবার ফ্লেমিশ এনগ্রেভার হেন্ডরিক গোল্টজিয়াস (১৫৫৮-১৬১৭) ধাতব পাতের পৃষ্ঠতলের গুণাগুণ বিচার করে কাঁটা ও বুনট তৈরির অবিশ্বাস্য রকমের দক্ষতা অর্জন করেন। এ ছাড়া বুরিন ব্যবহারের সর্বোত্তম উৎকর্ষও তিনি প্রদর্শন করেছেন। এ সময়ের আরও উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন মার্কান্টোনিও রেইমন্ডি (১৪৮০-১৫৩৪), জেন ডুভেট (১৪৮৫-১৫৬২), অ্যালার্ট ক্লাসেজ (১৪৯৮-১৫৬৪), কর্নেলিস্ মাতসিস (১৫০৮-১৫৬৫), জর্জিও গিহিস্ (১৫২০-১৫৮২) প্রমুখ।

---

[৫৫] Gale Colin, *Printmaking Handbook Etching and Photopolymer intaglio Techniques*, Great Brtain, A & C Black, Reprinted 2009, p. 7

[৫৬] Walter Chamberlain, *The Thames and Hudson Manual of etching and engraving*, London, Thames and Hudson, Reprinted 1992, p. 11

[৫৭] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 188

সপ্তদশ শতকের অসাধারণ ছাপচিত্রগুলোর অধিকাংশই এচিং মাধ্যমে করা। এনগ্রেভিং এ সময় ভীষণভাবে বাণিজ্যিক এবং পুনরুৎপাদনের মাধ্যম হয়ে পড়ায় এচিংই শিল্প রচনার প্রধানতম মাধ্যমে পরিণত হয়। উপকরণের মানোন্নয়ন ঘটে এবং স্টপআউট ভার্নিশ দিয়ে আলোছায়ার গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ফলে উন্মুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, পরিবর্তনশীল এবং নমনীয় এই মাধ্যমটি সৃষ্টিশীল শিল্পীদের লোভনীয় মাধ্যমে পরিণত হয়। এ সময়ে গুইডো রেনির (১৫৭৫-১৪৪২) হালকা রেখা এবং বিন্দু দিয়ে কাজ করার ব্যাপারটি তৎকালীন ইতালির এচারদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। কাছাকাছি সময়ে রঙিন ইন্টাগ্লিও প্রিন্ট নিয়ে প্রথম প্রকৃত নিরীক্ষা করেন হারকিউলিস স্যেগারস্ (১৫৮৯-১৬৩৫)।[৫৮] ছাপচিত্রের ইতিহাসে তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী এবং গবেষক, যিনি তাঁর সময়ের অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর কাজের রীতি পুরোপুরি প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। তিনি হালকা রং দেয়া ক্যানভাসে প্রিন্ট করেছেন, কালো পশ্চাৎপটের বিপরীতে অস্বচ্ছ সাদা রেখার ব্যবহার করেছেন এবং হাতে বিভিন্ন রং প্রয়োগ করে ছাপ তৈরি করেছেন। তাঁর এচিং পদ্ধতিও ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। এচিংয়ে ক্ষয়ে যাওয়া রেখা তাঁর বিষয়বস্তুর (জঙ্গল, পাহাড়, গাছপালা, পাথর প্রভৃতির) সাথে ভীষণ সংগতিপূর্ণ। এই ধরনের রেখা তাঁর আগে কেউ এচিংয়ে ব্যবহার করেনি। সেজন্য কিছু কিছু পণ্ডিতের ধারণা, তিনিই লিফট্ গ্রাউন্ড (lift ground) টেকনিক আবিষ্কার করেন। তাঁর অধিকাংশ ছাপছবিই শৃঙ্গময় এবং আকর্ষণহীন শুষ্ক ভূ-দৃশ্য। এ ছাড়া তিনি স্টিল লাইফ এবং ফিগারও এঁকেছেন, তবে সবকিছু নিষ্প্রাণ পাথরের মনে হয়। প্রথাবিরোধী আরও একজন শিল্পী জো ডি বিবেরা (১৫৯১-১৬৫২)। তিনি এচিং মাধ্যমে ইতালিয় আদর্শবাদী ধারণার বাইরে বেরিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতিমান শিল্পী তাঁর গুণ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ছাপাচিত্রের ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আর একজন শিল্পী জ্যাকুইস্ কেল্‌ট (১৫৯২-১৬৩৫)। তাঁর সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থাকে তিনি কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। টোনাল ভেরিয়েশন তৈরির জন্য বারবার এসিড তক্ষণ করার পদ্ধতি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। নিজের তৈরি বিশেষ ধরনের এচিং নিড্‌ল দিয়ে এনগ্রেভিংয়ের মতো (ফেঁপে ওঠা এবং ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া) রেখার ব্যবহার করেছেন। তাঁর ড্রইংয়ের ধারা মাধ্যম হিসেবে এনগ্রেভিং থেকে এচিংয়ে উত্তরণের সময়কার সুস্পষ্ট ছাপ বহন করে। তাঁর কাজ প্রায়ই আলংকারিক এবং ম্যানারিস্টিক (manneristic)। কোনো কোনো কাজে তিনি শুধু আলংকারিক রীতিকে অতিক্রম করে সর্বজনীন বলিষ্ঠ চিত্রভাষা তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই নতুন ধারার কাজ উনিশ এবং বিশ শতকের সমাজসচেতন শিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। নতুন কৌশল আবিষ্কার ছাড়াও বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাছাকাছি সময়ের বিশিষ্ট প্রতিকৃতি শিল্পী অ্যান্থনি ভন ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১) ২৭ বছর বয়সে সে সময়ের ১০০ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এচিং মাধ্যমে। এই প্রিন্টগুলোকে একত্রে আইকনোগ্রাফি (iconography) বলে। এর

---

[৫৮] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 194

মধ্যে তিনি নিজে মাত্র ১৬টি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন এবং বাকিগুলো তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্যদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছিল।[৫৯] এ সময়ে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্রী থাকলেও সম্ভবত খাঁটি এচিং মাধ্যমের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী রেমব্রান্ডট ভন রিজন (১৬০৬-১৬৬৯)। সমগ্র চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম এচিং শুরু করার পর সমগ্র ক্যারিয়ারে প্রায় ২০০-৩০০টির মতো ছাপচিত্র রচনা করেছিলেন এই মাধ্যমে। যা তাঁকে ছাপচিত্র তথা শিল্পের ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় উপনীত করেছে। একজন এচার হিসেবে তাঁর দক্ষতা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। বিষয় নির্বাচনেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিকৃতি, নিসর্গ, বাইবেল এবং পুরাণের (গ্রিক) বিষয়বস্তুকে চিত্রিত (চিত্র ৬) করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। ভিন্ন ধরনের হ্যাচিং (Hatching) ব্যবহার করে তিনি অসাধারণ আলো-আঁধারির পরিবেশ তৈরি করেছেন তাঁর ছবিতে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য–

> সে আলোর কত যে বৈচিত্র্য! কখনো আধারের সংগে তার সংঘাত ও যোঝাবুঝি, কখনো সমন্বয়। কখনো তা মুক্ত বাতায়নের পথে প্লাবিত, কিংবা তীব্র ও তির্যক্। কখনো ক্লান্ত-কুহেলী সন্ধ্যায় তার বিষন্ন বিস্তার, কখনো বা আমানিশায় মশাল শীর্ষে তার উল্লাস।[৬০]

আলোছায়ার এই অপূর্ব নাটকীয়তা, আঙ্গিক বিন্যাস এবং মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতাই ছাপচিত্রশিল্পের ইতিহাসে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছে। কিন্তু সমকালীন ইউরোপে তাঁর প্রতিভা উপেক্ষিতই থেকে গেছে। কারণ যারা ইতালিয় শিল্পের সুদৃশ্য মানব প্রতিকৃতি দেখে অভ্যস্ত ছিলেন তারা রেমব্রান্টের কাজ দেখে আহত হতেন। তিনি তথাকথিত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের নিখুঁত রূপায়ণকে গুরুত্ব না দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল রেখায় মানব অবয়বের আলোছায়ার সুষ্ঠু বিন্যাসকে উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে সমকালীনদের থেকে তিনি আলাদা এবং নিঃসঙ্গ। আর সেটাই তাঁকে শিল্পের ইতিহাসে অনন্য উচ্চতায় উপনীত করেছে। রেমব্রান্টের সমসাময়িক ওয়েনসেসলাস হলারও (১৬০৭-১৬৭৭) ছিলেন একজন দক্ষ এচার। তাঁর কাজ আজো শিল্প সমঝদারদের আগ্রহের বস্তু। তিনি কয়েকটি প্লেট অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করতেন। বিষয়বস্তু হিসেবে সমসাময়িক জীবনচিত্র, স্থাপত্য বিষয়ক নকশা এবং ভূ-চিত্রকে গ্রহণ করেছেন। লন্ডনে কাজ করার সময় তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা প্রায় তিন হাজার প্লেট রেখে গেছেন যা এই মাধ্যমে তাঁর প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে ছাপাই মাধ্যমে তাঁর প্রচুর সৃষ্টি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা এবং অধ্যবসায় থাকার পরও চরম দারিদ্র্য আর অবহেলায় মারা যান তিনি।[৬১]

---

[৫৯] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 194

[৬০] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, *চিত্র শিল্পের কাহিনী*, কলকাতা, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৮, পৃ ৮৮

[৬১] Fritz Eichenberg, op. cit., p. 193

লুডিং ভন সেইজেন (১৬০৯-১৬৮০) শিল্পী হিসেবে ছিলেন গড়পড়তা মানের, কিন্তু ছাপার পদ্ধতি 'মেজোটিন্ট' (Mezzotint) আবিষ্কার করে তিনি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন।[৬২] সেইজেনের যে অল্প কয়েকটি কাজের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের এনগ্রেভিং টুলসও ব্যবহার করেছেন। ইউরোপে প্রথমবারের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয় অদ্রিয়েন ভন অস্টেড (১৬১০-১৬৮৫)এর ছবিতে। বীর আখ্যান, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথম সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসেন তাঁর বিষয়বস্তু হিসেবে। তাঁর ছবি সাধারণ এবং নাটকীয়তা বর্জিত। এই শতাব্দীর অন্য একজন কৃতি ছাপচিত্রী রবার্ট নেনটুইল (১৬২৩/৩০-১৬৭৮)। তিনি মূলত প্রতিকৃতি শিল্পী এবং এই প্রতিকৃতি শিল্পকে কারুশিল্প থেকে চারুশিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেন নিজের দক্ষতায়। বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে প্রতিকৃতির মডেলিং এবং কাপড়ের অংশে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর করা অধিকাংশ কাজই সুন্দরভাবে ফ্রেম করা এবং যথাযথ তথ্যপ্রমাণাদি সংযুক্ত। প্রতিকৃতি শিল্পের আরেকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী আব্রাহাম ব্লোটেলিং (১৬৩৪-১৬৯০)। তিনি মেজোটিন্ট মাধ্যমের উন্নতির জন্য রকার (rocker) আবিষ্কার করেন এবং ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতির সূচনা ঘটান।[৬৩] এর পর থেকে সেখানে মাধ্যমটি ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে চর্চিত হতে থাকে। যা পরবর্তী সময়ে ইংলিশ স্টাইল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মেজোটিন্ট মাধ্যমের চমৎকার কালো রং এবং টোনাল গ্রেডেশনের কারণে এটি মৌলিক চিত্র নির্মাণ অপেক্ষা পুনরোৎপাদনের জন্য বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিকৃতি এনগ্রেভিংয়ের রীতি চালু হয়। যদিও তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে আমরা পাই না তবুও ইউরোপীয় ছাপচিত্রের ইতিহাসে সেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়কেই তুলে ধরে। এন্তোনি মেসন (১৬৩৬-১৭০০), জিরার্ড ইডিলিংক (১৬৪০-১৭০৭) প্রমুখ এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিন্টমেকিংয়ের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র ছিল ইতালি। এই শতাব্দীর প্রথম বিশিষ্ট ছাপচিত্র শিল্পী ছিলেন রোকোকো মাস্টার গিউভানি বাতিস্তা টিপোলো (১৬৯৬-১৭৭০) । সুনিপুণ দক্ষতায় অনিন্দ্যসুন্দর এচিং লাইন ব্যবহার করে অসাধারণ অতিব্যক্তিময় আলোছায়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর ছাপচিত্রে। আলোছায়ার কয়েকটি সূক্ষ্ম ধাপ বা পর্যায় লক্ষ করা যায় তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি ছাপচিত্রে ছন্দোময় সূক্ষ্ম বুনট দ্বারা স্পষ্ট এবং জীবন্ত পরিসর তৈরি করেছেন। তাঁর শিল্প এচিং মাধ্যমের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে টিপোলোর এই ধারা সপ্তদশ শতকের ইতালির নাটকীয় ছাপচিত্রকলা, বিশেষত রেমব্রান্টের ছাপচিত্রের প্রভাব দ্বারা উদ্ভূত হলেও স্বকীয়তায় তিনি উজ্জ্বল। অপর ইতালিয় শিল্পী এন্টোনিও ক্যানালেত্তো (১৬৯৭-১৭৬৮) শুদ্ধ এচিং মাধ্যমে কাব্যিক কিছু কাজের দ্বারা ভেনিসের রহস্যময় আবহকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ছাপাই ছবির প্রায়

---

[৬২] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 346

[৬৩] ibid., p. 349

সবগুলোই স্থাপত্য নিদর্শনে পূর্ণ। ছাপছবিগুলোতে ভেনিস একদিকে যেমন আলোর বন্যায় ভেসে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শান্ত নির্মেঘ গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে ঝকঝক করছে। যে কারো উপরেই অসহনীয় এই আলোর প্রভাব লক্ষ করা যায়। গল্প বলার কোনো প্রবণতা তাঁর কাজে লক্ষ করা যায় না বরং বিভিন্ন ধরনের রেখার সুষম ব্যবহারে দর্শককে প্রশান্তি দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। টু-পয়েন্ট লিনিয়ার পারস্পেকটিভ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন অগ্রগণ্য হিসেবেও তিনি বিবেচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ শিল্পী ইউলিয়াম হোগার্থের (১৬৯৭-১৭৬৪) আগ পর্যন্ত ইংরেজ ছাপচিত্রে বিদেশি প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত স্বকীয়তার পাশাপাশি একটি জাতীয় স্বকীয়তাও তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ছাপচিত্রকে গণমানুষের শিল্পে পরিণত করেছিলেন। কাজের মাধ্যমে তৎকালীন ইংরেজ সমাজব্যবস্থাকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে কটাক্ষ করেছেন। এচিং ও এনগ্রেভিং মাধ্যমে কাজ করলেও বিষয়বস্তুই তাঁর কাজকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কাঠের প্রস্থচ্ছেদ বরাবর খোদাই করে অভিজাত ধাতু খোদাইয়ের সাথে সহজেই পাল্লা দিতে পারে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন ফরাসি শিল্পী জ্যাঁ মাইকেল প্যাপিলন (১৬৯৮-১৭৭৬)।[৬৪] কিন্তু তখন এটাকে মুদ্রণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দরিদ্রতম বলে গণ্য করা হতো। কিছু ক্ষেত্রে নামপত্র, বিজ্ঞপ্তি, ওয়ালপেপার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার জন্য এটি ব্যবহৃত হতো। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে রেজিন (resin) দানা প্রয়োগ করে অ্যাকোয়াটিন্ট (aquatint) পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন জ্যাঁ চার্লস ফ্রাঙ্কোইস্ (১৭১৭-১৭৬৯)। ছাপচিত্রের করণকৌশলগত এই পরিবর্তন আসার পর আলোছায়ার ক্রম তৈরিতে ব্যাপকভাবে অ্যাকোয়াটিন্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সময় স্থাপত্যবিষয়ক ছাপচিত্র করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইতালিয় গিয়াভানি বাতিস্তা পিরানিসি (১৭২০-১৭৭৮)। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের এবং সম্ভবত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিষয়ক ছাপচিত্রীদের একজন। পুরনো রোমান স্থাপত্য সবসময় তাঁর আগ্রহের বস্তু ছিল। এ বিষয়ে তিনি প্রচুর ছবি যোগ করে ছাপচিত্রের ২৭টি ভলিউম প্রকাশ করেন।[৬৫] এ ছাড়া ভূরি ভূরি ছাপচিত্র তিনি রচনা করেছেন, যার অধিকাংশই অতুলনীয় এবং অনেকগুলোই শুধু ডকুমেন্টেশনের সীমা ছাড়িয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। পিরানেসি কখনোই স্থাপত্যের সোজাসাপ্টা বাস্তবায়নে সন্তুষ্ট ছিলেন না বরং রোমান স্থাপত্যের অন্তর্গত চিরন্তন সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করেছেন কাজে। তাঁর নিড্‌লের ব্যবহার এমনই সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত যে, এচিং ছাড়া আর কোনো মাধ্যমেই তাকে কাজে পরিণত করা অসম্ভব বলে বোধ হয়। মূলত রোম এবং ভেনিস নিয়ে করা ছবিগুলোই তাঁকে শতাব্দীর নায়কে পরিণত করেছে। এ সময় এনগ্রেভিংয়ে ক্রেয়নতত্ত্ব (crayon method) চালু করে স্মরণীয় হয়েছেন জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট লা প্রিন্স (১৭৩৪-১৭৮১)।[৬৬] তবে রেমব্রান্টের পরে ছাপচিত্র শিল্পের আরেকজন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হলেন একই শতকের ফ্রন্সিসকো ডি গইয়া (১৭৪৬-১৮২৮)। তিনি মানব প্রকৃতির

---

[৬৪] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 92

[৬৫] ibid., p. 203

[৬৬] ibid., p. 209

অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরেছেন তাঁর ছাপকর্মে। তৎকালীন স্পেনিশ সমাজ এবং ক্যাথলিক গির্জার ব্যভিচার, দুর্নীতি, রাজদরবারের ষড়যন্ত্র, অভিজাত শ্রেণির ঔদ্ধত্য এবং চাষাভূষাদের ডাইনিতত্ত্বের উপর বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশ করেছেন নিজের কাজের মাধ্যমে। আবার যুদ্ধের ভয়াবহতাকেও (চিত্র ৭) তিনি তুলে ধরেছেন একইভাবে। এসব ছাপচিত্রের মাধ্যমে মানুষকে চিরকালের মতো সতর্ক করেছেন তিনি। গইয়ার ভাষায় 'to stop being inhuman to each other.'[৬৭] গৃহযুদ্ধের হিংস্রতা থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষের যে ভয়াভয়তা, বর্বরতা এবং নিষ্ফলতাকে তিনি ছবিতে তুলে ধরেছেন শিল্পের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। তাই বলা যায়, 'উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর বক্তব্য ঋজু ও স্পষ্ট। অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তীব্র।'[৬৮] মাধ্যম হিসেবে প্রধানত লাইন এচিং এবং অ্যাকোয়াটিন্ট ব্যবহার করলেও শেষ দিকে কিছু লিথোগ্রাফও করেছেন তিনি, যা ছাপচিত্রের ইতিহাসে শৈল্পিক এবং করণকৌশলগত দক্ষতার চূড়ান্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাপচিত্র শিল্পী থমাস বেউইক (১৭৫৩-১৮২৮)। তিনি ইংল্যান্ডের আধুনিক বই অলংকরণের জনক। ষোড়শ শতকের প্রথম থেকেই শিল্পীদের কাছে ধাতু খোদাই এবং এচিং নিখুঁত ও সুন্দর ছাপাইকর্মের জন্য বেশি উপযোগী বলে মনে হওয়ার কারণে কাঠ খোদাই অতীতের শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। বেউইক এই মাধ্যমের পুনর্জাগরণ ঘটান। এনগ্রেভিংয়ের জন্য মাইকেল প্যাপিলন প্রবর্তিত শক্ত কাঠের প্রস্থচ্ছেদ ব্যবহার শুরু করেন তিনি। ফলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধাতবযন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে আলোছায়ার অপূর্ব সন্নিবেশ ঘটাতে সক্ষম হন। তাঁর প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রাসঙ্গিক–

> His greatness lies in the perfect harmony between his technique and his subject matter. Chief among his innovations was a new conception of the black and white picture. He did not think of it as a white space on which black outlines and solids made a linear design printed in relief, the background having been cut away to a lower level, as in the woodcuts of the fifteenth and sixteenth centuries, or in the crude illustrations in the chapbooks peddled round the country in the days of his youth. Instead he began with a black void out of which the subject appears in a varying range of grey tones with pure white for the lightest parts. This creation of a grey tint gives the subject a "colour", an atmosphere, and a third dimentional quality never before achieved in the woodcut.[৬৯]

---

[৬৭] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 226

[৬৮] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, *চিত্র শিল্পের কাহিনী*, কলকাতা, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৮, পৃ ৯৭

[৬৯] Philip James, *English Book Illustration 1800-1900*, London, The King Penguin, 1947, p. 18

প্রাণিবিষয়ক কাঠ খোদাই তাঁকে খ্যতিমান করে তোলে এবং একজন ডিজাইনার, ইলাস্ট্রেটর এবং এনগ্রেভার হিসেবে তাঁর মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[৭০] এ সময়ের ইংরেজ ব্যঙ্গরূপকারদের এক সার্থক প্রতিনিধি হলেন থমাস রোলান্ডসন (১৭৫৬-১৮২৭)। এচিং মাধ্যমে ছাপা তাঁর অধিকাংশ কাজই বই এবং ম্যাগাজিনের অলংকরণের জন্য সম্পন্ন হলেও স্বতন্ত্রভাবে ছেপেও তিনি তা বিক্রি করতেন। অত্যন্ত মেধাবী এবং দক্ষ এই ব্যঙ্গরূপকার ভীষণ মজার মাধ্যমে তৎকালীন ইংরেজ সমাজের নৈতিক এবং সামাজিক জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। তবে প্রথাগত এসব উপস্থাপন থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭)। তিনি তাঁর কবিত্ব এবং ছবি আঁকার প্রতিভাকে একসূত্রে বেঁধে রাজনীতি, ধর্ম এবং মনস্তত্ত্বকে ভিন্ন ছকে প্রকাশ করেছেন। কল্পনা এবং নিরীক্ষাপ্রবণ এই ছাপচিত্রী ইংল্যান্ডে ভূ-চিত্র অঙ্কনের স্বর্ণ যুগে বসে প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে অনুভূতি, কল্পনাশক্তি এবং ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চিত্রের জগৎ দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার আলোকে আঁকা নয়, বরং তিনি বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন মনের চোখ দিয়ে দেখে।[৭১] করণকৌশলের ক্ষেত্রে তিনি সবধরনের মাধ্যমই ব্যবহার করেছেন। কাঠ ও ধাতু খোদাই থেকে শুরু করে রিলিফ এচিংও (relief etching)। রিলিফ এচিং পদ্ধতিটি তিনিই প্রথম চালু করেন।[৭২] এক্ষেত্রে লেখা অথবা নকশা উল্টো করে এঁকে নিয়ে এসিডরোধী পদার্থ দিয়ে ঢেকে দিয়ে একটি ক্ষয়কারী রাসায়নিক সমগ্র প্লেটের উপরে দিয়ে দেয়া হতো। ফলে লেখা এবং নকশা একইসাথে উঁচু হয়ে ফুটে উঠত এবং একবারেই একটি পৃষ্ঠা ছাপানো সম্ভব হতো। নিজের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতেই তিনি তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ছেপেছেন।

এচিং, এনগ্রেভিং, মেজোটিন্ট এবং কাঠ খোদাই মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ছবি আঁকা চলে আসলেও ছাপচিত্রে শিল্পী আর শিল্পকর্মের মধ্যকার প্রাণস্পর্শের ঘাটতির সীমাবদ্ধতাটুকু অপসারিত হয় লিথোগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুর সন্ধিক্ষণে (১৭৯৭-৯৮) জার্মান নাট্যকার অ্যালয়স্ সেনেফিল্ডার (১৭৭১-১৪৩৪) লিথোগ্রাফ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মাধ্যমটিকে প্রথম জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন।[৭৩] ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে শিল্পীদের করা কাজ নিয়ে লিথোগ্রাফির প্রথম সংগ্রহ *Specimens of Polyautography* প্রকাশ করেন ফিলিপ আন্দ্রে (?-?)।[৭৪] এতে কাজ করেন থমাস স্টুথার্ড (১৭৫৫-১৮৩৪), হেনরি ফুসেলি (১৭৪১-১৮২৫), রিচার্ড কুপার (১৭৪০-১৮১৪), বেনঞ্জামিন ওয়েস্ট (১৭৩৮-১৮২০), জেমস ব্যারি (১৭৪১-

[৭০] John Rayner, *A Selection of engravings on wood by Thomas Bewick*, London and New York, The King Penguin Books, 1947, p. 20

[৭১] কামাল আহমদ, *শিল্পকলার ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ ১৫-১৪

[৭২] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 217

[৭৩] Erwin Neumayer and Christine Schelberger, *Popular Indian Art Raja Ravi Varma and The Printed Gods of India*, New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 6; Gascoigne Bamber, *How to Identify Prints*, Reprinted edition, Spain, Thames and Hudson, 1991, p. 19a

[৭৪] Fritz Eichenberg, op. cit., p. 376

১৮০৬) প্রমুখ শিল্পীগণ। উইলহেম রেউটার (১৭৬৮-১৮৩৪) ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনের কয়েকজন শিল্পীর করা কলম এবং ক্রেয়ন লিথোগ্রাফের একটা ফোলিও প্রকাশ করেন। সে সময়ে ছাপচিত্রের প্রধান মাধ্যম ছিল এচিং এবং শিল্পীরা লিথোগ্রাফকে প্রথমে এই এচিং পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার কারণে প্রথম দিকের লিথোচিত্রগুলো ভীষণ রৈখিক। বস্তুত অ্যাকোয়াটিন্ট তখনও সদ্য আবিস্কৃত হওয়ায় সবার হাতে পৌঁছায়নি, আর মেজোটিন্ট তো প্রথম থেকেই পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তা ছাড়া শুরুতে লিথোগ্রাফির করণকৌশলও ভীষণ গোপনীয় ছিল তবে সেনেফিল্ডার মাধ্যমটির পেটেন্ট লাভের পর ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে A Complete course of Lithography প্রকাশ করার মাধ্যমে ছাপার এই নতুন মাধ্যমটি সর্বসাধারণের হাতে পৌঁছায়। এর মাধ্যমে ছাপার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে (১৮৩০) মাধ্যমটি মোটামুটি পরিণত হয়ে ওঠে। কারণ সেনেফিল্ডার সারাজীবনই মাধ্যমটির উন্নতি সাধনের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ফলে প্রাথমিকভাবে এটি পুনরৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে ভীষন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময় রঙিন চিত্র ছাপাইয়ের ব্যাপারেও মাধ্যমটি নিয়ে নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। সেনেফিল্ডার নিজেও রঙিন ছবি ছাপার ব্যাপারে তত্ত্বগত ধারণা দিয়েছিলেন। তবে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ছাপচিত্রী জর্জ ব্যাক্সটার (১৮০৪-১৮৬৭) বাণিজ্যিকভাবে টেকসই রঙিন ছাপ পদ্ধতির পেটেন্ট লাভ করেন, যা প্রথমে কাঠ খোদাইয়ে ব্যবহৃত হলেও খুব দ্রুতই (দু-বছরের মধ্যে) তা লিথোগ্রাফেও প্রযোজ্য হয়ে ওঠে।[৭৫] সমসাময়িক সময়ে (১৯৩৭) গডফ্রে এঙ্গেলম্যান (১৭৮৮-১৮৩৯) 'ক্রমোলিথোগ্রাফ' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার মাধ্যমে উচ্চমানের রঙিন ছবি ছাপা সম্ভব ছিল।[৭৬] তিনিই ফ্রান্সে লিথোগ্রাফির প্রচলন করেন।

ফ্রান্স ছিল উনিশ শতকের বিশ্বশিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। শিল্পের ইতিহাসে এ এক উত্তাল সময়। নতুন নতুন শিল্পতত্ত্ব আর নতুন নতুন শিল্পমাধ্যমে শিল্পের উঠান তখন সরগরম। এ সময় লিথোমাধ্যমে রঙের মাত্রার ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি (litho-tint) আবিষ্কার করেন চার্লস জোসেফ হালমেন্ডেল (১৭৮৯-১৮৫০)। সারাজীবনই লিথোগ্রাফিক পদ্ধতির উন্নতির জন্য কাজ করেছেন তিনি। এই মাধ্যমের করণকৌশল সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'দ্য আর্ট অব ড্রইং অন স্টোন' (১৮২৪)[৭৭] তিনি প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ব্রিটিশ লিথোগ্রাফির গুরুত্বপূর্ণ এই চরিত্র প্রায় হাজারেরও বেশি লিথোচিত্র নির্মাণ করেছেন। এ সময়ে শিল্পী জ্যাঁ আগস্ত দামিনিক ইনগ্রে (১৭৮০-১৮৬৭) ছাপাই মাধ্যমে কিছু শিল্প রচনা করেন। আবার সাদা-কালো লিথোগ্রাফিতে নিজের মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন থিওডোর গেরিকাল্ট (১৭৯১-১৮২৪) ও। তিনি সদ্য আবিষ্কৃত মাধ্যমটির প্রথম প্রজন্মের চর্চাকারীদের একজন। এ মাধ্যমে লন্ডনের দরিদ্র

---

[৭৫] Robert Verhoogt, *Art in Reproduction, Ninteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tedma, Jozef Israels and Aryscheffer*, Netherland, Amsterdam University Press, 2007, p. 100

[৭৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Godefroy_Engelmann প্রেক্ষিত ০৮-০৩-২০১৭ খ্রি.

[৭৭] https://en.wikisource.org/wiki/Hullmandel,_Charles_Joseph_(DNB00) প্রেক্ষিত ২০-১২-২০১৪ খ্রি.

জনগোষ্ঠীর জীবনভিত্তিক কিছু চিত্র রচনা করেন তিনি। তবে পেশিবহুল মানবদেহ এবং ঘোড়া আঁকায় তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। লিথোগ্রাফি ছাড়াও এচিং এবং গ্লাস প্রিন্টিংয়েও (glass printing) নিজের দক্ষতার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট ক্যামিল করোট (১৭৯৬-১৮৭৫)। নিওক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক ধারা ভেঙে ভূ-দৃশ্য আঁকার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক রীতির প্রবর্তন করেন ফরাসি এই ছাপচিত্রী। তাঁর ছাপাই ছবিতে অনায়কোচিত সাধারণ জনজীবন প্রতিফলিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততায় পরবর্তীকালের 'ইমপ্রেশনিজম' (Impressionism) এর আগমনী লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের প্রথমে আবিষ্কৃত হওয়া লিথোগ্রাফ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন ইউজিন দেলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩)। লিথোগ্রাফ ছাড়া কিছু এচিং চিত্রও তিনি ছাপাই করেছেন। সমসাময়িক একিলে ডিবেরাও (১৮০০-১৮৫৭) বেশ কিছু লিথোচিত্র করেছেন। তবে লিথোপদ্ধতির প্রধানতম শিল্পীদের একজন হলেন অনরে দমিয়ের (১৮০৮-১৮৭৯)। তিনি একজন প্রধানতম রাজনৈতিক স্যাটায়ারিস্টও বটে। লিথো মাধ্যমে তাঁর মতো এতটা স্বচ্ছন্দ আর কাউকেই দেখা যায় না সমসাময়িক সময়ে। তিনি ভীষণ বিদ্রুপাত্মকভাবে ফ্রান্সের সমকালীন রাজনীতি এবং বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। ট্রান্সফার লিথোগ্রাফিক পদ্ধতি দমিয়েরেই প্রথম ব্যবহার করেন। এই শতকের মধ্যভাগে স্টুডিও পেইন্টিঙের বিরোধিতা করে গড়ে ওঠে 'বার্বিজন স্কুল'। তাদের কয়েকজন ছাপচিত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। প্রকৃতিপ্রেমী থিওডোর রশো (১৮১২-১৮৬৭) অন্য বার্বিজোন শিল্পীদের মতোই রেমব্রান্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভূ-দৃশ্যই রচনা করছেন। আর ভূ-দৃশ্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচিত্র (বিশেষত চাষিদের) বিধৃত করেছেন জ্যাঁ ফ্রাঁসোয়া মিলে (১৮১৪-১৮৭৫)। মাধ্যম হিসেবে লিথোগ্রাফি এবং এচিং ব্যবহার করেছেন তিনি। বার্বিজোন স্কুলের অপর শিল্পী চার্লস ফ্রাঁসোয়া ডুবিগনি (১৮১৭-১৮৭৮) কিছু সাদাকালো ভূ-দৃশ্য ছাপাই করেন এচিং মাধ্যমে। এ ছাড়া উড-এনগ্রেভিং এবং লিথোগ্রাফিতেও কিছু কাজ করেছেন। স্যার ফ্রান্সিস সেইমুর হাডেন (১৮১৮-১৯১০) উনিশ শতকের এচিং চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ইংল্যান্ডে। পেশায় সার্জন হাডেন অবসরকালীন শিল্পী থেকে সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কাজই এচিং মাধ্যমে করা ইংল্যান্ডের ভূ-দৃশ্য। অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি চারপাশের প্রকৃতির প্রামাণিক দলিল তৈরি করেছেন, যা ইংরেজ ভূ-দৃশ্য চিত্রণের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আবার একজন সংগঠক হিসেবে 'সোসাইটি অব পেইন্টার-এচারস্' গঠন করে ছাপচিত্র মাধ্যমের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৮] ভূ-দৃশ্য এবং সমুদ্রদৃশ্যকে বিষয়বস্তু করে আলোর সংস্পর্শকাতরতা এবং তার প্রতিফলনের নানা বিষয় উপস্থাপন করেছেন জন বার্থোল্ড জনকাইন্ড (১৮১৯-১৮৯১) তাঁর এচিং চিত্রগুলোতে। ডাচ এই ছাপচিত্রীর কাজ

---

[৮] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 232

বার্বিজোন স্কুল থেকে ইম্প্রেশনিজমে উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়কালকে নির্দেশ করে। এ সময়ে অনেক ফরাসি শিল্পীই বিশেষ কোনো রীতি বা দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবেই কাজ করেছিলেন। গ্রেট এচিংমাস্টার চার্লিস মিরন (১৮২১-১৮৬৪) এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন। উনিশ শতকের মধ্যভাগের প্যারিসের মেজাজ এবং জীবনকে তুলে ধরেছেন তাঁর এচিং চিত্রগুলোতে। প্যারিস বিষয়ক ছবিগুলোতে স্থাপত্যের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের দক্ষতা লক্ষণীয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দু-একজন শিল্পী এবং সমালোচকই মাত্র তাঁর দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং আধুনিকতার মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁর মতো একই রকম অস্বীকৃতি এবং ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেও রুডলফ ব্রিজডিন (১৮২২-১৮৮৫) এচিং এবং লিথোগ্রাফি উভয় মাধ্যমেই সাবলীলভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ভীষণ অনুপুঙ্খ কাজ, করণকৌশলগত দক্ষতা এবং ড্রইং তাঁকে স্মরণীয় করেছে। আলোর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে স্মরণীয় হওয়া ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা ছাপচিত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই ধারার প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী কামিল পিসারো (১৮৩০-১৯০৩) ছাপচিত্রেও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। প্রায় ৪০ বছর বয়সে শুরু করেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছবি ছেপেছেন তিনি এচিং মাধ্যমে।[৭৯] তাঁর সময়ে এচিংয়ে রং নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অল্প কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে তিনি একজন। তাঁর ছাপাই ছবিতেও ইম্প্রেশনিস্ট ধারার ড্রইং লক্ষ করা যায়। এদুয়ার্ড মানে (১৮৩২-১৮৮৩) এই ধারার অন্য আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী যিনিও ছাপচিত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি এচিং ও কাঠ খোদাই মাধ্যমে কিছু কাজ করলেও তাঁর স্বকীয় এবং সেরা কাজগুলো লিথোগ্রাফিতেই করা। সেখানে বিস্ময়কর দ্রুত এবং নির্ভুল ড্রইং যেন যথাযথ মাধ্যমকেই খুঁজে পেয়েছে। শিল্পী গইয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ক্রোধ ও উত্তেজনাময় মুহূর্তসহ, প্রতিকৃতি, ভূদৃশ্য এবং জড়জীবন এঁকেছেন তিনি।

১৮৫০-১৮৯০ মধ্যবর্তী সময়কালকে ইউরোপের এচিং পুনর্জাগরণ বা ‘এচিং রিভাইবাল’ বলে ধরা হয়। ফেলিক্স ব্রাকিউযন্ড (১৮৩৩-১৯১৪) এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ‘Society of Etchers’ প্রতিষ্ঠা করে চিত্রশিল্পী এবং ছাপচিত্রীদের দ্বারা চিত্রশিল্পের পুনরুৎপাদন বন্ধ করে ছাপাই মাধ্যমে মৌলিক শিল্প রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অন্য সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি ছাপাই শিল্পের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হলেন জে. এম. হুইসলার (১৮৩৪-১৯০৩)। তিনিও ছাপচিত্রের প্রসারে গঠিত বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদের পাশাপাশি এই মাধ্যমে কাজ করে আধুনিক ছাপচিত্রের উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[৮০] বেলজিয়ান ফেলিসিন রূপস (১৮৩৩-১৮৯৮) অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাপচিত্রী, বিশেষত ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। তাঁর চিত্রগুলো কিছুটা যৌনউদ্দীপনামূলক (পর্নোগ্রাফিক), যা তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রকে তুলে ধরে। এ ছাড়া তিনিই প্রথম আধুনিক এচার যিনি অবহেলিত ‘সফট

---

[৭৯] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 230

[৮০] Ibid, p. 232

গ্রাউন্ড এচিং' পদ্ধতিকে সম্মানের আসনে বসান। ছাপচিত্রে অবদান রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এদগার দেগাও (১৮৩৪-১৯১৭)। একজন পারফেকশনিস্ট হিসেবে তিনি ড্রাইপয়েন্ট, অ্যাকোয়াটিন্ট, বার্নিশারসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ব্যবহারের সাথে অত্যন্ত সতর্কভাবে ধাপে ধাপে তাঁর প্লেটগুলো প্রস্তুত করেছেন যতক্ষণ না চরিত্রগুলো আলোছায়ার নাটকীয়তার সাথে সূক্ষ্ম কালো পশ্চাৎপট হতে পৃথক হয়।[৮১] এচিং ও লিথোগ্রাফিতে করা তাঁর ঘোড়া এবং ব্যালে নাচের দৃশ্যগুলো (চিত্র ৮) পর্যবেক্ষণ এবং নির্ভুল সৃষ্টির এক অনন্য নিদর্শন। বলা যায় লিথোগ্রাফ মাধ্যমে নারীর শরীরের মোহনীয় রূপায়ণ দেগার হাতেই শুরু। তাঁর কাজ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> Few artists have had a keener sense of pictorial structure than Degas. The spontaneity of his works is an illusion—albeit an infinitely satisfying one.[৮২]

এ ছাড়া তিনি কিছু মনোপ্রিন্টও করেছেন, কারণ এই মাধ্যমের প্রতি তাঁর অসম্ভব দুর্বলতা ছিল। জাপানি কাঠ খোদাই চিত্রের প্রভাব লক্ষণীয় তাঁর কাজে। আভাগর্দ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ট্রাডিশনাল আর্টের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। রেমব্রান্টের পরে ছাপচিত্র আন্দোলনের যে গৌরব তিরোহিত হয় ১৮৬০ থেকে শুরু হয়ে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা আবার ফিরে আসে ব্যাপকভাবে। এ সময় ঝোড়োগতিতে ফ্রান্স এবং লন্ডনে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে লিথোতে করা জনপ্রিয় পোস্টার শিল্পের মাধ্যমে। রং, ছবি এবং লেখা একত্র করে অত্যন্ত শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম 'লিথো পোস্টার' এর যাত্রা শুরু হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলিস চেরেটের (১৮৩৬-১৯৩২) মাধ্যমে। এজন্য তিনি 'ফাদার অব দ্য ব্যেলে ইপোক পোস্টার' বলে পরিচিত। ক্রোমোলিথোগ্রাফ পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে তিনটি আলাদা রঙের প্লেট দ্বারা চমৎকার ও সস্তা ধরনের রঙিন পোস্টার তৈরি করেন তিনি। আবার পোস্ট-ইমপ্রেশনিজমের অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী পল সেজানও (১৮৩৯-১৯০৬) এচিং ও লিথোগ্রাফি মাধ্যমে অল্প কিছু কাজ করেছেন। মূলত লিথো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার মাধ্যমে শিল্পীর কাজের সাথে শিল্পকর্মের পার্থক্য কমে আসার ফলে সেজানের মতো বড় চিত্রশিল্পীরা ছাপাই মাধ্যমে মৌলিক শিল্প রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্রিজডিনের সংস্পর্শে এসে ছাপচিত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিখ্যাত সিম্বোলিস্ট চিত্রশিল্পী ওডিলন রেডন (১৮৪০-১৯১৬)। কিছু এচিং করলেও অধিকাংশই লিথোগ্রাফ করেছেন। লিথোতে নিজের করণকৌশলগত দক্ষতা প্রকাশ করেছেন গভীরতর এবং ঘন কালো রং ব্যবহারের মাধ্যমে। তাঁর কাজে পরবর্তী বিশ শতকের স্যুরিয়েলিস্ট আন্দোলনের ছায়া লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে শেষ বয়সে প্রিন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে নিজের পূর্ববর্তী চিত্রের ছাপচিত্র

---

[৮১] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 237

[৮২] Bernard Denvir, 'Impressionism', in David Britt edited, *Modern Art*, London, Thames and Hudson, 1974, p. 45

তৈরি করেন পিয়ের অগুস্ত রেনোঁয়া (১৮৪১-১৯১৯)। এ ছাড়া জামার্নিতে ম্যাক্স লিবারম্যান (১৮৪৭-১৯৩৫) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে কিছু এচিং ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৫৪) জাপানের সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলে জাপানি পণ্যসামগ্রী ইউরোপে প্রবেশ এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তৎকালীন ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জুলিস ক্লারিটি (১৮৪০-১৯১৩) একে 'জাপানিজম' বলে অভিহিত করেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর সাথে জাপানি কাঠ খোদাই চিত্রও (যা উকিও-ই নামে পরিচিত) এখানে আসে। তৎকালীন ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব চোখে পড়ে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীই তখন জাপানি কাঠ খোদাই চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাপচিত্রে অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> The Japanese print had become widely fashionable in the second half of the centrury, and had influenced almost all artists working at the time. From the work of Hokusai and Hiroshige, European artists learnt how to organize aflat surface, distorting perspective where necessary and balancing areas of flat colour with line.[৮৩]

জাপানি কাঠ খোদাইয়ের বিরাট প্রভাব লক্ষ করা যায় আমেরিকান বংশোদ্ভূত মেরী ক্যাসাট (১৮৪৫-১৯২৬)এর রঙিন এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট চিত্রগুলোতে।[৮৪] পল গগ্যাঁর (১৮৪৮-১৯০৩) কাজেও জাপানি ছাপচিত্র এবং আফ্রিকান লোকশিল্পের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি লিথোগ্রাফি, উড এনগ্রেভিং এবং উডকাট মাধ্যমেও কাজ করেছেন (চিত্র ৯)। তাঁর *ভোলপিনি স্যুয়িট*এর কাজগুলো লিথোর বদলে জিংকফলকে করছেন যাকে 'জিংকোগ্রাফ' (Zincograph) বলে। তাঁর কাজ উনিশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সে ছাপাই ছবির পুনর্জাগরণে ভূমিকা রেখেছে। বিশ শতকের ফোভিস্টদের (Fovist) মৌলিক রং ব্যবহারের গোড়াপত্তন করেন তিনি। জাপানি ছাপছবির রং এবং সমতলীয় অলংকারধর্মী পশ্চাৎপট ভিনসেন্ট ভ্যানগঘকে (১৮৫৩-১৮৯০) ভীষণ প্রভাবিত করেছিল। হিরোশিগের দুটি উকিও-ই প্রিন্টকে তিনি কপি করেন। এ ছাড়া কিছু প্রতিকৃতিও ছাপাই করেছেন তিনি। সমসাময়িক অনেকের চেয়ে তাঁর উপর জাপানি ছাপচিত্রের প্রভাব ব্যাপক এবং জটিল। চেক লিথোগ্রাফার আল ফোনসে মুসার (১৮৬০-১৯৩৯) উপরও জাপানিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনিও প্রচুর সংখ্যক পোস্টার ছাপাই করেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে করা 'Gismonda' নাটকের পোস্টার তাঁকে রাতারাতি তারকা খ্যাতি এনে দেয়। এতে নতুন ধরনের উলম্বরীতির কম্পোজিশন, রঙের চমৎকার বৈচিত্র্য এবং অল্পকিছু টেক্সট ব্যবহার করে

---

[৮৩] Alastair Mockintosh, 'Symbolism and Art Nouveau', in David Britt edited, *Modern Art*, London, Thames and Hudson, 1974, p. 103

[৮৪] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 238

পোস্টারটির নকশা করেছিলেন তিনি। সমসাময়িক সুইডিস শিল্পী আন্দ্রেস লিওনার্ড জোর্ন (১৮৬০-১৯২০) ও এচিং এবং ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে তাঁর কলাসিদ্ধির নমুনা দেখিয়েছেন। আবার নরওয়েজিয়ান শিল্পী এডওয়ার্ড মুঙ্খ (১৮৬৩-১৯৪৪) অন্য সব সিম্বোলিস্টদের মতো ইম্প্রেশনিস্টদের বহির্দৃশ্যের উপর আলোর তত্ত্বকে অনুশীলন করার রীতিকে বাদ দিয়ে ভালোবাসা এবং ঈর্ষা, একাকিত্ব এবং উদ্বেগ, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মতো অন্তর্গত অনুভূতিকে (বিষয়বস্তু করে) কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন (চিত্র ১০)। তিনি *দি স্ক্রিম* (১৮৯৩) শীর্ষক কাজটির জন্য নন্দিত হলেও আধুনিক যুগের অন্যতম উদ্ভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন ছাপচিত্রীও বটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাপচিত্র তৈরির জন্য প্রাথমিক অনুপ্রেরণা তিনি তাঁর চিত্রকলাগুলো থেকেই নিয়েছিলেন। ছাপচিত্র মাধ্যমের সকল ধারায় নিজের দক্ষতার সাথে সাথে মাধ্যম হিসেবে এর উন্নয়নেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> For instance, he made much use of the wood grain and fibre, deliberately selecting blocks of pine, Spriece or mahogany. He also devised new ways of printing in colour from separate blocks or pieces of blocks, Using various saws to cut a block in to sections and inking each section with a different colour before reassembling them for printing.[৮৫]

উডকাট মাধ্যমে সবচেয়ে বেশিসহ ছাপচিত্রের সকল মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করলেও লিথোগ্রাফির আবেদন তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশিই ছিল। প্রাথমিকভাবে গঁগ্যার কাজ দ্বারা প্রভাবিত হলেও খুব তাড়াতাড়ি নিজের স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করে নিতে সক্ষম হন।

রঙিন লিথোগ্রাফের সূচনা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তা গুনাগুন বিচারে উন্নত ছিল না। হেনরি দ্য তুলুজ লুত্রেকের (১৮৬৪-১৯০১) হাত ধরে তা অনন্য উচ্চতায় উপনীত হয়।[৮৬] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লুত্রেকের *La Goulue, Meulin Rouge* (চিত্র ১১) শীর্ষক পোস্টার, পোস্টারশিল্পকে চারুশিল্পে উন্নীত করে। তিনি সাদা-কালো এবং রঙিন মিলে মোট ৩৭০টির মতো লিথোচিত্র রচনা করেছেন।[৮৭] শিল্পমানের দিক থেকে তাঁর চিত্রকলা এবং ছাপচিত্রকলার মধ্যে কোনো ধরনের ব্যবধান নেই। লুত্রেকের কাজেও জাপানি ‘উকিও-ই’ শিল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায় ভীষণভাবে। তাঁর কাজের ফর্ম, কম্পোজিশন, অদ্ভুত ধরনের পরিপ্রেক্ষিত এবং রিবাট অংশ জুড়ে সমতল রঙের ব্যবহার নিঃসন্দেহে জাপানি কাঠ খোদাই চিত্রের প্রভাব। এমনকি ‘উকিও-ই’ শিল্পীদের

---

[৮৫] Walter chamberlain, *The thames and Hudson manual of woodcut printmaking and related techniques,* London, Thames and Hudson, 1978, p. 51

[৮৬] Hugh Honour & John Fleming, *A World History of Art,* London, Laurence King, 1984, p. 610

[৮৭] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print,* London, Thames and Hudson, 1976, p. 392

মতো একই রকম বিনোদনকেন্দ্র রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, অভিনেতা এবং পতিতালয়গুলো, অর্থাৎ প্যারিসের রাতের জীবনই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু হয়েছে। তিনি আলোর ব্যবহারকে একেবারে উপেক্ষাও করেননি আবার আলোছায়ার সুষম বিন্যাসও যে করেছেন এমনও নয়। তাঁর কাজের কোথাও বক্তব্য আছে, কোনোটা নিরপেক্ষ।[৮৮] কোনো ধরনের ভাবাবেগ বা গল্প বলার প্রবণতাকে আশ্রয় না করে সোজাসাপ্টাভাবেই বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন তিনি। লুত্রেক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পিঁয়ে বোনার্ড (১৮৬৭-১৯৪৭) ছাপচিত্র শুরু করেন। ছাপচিত্রের অন্যান্য মাধ্যমে কাজ করলেও মূলত রঙিন লিথোগ্রাফ ছাপাইতে তিনি উৎকর্ষ অর্জন করেন। তাঁর গ্রাফিক স্টাইল অবসরকালীন ও সমকালীন রীতিবিরুদ্ধ। স্পষ্ট নকশা করে বিশুদ্ধ টোনাল ভ্যালু এবং টেক্সার ব্যবহার করে প্যারিসের নগরজীবনের ব্যস্ততা এবং অভ্যন্তরীণ অন্তরঙ্গতাকে প্রকাশ করেছেন তিনি। জাপানি কাঠ খোদাইয়ের মতো পশ্চাৎপটে সমতল রঙের ব্যবহারও দেখা যায় তাঁর কাজে। ইউরোপে প্রচলিত জাপানিজ প্রিন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরল আকৃতি, সমতল রং এবং শক্তিশালী দেহরেখার ব্যবহার করেছেন এডওয়ার্ড ভুলার্ডও (১৮৬৮-১৯৪০)। নগরজীবনের দৈনন্দিন চিত্র, উষ্ণ অন্তরঙ্গ অভ্যন্তরীণ দৃশ্য ইত্যাদি প্রতিভাত হয়েছে তাঁর কাজে। রঙিন লিথোচিত্রে তিনি সিদ্ধি অর্জন করেন, যা তাঁকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন করেছে। প্রচুরসংখ্যক বই অলংকরণের মাধ্যমে এই শিল্পকেও তিনি নতুন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেন। তা ছাড়া শিল্পচর্চায় নিয়োজিত অন্যদেরকেও এচিং, লিথো প্রভৃতি তথা ছাপচিত্র মাধ্যমে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে এই মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। আবার জাপানি ছাপচিত্রের সরলতা আরও প্রভাবিত করেছে হেনরি মাতিসকেও (১৮৮৯-১৯৫৪)। তিনিও প্রচুর লিথোচিত্র, কিছু লাইন এচিং ছাড়াও কিছু কাঠ খোদাই করেছেন যা, নকশা এবং রঙের বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাইলফলক বলে স্বীকৃত। প্রিন্টমেকিংকে তিনি ড্রইংয়ের একটি এক্সটেনশন বলে মনে করেছেন, যা তাঁর সমগ্র শিল্পচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অধিকাংশ সময়ই তিনি সাদা-কালো চিত্র ছাপাই করেছেন। বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। যেমন: একই ন্যুডকে তিনি বিভিন্নভাবে এঁকেছেন ভিন্ন ভিন্ন অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার সাথে। তবে সরাসরি প্রতিনিধিত্বমূলক না করে এ ক্ষেত্রে খানিকটা বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়েছেন কখনো কখনো। অনিয়ন্ত্রিত রেখা, রং এবং অনুষঙ্গগুলোকে দ্বিমাত্রিক তলে অতি সংবেদনশীলতায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর ছবি দর্শকদের ভালো নাও লাগতে পারে তবে তা ভুলে যাওয়া কঠিন।[৮৯] ছাপচিত্রের এই সাবলীল উপস্থাপন তাঁকে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে ফটোগ্রাফির আবিষ্কার দৃশ্যকলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষত ছাপচিত্রে। এত দিন ধরে চিত্রশিল্প পুনরুৎপাদনের যে ধারা ছাপচিত্রে চলে আসছিল তা

---

[৮৮] কামাল আহমদ, *ইউরোপের একশ দু'জন চিত্রশিল্পী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১, পৃ ৬১

[৮৯] তদেব, পৃ ৬৭

ফটোগ্রাফির দখলে চলে যায়। ফলে ছাপচিত্র সৃষ্টিশীল শিল্পমাধ্যম হিসেবে শিল্পীদের দ্বারা নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ শতকে এসে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে থাকে। এ সময় প্যারিস হয়ে ওঠে শিল্পের কেন্দ্র। ব্রিটেন কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও একই সময়ে জার্মানিও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। জার্মান প্রকাশবাদ এবং পরে বাউহাউস এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জার্মান প্রকাশবাদের দুটি দল 'ড্রাইব্রুক' এবং 'দ্য ব্লু রেইটার' সেখানে গ্রাফিক আর্টের বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানত উডকাট এবং লিথোগ্রাফিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে। পূর্বে ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের কারণে সৃষ্টিশীল মাধ্যম হিসেবে লিথোগ্রাফ গ্রহণযোগ্যতা হারালেও এ সময় তা শিল্পমাধ্যম হিসেবে নতুন প্রাণ ফিরে পায়।[১০] আর উডব্লক মাধ্যমটি পূর্ব থেকেই নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্বের সাথে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করে আসছিল। তবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান প্রকাশবাদী ধারার উত্তরণের সাথে সাথে তাদের হাতেই এ মাধ্যমটি অভিব্যক্তি প্রকাশের এতটাই যথাযথ এবং বলিষ্ঠ মাধ্যম হয়ে ওঠে, যা অতীতের সকল কীর্তিকে অতিক্রম করে যায়। জার্মান প্রকাশবাদী দলের সদস্যরা অতিরঞ্জিত আবেগপূর্ণ রঙের সাথে ভীষণ সরলরেখা যোগ করে তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। এ ধারার একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন ভ্যাসিলি কান্দিনাসকি (১৮৬৬-১৯৪৪)। বিমূর্ত শিল্পের উন্নয়নে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় চিত্রমালা তাঁকে যেমন আজীবন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের অগ্রপথিক করেছে তেমনি শেষের পরিণত কাজে জ্যামিতিক ফর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি জ্যামিতিক বিমুর্ততাবাদের পরিচয়ও ঘটিয়েছেন। ছাপচিত্র শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে এই মাধ্যমের সম্পূর্ণতা সাধন করেছেন, বিশেষত উডকাটে। উডকাট-ই তাঁর উপর সরলতা আরোপ করেছে এবং তাঁর নকশার উপাদানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ঘটাতে সাহায্য করেছে। পরে এগুলোই তাঁর নিজস্ব শৈলী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত অলংকরণ ও বিমূর্ততার মধ্যে পার্থক্য তৈরিতে। জার্মান প্রকাশবাদীরা কোনো তত্ত্ব দ্বারা একত্র না হলেও মানবিক অনুভূতিতে ছিল সমগোত্রীয় এবং কিছুটা কম বহুজাতিক। আবার সবাই কমবেশী ছাপচিত্র মাধ্যমের সাথে জড়িত। লভিস কোরিন্থের (১৮৫৮-১৯২৫) কাজে উনিশ শতকের ন্যাচরালিজম থেকে জার্মান প্রকাশবাদী আন্দোলনে উত্তরণের রূপরেখা দেখা যায়। এর পরবর্তীতে দেখা যায় ক্যাঁথে কোলউয়িথস (১৮৬৭-১৯৪৫)কে। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকেই তুলে ধরেছেন। বিশেষত দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং যুদ্ধের প্রতি শক্তিশালী প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন শিল্পের মাধ্যমে (চিত্র ১২)। সেজন্য তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রোষানলেও পড়েছেন তিনি। তাঁর কাজ অস্থির, উত্তেজনাকর এবং অবিস্মরণীয়। তা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, মৃত্যু এবং ধ্বংস যা-ই প্রকাশ করুক না কেন, তাতে নির্মমতার তীব্রতা কিছুতেই হ্রাস পায় না। তাঁর কাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো

---

[১০] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, pp. 397-398

অবয়বকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা। কখনো কখনো কাপড় বা আচ্ছাদন পুরোটাই অন্ধকারে, আর শুধু মুখ বা হাত দিয়ে পুরো অবয়ব প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম জার্মান প্রকাশবাদী এবং ডাইব্রুক দলের সদস্য এমিল নোলডে (১৮৬৭-১৯৫৬) বিখ্যাত তাঁর বলিষ্ঠ তুলির আঁচড় এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ রং ব্যবহারের জন্য। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকাংশ কাজই সাদা-কালো কাঠ খোদাই, তবে লিথোগ্রাফিতে রং নিয়ে কিছু নিরীক্ষা করেছেন। ভীষণ রকমের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয় তাঁর কাজে। জার্মান প্রকাশবাদী ধারার সক্রিয় সদস্য না হয়েও ভাস্কর, ছাপচিত্রী এবং নাট্যকার আরনেস্ট বারলাস (১৮৭০-১৯৩৮) ছাপচিত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশকিছু সাদা-কালো লিথোগ্রাফ এবং কাঠ খোদাই চিত্র ছাপাই করেন। জীবনঘনিষ্ঠ এসব শিল্পকর্ম সৃষ্টির দায়ে তিনি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রোষানলেও পড়েন। লায়নেল ফিনিঞ্জারও (১৮৭১-১৯৫৬) জার্মান প্রকাশবাদী ধারায় অবদান রেখেছেন। ডার ব্লু রেইডার দলের সদস্য হিসেবে প্রথমে এবং পরে বাউহাউসের সাথে (১৯১৯-১৯৩৩) কাজ করেন। বাউহাউসের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ছাপচিত্র নির্মাণ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কিউবিক ধারার সাথে পরিচিত হওয়ার পর কিউবিক শৈলীতে ভূ-দৃশ্য ছাপাই শুরু করেন। প্রথম দিকে কিছু এচিং এবং লিথোগ্রাফ করলেও প্রধানত তিনি কাঠ খোদাই-ই করেছেন। ফরাসি প্রকাশবাদী শিল্পী জর্জ রাউল্ট (১৮৭১-১৯৫৮) প্রকাশবাদী শিল্পধারায় এমন নিজস্ব শৈলী তৈরি করেন যা তাঁকে আধুনিক শিল্পে এক স্বাতন্ত্রসূচক অবস্থান দিয়েছে। চিত্রকলার মতো ছাপচিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি মোটা কালো বহিঃরেখা দ্বারা ক্লাউন, এক্রোব্যাট, ড্যান্সারদের এমনভাবে এঁকেছেন যা ভ্যানগঘকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি কাজ করেছেন। জার্মান প্রকাশবাদী ধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ড্রাইব্রুক দলের সদস্য অটোমুলার (১৮৭৪-১৯৩০) বেশকিছু সংখ্যক ছাপাইছবি নির্মাণ করেছেন যার অধিকাংশই লিথোগ্রাফ। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল নগ্ননারী, যাদের তিনি খুব বেশি বিকৃত না করেই উপস্থাপন করতে পছন্দ করতেন।[৯১] তাঁর কাজ কিছুটা কাব্যিক এবং অন্য এক্সপ্রেশনিস্টদের থেকে কম যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ফরাসি ছাপচিত্রী জ্যাকুইস ভিলনও (১৮৭৫-১৯৬৩) প্রচুর সংখ্যক রঙিন লিথোগ্রাফ, ড্রাইপয়েন্ট, এনগ্রেভিং এবং এচিং করেছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি লুত্রেক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি পরিণত শৈলীর উন্নয়ন ঘটান, যাতে কিউবিস্টদের মতো সমতল জ্যামিতিক আকৃতির সাথে ইমপ্রেশনিস্টদের রং বিন্যাস ব্যবহার করেছেন। একই সময়ে সুইস প্রকাশবাদী ধারার শিল্পী পল ক্লিও (১৮৭৯-১৯৪৯) ছাপচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এচিং ও লিথোগ্রাফি মাধ্যমে করা তাঁর ছাপাই ছবি বিমূর্ততা, স্বপ্নময় রং ও পরিবেশ নিয়ে নাটকীয় ঢঙে ফুটে উঠেছে।

---

[৯১] Bernard Devnir, ‘Fauvism and Expressionism’, in David Britt edited, *Modern Art*, London, Thames and Hudson, 1974, p. 141

বিশ শতাব্দীর শুরুতে ফবিজম আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আন্দ্রে ডিরেইনের (১৮৮০-১৯৫৪) ছাপচিত্র বিক্ষিপ্ত এবং তাঁর কৌশলও অনিয়ত। তবে সেজান এবং আফ্রিকান আদিম শিল্পের প্রভাবে তিনি কিছু ছাপাই ছবি নির্মাণ করেছেন, যা তাঁকে সময়ের অগ্রগামী শিল্পীতে রূপান্তরিত করেছে। সমসাময়িক ফর্নান্দ লেজে (১৮৮১-১৯৫৫) স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষালাভ করলেও শিল্পের বহু মাধ্যমেই তিনি নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কাজে কিছুটা কিউবিক উদ্ভূত বিমূর্ততা লক্ষ করা যায়। এই কিউবিক শিল্পধারার একজন উদ্ভাবক ও এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯73) সন্দেহাতীতভাবে বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীও। ছাপচিত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন: লিথোগ্রাফ, এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, লিনোকাট, উডকাট প্রভৃতিতে অসম্ভব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মাধ্যমটি নিয়ে তিনি প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। লিনোকাট পদ্ধতিটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। কয়েকটি ছাপাই পদ্ধতি একত্রে করেও তিনি কিছু কাজ করেছেন। জীবদ্দশায় প্রায় হাজারখানেক ছাপাই ছবি (চিত্র ১৩) করেছেন, যার অধিকাংশই সাদা-কালো এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রবল উৎসাহের সাথেই এ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন। শেষের দিকে করা ছাপাই ছবিগুলোতে কিউবিক রীতির চাইতে বিষয়বস্তুর সাদামাটা উপস্থাপনের দিকেই তাঁর মনোযোগ বেশি লক্ষণীয়। সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং অনুভূতির সাহায্যে নিঁখুতভাবে বিষয়বস্তুর নির্যাসকেই তিনি তুলে ধরেছেন সবসময়। একজন অসামান্য চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর হওয়া সত্ত্বেও ছাপচিত্রের সব শাখায়ও তিনি এত অবদান রেখেছেন যে, সে উচ্চতায় আজো তিনি একা। কিউবিক শিল্পধারার অন্য সূচনাকারী জর্জ ব্রাক (১৮৮১-১৯৬৩) তীব্রভাবে জড়জীবন অবয়বকে নিজস্ব শৈলী এবং বুনটের মাধ্যমে গ্রাফিক উপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। ছাপ তৈরির প্রায় সকল মাধ্যমে তিনিও অবদান রেখেছেন।

এ সময়ে ফ্রান্স এবং জার্মানির তুলনায় ইতালিতে ছাপচিত্রের চর্চা অনেক কম হয়েছে। ফিউচারিস্ট শিল্পী আমবার্তো বকিওনি (১৮৮২-১৯১৬) এবং কিউবিস্ট শিল্পী জিনো সেভেরিনি (১৮৮৩-১৯৬৬) কিছু এচিং এবং লিথোগ্রাফ করেছেন। জার্মানিতে কাঠ খোদাইয়ের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে ডাই ব্রুক শিল্পীরা পুনরুদ্ধার করেন, অমসৃণ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং শক্তিশালী স্পষ্ট সমতলীয় রং ব্যবহারের মাধ্যমে। ডাই ব্রুক দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এরিক হেকেল (১৮৮৩-১৯৭০) একজন ছাপচিত্রীও। কাঠ খোদাইয়ে শক্তিশালী ন্যুড এবং ভূ-দৃশ্যের জন্য তিনি সুপরিচিত। আফ্রিকান ভাস্কর্যের প্রতিও যে তাঁর আগ্রহ ছিল তা তাঁর কাঠ খোদাই চিত্র *স্লিপিং নেগরেস* (১৯০৮) এ প্রতীয়মান হয়। সরলীকৃত আকৃতি এবং অসাধারণ সমতলীয় রং বিন্যাস তাঁর কাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এরিক হেকেলের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মেডিকেল কোরে পরিচয় হয় প্রকাশবাদী শিল্পী ম্যাক্স বেকম্যানের (১৮৮৪-১৯৫০)। বেকম্যানও একজন সুদক্ষ ছাপচিত্রী। মূলত এচিং এবং ড্রাইপয়েন্টে কাজ করলেও কাঠ খোদাই এবং লিথোগ্রাফও কিছু করেছেন। তাঁর অধিকাংশই সাদা-কালো ছাপাই ছবি। নাগরিক বিষয়বস্তু, যুদ্ধোত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং কখনো কখনো জীবনকে থিয়েটার কিংবা সার্কাসের সাথে

তুলনা করে ঠাসা কম্পোজিশন তৈরি করেছেন। তবে শেষের দিকে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কিছু প্রতিকৃতিও ছেপেছেন তিনি ছাপাই মাধ্যমে। সমসাময়িক জার্মান এবং ফরাসি ছাপচিত্রীদের মধ্যে কার্ল স্কমিথ রট্টলফ (১৮৮৪-১৯৭৬), জুলিস পাসিন (১৮৮৫-১৯৩০), অর্নেস্ট লুডিং কিসনার (১৮৮৬-১৯৩৮), জেন হ্যান্স আর্প (১৮৮৬-১৯৬৬), অস্কার কোকোসাকা (১৮৮৬-১৯৮০) প্রমুখ শিল্পীও ছাপচিত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ফরাসি স্কুলের রাশিয়ান শিল্পী মার্ক শাগাল (১৮৮৭-১৯৮৫) ভীষণ কাব্যিক, কিছুটা অপরিণত এবং একই সময়ে ভীষণ পরিশীলিত (সূক্ষ্ম) ভাবে অন্য সব শিল্পান্দোলনের বাইরে বেরিয়ে নিজস্ব শৈলী তৈরি করেছেন (চিত্র ১৪)। তাঁর অধিকাংশ ছাপাই ছবি অলংকরণ হিসেবে করা। কখনো কখনো তিনি লিথোগ্রাফিতে সঠিক রং তৈরির জন্য ২৫টি আলাদা আলাদা প্লেটও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রঙের ব্যবহার নিয়ে পাবলো পিকাসো বলেছেন–

> When Henri Matisse dies, Chagall will be the only painter left who understands what color really is.[৯২]

মার্ক শাগালের কাজ পরবর্তীকালের পরাবাস্তববাদকে (স্যুরিয়েলিজম) প্রভাবিত করেছে। পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ম্যাক্স আর্নেস্ট (১৮৯১-১৯৭৬) ছাপচিত্র মাধ্যমে এই দলের অন্য সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করেছেন। প্রভাবশালী এবং প্রচণ্ড উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন এই শিল্পী তাঁর গ্রাফিক শিল্পে নানা ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কোলাজ'এর কল্পনাশ্রয়ী ব্যবহার। জর্জ গ্রজ (১৮৯৩-১৯৫৯) এচিং এবং লিথোগ্রাফকে ব্যবহার করেছেন যুদ্ধের মধ্যে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ও সামাজিক সমালোচনামূলক অভিব্যক্তি প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে। রোফ নেসা (১৮৯৩-১৯৭৫) বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় নিরীক্ষামূলক ছাপচিত্রী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নেসা ধাতুর পাত, টুকরা ইত্যাদি প্রিন্টমেকিং প্লেটে যোগ করে তা থেকে ছাপ নেয়ার পদ্ধতি তৈরি করেন যাকে 'মেটাল প্রিন্ট'(metal print) বলে। প্রিন্টমেকিং নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির আলোয় নিয়ে আসে। পিকাসোর মতো আরেকজন স্পেনীয় জনমিরোও (১৮৯৩-১৯৮৩) দক্ষ ছাপচিত্রী ছিলেন। অদ্ভুত রকমের মজার প্রাণী, মানবদেহের বিকৃতি, কোকড়ানো জৈব আকৃতি এবং ভীষণ সাহসী মৌলিক রঙের জ্যামিতিক আকৃতি সমতল স্বাভাবিক পশ্চাৎপটে ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর রসালো রঙিন এচিং এবং লিথোগ্রাফগুলো তাঁর চিত্রকলার সমান খ্যাতি এবং গুরুত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। মিরো ছাপচিত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠেন আন্দ্রে মেসনের (১৮৯৬-১৯৮৭) মাধ্যমে পরিচিত হওয়া লেখক এবং কবিবন্ধুদের অনুপ্রেরণায়। পরাবাস্তববাদী মেসনও ছাপচিত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ছাপাই মাধ্যমে তিনি ভয়াবহতা ও যন্ত্রণা,

---

[৯২] http://www.pablopicasso.org/picasso-and-chagall.jsp প্রেক্ষিত ১৩-১১-২০১৩ খ্রি.

যৌন কামনা, আত্মোৎসর্গ এবং মানবজীবনের অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করেছেন দক্ষতার সাথে। একই সময়ে কিংবদন্তি ব্রিটিশ ভাস্কর হেনরিমুরও (১৮৯৮-১৯৮৬) কিছু শক্তিশালী লিথোগ্রাফ তৈরি করেন। তবে সমকালীন ছাপচিত্রের উন্নয়নে ব্রিটিশ ছাপচিত্রী উইলিয়াম হেইটার (১৯০১-১৯৮৮) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। শুধু একজন ছাপচিত্রী নন, একজন শিক্ষক, সংগঠক এবং একজন উদ্ভাবক হিসেবেও তিনি ছাপচিত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি *আতেলিয়ার'* ১৭ নামে একটি স্টুডিও গড়ে তোলেন। সমকালীন ছাপচিত্র চর্চায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ সময়ের প্রায় সকল শিল্পীই কোনো না কোনোভাবেই আতেলিয়ার' ১৭এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকাতেও যান এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা সমকালীন আমেরিকান ছাপচিত্রশিল্পকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া তিনি 'হেইটার টেকনিক প্রিন্ট' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যাকে 'ভিস্কোসিটি' (Viscosity) পদ্ধতিও বলে। এ পদ্ধতিতে তিসির তেলের দ্বারা রঙের সান্দ্রতার পরিবর্তন ঘটিয়ে একই প্লেটে তিনটি ভিন্ন রোলারের সাহায্যে রং লাগিয়ে একবারেই রঙিন ছাপ উৎপাদন করা হয় (চিত্র ১৫)। এ ছাড়া আলবার্তো গিয়াকোমিতি (১৯০১-১৯৬৬), জ্যাঁ ডুবাফেট (১৯০১-১৯৮৫), গ্রাহাম সুদার ল্যান্ড (১৯০৩-১৯৮০), সালভাদার দালি (১৯০৪-১৯৮৯) প্রমুখ শিল্পীগণও ছাপচিত্র মাধ্যমকে সমৃদ্ধ এবং এ মাধ্যমের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ঊনবিংশ শতক পর্যন্তও আমেরিকান ছাপচিত্র মফস্বল (এলাকা) এবং স্বল্প উদ্যোগভিত্তিক ছিল। তা ছাড়া এ সময়ে ইউরোপীয় মাস্টারদের সাথে তুলনীয় উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্রীও দেখা যায় না। তবে এই শতকের মধ্যভাগের ইউরোপীয় আভাগর্দ আন্দোলনের ধারার প্রভাব আমেরিকান ছাপচিত্রের উপর পরিলক্ষিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে। বিশেষত অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব। এ সময়ের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পীই সমান গুরুত্বের সাথে ছাপচিত্র চর্চাও করেছেন। যেমন: জন স্লোয়ান (১৮৭১-১৯৫১) এচিং মাধ্যমে নিউইয়র্কের দৈনন্দিন জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। জর্জ বিলোস (১৮৮২-১৯২৫) নাগরিক জীবনকে তুলে ধরেছেন লিথোগ্রাফির মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী এডওয়ার্ড হোপারও (১৮৮২-১৯২৫) কিছু উচ্চমানসম্পন্ন এচিং করেছেন। এ ছাড়া মিলটন অ্যাভেরির (১৮৮৫-১৯৬৫) ড্রাইপয়েন্ট ও মনোপ্রিন্ট, জোসেফ আলবার্চের (১৮৮৮-১৯৭৮) রঙিন সিল্কস্ক্রিন, স্টুয়ার্ড ডেভিস (১৮৯২-১৯৬৪) ও এডলফ দেনের (১৮৯৫-১৯৬৮) লিথোগ্রাফ, রিগনাল্ড মার্শ (১৮৯৮-১৯৫৪) এবং বেন শানের (১৮৯৮-১৯৬৯) এচিং আমেরিকায় ছাপচিত্র চর্চার উত্তরণের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে এঁদের উত্তরসূরীরা সৃষ্টিশীল ধারার তুলনায় অধিকাংশই বাণিজ্যিকভাবে ছাপচিত্র উৎপাদনের সাথে যুক্ত থেকেছেন।

বিশ শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার পর আমেরিকায় ছাপচিত্র চর্চার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী শিল্পীরা এ সময় সম্ভাব্য সকল মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন। সম্ভবত এ সময়ে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছাপচিত্র ছাপা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও এই মাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ সময়ে ইউরোপীয় বিমূর্ত প্রকাশবাদ, পপ আর্ট এবং অপ আর্ট আমেরিকান শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত পপ ও অপ আর্টের সময় ছাপচিত্র গুরুত্বপূর্ণ উচ্চতা লাভ করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান রিয়েলিস্ট পেইন্টার ফোয়ারফিল্ড পোর্টার (১৯০৭-১৯৭৫) লিথোগ্রাফির মাধ্যমে নগরের এবং ভূ-দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন। বিমূর্ততা এবং প্রকাশবাদী ধারার চরম উৎকর্ষের সময়েও তিনি বস্তুর রূপায়ণে প্রতিনিধিত্বমূলক গুণকে প্রাধান্য দিয়ে আলো এবং রঙের অনুপুঙ্খতা প্রকাশ করেছেন। শক্তিশালী সমতল রং এবং অধিক্রমণকারী আকৃতি ব্যবহার করে নিজস্ব শৈলীতে ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন জ্যাকব লরেন্স (১৯১৭-২০০০)। নিজের কাজকে তিনি অবিরামভাবে বেড়ে ওঠা এবং নিজে নিজেই গড়ে ওঠা বলেছেন। এচিং, উডকাট, সিল্কস্ক্রিন এবং লিথোগ্রাফ মাধ্যমে কাজ করেছেন তিনি। অন্যদিকে রবার্ট রাউশ্যান বার্গ (১৯২৫-২০০৮) খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন থেকে নেয়া প্রচুর ছবি দিয়ে ভর্তি চিত্রকলাসুলভ ছাপচিত্র তৈরি করেছেন (চিত্র ১৬)। এ ছাড়া বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন মাধ্যম নিয়ে, যেমন এমবুস (emboss) তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যিক প্রিন্ট মিডিয়া (খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) থেকে চিত্রকল্পরাশি গ্রহণ করলেও শেষের দিকে নিজের ফটোগ্রাফিই ব্যবহার করেছেন এই পপশিল্পী। আমেরিকান পপ সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী এ্যান্ডি ওয়ারহোল (১৯২৮-১৯৮৭) বাণিজ্যিক শিল্পকে চারুশিল্প এবং সাধারণ মুদ্রণ কৌশলকে 'চিত্র' রচনার মাধ্যমে পরিণত করেন। তাঁর ছাপাই ছবি এবং চিত্রশিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ছাপাচিত্রের মাধ্যমকে তাঁর পূর্বে আর কেউ এভাবে চিন্তা করেনি। তাঁর কাজ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রাসঙ্গিক–

> Warhol’s images, in spite of thair familiarity, inspite of their ready availability else where than in his painting, inspite or even because, of their dispassionate presentation, remain extremely potent. His work looked at overall, reveals certain constant aqnd significant preoccupations with ame, with glamour, with death, with violence and disaster and with money.[১৩]

তিনি খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন থেকে নেয়া ছবি সিল্কস্ক্রিন মাধ্যমে কাপড় অথবা কাগজে স্থানান্তর করে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন (চিত্র ১৭)। এ মাধ্যমে তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন যেমন: এলভিস প্রিসলি, মেরলিন মনরো প্রমুখ। এ ছাড়া সাম্প্রতিককালের নেতৃত্বদানকারী অনেক

---

[১৩] Simon Wilson, ‘Pop’, in David Britt edited, *Modern Art*, London, Thames and Hudson, 1974, p. 316

ছাপচিত্রীই নবতর করণকৌশল ব্যবহার করে এই মাধ্যমকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। যেমনঃ জেসপার জোন্স (১৯৩০), ওয়েনি টাইবাউড (১৯২০), জিম ডাইন (১৯৩৫), জুলিয়ান সেনাবেল (১৯৫১), কিকি স্মিথ (১৯৫৪), কোরি জেমস মার্শাল (১৯৫৫) প্রমুখ।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানবসভ্যতার উষালগ্নে বিকশিত ছাপের ধারণা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ লাভ করেছে শিল্পিত উৎকর্ষ। প্রয়োজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে সৃজনশীল শিল্প নির্মাণের মৌলিক মাধ্যম। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এতেও যোগ হয়েছে নানা ধরনের নতুন মাত্রা। বহু শিল্পী ও উদ্ভাবকের অদম্য প্রচেষ্টা আর নিরলস পরিশ্রমে একটু একটু করে পরিশীলিত হয়ে ছাপচিত্র আজকের অবস্থানে এসেছে এবং নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা আর উদ্ভাবন নিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যেখানে অন্যকোন মাধ্যমের সাহায্য ব্যতিরেকেই সে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে ছাপচিত্র বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত হওয়ার কারণে এই ধারার চিত্রচর্চার পরিবেশ বেড়েছে এবং তা অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততায় বিকাশ লাভ করে চলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে উৎপাদিতও হচ্ছে ছাপাই মাধ্যমে শক্তিশালী সব নির্মাণ। আবার নানারকম সাংগঠনিক চর্চাও এই মাধ্যমের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছাপচিত্র এখন আর নিছক ছবি ছাপা-ই নয়, বরং এখন তা উচ্চমানের এমন সৃষ্টিশীল আর্টফর্ম হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে যুগোপযোগী প্রকাশভঙ্গির বিপুল সম্ভাবনা।[১৪]

[১৪] নির্মাল্য নাগ, *শিল্প চেতনা*, কলকাতা, দীপায়ণ, ১৯৮৭, পৃ ১১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় ছাপচিত্র

(ভারত বিভাগ-পূর্ব)

কোনো জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার এবং তা প্রকৃষ্টরূপে অনুধাবনের জন্য তার ভৌগলিক সীমা এবং ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। কারণ যথাযথ ভূগোল জ্ঞান ছাড়া কোনো ইতিহাসই প্রকৃতরূপে অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই বাংলায় ছাপচিত্রের ইতিহাস আলোচনা করার আগে কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বাংলা বলে অভিহিত করা হচ্ছে, সে বিষয়ে এবং তার উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অর্থাৎ বিভাগ-পূর্ব বাংলাকে একত্রে বাংলা বলে এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। কারণ এই অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। যদিও আদিতে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল একত্রে 'বাংলা' বা 'বঙ্গ' বলে অভিহিত হতো না। তবে এ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানের মাটির গঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলের অস্তিত্ব এবং এখানে মানব বসতি ছিল। যদিও প্রাচীন নথিপত্রে বঙ্গের উল্লেখ অস্পষ্ট। ঐতরেয় আরণ্যক (৬০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) গ্রন্থের 'বয়াংসিবঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ' উক্তি সম্ভবত বঙ্গ বা বাংলা সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ।[৯৫] পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৬] তাই ধারণা করা হয়, শুরুতে বঙ্গ হয়তো ছোট সাধারণ কোনো জনপদ ছিল, যার হয়তো কোনো আলাদা গুরুত্ব ছিল না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নথিপত্রে বঙ্গের সাথে আরও কিছু পাশাপাশি অবস্থিত সমসাময়িক জনপদের নাম বারবার উল্লেখিত হয়েছে। যেমনঃ গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বরেন্দ্র, হরিকেল, সমতট, লক্ষ্মণাবতী ইত্যাদি। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য বাংলা অঞ্চল হয়তো শুরুতে ছোট ছোট অনেক জনপদে বিভক্ত ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে পশ্চিমের বিভিন্ন জনপদ ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। সম্ভবত গুপ্ত সাম্রাজ্যের (৩২০-৫৫০) পতনের পর মগধে আর কোনো শক্তিশালী রাজশক্তির অভ্যুদয় না হওয়ায় দেশ অরাজক হয়ে পড়ে এবং পশ্চিমের জনপদগুলো এই সুযোগকেই কাজে লাগায়।[৯৭] অষ্টম শতক থেকে বাংলার তিনটি জনপদ গৌড়, পুণ্ড্র এবং বঙ্গ সমগ্র দেশের সমার্থক হয়ে ওঠে পাল শাসকদের (৭৫০-১১৬০) হাতে। পাল এবং সেন শাসকদের (১১৬০-১২০৩) দ্বারা বাংলার একটা বিরাট অংশ শাসিত হলেও

---

[৯৫] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭, পৃ ৯

[৯৬] ডক্টর সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব)*, ঢাকা, অরিত্র, ২০০৪, পৃ ৩১

[৯৭] তদেব, পৃ ৪

তাঁরা নিজেদের 'গৌড়েশ্বর' বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন। তেরো শতকের গোড়ায় সেন আমলের শেষে তুর্কিরা যখন এই দেশ জয় করে তখনো এর নাম ছিল গৌড়, বঙ্গ নয়।[৯৮] হিন্দু রাজাদের অখণ্ড গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলমান শাসকদের হাত ধরে অখণ্ড রাজ্য হওয়ার সেই গৌরব অর্জন করে বাংলা। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) প্রথমে গৌড়, বরেন্দ্র, সুক্ষ্ম, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি এলাকা দখল করে এই যুক্ত অঞ্চলগুলোকে 'বাঙ্গালা' এবং এর অধিবাসীদের 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন এবং নিজে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্' ও 'শাহ-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করেন।[৯৯] মূলত, বিজয়ী জাতি হিসেবে বিজিত জাতির সকল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের (১৭৫৭-১৯৪৭) শুরুতেও দেখা যায়। সে যাই হোক, ইলিয়াস শাহের ক্ষমতারোহণের ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিশাল জনপদ বাংলা পরিচিত হয়। আর তখন থেকে এর অধিবাসীরা বাঙালি নামেই পরিচিত।[১০০]

এই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি খুব কম হলেও কেউ কেউ গঙ্গা অববাহিকার প্রাচীন বাংলায় আলাদা একটি সভ্যতা গড়ে ওঠার সম্ভাব্যতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো, ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে প্রাচীন বাংলা মহেনজোদারো সভ্যতারই অংশীদার এবং এর ইতিহাস সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসের সমসাময়িক।[১০১] মানুষের ইতিহাসে যত প্রাচীন সভ্যতার খবরই আজ পর্যন্ত জানা গেছে তার প্রায় সবই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের এবং কৃষিভিত্তিক ছিল। আর কোনো একটি প্রধান ফসলকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সেগুলো। যেমন ইউরোপ গম, আমেরিকা ভুট্টা এবং চীন ও ভারতবর্ষ ধান এবং যব-ভিত্তিক ছিল। তাই বলা যায়, প্রত্যেক সভ্যতাই ভূমিজ ও উদ্ভিদমূলক। সভ্যতা ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু তাকে মাটির আশ্রয় নিতেই হবে আত্মপ্রকাশের জন্য। ভাবের সাথে ভবের মিলনেই সভ্যতা প্রসূত হয়।[১০২] ভাব এবং ভবের সে মিলন ঘটেছিল নদীকে কেন্দ্র করে, আর নদীই ছিল এসব সভ্যতার মাতৃস্বরূপ। নীলনদের তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা আর সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে উন্নত ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন 'সিন্ধু সভ্যতা'। অর্থাৎ হরপ্পা এবং মহেনজোদারো। ২৯০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার মূল সময়কাল। তবে নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল এর অনেক আগেই।

---

[৯৮] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, অবসর, ২০০৮, পৃ ১৯

[৯৯] তদেব, পৃ ২০; ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি.), দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮,পৃ ৩

[১০০] তদেব, পৃ ৩-৪

[১০১] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাঙালির ইতিহাস*, ঢাকা, অনুপম, ১৯৯৮, পৃ ১৭-১৯

[১০২] শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা, *প্রবাসী*, ৩৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ ৩৪৯

যদি লিখিত বর্ণমালার আবিষ্কার অর্থাৎ, মানুষের লিখতে শেখার মাধ্যমেই সভ্যতার সূত্রপাত বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেই ভারতে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কারণ, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে রানা ঘুন্ডাই (৩৫০০), আমরি-নাল (৩০০০), কুল্লি (২৪০০) সভ্যতায় সমাজ ও শিল্পের পরিণত বিকাশ ঘটেছিল। এসব সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন শিল্প ও মৃৎপাত্রের নিদর্শন থেকে অনুরূপ ধারণা করা যায়। মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বলে বিবেচিত মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক এসব ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষকাল। সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল হতে মানুষ প্রথম গাড়ির চাকা ও কুমোরেরা চাক ব্যবহার করতে শেখে। রোদে শুকানো এবং পোড়া ইটের ব্যবহার, লেখার জন্য ধাতুর তৈরি নিব, শল্যচিকিৎসার জন্য শলাকার, এমনকি প্রথম বস্ত্র বা কাপড় তৈরির নমুনাও আমরা এখানেই প্রথম দেখি।[১০৩] এসব ছাড়া নানা ধরনের শিল্প নিদর্শন, অলংকৃত মৃৎপাত্র এবং চিত্র ও লিপি উৎকীর্ণ প্রচুর সংখ্যক সিলমোহরও (চিত্র ১৮) আবিষ্কৃত হয়েছে এ সভ্যতায়। মাটির জিনিস এবং সিলমোহরগুলোতে ডুমুর গাছ, ষাঁড়, হাতি এবং বিভিন্ন মিশ্র জন্তু দেখে ধারণা করা হয়, ভারতে সে সময় এগুলোর পূজা করার রীতি প্রচলিত ছিল।[১০৪] সিন্ধুতে প্রাপ্ত সিলমোহরগুলো কয়েক ধরনের। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো এক বর্গ ইঞ্চি আয়তনের স্ট্যাম্প সিল।[১০৫] এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> The seals are of ivory, or blue or white faience, square in form, and with a perforated boss at the black for suspension. They bear a great variety of designs, including bulls both with and without hump, elephants, tigers, and a representation of a Pippala tree (*Ficus religiosa*) with two horned monsters affronted attached to the stem. Further, the seals bear numerous characters of a pictographic script which it has not yet been possible to decipher.[১০৬]

এই সিলমোহরগুলোই ভারতবর্ষে প্রতিলিপি তৈরির প্রথম নমুনা। এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি বক্তব্যকে আরও সরল করবে।

> As in the ancient Near East, the Indus Peoples Sometimes used the Seals to make impressions on clay, apparently of Securing trade goods wrapped in textiles.[১০৭]

---

[১০৩] নির্মল কুমার ঘোষ, *ভারত শিল্প*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ফার্মা কে এল এস, ১৯৮৩, পৃ ৭

[১০৪] মার্টিমার হুইলার, 'চার হাজার বছর আগে পাকিস্তান', *মাহে-নও*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৪৯, পৃ ২৮

[১০৫] Irene N. Gajjar, Ph. D., *Anciant Indian Art and the West*, Bombay, D. B. Taraporevala, 1971, p. 27

[১০৬] Ananda K. Coomarswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1972, p. 4

[১০৭] Fred S. Kleiner, *Gardner's Art through The Ages A Global Histroy*, Thirteen edition, New York, Thomson Wards worth, 2009, p. 159

মাটির তৈরি এসব সিলমোহরে নকশা এঁকে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হতো। এসব নকশায় উৎকীর্ণ লিপি এবং চিত্রের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও কোনো কোনো পণ্ডিত এগুলোকে ধর্মীয় ব্যক্তিগত পরিচিতির জন্যই নির্মিত[১০৮] বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। এর ভেতরের কিছু সিলে পশ্চিমা প্রভাব স্পষ্টত দৃশ্যমান কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক নমুনা কোনোভাবেই হরপ্পান খোদাই-সংক্রান্ত সংস্কৃতির অংশ না হয়ে বরং সেগুলো একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক পটভূমির মধ্যে অন্য সংস্কৃতির অনিয়মিত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে হয়।[১০৯] এ জন্য কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক (ঐতিহাসিক) সিন্ধু সভ্যতার সাথে সমসাময়িক সুমেরীয় সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। মূলত বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণেই দুটি স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠা সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির আদান-প্রদান সহজ হয়েছিল। প্রাচীন সুমেরীয় এবং মিশরীয় সভ্যতায় উন্নতমানের সুতা আবিষ্কৃত হয়, যা মানুষকে সভ্যতার দিকে নতুন পথ দেখায়। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটস ভারতবর্ষে একধরনের গাছের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে ফলের পরিবর্তে লোম উৎপন্ন হয়, যা মেষলোমের চেয়েও সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট এবং তা দিয়ে ভারতীয়রা তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় প্রস্তুত করে।[১১০] ঋগ্‌বেদেও ভারতীয় তাঁতশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের সমসাময়িক আথবা কিছুকাল পর থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ কাপড়ে নানা কারুকাজ করে আসছে। কারণ, মহাকাব্যের যুগেও ভারতীয় নকশিবস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যের মোড়ক প্রস্তুত করার জন্য এবং স্বাধীন বস্ত্র-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের সুনাম ছিল পৃথিবীব্যাপী। ভারতীয় বস্ত্র রোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল হতে বিখ্যাত এবং সম্ভবত তার কিছুকাল পূর্ব হতেই ইউরোপে রপ্তানি হতে শুরু করে।[১১১] তবে খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই এখানে কাপড়ের ওপর মুদ্রণের ধারণা বিকশিত হয়।[১১২] ভারতে কাপড় মুদ্রণের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণস্বরূপ একটি ছোট খোদিত পাথর-ফলক পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের এই নমুনাটি বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বান্নু জেলায় পাওয়া যায়।[১১৩] সপ্তম শতকের শেষের দিকে চিনা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তীর্থযাত্রী আই-চিং (I-ching) তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয়দের সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন–

---

[১০৮] ড. রফিকুল আলম, *উপমহাদেশের শিল্পকলা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ ১৯

[১০৯] Irene N. Gajjar, Ph. D., *Anciant Indian Art and the West*, Bombay, D. B. Taraporevala, 1971, p. 27

[১১০] শ্রী মোহাম্মদ হেদায়েত্ উল্লা, 'ভারতীয় কার্পাসশিল্প', *প্রবাসী*, ৫ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১২, পৃ ৫৮২

[১১১] Ananda K. Coomarswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1972, p. 137

[১১২] G.K. Ghosh, and Shukla Ghosh, *Indian Textiles: Past and Present*, New Delhi, APH Publishing, 1995, p. 114

[১১৩] Pranab Ranjan Ray, 'Print making by wood block up to 1901: A social and Technological History', in Ashit Paul (Edited) *Woodcut Prints of Nineteenth century Calcutta* , Calcutta, Seagull Books, 1983, p. 80

> They make clay pagodas, and they fashion images of clay; also they stamp them on silk or paper.[১১৪]

আবার ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অভিধানভুক্ত হওয়া গুজরাটি ছিট বা চিনৎজ শব্দটির উল্লেখ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে।[১১৫] গুজরাটের আহমেদাবাদ সে সময় ছাপানো কাপড় তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এ সম্পর্কে জর্জেস রাকোসের লেখা থেকে জানা যায়। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুরাতে (Surat) পৌঁছান– 'The East Indian Company and Francis Martin'-এর একজন প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর মতে, আহমেদাবাদের ব্লক শিল্পীরা কাপড়ের ওপর করা ব্লকের ছাপ কাগজে নিয়ে তার নমুনা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য রেখে দিত।[১১৬] মধ্যযুগে ভারতে 'উডব্লক'-এ ছাপা কাপড়ের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়; বিশেষ করে রাজস্থানের দিকে। গৃহের অভ্যন্তরে সজ্জিত করার মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত তাঁবু অথবা রাজার শিকারের জন্য ব্যবহৃত তাঁবু কিংবা গ্রামের বড় কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সজ্জার জন্য এই ধরনের অলংকৃত কাপড়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। একই সময়ে গুজরাটেও এক বিশেষ ধরনের অলংকৃত বস্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। যার বিশেষত্ব ছিল লাল ও কালো রেখার পাখি, প্রাণী এবং নৃত্যরত রমণীর মোটিফ ব্যবহার করে নিঁখুতভাবে অলংকৃত করা। এগুলো তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঠের ব্লক তিন ধরনের ছিল : নকশার বহিঃরেখা নির্মাণের জন্য একটি, একটি ভূমির (ground) জন্য এবং তৃতীয়টি বিস্তারিত বিবরণের (detail) জন্য।[১১৭] উপর্যুক্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের অলংকৃত বস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন। গুজরাটি বস্ত্রের চরম উৎকর্ষের সময়ে বস্ত্র অলংকরণের রীতি ভারতবর্ষের অনান্য অংশেও প্রচলিত ছিল। যেমন মধ্যযুগের চিনৎজ বা শামিয়ানা এবং বহু পুরনো নামাবলি বাংলায়ও ছাপা হতো বলে জানা যায়।[১১৮] এ ছাড়া মসলিন ও জামদানি অলংকরণের রীতিও বাংলায় একই সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অ্যাসিরীয়া এবং ব্যাবিলনেও মসলিন ব্যবহারের নানা তথ্য পাওয়া যায়। তবে মুঘল আমল (বাংলায় ১৫৭৫) থেকেই ছাপানো মসলিন ইউরোপে রপ্তানি হতো বলে জানা যায়। অর্থাৎ অলংকৃত বস্ত্রের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য একই সাথে বাংলাও লালন করে আসছিল। তবে বাংলায় ছাপের আদি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অদূরে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। যেখানে প্রাপ্ত Seatile পাথরের সিলমোহরকে ২৭০০-১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মিনোয়া (Minoan) সংস্কৃতির সাথে মিল রয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মতামত ব্যক্ত

---

[১১৪] Mosaku Ishida, *Japanese Buddhist Prints*, New York, Harry N. Abrams, 1964, p. 11

[১১৫] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'ছাপাখানা: চীন থেকে চিনসুরা' দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ১৪

[১১৬] P. R. Schwarte, *Printing on cotton at Ahmedabad India in 1678*, Ahemadabad, Calico Museum of Textiles, 1969, p. 11

[১১৭] ibid, p. 11

[১১৮] কমলকুমার মজুমদার, 'বঙ্গীয় গ্রন্থ-চিত্রণ', দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, ২০১১, পৃ ৪১; শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ৪৭

করেছেন। আবার চব্বিশ পরগনার হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রাপ্ত সিলমোহরকে পণ্ডিতগণ ক্রিটিয় (Creatan) সংস্কৃতির বলে মনে করছেন।[১১৯] অর্থাৎ ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই বাংলার মানুষের ছাপ পদ্ধতির ধারণা ছিল এবং এ সময় থেকেই ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাণিজ্যের অপরিহার্য উপাদান হলো মুদ্রা। মুদ্রার পিঠেও প্রাচীন বাংলার ছাপরীতির আরও একটি ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমসাময়িক জীবনধারার বিভিন্ন দিক এবং তাদের শিল্পভাবনা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। পূর্বে ধারণা করা হতো, বাংলায় ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-এর আগে মুদ্রার প্রচলন ছিল এসব অঞ্চলে, এমন মনে হয় না; প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না।[১২০] তিনি উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মুদ্রিত সিলমোহর এবং ঢালাই মুদ্রা নিরীক্ষা করে এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তবে সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রাক-মৌর্য বা জনপদ শ্রেণীভুক্ত ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার (চিত্র ১৯) সময়কাল ৬০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধারণা পোষণ করেছেন। এসব মুদ্রার গায়ে নানা ধরনের নকশা ছাপাঙ্কিত। ধারণা করা হয়, মুদ্রার ধাতব বিশুদ্ধতা ও সুনির্দিষ্ট তৌলরীতিকে প্রত্যয়িত করার জন্য এসব ছাপ দেয়া হতো।[১২১] মুদ্রা ছাড়াও ছাপের নানা লোকজরূপ বাংলায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। কারণ প্রয়োজনই শিল্পসৃষ্টির প্রাথমিক ভিত্তিরূপে কাজ করেছে আর বাঙালির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাচীন বাংলায় ছাপের যে নানা লৌকিক রূপ পরিলক্ষিত হয় তার অধিকাংশই ব্যবহারিক প্রয়োজনে আবার কখনো কখনো কোনো লোকজ আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে আলপনার কথা বলা যায়। নানা ধরনের ব্রত, পূজা-পার্বণে এবং বিবাহসহ প্রায় সব ধরনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনার প্রচলন লক্ষ করা যায়। লক্ষ্মীপূজায় বিবিধ প্রকারের লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আলপনা আকারে তৈরি করা হয়। এ ধরনের ছাপের প্রচলনের পেছনে প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গুহাবাসী মানুষ যেমন বিশ্বাস করত শিকারের ছবি আঁকলে শিকার ধরা পড়বে, তেমনি আলপনায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকলে লক্ষ্মী সত্যি সত্যি ঘরে থাকবে এবং 'গৃহস্থ' সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দুটি ক্ষেত্রে কেবল স্থান-কালেরই পার্থক্য; উদ্দেশ্য অভিন্ন। আতপ চালের গুঁড়ো জলে গুলে সাদা পিটালি তৈরি করে হাতের কাত (হাতের পার্শ্ব অংশ কড়ে আঙুল পর্যন্ত) দিয়ে মাটিতে ছাপ দিয়ে প্রথমে পায়ের তালু এবং আঙুলের ছাপ দিয়ে পায়ের আঙুল তৈরি করা হয়। এভাবে ডান ও বাঁ হাত দিয়ে যথাক্রমে লক্ষ্মীর ডান ও বাঁ পায়ের ছাপ তৈরি করা হয়। আবার নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপনের সময় একধরনের ছাপ ও আলপনার ব্যবহার আজও পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের জেলাগুলোতে প্রচলিত আছে। গোবর লেপা উঠানের

[১১৯] নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০, পৃ ৬৪

[১২০] তদেব, পৃ ১৬৬

[১২১] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *উয়ারী বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১২, পৃ ১২৬

মাঝখানে চালের গুঁড়ো ছিটিয়ে বড় বৃত্ত তৈরি করে তার মাঝে কৃষকের হাতের ছাপ এবং ফসল ফলানোর বিভিন্ন উপকরণের ছাপ দেওয়া হতো কিছুটা গুহাচিত্রের হাতের ছাপের আদলে, কখনো নেগেটিভ আবার কখনো পজেটিভ পদ্ধতিতে। আলপনার নানা নকশা ব্যবহার করে নকশি পিঠার ছাঁচ তৈরি করা হতো, যা বাংলায় লোকজ ছাপ-রীতির আরও একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বাঙালি নারীরাই প্রধানত এই শিল্পের প্রাণ। সাধারণত পরিবারের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বয়স্ক নারীরাই এসব কাজে নেতৃত্বের আসনে থাকতেন। কাঠ, পাথর, পোড়ামাটি অথবা পাথরে নির্মিত কোনো তৈজসপত্রের ভাঙা টুকরো থেকে সুই, নরুন, কিংবা সরু কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে খোদাই করে নকশা উৎকীর্ণ করা হতো। আমসত্ত্ব, সন্দেশ, ক্ষীরের সন্তি এবং ক্ষীরের পুতুলের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে নানা মোটিফের সাথে কখনো কখনো লেখাও যোগ করা হতো। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে নকশার পাশাপাশি 'জামাই বাবুর শুভ বিবাহ', 'সাবিত্রী সিঁদুরের কুটই' ইত্যাদি লেখাও থাকত।[১২২] এ ছাড়া সতীদাহের সময় তেল-সিঁদুর রঞ্জিত সতীর হাতের ছাপ সরাসরি নিকটস্থ মন্দিরের দেয়ালে লাগানোর পর দাহ কার্য সম্পাদন করা হতো।[১২৩] একসময় রাজ আদেশে পাঞ্জা বা হাতের ছাপ কিংবা আংটির ছাপ দেয়ার প্রচলনও ছিল। আবার মৃত ব্যক্তির স্মৃতি সংরক্ষণার্থে আলতা বা চন্দন রঞ্জিত পায়ের ছাপ নেওয়ার প্রচলন আজও গ্রামে-গঞ্জে পরিলক্ষিত হয়। হালখাতায় সিঁদুরে চুবানো কড়ি বা পয়সার ছাপ নেওয়ার রীতি সুদূর অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ ধরনের ছাপ পদ্ধতি সংবলিত বিভিন্ন মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতির স্মারক বর্তমান বাংলায় বিরল হলেও একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।

বাংলায় প্রচলিত এসব প্রাচীন এবং লোকজ ছাপরীতির ধারণাই পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতবর্ষে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির সূচনা হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ছাপার আধুনিক এই পদ্ধতি আসার পূর্ব পর্যন্ত তালপাতা, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে হাতে লিখে পুঁথি আকারে সংরক্ষণ করা হতো। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের দিকে ভারতবর্ষ কাগজের সাথে পরিচিত হয়, কিন্তু এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ত্রয়োদশ শতক থেকে।[১২৪] এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন কাগজের নমুনা হলো জৈনপুঁথি, যা ১৪২৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। তবে তারিখ না দেওয়া হাতে-লেখা কিছু পুঁথির বয়স আরও বেশি হতে পারে বলে পণ্ডিতগণ মত দিয়েছেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষে ছাপানো কোনো কাগজের নমুনা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে অর্থাৎ গুটেনবার্গের মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের দু'শ বছর পর কাঠের দুটি আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র

---

[১২২] অনির্বাণ ব্যনার্জী, 'বাংলার আমসত্ত্ব ও সন্দেশের ছাঁচ', দ্র. বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, *লোকজ শিল্প*, কলকতা, পারুল, ২০১১, পৃ ৩২৭

[১২৩] মো. আবদুস সোবাহান, *বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : সফিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)*, পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), পৃ ৪৪

[১২৪] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৭৪

(পদ্ধতি) এসে পৌঁছায় ভারতের গোয়াতে।[১২৫] এর পর থেকেই ভারতে কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে আধুনিক মুদ্রণের সূত্রপাত।

মুদ্রণশিল্পের গোয়াকেন্দ্রিক এই পর্বটি খুব বেশি দিন স্থায়ী না হলেও ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ছাপানোর রীতি প্রচলিত হয়ে যায় একে একে। ছাপাখানা গোয়া থেকে কুইলন, কোচিন, পুডিকাইল, ভিপিকোট্টা, আমবালা কোট্টা, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ হয়ে হুগলিতে অর্থাৎ বাংলায় আসে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ২২২ বছর পর গোয়া উপকূল হতে মুদ্রণ প্রকৌশল এসে পৌঁছায় বাংলার প্রধান শহর কলকাতায়। শুরু থেকেই কলকাতার বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকলেও ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়ে ওঠার পর এ শহরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক এবং সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যই মূলত মুদ্রণযন্ত্র আমদানি অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর সুবেবাংলার শাসনভার ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে চলে আসে। কিন্তু শাসনভার গ্রহণ করার পর কোম্পানির কর্মচারীদের সরাসরি প্রজাদের মুখোমুখি হতে হয়। আর এতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় এখানকার ভাষা। সরকারের অপ্রকাশিত এক নথি থেকে জানা যায়, ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার কারণে কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মি. ব্রিস্টোকে (Mr. Bristow) অপসারণ করা হয়েছিল।[১২৬] ফলে বাধ্য হয়ে তারা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। বস্তুত তাদের হঠাৎ এই বাংলা প্রীতির পেছনে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কারণ চক্রান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বেনিয়া ইংরেজ বিজিত মুসলমান শক্তির ভাষা (ফরাসি), রীতি-নীতি এবং সংস্কারকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত-বহুল বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে এবং দ্রুতই বাংলা ভাষা ব্যবহারে প্রসার পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের হাটে-বাজারে দেশি ভাষায় সরকারি বিজ্ঞাপন টাঙানোর কথা জানা যায়।[১২৭] অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে আয়ত্তে আনার জন্য গবেষণা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কোম্পানির কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনৈক অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানা থেকেই ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের (১৭৫১-১৮৩০) *গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ* (চিত্র ২০) প্রকাশিত হয়। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু। তবে এর আগেও কিছু মুদ্রিত বাংলা নমুনার কথা জানা যায়, যেমনঃ *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ*, *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*,

---

[১২৫] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'ছাপাখানাঃ চীন থেকে চিনসুরা' দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ১৮

[১২৬] শ্রীসজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৫, পৃ ১১৬

[১২৭] তদেব; মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "মুদ্রণ ও প্রকাশন", দ্র. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ ২৫

প্রশ্নোত্তরমালা এবং *প্রার্থনামালা*। ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে ছাপানো একটি বই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন এইচ. হস্টেন এবং এ ধরনের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় জর্মানি থেকে ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রিত *Aurenk Szeb* নামক বইটিতে।[১২৮] মুদ্রিত এসব নমুনার সবই ব্লক বা ছবি হিসেবে ছাপা। তা ছাড়া, সেগুলো ছাপাও হয়েছিল বিদেশে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও সেখানে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ছাপার জন্য 'চলনশীল হরফ' ব্যবহৃত হয়েছিল। হ্যালহেডের ব্যাকরণ বইয়ের মুদ্রাকর ছিলেন চার্লস উইলকিন্স। এতে ছেনি কাটা থেকে শুরু করে হরফ ঢালাই, ছাপার কাজ, সবই উইলকিন্স করেছেন নিজের হাতে।[১২৯] এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন বাঙালি কারিগর পঞ্চানন কর্মকার এবং ব্রিটিশ খোদাই শিল্পী জোসেফ শেফার্ড। অবশ্য এর পূর্বেই উইলিয়াম বোলটস লন্ডনে বাংলা হরফ তৈরির কাজ শুরু করলেও অর্থাভাবে শেষ করতে পারেননি বলে জানা যায়।[১৩০] সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বেই হয়তো জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তার এই ছাপাখানা থেকেই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হয়।[১৩১]

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২২ বছর পর (১৮০০) শ্রীরামপুরে ছাপাখানা আসে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে আসা ড. উইলিয়াম কেরির উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রেসটি। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় বাইবেল এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় বই ছেপে স্থানীয়দের মাঝে প্রকাশ করে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা। এই প্রেস হয়ে উঠেছিল সমকালীন বাংলা মুদ্রণের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এর আগের ২২ বছরে বাংলা থেকে যে কয়েকটি বই মুদ্রিত হয়েছিল, শ্রীরামপুর মাত্র দুই বছরে সে সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তার সময়ে বাংলায় প্রকাশনা শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রই হয়ে উঠেছিল শ্রীরামপুর। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে এই প্রেস থেকেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়।[১৩২] সমাচার দর্পণের প্রকাশ তৎকালীন বাঙালির জীবনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ছাপাখানা পৌঁছে যায় মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্দরমহলে। সাথে সাফল্য

---

[১২৮] শ্রীসজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫, পৃ ৫৫-৫৬

[১২৯] শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ৮

[১৩০] চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বোলটসের বিচল হরফ', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩৭১-৩৭২; শ্রীসজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৫, পৃ ১১৭; সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (১৮০১-১৮৮০), [প্রথম সংস্করণ, ১৩৫০], প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০১, পৃ ৫

[১৩১] শ্রীসজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১৯; গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ৩য় মুদ্রণ [প্রথম মুদ্রণ ২০০৬], ঢাকা, অবসর, ২০০৮ পৃ ১০৬; শ্রীপান্থ, 'তলোয়ার বনাম কলম : প্রথম শতবর্ষে', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ১২৯

[১৩২] শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র', *প্রবাসী*, ৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৩০৬; শিশির কুমার দাশ, 'সাহেবদের ঠাকুর', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৭৪

বাড়ে শ্রীরামপুরেরও। টাইপ ঢালাই, কাগজ ও কালি তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলো নিজেরাই মেটানোর ফলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কলেবরে সুবৃহৎ হতে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুরসংখ্যক বই প্রকাশিত হতে থাকে এখান থেকে। কেরি এবং তাঁর সহকর্মীদের এই সাফল্যের নেপথ্য কারণ হলো লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করা। প্রাচ্যভাষাবিদ উইলিয়াম কেরি সেখানে নিয়োগ লাভ করেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে। ফলে প্রেসের সাথে কলেজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং সেই সুবাদে কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব পায় প্রেস, যার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় প্রেসের। অন্যদিকে কেরিও বিভিন্ন মাতৃভাষাভাষী বহু কৃতি ভারতীয় পন্ডিত এবং জ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। সে কারণে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই-পুস্তক অনুবাদ, তার হরফ তৈরি এবং ছাপানোর কাজটি অনেক সহজ হয় তাঁর জন্য। তবে খুব শিগগিরই সুদিন শেষ হয়ে আসে শ্রীরামপুরের। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মিশনারিরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইউস্টেস কেরি, উইলিয়াম পিয়ার্স, ইয়েটস প্রমুখের নেতৃত্বে একটি দল কলকাতার সার্কুলার রোডে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৩] ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সাথে মিলে যায় এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাকে সরকারিভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।[১৩৪] কিন্তু এই বারো বছরে বাঙালির জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল এই ছাপাখানা। ছাপখানার বিকাশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরণের পথকে সুগম করে। বস্তুত এ সময় (উনিশ শতকে) ভারতবর্ষ একটি মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে অধুনিক হয়ে উঠতে থাকে।[১৩৫] সংবাদ-সাময়িকীর প্রকাশ, গদ্য সাহিত্যের ব্যাপকতা লাভ, রামায়ণ-মহাভারতসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মুদ্রিত কপির প্রকাশ ইত্যাদি নানা কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে বেড়ে যায় মুদ্রিত বইয়ের সংগ্রহ। আর চাহিদার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ছাপাখানা, মুদ্রক ও প্রকাশক– একত্রে বললে ‘বাজার’।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় খিদিরপুরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক বাবুরামের ‘সংস্কৃত প্রেস’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা মুদ্রণশিল্পের জগতে পদার্পণ করে।[১৩৬] এ সময়ে কলকাতায় চার-পাঁচটি প্রেস থাকার কথা বর্ণনা করেছেন শ্রীপান্থ, যার মধ্যে চারটির পরিচালকই স্বদেশি। এরপর থেকে কলকাতা শহরে বাঙালিদের দ্বারা যেমন বহু প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি বইপত্রও প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর। বাঙালিদের এসব প্রকাশনার ছাপার মানও ছিল যথেষ্ট ভালো, যার

---

[১৩৩] বরুণ মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলা মুদ্রণের চার যুগ’, দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৯৮

[১৩৪] শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ২৩

[১৩৫] Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and the art of his times*, New Delhi, Lalit Kala Academi, 1968, p. 3

[১৩৬] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৭৫; গোলাম মুরশিদ, *বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি পর্ব (১৭৭৭-১৮১৭)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ ৪৭

ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বটতলা থেকে প্রকাশিত বইয়েও। যারা কিনা অত্যন্ত সস্তায় বই পৌঁছে দিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে (বিশেষ করে সমাচার দর্পণ) সাধারণ মানুষের বই পড়ার চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু মিশন প্রেসের মতো দামি প্রেসের বই কেনার সামর্থ্য সবার না থাকার কারণে বাড়তে থাকে সস্তা প্রেসের সস্তা ছাপার বইয়ের চাহিদা। হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, শহর-শহরতলী সর্বত্র ছিল এর ব্যাপক চাহিদা। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে শোভাবাজার-চিৎপুর এলাকার তথাকথিত 'বটতলা' অঞ্চলে গড়ে ওঠে অসংখ্য সস্তা ছাপাখানা এবং সস্তা বইয়ের বাজার। বটতলার উত্থান নিয়ে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীপান্থ বলেছেন–

> ...তখন ওই বিস্তীর্ণ এলাকায় শুধু ছাপাখানাগুলো নয়, ব্যস্ত আরও অনেকেই। একদিকে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি, সমাজ সংস্কারক এবং ধর্ম আন্দোলনকারীরা, অন্যদিকে কারিগর, শিল্পী এবং নগরে তখনও উদ্বাস্তু প্রায় গ্রামবাংলার ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল। শহরের আলো হাতছানি দিয়ে তাদের কাছে টেনে এনেছে, কিন্তু আপন করতে পারেনি। নগরের হালচাল দেখে তারা বিভ্রান্ত, বিচলিত, হতাশ এবং বিমর্ষ। কেননা, পুরনো মূল্যবোধ এখানে বিপর্যস্ত, অথচ নতুন যা কিছু তার মধ্যে বৈপরীত্য, শঠতা এবং কপটতাও তো কম নয়। এই জটিল কুটিল সামাজিক নক্‌শায় বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতিতে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত যখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তারই মধ্যে বিশ্বম্ভর দেব নামে একজন ছাপাখানা খুলে বসলেন বাঙালি সংস্কৃতির রাজধানীস্বরূপ বটতলায়। অবরুদ্ধ আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা, আশানিরাশা, ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের উৎসমুখ খুলে গেল। সহসা মুখর হয়ে উঠলেন মূকের দল।[১৩৭]

সর্বস্তরের বাঙালির আনাগোনা ছিল এই বটতলার বাজারে। বটতলা থেকে প্রকাশিত স্বল্পমূল্যের বিনোদনমূলক বই মফস্বল থেকে স্বল্প বেতনে চাকরি করতে আসা কেরানিকুলের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। পরাধীন এবং দরিদ্র জীবনের গ্লানি, কর্মক্ষেত্রে সাহেব উপরওয়ালা ও তার বাঙালি অনুচরবর্গের অত্যাচার এবং গ্রামে-মফস্‌সলে ফেলে আসা আত্মীয়-পরিজনের বিরহে ভারাক্রান্ত এইসব মানুষের কাছে বটতলার বইয়ের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল।[১৩৮] এমনকি ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথও পাঠক ছিলেন বটতলার বইয়ের। *জীবন স্মৃতি*'র সূচনাতেই তিনি তার উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।'[১৩৯] এই রামায়ণ যে বটতলা থেকে মুদ্রিত ছিল সেটা *আকাশ প্রদীপ*-এর 'যাত্রাপথ' নামক কবিতাটি থেকে স্পষ্ট হয়।[১৪০] অর্থাৎ বটতলার বইয়ের অবাধযাত্রা ছিল মনিব থেকে ভৃত্য পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের কাছে। কারণ বটতলা পাঠকের নাড়ি

---

[১৩৭] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ১৯

[১৩৮] অনিন্দিতা ঘোষ, 'বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস', দ্র. অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩, পৃ ৫৯

[১৩৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড*, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ ২৬৬-২৬৭

[১৪০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড*, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫, পৃ ৭৭-৭৮

বুঝত। পাঠক কী চায় এবং ঠিক কোন বিষয়ের বই ছাপলে বাজার কাটতি ভালো হবে এসবের প্রাথমিক ধারণা নিয়েই বটতলার প্রকাশকরা বই প্রকাশ করেছে। আর এসব সস্তা বইয়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে শুধু কলকাতা শহরই নয়, ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে চড়ে তা পৌঁছে গিয়েছিল অজপাড়া-গাঁয়ের পর্ণকুটিরেও।

ঠিক দিন-তারিখ জানা না গেলেও বটতলায় প্রথম ছাপাখানা বসিয়েছিলেন বিশ্বনাথ দেব (মতান্তরে বিশ্বম্ভর দেব)। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রেস থেকেই ভারতচন্দ্রের কাব্য ছাপা হয়েছিল।[১৪১] এর পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বটতলার আয়তন। সুকুমার সেন বটতলাকে কেন্দ্র করে দেশীয় লোকদের দ্বারা স্থাপিত প্রেসের অবস্থানকে কয়েকটি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলে ভাগ করে দেখিয়েছেন এভাবে–

১ মূল বাঁধা বটতলা

শোভাবাজার বালাখানা, দরজিটোলা, কুমোরটুলি, গরাণহাটা, আহিরীটোলা।

ক দরজিপাড়া, সিমলে।

খ শ্যামবাজার, বাগবাজার, টালাবাগান লেন।

গ পাথুরেঘাটা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, ডোমপাড়া, চোরবাগান।

ঘ ঝামাপুকুর, ঠনঠনে, পটলডাঙা, বারসিমলে, শিয়ালদ।

২ বড়বাজার, আড়পুলি, কলুটোলা, সেকরাপাড়া, বউবাজার, চাঁপাতলা, লালবাজার, মুদিয়ালী, কসাইটোলা, ধর্মতলা।

৩ ভবানীপুর, সাহানগর।[১৪২]

আসলে সস্তায় ভালো মানের ছাপায় শুরু থেকেই পাঠক-মন জয় করেছিল বটতলা। সাথে যোগ হয়েছিল বিষয়-বৈচিত্র্য। তবে এতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ফলে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শহরতলিতে চাকরির বাজার তৈরি হওয়া এবং নানা ধরনের ধর্মীয় সাহিত্যের প্রকাশ। বিশেষত বাজারে বৈষ্ণব সাহিত্যের চাহিদা ছিল ব্যাপক। এ ছাড়া অনান্য ধর্মের সাহিত্যও ছিল। এমনকি ছিল মুসলমান সাহিত্যও। অর্থাৎ মুসলমানি পুঁথি এবং এর প্রকাশকও। এসব প্রকাশকদের মধ্যে কাজী সফীউদ্দীন ও তার ছেলে কাজী সাহাভিক, মোহাক্ষাদ সোলেমান, মোহাক্ষাদ আপ্তাবদ্দিন, আফাজউদ্দিন আহম্মদ, মহাক্ষাদ খাতের, মুন্‌শী মনিরূদ্দীন আহাম্মদ, মৌলবী জহিরউদ্দিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এক হিসাব অনুযায়ী, তৎকালীন মুসলমান কবিগণ প্রায় ৮৩২৫টি বই রচনা করেছিলেন, যা বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪৩] এসব প্রকাশনার

[১৪১] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ২৬

[১৪২] সুকুমার সেন, 'বটতলার বই', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ২৭০-২৭১; সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ৫৪

[১৪৩] মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্, 'আমাদের সাহিত্য', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ ৪৩৮

মুসলমান প্রকাশকরা সমসাময়িক হিন্দু প্রকাশকদের তুলনায় বেশ কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন। সে কারণেই তাঁদের প্রকাশিত পুঁথির সাজ-সজ্জার ধরন আরবি বা ফারসি কেতাবের অনুরূপ। খুব সস্তায় প্রকাশ করার জন্য যথাসম্ভব খরচ বাঁচিয়ে এগুলো ছাপা হতো। এ ক্ষেত্রে কাগজই মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া চাহিদার কারণে বটতলার বই সংখ্যায়ও অনেক বেশি ছাপা হতো বলে উৎপাদন খরচও কম হতো। ফলে সস্তায় বিক্রি করতে অসুবিধা হতো না। খুব বেশি নমুনা না থাকলেও বটতলায় লিথোর প্রচলনও ছিল। ভারতবর্ষে লিথোর প্রচলন হয়েছিল বটতলার সমসাময়িক সময়েই। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি শিল্পী মি.দি সাভিজ্ঞাক, মি. বেলন্সের সহযোগিতায় চিনারির করা হেস্টিংসের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কনের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে লিথোগ্রাফ পদ্ধতি চালু করেন কলকাতায়।[১৪৪] এ ছাড়া ডা. আইএনরিভ-ও কলকাতায় স্বাধীনভাবে প্রথম লিথোপদ্ধতি চালু করতে সমর্থ হন। তিনি এ ব্যাপারে গভর্নমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে 'গভর্নমেন্ট লিথোগ্রাফিক প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪৫] ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট লিথোগ্রাফিক প্রেস থেকে বই অলংকরণের জন্য প্রথম লিথোগ্রাফ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।[১৪৬] কোম্পানি-সরকার ভারতবর্ষের মন্দির, মসজিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, মানচিত্র, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার প্রামাণ্যচিত্র ধারনের জন্য নতুন মাধ্যম হিসেবে লিথোগ্রাফ পদ্ধতির সূচনা করে। বিশেষ করে ভারতে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হওয়ার ফলে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে ফর্ম এবং ভাউচার ছাপানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রতিটি রেল হেডকোয়ার্টারে একটি করে লিথো প্রেস স্থাপন করা হয়। এভাবে মাধ্যমটির প্রাথমিক বিস্তৃতি ঘটে এবং খুব শিগগির মাধ্যমটি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় এ মাধ্যমে ছাপা দেব-দেবীর রঙিন ছবি। কারণ পাথর খোদাই কিংবা ধাতুর তৈরি দেব-দেবীর মূর্তির তুলনায় এগুলো ছিল সহজলভ্য। এ ছাড়া দেখতেও অনেক বেশি মানুষের মতো বলে এবং দামেও অত্যন্ত সস্তা হওয়ার কারণে এগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। আর এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে সমকালে লিথোচিত্র চারুশিল্পের মর্যাদা বঞ্চিত ছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগেই (১৮৪০-১৮৭০) বাংলার মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা। প্রায় একই সময় কলকাতার বাইরেও ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১৮৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বাইরে ছাপাখানা ছিল বর্ধমান, হুগলি আর হাওড়ায় কয়েকটি এবং পূর্ববঙ্গের রংপুরে একটি।[১৪৭] কলকাতায় ছাপাখানা আসার অর্ধ শতকেরও (১৭৭৭-১৮৪৭) বেশি সময় পর পূর্ববঙ্গে প্রথম ছাপাখানার আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকেই লোকশিল্প

---

[১৪৪] Erwin Neumayer and Christine Schelberger, *Popular Indian Art Raja Ravi Varma and The Printed Gods of India*, New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 8; শ্রীপান্থ, 'বটতলা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৮৮

[১৪৫] Erwin Neumayer and Christine Schelberger, op.cit., pp. 8-9

[১৪৬] নীলমনি সেনগুপ্ত, 'ছবি ছাপার কলা কৌশল', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩৯৪

[১৪৭] শ্রীপান্থ, 'বটতলা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ১৩

এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক পর্যন্ত বিশেষভাবে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার।[১৪৮] অন্যান্য রপ্তানিপণ্যের সাথে নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য যেমন বয়নশিল্প, সূচিশিল্প, দারুশিল্প এবং কারুশিল্পের রপ্তানির জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল সর্বব্যাপী। আর বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন এবং জামদানির খ্যাতি তো জগদ্বিখ্যাত। প্রাচীন অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনেও ঢাকাই মসলিন খ্যাতি লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪৯]

ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর। সুপ্রাচীন নগর হওয়া সত্ত্বেও এর ধারাবাহিক ইতিহাস অস্পষ্ট। তবে পূর্ব থেকে এর অস্তিত্ব থাকলেও বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে বাড়তে থাকে ঢাকার বৈভব। তের শতকের শেষের দিকে (১২৮০) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সোনারগাঁ জয় করেন এবং এখানে পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁ থেকে প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয়।[১৫০] এই মুদ্রা-ব্যবস্থাপনাকে যদি প্রাচীন ছাপানো বস্তুর নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে 'টাকশাল'কে প্রাচীন ছাপাখানা বলা যায় নিঃসন্দেহে। বাংলার সুলতানি শাসকগণ মুদ্রাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে টাকশালের বিকেন্দ্রিকরণ নীতি গ্রহণ করেন। রাজধানী ছাড়াও দেশের প্রশাসনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাকশাল স্থাপন করে সেখান থেকে তাঁরা মুদ্রা প্রকাশ করেন। সুলতানি আমলের ২৭টিরও বেশি টাকশালের নাম পাওয়া যায়।[১৫১] ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তৈরির মতো মোটাদাগের ছাপ-পদ্ধতির প্রচলন পূর্ববঙ্গে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিকরা প্রথম ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করলে কিছুকাল পর থেকে এশিয়া-মাইনর অঞ্চলেও তার ব্যবহার শুরু হয়।[১৫২] খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০ অব্দ থেকে মুদ্রাপৃষ্ঠে ছাপ অঙ্কন করার প্রমাণ নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বরেই পাওয়া গেছে।[১৫৩] এ ব্যাপারে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও তৃতীয় বা দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বাংলায় ধাতব মুদ্রার উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানগড়ে খননের সময় কিছু ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত এসব নমুনা বিশ্লেষণ করে তা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (৩১৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আমলের বলে ধারণা করা হয়।[১৫৪] আবার, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় (সোনারগাঁ) ভ্রমণকারী

---

[১৪৮] তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪, পৃ ১০

[১৪৯] তদেব পৃ ৪২

[১৫০] রশীদ আমিন,'ছাপচিত্র', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ১৫৭

[১৫১] মোঃ রেজাউল করিম, 'মুদ্রা',বাংলাপিডিয়া, http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE প্রেক্ষিত ১৮-০৪-২০১৫ খ্রি.

[১৫২] Fritz Eichenberg, *The Art of the Print*, London, Thames and Hudson, 1976, p. 27

[১৫৩] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী বটেশ্বর: শেকড়ের সন্ধানে*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ ১২৫

[১৫৪] Md. Mosharraf Hossain, 'Recent discovery of a hord of punch-marked coins at Mahasthangarh', in Enamul Haque edited, *Journal of Bengal Art*, ঢাকা, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, 1999, Vol. 4, pp. 477-478

চীনা দূতদলের সঙ্গী হিসেবে আগত দোভাষী মাহুয়ানের বিবরণীতে খোদাই করা রৌপ্যমুদ্রা এবং বিভিন্ন পদমর্যদার রাজ-কর্মচারীদের সিলমোহর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫৫] মুদ্রার ব্যবহার ছাড়াও ঢাকা-কেন্দ্রিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় বস্ত্র অলংকরণের ক্ষেত্রে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে ঢাকার প্লেন ও ছাপা মসলিনের সীমিত চাহিদা থাকলেও জাহাঙ্গীরের আমলে এর চাহিদা ব্যাপক হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫৬] আবার ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের পেশাভিত্তিক জরিপের একটি তালিকা থেকে দেখা যায়, কিছু লোকের পেশা ছিল মসলিনে ছাপ মারা।[১৫৭] তা ছাড়া জেমস ওয়াইজের বিবরণ হতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ছিপি-গর' নামক পেশাজীবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গে, যারা 'কাশিদা' ও 'চিকন' মসলিনে নকশা করার আগে নকশার ছাপ দিত। মূলত মেয়েরাই এ পেশায় যুক্ত ছিল।[১৫৮] অর্থাৎ বস্ত্র অলংকরণের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যই বহন করে চলেছিল ঢাকা। জেমস টেলর এ অঞ্চলের মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে অলস এবং নিষ্কর্মা বললেও শিল্পকলায় তাদের পারদর্শিতার কথাও উল্লেখ করেছেন।[১৫৯] আসলে প্রকৃতি এ অঞ্চলের মানুষকে কিছুটা আয়েশি করে তুললেও শিল্প ও জীবনবোধও প্রবলভাবে উপলব্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকেই ঢাকা শ্রীহীন হতে শুরু করে। তা আরও বেগবান হয়, যখন কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এককালের রাজধানী ধীরে ধীরে প্রদীপের আলোর বাইরে চলে যায়। এ সময় কলকাতাই হয়ে ওঠে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'কমিটি অব ইম্প্রুভমেন্ট' গঠনের পর ঢাকায় নতুন করে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কমিটি শহরের পুনর্গঠনে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[১৬০] ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা কমিটি' নামে ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকার আধুনিকায়ন শুরু হয়। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে জেলা বোর্ড, ঢাকা কলেজসহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮৪৬) এবং বিদ্বজ্জনেরা সংঘটিত হয়ে যাত্রা শুরুর ফলে ঢাকার সামাজিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ সুগম হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এ সময়েই ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য রংপুরেই প্রথম ছাপাখানা বসানো হয় সমগ্র পূর্ববঙ্গের মধ্যে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শিক্ষানুরাগী জমিদার কালীচন্দ্র

---

[১৫৫] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, মো: রেজাউল করিম অনূদিত, ঢাকা, আই সি বি এস, ১৯৯৭, পৃ ১২১-১২২

[১৫৬] তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪, পৃ ৫৩

[১৫৭] জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮, পৃ ১২৬

[১৫৮] জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, ফওজুলকরিম অনূদিত, ঢাকা, আই সি বি এস, ১৯৯৮, পৃ ৬৭-৬৮; যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, ঢাকা, বইপত্র, ২০০৭, পৃ ২১৩

[১৫৯] জেমস টেলর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৮৭

[১৬০] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ ১১৮

রায়ের অর্থানুকূল্যে গুরুচরণ রায়ের মালিকানায় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'বার্ত্তাবহ যন্ত্র' নামে পূর্ববঙ্গে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়।[১৬১] অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সুনির্দিষ্ট করেই বলেছেন সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যই এই মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। আসলে কলকাতায় উনিশ শতকের শুরুতে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং প্রচুর সংখ্যক সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রচার বাঙালির সামাজিক জীবনে যে নবজাগরণ সূচিত করেছিল, তার প্রভাব এসে পড়েছিল পূর্ববঙ্গেও। তাই শিক্ষা, মতাদর্শ প্রচার এবং সামাজিক জীবন মানোন্নয়নের জন্য এ দেশেও মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পূর্ববঙ্গে তিনটি প্রেসের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি পূর্বোল্লিখিত রংপুরের 'বার্ত্তাবহযন্ত্র' আর বাকি দুটো ঢাকায়।[১৬২] ঢাকায় ধর্মীয় মতাদর্শ এবং শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইস্ট বেঙ্গল মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'কাটরা প্রেস' নামে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল।[১৬৩] সুইস নাগরিক স্যামুয়েল বোস্ট ছিলেন এর প্রিন্টার। বোস্টের দল সম্ভবত ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্যাসেল থেকে মুদ্রণযন্ত্রটি আনিয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, ১৮৪৯-১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাটরা প্রেস সচল ছিল। কাটরা প্রেস থেকে প্রকাশিত এ পর্যন্ত তিনটি বইয়ের নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি বাংলা ও একটি ইংরেজিতে। ইংরেজি বইটি ব্যাপ্টিস্ট মিশন সংক্রান্ত রিপোর্ট। বাংলা বইয়ের একটির নাম 'প্রহেলিকা', অপরটির নাম 'প্রার্থনা অনুক্রম'।[১৬৪] দ্বিতীয় প্রেসটি হলো 'Dacca News Press' যেটি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলেক্সান্ডার ফোর্বেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬৫] এটিই ঢাকার সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক প্রেস। গ্রাহাম'শর ধারণা, ফোর্বেস হয়তো মিশনারিদের থেকে প্রেসটি কিনে নিয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল এই প্রেস থেকে 'ঢাকা নিউজ' পত্রিকাটি প্রথম ছাপা হয়।[১৬৬] ইংরেজিতে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিই ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র। এটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ফোর্বেস। সেজন্য তাঁকে 'The father of modern journalism in Dacca' বলা হয়।[১৬৭] এই উদ্যোগের সাথে অবাঙালিরাই জড়িত ছিল এবং এটি কখনোই বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল না। ফলে তা সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখপত্র হয়ে উঠতে পারেনি কখনোই। বাঙালির সেই অতৃপ্তি পূরণ হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রেস স্থাপনের মাধ্যমে। ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ভগবানচন্দ্র বসু,

---

[১৬১] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৬, পৃ ২৭

[১৬২] তদেব, পৃ ২৮

[১৬৩] G.W. Shaw, 'Printing and Publishing in Dhaka1849-1900', in Sharif uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1991, p. 107-108

[১৬৪] মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী'http://www.kaliokalam.com/2013/10/12/ঢাকা-স্মৃতি-বিস্মৃতির-নগ/ প্রেক্ষিত ০৮/০৪/২০১৫ খ্রি.

[১৬৫] G.W. Shaw, op. cit., p. 108

[১৬৬] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ ১১৭

[১৬৭] G.W. Shaw, op. cit., p. 108

ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও রামকুমার বসু প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রেসটি।[১৬৮] মূলত ঢাকার তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব বিদ্বান প্রতিভূ তাঁদের ইংরেজি শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, চিন্তাভাবনা এবং মতামত প্রকাশের নিমিত্তে এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রেসটির প্রতিষ্ঠা বাঙালির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে আলোড়িত করে। এই প্রেস থেকেই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে পত্রিকাটির মালিকানার সাথে সাথে আদর্শও পরিবর্তিত হয় এবং 'ঢাকা প্রকাশ' হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। মূলত, ঢাকার মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদী মননের প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই পত্রিকাটির মাধ্যমে। বাঙ্গালা যন্ত্রের এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় একই দশকে ঢাকায় আরও চারটি প্রেস গড়ে ওঠে– নতুন যন্ত্র (১৮৬২), সুলভ যন্ত্র (১৮৬৩), বীজনপাণি যন্ত্র (১৮৬৬) এবং গিরীশ যন্ত্র (১৮৬৯)।[১৬৯] এই ঘটনা শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র পূর্ববঙ্গের প্রকাশনা শিল্পের বিকাশের পথকে সুগম করে। ঢাকা-ই হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গের প্রধান মুদ্রণ কেন্দ্র। ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল এমনকি গুয়াহাটি থেকেও লেখকরা বই প্রকাশের জন্য ঢাকা আসতে থাকেন।[১৭০] যদিও ঢাকা ছাড়া পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানেও তখন ছাপাখানা ছিল। এ প্রসঙ্গে আলাদা মনোযোগ দাবি করে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩-১৮৮৫) এবং এর সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬)। আপাত বিস্মৃত এই নাম দুটি উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল এবং গোরা পল্টনের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিকারে এই পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রথমে কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যারত্ন প্রেস'-এ মুদ্রিত হলেও ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে রাজীবলোচন মজুমদারের সহায়তায় তিনি কুমারখালীতে 'মথুরানাথ যন্ত্র' স্থাপন করেন এবং এই প্রেস থেকেই 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করতে শুরু করেন।[১৭১] এ ছাড়া দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, নোয়াখালীসহ ১৬টি স্থানে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মোট ৬৬টি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।[১৭২]

প্রথম দিকে যন্ত্রগুলো সংবাদ সাময়িকী প্রকাশের জন্যই স্থাপন করা হয়েছিল। তবে ক্রমে ক্রমে তাতে যোগ হয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। মূল কাজের পাশাপাশি কিছু কিছু বই-পুস্তক, সাহিত্য এবং পাঠ্যপুস্তক

---

[১৬৮] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ ১২৩

[১৬৯] G.W. Shaw, 'Printing and Publishing in Dhaka1849-1900'', in Sharif Uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future*, Dhaka,Asiatic Society of Bangladesh, 1991, p. 130

[১৭০] ibid, p. 106

[১৭১] আবুল আহসান চৌধুরী, "এডিটর মহাশয়' কাঙাল হরিনাথ', দ্র. রিদওয়ান আক্রাম সম্পাদিত, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ২০১৭

[১৭২] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৬, পৃ ৪০

ছাপিয়েই তাদের ব্যবসা টিকে ছিল। ঢাকা থেকে প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৮৯৪ এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নিবন্ধিত বইয়ের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা থেকে ৮৬৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে।[১৭৩] আর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৮৪২টি।[১৭৪] এ সময় রাজশাহী এবং চট্টগ্রামেও আরও দুটি বড় মুদ্রণ কেন্দ্র ছিল বলে বিভিন্ন নথিপত্রে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের এসব মুদ্রণ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত বইয়ের অধিকাংশ বাংলা ভাষায় ছাপা হলেও, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় এবং সামান্য কিছু উর্দু, আরবি ও ফারসিতেও ছাপা হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গে ছাপার কাজে ঠিক কী ধরনের মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, তার সঠিক কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলেও গ্রাহাম'শর গবেষণা হতে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রাথমিকভাবে 'লেটার প্রেস' ব্যবহৃত হয়েছিল। যশোরে শিশিরকুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশের জন্য হাতে তৈরি কাগজ, জীর্ণ টাইপ এবং কাঠের মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৭৫] অন্যদিকে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বোস্ট যে মুদ্রণযন্ত্রটি এনেছিলেন তা 'অ্যালবিয়ন প্রেস' বলে উল্লেখ করে শেষের দিকে ছাপার মানের সাথে সাথে প্রেসের গুণমানেরও উন্নতির আভাস দিয়েছেন।[১৭৬] এ সময় উন্নতমানের ঢালাই লোহার কলাম্বিয়ান প্রেস, ইমপিরিয়াল প্রেস, অ্যালবিয়ন প্রেস ইত্যদি যথেষ্ট সংখ্যক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অন্তত একটি এখনো চালু অবস্থায় আছে বলে জানা যায়।[১৭৭] এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট[১৭৮] এবং ঢাকা নগর জাদুঘরে একই ধরনের দুটি প্রেস সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে সস্তা কাঠের যন্ত্র ব্যবহৃত হলেও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এখানেও নতুন নতুন পদ্ধতি এবং যন্ত্রাদির আমদানি ঘটতে থাকে। একই উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের সত্তরের দশকের প্রথম দিকে লিথো প্রেসেরও আগমন ঘটে ঢাকায়। সত্তর ও আশির দশকের প্রকাশনার ক্ষেত্রে কলকাতায় লিথো প্রেস ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এরই প্রভাব পড়েছিল এখানেও। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'মোহাম্মদী যন্ত্র' এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথ যন্ত্র' লিথো প্রেস ছিল বলে অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বক্তব্যকে সমর্থন করবে–

---

[১৭৩] Report- Publications issued and Registered in the several provinces of British India, during the year 1887, 1889, 1894 & 1898. Culcatta: Office of the Superintend of Government Printing, India.

[১৭৪] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৬, পৃ পৃ ৫২-৫৩

[১৭৫] ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৮৭)*, কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৭, পৃ ৬৯

[১৭৬] মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃ ৪২ এবং মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী' http://www.kaliokalam.com/2013/10/12/ঢাকা-স্মৃতি-বিস্মৃতির-নগ/ প্রেক্ষিত ০৮/০৪/২০১৫ খ্রি.

[১৭৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ ৪; কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর 'ভান্ডারী প্রিন্টিং প্রেস'-এ ১৮২০ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি 'হপকিন্সন অ্যান্ড কোপ'-এর তৈরি অ্যালবিয়ন প্রেসটি এখনো চালু অবস্থায় আছে

[১৭৮] প্রেসটি শিল্পী রশিদ চৌধুরী চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী চরাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন

> One persion work published in October 1900 was Gane- i mahe paiker, “verses in memory of the death of the Qamerun Nesa Naweb Begam”. This was also one of the only 3 works known to have been printed by lithography rather than letter-press during this period, the other 2 being Srinath Guha’s English copy-book to be used by children to practice hand writing (Raghunath Yantra, 1885) and Nizam Uddin Ahmad’s Hadis Arbain, forty incidents in the prophet’s life in Arabic and Urdu (Mohammadi yantra, 1887).[১৭৯]

তবে উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকায় লিথোগ্রাফি নামমাত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময় সমগ্র পূর্ববঙ্গের চিত্র ঠিক কী রকম ছিল, তা জানা না গেলেও পরের দিকে (২০ শতকে) বেশ কিছু লিথো প্রেস পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং এর আশপাশের অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথর এবং প্রেসগুলোই তার স্বাক্ষর বহন করে।

প্রথম দিকে প্রকাশকরা সামাজিক চাহিদাসম্পন্ন বিষয়গুলো ছাপাতে শুরু করলেন, যা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বই, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক বই এবং পাঠ্যপুস্তক, পঞ্জিকা, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্রমেই এই প্রয়োজনীয় দিকের গণ্ডি পেরিয়ে সৃজনশীল প্রকাশনার দিকে ঝোঁকেন প্রকাশকরা। অন্যান্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পাশাপাশি পুঁথি-পাঁচালিও প্রকাশের বস্তু হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের প্রকাশনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এই পুঁথি, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ‘মুসলমানি পুঁথি’র প্রকাশ। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের তুলনায় ঢাকা থেকেই পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে বেশি। ঢাকার চকবাজারের পশ্চিম দিকে স্থাপিত কয়েকটি বইয়ের দোকান এবং তার আশপাশের কয়েকটি ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে মুসলমানি পুঁথির বেসাতি শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে তা পার্শ্ববর্তী মোঘলটুলি, বড়কাটরা, ছোটকাটরা, চম্পাতলি, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে।[১৮০] একই এলাকাতে ছাপা, বাঁধাই এবং বিক্রয় সম্পন্ন হতো বলে চকবাজারের প্রেস এলাকাটা ‘কেতাবপট্টি’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১৮১] এটাই ছিল পুঁথি প্রকাশ ও বিক্রয়ের মূল কেন্দ্র। এই কেতাবপট্টিই এ দেশের প্রকাশনাকে নব্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য প্রভাবিত এলিটদের বাইরে এনে সাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিল। বিভিন্ন প্রকাশিত রচনা থেকে জানা যায়, মুসলমানি পুঁথির অধিকাংশ প্রকাশক ও কম্পোজিটর মুসলমান ছিলেন। পুঁথির মিশ্র ধরনের ভাষারীতির সংগে মুসলমানদের সংশ্লিষ্টতা এবং পরিচিতি বেশি ছিল বিধায় ছাপায় মুদ্রণজনিত ভুল কম

---

[১৭৯] G.W. Shaw, ‘Printing and Publishing in Dhaka1849-1900’, in Sharif Uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future,* Dhaka,Asiatic Society of Bangladesh, 1991, p. 113

[১৮০] মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, *চকবাজারের কেতাবপট্টি*, ঢাকা, ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০, পৃ ১৪-১৫ এবং শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ১৪

[১৮১] মাসুম সায়ীদ, ‘এপারের বটতলা’, দ্র. ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদিত, *অবসরে* (দৈনিক কালের কণ্ঠ’র শনিবারের ক্রোড়পত্র), ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ ৭

হতো। 'মুসলমানি বাঙ্গালা' খ্যাত এই বিশেষ ধরনের ভাষারীতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের উন্নাসিকতা ছিল। কেউ কেউ একে উৎকট ও পাঠের অযোগ্য এবং শক্তিহীন ও দুর্বল জগাখিচুড়ি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮২] এমনটি ঘটেছে বটতলা কিংবা কেতাবপট্টি উভয় ক্ষেত্রেই। আসলে ভাষা, বিষয় ও আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে বটতলার মুসলমানি পুঁথি ও কেতাবপট্টির পুঁথিতে কোনো প্রভেদ ছিল না।[১৮৩] সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য প্রকাশনার তুলনায় পুঁথির হরফগুলো আকারে বড়। কারণ তখনকার সময়ে দিনের কঠোর ক্লান্তিকর পরিশ্রম শেষে বিনোদনের জন্য সাধারণত রাতের বেলায় পুঁথিপাঠের আসর বসত। কেরোসিন কুপির স্বল্প আলোয় পাঠকের দেখতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্যই এগুলো মোটা হরফে ছাপানো হতো। ফারসি কেতাবের মতো পুঁথিগুলোও বাঁ দিক থেকে খুলে পড়তে হতো। এ ক্ষেত্রে বটতলা প্রথম একটি পার্থক্যের সূচনা করে, তা হলো বটতলা হতে প্রকাশিত পুঁথি সচিত্র হয়ে ওঠে। যদিও বটতলার সচিত্র মুসলমানি বইয়ের সংখ্যা নগণ্য এবং বিশ শতকের গোড়া থেকেই এগুলো সচিত্র-করণ শুরু হয়েছিল।[১৮৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কবি মোক্তাল হোসেনের 'ছহি বড় জঙ্গ নামা'র কথা। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গরাণ হাটা, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত পুঁথিটিতে তিনটি ছবি (চিত্র ২১) ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কবি এয়াকুব রচিত (প্রাপ্ত নমুনায় নামপত্র না থাকায় প্রকাশনার বছর এবং প্রকাশকের নাম এবং অনান্য তথ্য উপস্থাপন করা গেল না) 'জঙ্গ নামা'তে দুটি ছবি দেখা যায়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'ছেরাজল এসলাম' নামক পুঁথির শেষে হাজী আফাজদ্দিন আহ্মদ প্রকাশিত, মৌলবী কফিল উদ্দিন আল সিদ্দিকি সাহেব প্রণীত 'কেরায়ে তোল কোরআন বা জিন্নাতল কারী'র বিজ্ঞাপন থেকে ১২টি চিত্র সহযোগে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। আবার ঁকোকা পণ্ডিতের 'লজ্জতন্নেছা'ও অনেকগুলি ছবিযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৮৫] এ ছাড়া 'সোনাভানের পুঁথি', 'হাতেমতাই', 'সচিত্র ছহি আবুসামা', 'লায়লি মজনু' ইত্যাদি পুঁথি সচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আর 'বটতলার বাইরে মুসলমান প্রকাশকের কোনও বইয়ে ছবি দেখিনি'[১৮৬] বলে মত প্রকাশ করেছেন সুকুমার সেন। তবে মেছুয়া বাজারের 'লায়লি মজনু', 'হাতেমতাই'এ কাঠ খোদাই ছবির দেখা মেলে।[১৮৭] আসলে মুসলমান প্রকাশকরা প্রথম প্রেসস্থাপন করেছিল শিয়ালদহ অঞ্চলে। তারপর বটতলার ব্যাপক জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা বটতলায় প্রেস স্থাপনে আগ্রহী হন। এদের প্রকাশিত মুসলমানি পুঁথির বাজার দেখে হিন্দু প্রকাশক রামলাল শীল

---

[১৮২] মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, 'আমাদের সাহিত্য', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ ৪৩৮

[১৮৩] মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, *চকবাজারের কেতাবপট্টি*, ঢাকা, ঢাকা নগরজাদুঘর, ১৯৯০, পৃ ১৩ এবং শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ১৩

[১৮৪] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ৪০

[১৮৫] ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গরাণ হাটার সত্যনারায়ণ প্রেসে মুদ্রিত 'ছহি চাহার দরবেশ।' পুঁথির শেষে মুদ্রিত বিজ্ঞাপণ।

[১৮৬] সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪০

[১৮৭] সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত*, (প্রথম খন্ড), কলকাতা, নিউ এজ, ২০১৫, পৃ ১০৪

মুসলমানি বই ছাপা শুরু করেন সচিত্র।[১৮৮] এই সচিত্র পুঁথির জনপ্রিয়তার কারণে বটতলার মুসলমানি প্রকাশকরাও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে বেরিয়ে সচিত্র বইপত্র ছাপা শুরু করেন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কলকাতায় মুসলমান প্রকাশকরা প্রেস স্থাপন করেছেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মুসলমানি বইয়ে কোনো অংলকরণ হয়নি। মুসলমানদের পরিচালিত প্রেসগুলো ছিল খুবই সাধারণ মানের এবং ছবিসহ উন্নতমানের ছাপা সেখানে সম্ভব ছিল না। বিশ শতকের শুরুর দিকে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন 'সওগাত' প্রকাশ করার সময় মুসলমানদের পরিচালিত প্রেস সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> মনে করেছিলাম, মুসলমানদের কোন একটা প্রেসে ছাপার কাজ দিয়ে দেব। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, সারা কলকাতা ঘুরেও আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রঙিন প্রচ্ছদপট ও হাফটোন ছবি সহ পত্রিকা ছাপা হতে পারে, মুসলমানদের এরূপ কোনো প্রেস পাওয়া গেল না। তখন আমাদের সমাজে পুঁথি সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল, সেগুলি কোনোপ্রকারে ছাপার জন্য কতিপয় প্রেস ছিল। উন্নত ধরনের কোনো ছাপার কাজ তাতে হ'ত না।[১৮৯]

ধর্মীয় কারণে যেহেতু মুসলমান-প্রকাশনায় ছবি ব্যবহৃত হতো না, সেজন্যই প্রেসগুলোতেও সে ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আবার সস্তায় বিকোনো পুঁথির ক্রয়মূল্য দরিদ্র সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের মধ্যে রাখার জন্যও প্রেসের যুগোপযোগী উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম আগমনের পর থেকেই জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি নির্মাণ এবং তার ব্যবহার ইসলাম সিদ্ধ কি না, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয় মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর যুক্ত হওয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের হাতে মুদ্রিত বস্তু পৌঁছানোর পর। কারণ শুরু থেকেই ভারতীয় আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে বিরোধিতা করে আসছিলেন। পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপানোকে তারা হারাম বলে মনে করতেন। আর সাধারণ মুসলমান সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা বিচারের সুযোগও ছিলনা ধর্মীয় নেতা বা মৌলবি-মাওলানাদের ভয়ে। কারণ ধর্ম ও ধর্মক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টিই ছিল তাদের ব্যবসার প্রধান ক্ষেত্র। যে যত বড় বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারত সমাজে তার অবস্থান তত বড় ছিল। তথাকথিত এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করত। ফলে ধর্মীয় অজ্ঞতার সাথে সাথে যোগ হতো ধর্মান্ধতাও। আর তখনকার সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মুসলমানদের অবস্থানও ছিল কোণঠাসা। যেমন– মুসলমান সমাজের রেনেসাঁ-ব্যক্তিত্ব দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৫) বলিষ্ঠ এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলমানদের জাগতিক আইনকে ইসলামি ধর্মীয় বিধান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হলো মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অপরিবর্তনশীল ধর্মীয়

---

[১৮৮] সোমব্রত সরকার, 'বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত', (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, নিউ এজ, ২০১৫, পৃ ১০১

[১৮৯] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, '"সওগাত" এর ইতিবৃত্ত', *সওগাত*, ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ ১৮

আইন বা বিধান দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়।[১৯০] কিন্তু দেলওয়ার হোসেনের অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ সেকালের মুসলমান সমাজ ছিল ঘোর রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কারো কারো মতে দুনিয়ায় যত প্রকার দৈন্য ও কুসংস্কার আছে– বাংলার মুসলমান সমাজে যেন তার সবই অনুপ্রবেশ করেছিল। সে অন্ধকার যুগে চিন্তার স্বাধীনতা বা স্বাধীন মতপ্রকাশের চেষ্টা ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। এমন সময়ে মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও সামাজিক রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে সচিত্র বই-পুস্তক প্রকাশ করতে কেউ আগ্রহী হতেন না। এমনকি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষক পাওয়াও দুষ্কর ছিল বলে জানিয়েছেন ‘সওগাত’ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তাঁর মতে প্রকাশকদের ধারণা ছিল, ‘...হিন্দুদের মত ছবি দিয়ে ও ধরণের কাগজ বের করার উৎসাহ দেওয়া যায় না। এটা গোনাহ্‌র কাজ হবে।’[১৯১] কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে সচিত্র হয়ে প্রকাশিত হয় ‘সওগাত’-এর প্রথম সংখ্যা। বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন–

> প্রথম সংখ্যায় মানুষের, বিশেষ করে মুসলমান নারীদের কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি ছাপা হয়। এই ছবি ছাপাকে কেন্দ্র করে গোঁড়া মোল্লা শ্রেণীর লোকেরা সওগাতের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তাঁরা মানুষের ছবি ছাপাকে ইসলাম বিরোধী কাজ বলে অভিহিত করেন। ...অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়ে পত্র লেখেন। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমি কি রকম মোছলমান? ফরিদপুরের বিখ্যাত আলেম ও নেতা পীর সাহেব তাঁর পত্রে লিখেছিলেন যে, সওগাত খুব ভাল পত্রিকা হইয়াছে। কিন্তু আপনার কাগজে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাপার দরুন ইহা ঘরে রাখিয়া নামাজ পড়া যায় না–ইত্যাদি।[১৯২]

এ ছাড়া ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ‘নূর’-এর একটি সংখ্যা নিষিদ্ধ হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোড়সওয়ারের ছবি ছাপায় এবং মাসিক ‘বঙ্গনূর’ একে ইসলামের লঙ্ঘন বলে সমালোচনা করে।[১৯৩] একই বছর ‘আল-এছলাম’ মানুষ এবং জীবিত কোনো কিছুর ছবি আঁকাকে ইসলাম-বিরুদ্ধ বলে রায় দেয়। আল-এছলাম লেখে–

> মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর ছবী এছলাম ধর্ম্মে হারাম, কিন্তু মোছলমানগণ কেবল যে ঠেকিয়া বা বিশেষ প্রয়োজন মতে তাহা ব্যবহার করিতেছেন তাহা নহে, বরং শুধু অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া মাসিক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কোন একটী রূপসী নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করাটা কাগজের বিশেষত্ব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন;

---

[১৯০] সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ, ‘বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ’, দ্র. মতিউর রহমান সম্পাদিত, ‘শিল্পসাহিত্য’ (দৈনিক প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র), ২ অক্টোবর, ২০১৫, পৃ ২

[১৯১] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, ‘“সওগাত” এর ইতিবৃত্ত’, *সওগাত*, ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ ১১

[১৯২] তদেব, পৃ ২১

[১৯৩] Mustafa Nurul Islam, *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in The Bengali Press 1901-1930*, Dhaka, Bangla Academy, 2003, p. 113

> ...ছবি আঁকা, দেব দেবীর মূর্ত্তি ধ্যান, হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, তাহাদের ধর্ম্মের সহায়, সুতরাং হিন্দুরুচির অনুকরণ করা ধার্ম্মিক মোছলমানের পক্ষে সম্ভবপর নহে।[১৯৪]

নাচ, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চাকে তারা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করত। এমনকি ছবি তোলাকেও তারা গুনাহের কাজ বলে মনে করত। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় মুসলমান মহাসম্মেলনে আগত নেতাদের ছবি তুলতে গিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়। মওলানা আজাদ সোভানী ছবি তুলতে দিতে রাজি হননি এবং মওলানা আকরম খাঁ-ও প্রথমে প্রবল আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত রাজি হন। সওগাতের ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এই মুসলমান সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রথমবারের মতো মুসলমান সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশের ঘটনা সেটাই প্রথম। এ ধরনের সংস্কারমূলক উদ্যোগ, চিন্তাশীল প্রগতিকামী মুসলমান সমাজ, বিশেষত তরুণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রবলভাবে আদৃত হলেও উগ্র ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ধিকৃতও হয়। বিশ শতক একটু একটু করে মুসলমান সমাজে আলোর ঝলকানি নিয়ে আসতে থাকলেও ছবি আঁকার সাথে ইসলামের বিরোধ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থাকায় প্রগতিশীল ইসলামি সাহিত্যিক-খ্যাত মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'চিত্রকলা ও এছলাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন মাসিক 'মোহাম্মদী'তে। তিনিও এতে উল্লেখ করেন, '...ছবি তুলিতে ছাপিতে বা তাহার ব্যবহার করিতে, ভারতবর্ষের বাহিরের মুছলমানদিগকে বিশেষ কোন আপত্তি করিতে দেখা যায়না।'[১৯৫] অর্থাৎ ভারতবর্ষের মুসলমানগণ ছবি তুলতে বা ছাপতে আপত্তি করতেন। একই রচনার অন্য এক জায়গায়ও বিশ্বের মুসলমান-প্রধান দেশগুলোতে ছবি তোলা ও ছাপার ব্যাপারে উদারতা ও ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আবার মাসিক 'মোহাম্মদী'তে সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং পরে তা 'সচিত্র মাসিক মোহাম্মদী' হিসেবে প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন–

> ...সপ্তাহিক মোহাম্মদীর বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় ছবি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আমাদের কয়েকজন আলেম নিজেদের ধর্ম্মপ্রীতি প্রতিপাদনের জন্য যথেষ্ট অধীরতা দেখাইতে লাগিলেন, এবং এই সুযোগের সুবিধা লইয়া, মোহাম্মদী-বয়কট করাইবার জন্য নিজেদের শক্তি সামর্থ্য টুকু তাঁহারা নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারটা কাল-প্রভাবে কতকটা "গা-সওয়া" হইয়া যাইতে না যাইতে আমার সম্পাদকতায় মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশিত হইল– সচিত্র আকারে। আমার এই "কুমতি" দেখিয়া বাঙ্গালার আলেম সমাজের মধ্যে অনেকে সত্য-সত্যই মর্ম্মাহত হইলেন। আমার পরম ভক্তিভাজন ওস্তাদ বর্দ্ধমান নিবাসী মাওলানা নে'মাতুল্লাহ্‌ছাহেব, তাঁহার স্বভাবিক স্নেহ বশতঃ, আমাকে এ সম্বন্ধে একখানা পত্র লেখেন। ঐ পত্রে মাওলানা ছাহেব কতকগুলি হাদিছের উল্লেখ করিয়া, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানিতে চান। দুইখানা সংবাদপত্র এই লইয়া আমাকে পুতুল-পূজক ও

---

[১৯৪] এছলামাবাদী, 'আলোচনা (সাহিত্যের গতি)', *আল-এছলাম*, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ ২০৯

[১৯৫] মোহাম্মদ আকরম খাঁ,'চিত্রকলা ও এছলাম', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৩৩৭ প্রাপ্ত নমুনায় পৃ নং নেই

মোশ্‌রেক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই– তাঁহাদের বিশিষ্ট "খাঁটি মুছলমানী" গালগুলি ইহার উপর অধিকন্তু।[১৯৬]

মূলত 'চিত্রকলা ও এছলাম' শীর্ষক রচনারটির মাধ্যমে তিনি ইসলামের সাথে শিল্পের বিরোধহীনতার কথা নানা তথ্য সহকারে প্রতিপাদন করেছেন। আর সেজন্য তৎকালীন মুসলমান সমাজে ব্যাপক সমালোচিতও হয়েছিলেন তিনি। এই যদি বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার মুসলমান সমাজচিত্র হয়, তবে উনিশ শতকের শেষ ভাগের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যদিও উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী শিক্ষিত এবং মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা কুসংস্কারমুক্ত হয়ে একটু একটু করে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ জনমতের গড্ডলিকা প্রবাহের নাম লোকমত হলেও তা ভ্রান্ত এবং ভ্রষ্ট। তা ছাড়া মুসলমান সমাজে ইসলামি রীতি-নীতি এবং সংস্কার সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবই কুসংস্কারাচ্ছন্নতার মূল কারণ। আর এজন্য তৎকালীন সমাজের মৌলবি, মোল্লা ও পির তথা ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীরাই দায়ী। এ প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

যাহারা সমাজের ও ধর্ম্মের রক্ষক, তাহারই যদি ভক্ষক হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে বাস্তবিক আর উপায় কি আছে! তথাকথিত বর্ত্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীর সাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে, সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতি-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ, সমাজের উন্নতিকে অন্যূন আর কয়েক শতাব্দী পশ্চাৎ হটাইয়া দিয়াছেন। [ইস্‌লাম প্রচারক, অক্টোবর, ১৯০৩ হতে উদ্ধৃত][১৯৭]

এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামও এক অভিভাষণে বলেছেন–

আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ...মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠ-মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের, জাতির, ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ..."দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো" –নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে।[১৯৮]

এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কার, এবং জাতীয়তাবাদের চেতনাকে আন্দোলিত করে। তাই শিক্ষা, সংস্কার, একতা, সৌজন্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে প্রগতিশীল মুসলমানরা বাংলার মুসলমান সমাজে আলোকবর্তিকা হাতে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল কিছু মুসলমানদের

---

[১৯৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'চিত্রকলা ও এছলাম', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

[১৯৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, 'ইস্‌লাম ও মিশন', *আল্‌-এস্‌লাম*, ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫, পৃ ৩৯৯

[১৯৮] কাজী নজরুল ইসলাম, 'যৌবনের ডাক', *সওগাত*, ৫৪শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩৭৮, পৃ ২৭

উদ্যোগে বিশ শতকের গোড়া থেকে মুদ্রণের কলকাতা কেন্দ্রে নগণ্য মাত্রায় মুসলমানি গ্রন্থ সচিত্রকরণ শুরু হয়।[১৯৯] তবে রাজধানীর বাইরে ঢাকার মতো প্রান্তিক নগরে পূর্বের অন-অলংকৃত মুসলমানি বইয়ের ধারাটিই প্রচলিত থাকে। তবে ধর্মীয় সংস্কারের কারণেই প্রথম দিকে আরবি-ফারসি পুঁথির আদলে নির্মিত কলকাতার অন-অলংকৃত পুঁথির ধারাটি অনুসৃত হলেও[২০০] পরবর্তীকালে বেশ কিছু সচিত্র পুঁথিও মুদ্রিত হয়েছে কেতাবপট্টি থেকে। এর মধ্যে 'সোনভানের পুঁথি', 'ছায়েত নামা', 'সচিত্র বড় ছায়েত নামা', 'সচিত্র ছহি বড় সোনাভান' এবং 'সচিত্র আদি ও আসল বড় সোনাভান' (চিত্র ২২) উল্লেখযোগ্য। তবে কলকাতা কেন্দ্রের ছবিযুক্ত মুসলমানি পুঁথির তুলনায়, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুঁথির ছাপা ও কাঠ খোদাই ছবিগুলো ভীষণ ঝকঝকে।[২০১] কখনো কখনো বিষয়ের ভীষণ সংবেদনশীল উপস্থাপন ঋদ্ধ। এসব পুঁথিতে প্রকাশনার কোনো সময়কাল উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় বিশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছি সময়ে এগুলো প্রকাশিত।

কিন্তু এই সচিত্র মুসলমানি পুঁথি প্রকাশেরও আগে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত দু-একটি (হিন্দু) প্রকাশনায় সামান্য অলংকরণ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামপত্রে, তবে ভেতরেও ছোট ছোট ছবিও দেখা যায়। বিশেষত বিষয়বস্তুর শুরু এবং শেষের দিকে। কখনো তা বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং কখনো তা বৈসাদৃশ্যপূর্ণও হতে পারে) লক্ষ করা যায়। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, বীণা হাতে স্বরসতী, বাঁশি হাতে কৃষ্ণ, ফুলের ঝুড়ি কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্যের অলংকরণও চোখে পড়ে। কখনো কখনো একই ছবি বা নকশা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার অমরযন্ত্রে মুদ্রিত ত্রিপুরি ব্যাকরণ 'কক্‌বর্মা।'-র নামপত্রে যে ফুলের ঝুড়ির ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছে ওই একই ছবি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত।'-র শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। ধারণা করা হয়, এসব ছবির অধিকাংশ ব্লকই কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'রেডিমেড' হিসেবে বিভিন্ন প্রেস সংগ্রহ করেছে। তবে এ সময়কার মুসলমানি প্রকাশনা বা পুঁথির ক্ষেত্রে নামপত্রে বা প্রচ্ছদে শুধু লতাপাতার নকশাই দেখা যায়। ভেতরের দিকটা সাদামাটা হরফেই ছাপা। গ্রাহাম'শ এসময়ে মুদ্রিত সীতানাথ বসাকের 'শিল্পশিক্ষা'র কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে–

> The only illustrated book listed is Sitanath Basak's 5-Page "Silpa Siksha"a few general rules, with illustrations,...for drawing figures and forms of flowers,

---

[১৯৯] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ৪০

[২০০] সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত*, (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, নিউ এজ, ২০১৫, পৃ ১০১

[২০১] এরূপ হবার কারণ হলো বটতলার পুঁথি ছাপা হতো অনেক সংখ্যক ফলে এগুলো ছাপার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি কাঠের ব্লকটি ব্যবহৃত না হয়ে এর উপরে একটি ধাতব আবরণ ব্যবহার করা হতো যাকে বলা হয় 'ইলেকট্রোব্লক'। ফলে কাঠের উপরে খোদিত ছবি অনেক ক্ষেত্রে ঝাপসা ও রেখাগুলো কাঁপা কাঁপা হতো (যদিও ইলেকট্রোব্লকে ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন ছাপার অসংখ্য নমুনাও বটতলায় রয়েছে)। পক্ষান্তরে ঢাকা থেকে পুঁথি যেহেতু অল্প সংখ্যায় মুদ্রিত হতো সেক্ষেত্রে হয়তো সরাসরি কাঠের ব্লকটিই মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হতো। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত পুঁথির ব্লকও (সম্ভবত) সংগ্রহ করা হয়েছে কলকাতা থেকেই। কারণ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ ব্লকই আসতো কলকাতা থেকে।

> leaves, creepers & C., printed at the Shital yantra, 1885. See *Bengal Library Catalogue of Books*, 1885, 4th quarter, PP 2-3. If the author was the printer Sitanath Basak then he was evidently an artist and engraver also.[২০২]

আবার বিশ শতকের শুরুতে ঢাকার আশুতোষ প্রেস থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'র প্রথম পৃষ্ঠায় গৌর-নিতাইয়ের একটি যুগল ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটির নিচে ডান পাশে কালো কালিতে লেখা রয়েছে শিল্পীর নাম 'কেশব ঢাকা ১৩১৭'। লেখাটি ব্লকে ডট (dot) এ বিভাজিত হওয়ার ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মূল ছবিতে ঢাকা নিবাসী শিল্পীর স্বাক্ষর এটি। সীতানাথ বসাক বা কেশবের মতো শিল্পী এবং সামান্য কিছু অলংকরণের তথ্য থাকলেও আস্বীকার করা যাবে না যে, ভালো ছাপা ও অলংকরণের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবও ছিল এখানে। তাই কলকাতা থেকে মুদ্রিত সচিত্র পুঁথি যখন ঢাকা থেকে আবার ছাপা হয়েছে তখন তা ছবি ছাড়া ছাপা হয়েছে। আবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুঁথির পুনর্মুদ্রণ যখন কলকাতা থেকে হয়েছে তখন তাতে ছবি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কেতাবপট্টি থেকে হাফেজ আব্দুল সামাদ মুনসি, জয়নাল আবেদিনের 'ছহি বড় আবুশামা' প্রকাশ করেন এবং এর এক দশকের ভেতরে বইটি কলকাতার মেছুয়া বাজার স্ট্রিটের গওসিয়া লাইব্রেরির নূরুদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক আবার প্রকাশিত হয়।[২০৩] লেখকের নাম ভিন্ন হলেও ভাষা ও বিষয়-বিন্যাস একই। তবে পার্থক্য হলো, কলকাতার প্রকাশনাটি সচিত্র। আসলে বিশ শতকে পুনর্মুদ্রিত কোনো বইয়ে ছবি যোগ না করে প্রকাশ করে বাণিজ্যকভাবে সফল হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ প্রসেসড ব্লকের কল্যাণে তখন প্রচুর ছবি ছাপা হচ্ছিল বইয়ে। উনিশ শতকের শেষ দশকে কলকাতায় 'হাফটোন' ব্লকের প্রচলনের কিছুদিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গেও তার ব্যবহার শুরু হয়। বিশ শতকের শুরুতে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'সৌরভ'-এর ছাপার মান সমসাময়িক কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তুলনায় যথেষ্ট ভালো ছিল। মফস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও ছাপার কাজ হতো ঢাকায়। এই পত্রিকায় হাফটোন ব্লক ব্যবহার করে প্রায়ই রঙিন ছবি ছাপা হতো। সেসব ছবির মানও সমসাময়িক জনপ্রিয় পত্রিকার মতোই। এসব ছবির জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক কলকাতা থেকেই তৈরি করে আনা হতো। ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছবি ছাপাতে না পারা প্রসঙ্গে সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের নিম্নোক্ত 'চিত্র সম্বন্ধে কৈফিয়ত' শীর্ষক উদ্ধৃতিটি বক্তব্যকে আরও সরল করবে–

> কলিকাতা হইতে ব্লক করাইয়া, ঢাকা হইতে ছাপাইয়া মফস্বল হইতে পত্রিকা বাহির করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এরূপ করিয়াও আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়েই "সৌরভ" বাহির

---

[২০২] G.W. Shaw, 'Printing and Publishing in Dhaka1849-1900', in Sharif Uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1991, p. 138

[২০৩] গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া ক'বার বটতলায় যায়?*, কলকাতা, ছাতিম বুকস্, ২০১১, পৃ ৩৯৮

> করিয়া আসিতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্লক কলিকাতা হইতে অদ্য পর্য্যন্তও আসিয়া না পঁহুছায়, নিয়মিত প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপিত চিত্র ব্যতীতই এই সংখ্যা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।[২০৪]

পত্রিকাটির মূল পাঠ্যবস্তু থেকে ছবি ছাপানো পৃষ্ঠাটি একটু উন্নতমানের এবং প্রতিটি ছবির নিচে মুদ্রিত প্রেসের নাম থেকে জানা যায়, সেগুলো ঢাকার আশুতোষ প্রেসে ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ ঢাকা থেকে ব্লক ব্যবহার করে ছবি ছাপার ধারা প্রচলিত ছিল। ব্লক তৈরি করার পর লেটার প্রেস ব্যবহার করেই তা থেকে ছাপ নেওয়া হতো। এই লেটার প্রেস এ দেশে মুদ্রণের গোড়া থেকেই ছিল। তবে ব্লকের ক্ষেত্রে কলকাতার ওপর ঢাকার নির্ভরশীলতা ছিল দীর্ঘদিন পর্যন্ত। শিল্পী আমিনুল ইসলাম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের স্মৃতিচারণামূলক লেখায় ব্লক তৈরির জন্য কলকাতায় পাঠাতে হতো বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২০৫] মূলত দেশবিভাগের পর অবাধে কলকাতা যাওয়ার পথরুদ্ধ হলে আস্তে আস্তে এখানকার মুদ্রণ প্রকৌশলের সাথে জড়িতরা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। সেজন্যই ধীরে ধীরে এখানে মুদ্রণ সম্পর্কিত দ্রব্যাদির বাজার গড়ে ওঠে। ঢাকায় পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকেই বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় প্রসেস ব্লক তৈরির প্রথম প্রতিষ্ঠান 'ইষ্ট এন্ড প্রসেস ওয়ার্কস ও টাইপ ফাউন্ড্রী' প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪নং মদনমোহন বসাক রোড, ওয়ারীতে।[২০৬] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত মাসিক দিলরুবার সংখ্যাটিতে ইষ্ট এন্ড প্রসেস ওয়ার্কস ও টাইপ ফাউন্ড্রীকে ' ... আধুনিক উন্নতধরনের ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট রকমের হাফটোন, লাইন ও কালার ব্লক ইত্যাদি প্রস্তুত করার পূর্ব্বপাকিস্তানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান' বলে প্রতিষ্ঠানটির একটি বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে।[২০৭] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার পূর্বেই অর্থাৎ, ১৯৫০ বা তার মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ই নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উক্ত প্রতিষ্ঠানটি।

প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের মধ্যভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক মুদ্রণ প্রকৌশল ও শিল্প, কোনোটাই স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ কলকাতা তখনো ছিল কেন্দ্র। পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা টিকে ছিল মূলত পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করেই। পুঁজি ছোট হওয়ায় ধ্রুপদী সাহিত্য প্রকাশের চেয়ে ব্যবসায় সফলতা দিতে পারে এমন বিষয় প্রকাশের দিকেই তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। যা-ও বা অল্প কিছু সাহিত্য প্রকাশিত হতো, তা-ও পাঠককে ততটা আকর্ষিত করতে পারত না নিম্নমানের কারণে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য–

---

[২০৪] *সৌরভ*, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ ২৭২

[২০৫] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩২

[২০৬] প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, গবেষক শাওন আকন্দ *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* এ প্রকাশিত তাঁর 'গ্রাফিক ডিজাইন' শীর্ষক রচনায় প্রথম প্রসেস ব্লক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ইস্টার্ন প্রসেস' এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল 'পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে' (শাওন আকন্দ, 'গ্রাফিক ডিজাইন', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৭৮) বলে দাবি করেছেন, যা সঠিক নয়

[২০৭] *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭

> স্বাধীনতা-উত্তর এক যুগে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেও আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য এখনও বড়জোর হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। বইয়ের দোকানে ঢুকে ক্রেতাদের প্রথম প্রশ্ন "কোলকাতার বই আছে?"-থেকেই একবার কিছুটা প্রতিফলন পাওয়া যেতে পারে। জিজ্ঞাসাটাকে সম্পূর্ণ কমপ্লেক্স-প্রণোদিত বলে উড়িয়ে দেয়া উচিত হবে না। এ জন্যে যে, রসিকজনের রুচি-উত্তীর্ণ উপন্যাস পূর্ব পাকিস্তান এখনো দিতে পেরেছে কি-না সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।[২০৮]

তাই বই প্রকাশ করে টাকা বসিয়ে রাখার চেয়ে কলকাতা বা বিদেশ থেকে বই আমদানি করাকেই তাঁরা বেশি লাভজনক ভেবেছিলেন। তা ছাড়া সুদৃশ্য মুদ্রণের জন্য ভালো ছাপাখানা, ভালো টাইপ এবং কাগজের অভাব তো ছিলই। ফলে প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না অনেকাংশে। এসব সীমাবদ্ধতা আস্তে আস্তে দূর হতে থাকলেও পূর্ববঙ্গের বই সম্পর্কে পাঠকের উন্নাসিকতাও ছিল, যা এখানকার মুদ্রণশিল্পের বিকাশের গতিকে রুদ্ধ করেছিল। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পরও 'কলকাতার সব পুস্তকই ভাল নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সব পুস্তকই খারাপ নয়' বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপার কথাও শোনা যায়।[২০৯] ১৯৪৭-'৫৯ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে বই প্রকাশিত হয়েছে ৭৫৭২ টি। এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক ৫০১১ এবং সাহিত্যধর্মী ২৫৬১ টি।[২১০] এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু ব্রিটিশ ভারতেই নয় পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ঢাকা প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী হয়ে উঠলেও এখানকার প্রকাশনা-শিল্প শৈশবও অতিক্রম করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মুদ্রণ-সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং এর পরিসরও ব্যাপকতা লাভ করে। উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্রগুলো এ সময় অফসেট প্রেস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে নিশ্চল আপদে পরিণত হলেও প্রযুক্তির নতুন নতুন ছোঁয়ায় এ শিল্পের ব্যাপকতার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিনিয়তই। পুরান ঢাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ঢাকার অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে প্রচুর ছাপাখানা। আর শুধু রাজধানী নয়, কম্পিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আজ পৌঁছে গেছে মুদ্রণ-প্রকৌশল। প্রতিবছর ছাপা হচ্ছে হাজার হাজার বই, বসছে মেলা। এ মাধ্যমের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে নিয়েছেন তাদের জীবন ও জীবিকা।

অথচ একসময় মুদ্রণ-পদ্ধতির আগমনকে বাঙালিরা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। এ দেশীয়দের ধারণা ছিল, তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য ইউরোপীয় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুদ্রিত বইয়ের প্রচলন শুরু হয়েছে। তখন অনেকে নিজেদের এই অপবিত্র কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বক্ষণ রাম-নাম জপ করত। কেউ কেউ ছাপানোর যন্ত্র দেখলে বা ছাপানো বই স্পর্শ করলে তিনবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে পবিত্র হওয়ার কথাও প্রচলিত আছে।[২১১] আসলে কলকাতায় মুদ্রণ কলাকৌশল প্রচলিত হওয়ার প্রথম দিকে

---

[২০৮] সোফিয়া রহমান, 'প্রকাশিকার কৈফিয়ৎ', দ্র. রাজিয়া খান রচিত, *বটতলার উপন্যাস*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৫৯

[২০৯] অব্দুর রশীদ খান এম. এ., 'পূর্ব-পাকিস্তানের পুস্তক প্রকাশনা', *মাহে-নও*, ১১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬০, পৃ ১২৮

[২১০] তদেব

[২১১] পূর্ণেন্দু পত্রী, 'বটতলা উডপ্রিন্টের ছবি', দ্র. *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ ১৩৩

স্থানীয়রা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। তখন শুধু ইউরোপীয়রাই এ মাধ্যমের সাথে যুক্ত ছিল এবং নানা সংগত কারণে তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল না। তাদের প্রায় সবকিছু সম্পর্কে এদেশীয়দের উন্নাসিকতা ছিল। আসলে রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড হাতিয়ে নেওয়ায় ইংরেজদের সব সময় সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখা হতো। কারণ, ভারতবর্ষে তাদের আগমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য।

আর সে উদ্দেশ্যে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক কলকাতার পাশে সুতানুটিতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উন্নয়নের ধারায় পরিবর্তিত হতে হতে সুতানুটি-কলকাতা একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির রাজধানীতে পরিণত হয়। তবে সরকারিভাবে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়ার পর থেকে তার গুরুত্ব অভাবনীয় দ্রুততায় বাড়তে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে নাগরিক উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে ভাগ্যান্বেষণে দলবেঁধে ইউরোপীয়রা এখানে আসতে থাকে। অন্যান্য ভাগ্যান্বেষণকারী সাধারণের সাথে সেখানকার জীবনসংগ্রামে গলদঘর্ম বেশকিছু শিল্পীরও আগমন ঘটে এ সময়। ইউরোপীয় ধারার এই শিল্পীদের কাজ খুব সহজেই এদেশীয় বিত্তশালীদের দ্বারা সমাদৃত হয় এবং ইউরোপ থেকে আরও শিল্পীর আগমন ঘটে এখানে। এ ক্ষেত্রে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আগত টিলি কেটলের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হলেও তারও আগে হেনরিলিকি নামে অন্য একজন অখ্যাত ইংরেজ শিল্পী ভারতে এসেছিলেন বলে জানা যায়।[২১২] তবে অষ্টাদশ শতকের পূর্বেও ভারতে ইউরোপীয় শিল্পী, মুদ্রাকার, খোদাইকাররা এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ অন্তর্লীন বা ইন্টাগ্লিও পদ্ধতিতে ছাপ নির্মাণের পদ্ধতি এ দেশে প্রচলন ঘটান ড্যানিশ মিশনারি বার্থোলিমিউ জিগেনবালগ। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রাংকুইবার (তামিলনাড়ু জেলা) থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘দি ইভানজেলিস্ট অ্যান্ড দি অ্যাক্টস অব দি অ্যাপোস্টেলস’ নামক বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় বাদামি রঙের একটি এচিং সংযোজিত হয়েছিল। এরপর জিগেনবালগের অন্য বই ‘গ্রামাটিকা ডামুলিকা’তে প্রথম প্লেট এনগ্রেভিং দেখা যায়।[২১৩] প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির প্রচলন ঘটানোর পর বিভিন্ন বর্ণনামূলক বিষয়কে আরও রসালো এবং সহজবোধ্য করার প্রয়োজনে ইউরোপীয়রাই শিল্পীদের সাথে সাথে প্রিন্টার, এনগ্রেভার এবং এচারদেরও এ দেশের সাথে পরিচয় ঘটান। আর এসব শিল্পী তথা প্রিন্টার, এনগ্রেভাররাই ভারতবর্ষে ছাপাই মাধ্যমে প্রথম গ্রন্থচিত্রণ এবং এক পাতার ছাপচিত্র জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৭৬৬ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬১ জন ইউরোপীয় শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন।[২১৪] শিল্পীদের এ দেশে আসার এই হুজুগ শীর্ষে পৌঁছায় ১৭৮০ থেকে ১৭৮৬

[২১২] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ ২০

[২১৩] http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx প্রেক্ষিত ০৩-০৪-২০১৫ খ্রি.

[২১৪] ফয়েজুল আজিম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০-২১

খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[২১৫] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম হজেস, থমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, ফ্রাঁসোয়া বেলথাসার সলভিন্স, কোলেসওয়ার্দি গ্রান্ট, ফ্রান্সিস ডরমিক্স, জেমস মোফাট, সামুয়েল হাওইট, জেমস বেইলি ফ্রেজার, কেলেব জন গারব্রান্ট, দ্য সাভিজ্ঞাক প্রমুখ। অন্যান্য বিদেশি শিল্পীর মতো রুশ শিল্পীরাও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে এদেশ মাড়িয়েছেন। সে যাত্রায় অগ্রপথিকদের একজন হলেন সালতিকভ। আবার এসব পেশাদার শিল্পীর বাইরে সে সময় অনেক শৌখিন শিল্পীও ছিলেন। এ ধরনের শিল্পীরা ভিন্ন পেশাজীবী হলেও তাঁদের নেশা ছিল ছবি আঁকা। এমনই একজন শখের শিল্পী সিভিলিয়ান স্যার চার্লস ডয়েলি। কোম্পানি আমলে যে কয়েকজন শিল্পী ছাপচিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, ডয়েলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ‘দ্য ইউরোপীয়ান ইন ইন্ডিয়া’, ‘অ্যান্টিকুইন্টিস অব ঢাকা’, ‘স্কেচেজ অন দ্য নিউ রোড’, ‘ইন্ডিয়ান স্পোর্টস’, ‘ভিউজ অব ক্যালকাটা’, ‘বিহার অ্যামেচার লিথোগ্রাফিক স্ক্রাপবুক’, ‘দ্য কস্টিউমস অ্যান্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইন্ডিয়া’ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। তৎকালীন ঢাকার নানা দৃশ্য বিধৃত আছে, অ্যান্টিকুইন্টিস অব ঢাকায় (চিত্র ২৩)। ছবিগুলোয় তৎকালীন ঢাকার আর্থ-সামাজিক ক্রমাবনতির দৃশ্য নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একজন সংগঠক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ডয়েলি। পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টে থাকার সময় সেখানে ‘বিহার লিথোগ্রাফিক প্রেস’ নামে একটি প্রেস চালু করেছিলেন এবং ‘দি ইউনাইটেড পাটনা অ্যান্ড গয়া সোসাইটি অ্যান্ড বিহার স্কুল অব এথেন্স’ নামে দেশীয় এবং ইংরেজ শিল্পীদের সমন্বয়ে একটি শিল্পী-সংস্থাও গড়ে তোলেন তিনি।[২১৬] সমসময়ের আরেকজন সিভিলিয়ান শিল্পী হলেন জর্জ ফ্রাংকলিন অ্যাটকিনসন। ‘দ্য ক্যাম্পেন ইন্ডিয়া’, ‘কারি অ্যান্ড রাইস’, ‘ইন্ডিয়ান স্পাইসেজ ফর ইংলিশ টেবল’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। তৎকালীন ইউরোপ থেকে আসা এচার এবং এনগ্রেভারদের মধ্যে আরও যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরা হলেন– জোসেফ শেপার্ড, রিচার্ড ব্রিটরিডজ, থমাস টেইলর, হেনরি হাডসন, উইলিয়াম বেইলি, অ্যাভোন আপজন, জন ব্রাউন, জন অ্যালে ফাউন্ডার, জে আহরেন্টজ, জি হ্যামিলটন, স্যামুয়েল ডেভিস, টমাস হিকি, উলিয়াম ফ্রাংকলিন, এমিলি ইডেন, জ্যাকুইস বেলনস প্রমুখ।[২১৭]

পরিশ্রমী এই শিল্পীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের জন্য প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন মনুমেন্ট, ঐতিহাসিক স্থাপনা, ভূ-দৃশ্য, এ দেশের সামাজিক জীবনচিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র প্রভৃতি অঙ্কন করেন। এগুলোর কিছু কিছু থেকে পরবর্তী সময়ে ছাপচিত্রের বহু অ্যালবামও প্রকাশ করেন

---

[২১৫] প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশি চিত্রকর*, কলকাতা, অয়ন, ১৯৭৮, পৃ ২৭

[২১৬] Erwin Neumayer and Christine Schelberger, *Popular Indian Art Raja Ravi Varma and The Printed Gods of India*, New Delhi: Oxford University Press, 2003, P. 9; মৌমিতা বসাক, ‘চার্লস ড'য়লির প্রদর্শনী’, *শিল্পও শিল্পী*, www.shilpaoshilpi.com/?P=484 প্রেক্ষিত ০৬-০৪-২০১৫ খ্রি.

[২১৭] Surmistha Maiti, ‘Printmaking in the City of Joy’, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=printmaking-in-the-city-of-joy&iid=23&artieleid=597 প্রেক্ষিত ০৩-০৪-২০১৫ খ্রি.; শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৭৪-৭৫

তাঁরা। এ দেশে আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির সেই প্রাথমিক যুগে ছাপচিত্রের এসব অ্যালবাম করণকৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার এসব ছবি শিল্পোরসোত্তীর্ণ কিনা, সে প্রশ্নও উঠতে পারে। তবে শিল্পমূল্য যা-ই হোক ক্যামেরাহীন সে যুগে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সংস্থানের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সেগুলোর তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> Most of the visiting European artists were not top rate. But they were definitely amongst the best in the second category of artists during their time. They left behind invaluable historical documents for reconstructing the manners, customs, religious festivals, costumes, and the ecological history of Bengal and the rest of the colonial subcontinent. In the absence of photo-graphic and other visual media, these lithograph engravings are the only genuine and contemporary documents available to us for reconstructing the social system, public life and topography of 18th and 19th century colonial India. Read together with the memories and diaries of those times, these documents help us to better understand the internal dynamics of British rule and the social and religious life of the subcontinent during eighteenth and the first half of the nineteenth century.[২১৮]

এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের সাথে এ দেশীয় মুদ্রণ ও চারুশিল্পের বিকাশেও এই শিল্পীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁদের সান্নিধ্যে আসার ফলে ধীরে ধীরে এ দেশি শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ছবি ছাপার কলাকৌশলকে উন্নত করে এবং উনিশ শতকে এসে সচিত্র বই প্রকাশ করার মাধ্যমে শিল্পের এই মাধ্যমটিকে নিজেদের করে নিতে সক্ষম হন। তা ছাড়া পরবর্তীকালের আধুনিক শিল্পের পথচলার শিকড়ও এখানেই প্রোথিত।

বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মুদ্রিত বই প্রকাশের অল্প কিছুদিন পর ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জর্জ গর্ডনের প্রেস থেকে কেপটাউন ও স্টেবল মাউন্টেনের খোদিত ছবি যোগ করে মিস এমিলি ব্রিটলের 'দ্য ইন্ডিয়া গাইড অর জার্নাল অব এ ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ' প্রকাশিত হয়।[২১৯] একই বছর ডানিয়েল স্টুয়ার্টের প্রেস থেকে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'দ্য বেভি অব ক্যালকাটা বিউটিজ' নামে একটি সচিত্র কবিতা-সংকলন বের হয়।[২২০] আবার ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর প্রথম খণ্ডে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, কার্তিক, কৃষ্ণ, সূর্য,

---

[২১৮] Mahboob Alam, 'eurpean artists in Bengal (1760-1824)', in Luva Nahid Chudhury edited, *Jamini*, Vol. 2, No. 3, 2005, p. 97

[২১৯] স্বপন বসু, 'ভূমিকা', দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭, পৃ ৭

[২২০] তদেব

রাম, নারদ প্রমুখ দেবতার চৌদ্দটি ধাতু খোদাই-চিত্র মুদ্রিত হয়।[২২১] এ সময়কার ইন্টাগ্লিও প্রিন্ট-সমৃদ্ধ প্রকাশনা থেকে অনুমান করা যায়, কলকাতায় সে সময় ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবহার বেশ প্রতিষ্ঠিতই ছিল। তবে ধাতু খোদাইয়ের পাশাপাশি এ সময়েও ছাপচিত্রের সস্তা মাধ্যম হিসেবে খ্যাত কাঠ খোদাই মাধ্যমেও কাজ চলছিল। প্রমাণস্বরূপ ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত 'ভোকাবুলারি পার্ট-১'-এর অলংকৃত নামপত্রের কথা বলা যায়।

> ...পৃষ্ঠার নিচের অংশে একটি ছোট উড-এনগ্রেভিং একটি বনকে উপস্থাপন করছে। যদিও উদ্ভিদ এবং পর্ণরাজি ভীষণ ছোট এবং প্রায় মিনিয়েচারিশ, তাদের ধারণা এবং পরিবেশনা (আলো-ছায়ার অঙ্কনে) প্রকৃতিবাদী, যদিও মোটিফের পরিবেশনা এবং ধারণা থেকে, সেই সাথে গঠন পদ্ধতি থেকে, এটি কোনো ভারতীয় শিল্পীর কাজ বলে মনে হয় না, যদিও আমরা জানি যে, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পী এবং কারিগররা এমন ছোট স্থানে এত সুদক্ষ ভাবে কাজ করতে সক্ষম ছিল না। তবে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্লকটি এখানে নির্মিত হয়েছিল এবং রিলিফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছিল... ।[২২২]

এ ছাড়া ফ্রস্টারের 'কর্নওয়ালিস কোড' (১৭৯৩) এবং উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাস মালা' (১৮১২)-তেও সামান্য কিছু অলংকরণ যোগ করা হয়েছিল কাঠ খোদাই মাধ্যমে।[২২৩]

কাঠ এবং ধাতু খোদাই যোগ করে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রেস থেকে সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'-এর সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের প্রেসে কাজ করার সুবাদে গঙ্গাকিশোর মুদ্রণ এবং বইয়ের ব্যবসা ভালো বুঝতেন। অন্নদামঙ্গল প্রকাশের আগে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি 'গভর্নমেন্ট গেজেটে' একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রকাশের ঘোষণা দিয়ে বাজারে বইয়ের চাহিদা নিরূপণ করে নেন এবং তার পরে একই বছরে অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন।[২২৪] সচিত্র গ্রন্থ হিসেবে অন্নদামঙ্গলের (চিত্র ২৪) মধ্য দিয়ে একটি সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়। এরপর বাংলা বইয়ে ছবি যোগ করার রীতিমতো জোয়ার সৃষ্টি হয় কলকাতায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল নানা ধরনের চরিত্র বসিয়ে বর্ণনাকৃত ঘটনার সচিত্র বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। ফলে ছবিগুলোতে স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য যুক্ত না হয়ে লেখার অধঃস্তন সহকারী হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। কেননা, চিত্রগুলোতে চরিত্রগুলোকে কোনো না কোনো বর্ণনার মুহূর্তের ভঙ্গিতেই উপস্থাপন করতে পারাতেই সার্থকতা বিবেচিত হয়েছে, যাতে লাইনের পর লাইন লেখা দেখতে দেখতে ক্লান্ত পাঠকের চোখ হঠাৎ ছবিতে চোখ বুলিয়ে স্বস্তি লাভ

---

[২২১] কমল সরকার, 'বাংলা বইয়ের ছবি', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩১৩

[২২২] Pranab Ranjan Ray, 'Printmaking by Woodblock upto 1901: A Social and Technological History', in Asit Paul edited, *Woodcut Prints of 19th Century Calcutta,* Calcutta, Seagull Books, 1983, p. 82

[২২৩] ibid

[২২৪] শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র', *প্রবাসী*, ৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৩০৬

করতে পারে। এর অধিকাংশই লোকজ ঢঙে আঁকা একধরনের কাল্পনিক চিত্রাবলি। এতে লোকজ পটচিত্রের শৈলী এবং মুঘল চিত্রশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। আর চরিত্রগুলোও দেশজ। আসলে ছাপ বা ইম্প্রেশন সম্পর্কে এ দেশীয়দের ধারণা পূর্ব থেকেই ছিল। বিশেষ করে বস্ত্র অলংকরণের জন্য ব্লক এবং সিলমোহর এ দেশীয় সূত্রধর, কর্মকাররাই তৈরি করতেন। আবার সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার নিজস্ব রীতিতে নির্মিত ধাতু খোদাইয়ের দুটি নমুনা খুঁজে পাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়, যাতে ছবি খোদিত আছে। এর একটি নমুনা হলো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে করা *বিষ্ণু এবং অবনত ভক্ত*-র (চিত্র ২৫) ধাতু খোদাই চিত্র।[২২৫] এতে বিষয় হিসেবে এসেছে গতানুগতিক বিভিন্ন প্রতীকসহ উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি এবং ভক্তিতে অবনত এক ভক্ত। ভক্তের রৈখিক গড়নে ত্রিমাত্রিকতার অবভাস থাকলেও বিষ্ণুমূর্তির প্রতিকৃতি ভক্তের দিকে পার্শ্বীয়ভাবে উপস্থাপিত এবং দ্বিমাত্রিক। অন্যদিকে বিষ্ণুর শরীরের উপস্থাপন সামনাসামনি এবং বিশেষ শৈলীবদ্ধ। বিষ্ণুর শরীর আংশিকভাবে অলংকৃত এবং দুটি চরিত্রের হাত ও পায়ের আঙুলের গড়ন সুঁচাল। পরনের কাপড়ের ভাঁজসমূহ গৎবাঁধা। এতে পাল চিত্রকলার প্রভাব দৃশ্যমান। অন্য খোদাইচিত্রটি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে করা *দামোদর*-এর। বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। করণকৌশলগত দিক থেকে এটিও সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত নমুনাটির মতোই।[২২৬] এই দুটি প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্রের নমুনা বাংলাদেশ তথা বাংলার সামগ্রিক শিল্প ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ শুধু সিলমোহর, লিপি বা নকশাই নয় ধাতু খোদাই করে ছবি আঁকার দেশীয় পদ্ধতির প্রচলনও যে এ অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ এই নমুনা দুটি। সুতরাং ব্লক তৈরি ও ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও ছবি ছাপার প্রচলন একেবারে ছিল না– এমন মতামত কিছুটা দ্বিধান্বিত চিত্তেই মেনে নিতে হয় (কারণ এই বক্তব্যের বিপক্ষে অকাট্য কোনো প্রমাণ আজো হাজির করা সম্ভব হয়নি)। তা ছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশীয় শিল্পীদের কাজে ইউরোপীয় প্রভাবও খুব অল্পই ছিল বলা যায়। বিশেষত কাঠ খোদাইয়ের ক্ষেত্রে। তাদের সে ছবি যতটা দেখার, তার চেয়ে বেশি জানার। অর্থাৎ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বাস্তবিকতার চেয়ে জানা জ্ঞানটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তারা। প্রথম দিকে খোদাইয়ের জন্য, বিশেষত কাঠ খোদাইয়ের জন্য দেশীয় যন্ত্রাদিই ব্যবহার করেছেন এসব শিল্পী। প্রখ্যাত গবেষক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ের কাঠ খোদাই সম্পর্কে বলেছেন–

> সে-যুগের কাঠ-খোদাই-চিত্রে অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচয় থাকিলেও চিত্রগুলির পিছনে যথার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় নাই; আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মিস্ত্রীরা যে ভাবে নিতান্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, এগুলি

---

[২২৫] Ghosh D. P., ‘The copper-plate engravings of ancient Bengal and the source of south east Asian art’, in Enamul Haque edited, *Bangladesh Lalit Kala*, Vol. 1, No. 1, Dacca, Dacca Museum, January 1975, p. 30

[২২৬] ibid, p. 31

ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে; প্রাণের কোনো স্পর্শই এগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, এগুলির কোনোটিই স্বাধীন কল্পনাশ্রিত ছবি নয়, অধিকাংশই নির্দিষ্ট চিরাচরিত সংস্কারণুবর্ত্তী দেবদেবীর চিত্র।[২২৭]

তবে সেগুলো শিক্ষিত-অশিক্ষিত – যার দ্বারা যেভাবেই নিষ্পন্ন হয়ে থাকুক, বাংলার ছাপচিত্র এবং গ্রন্থচিত্রণের ধারার প্রবর্তনের সূচনা পর্বে এসব ছবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। একটি মাধ্যমকে শিল্প মাধ্যমে রূপান্তর এবং জনগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এসব অনুকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সচিত্র বই প্রকাশের ঘটনা সবচেয়ে প্রভাবিত করে বটতলার প্রকাশকদের। সস্তা কাগজে জীর্ণ ছাপার বইয়ের বাজারকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তারাও ছবি যোগ করা শুরু করে। ১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বম্ভর দেবের ছাপাখানায় ছাপা হওয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে বটতলার বইয়ে প্রথম ছবি দেখা যায়।[২২৮] এতে পাঁচটি পূর্ণ পৃষ্ঠা ধাতু খোদাই চিত্র সংযুক্ত হয়েছিল। শিল্পীর নাম-পরিচয় না থাকলেও ছবিগুলো বাংলার নিজস্ব রীতিতেই আঁকা বলে মত প্রকাশ করেছেন সুকুমার সেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মোটামুটি নিয়মিতভাবেই সচিত্র বই প্রকাশিত হতে থাকে বটতলা থেকে।[২২৯] প্রায় পুরো উনিশ শতক জুড়ে বটতলা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য সচিত্র বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের চাহিদা বেড়েছে, সাথে সাথে বেড়েছে ছবি তৈরি ও ছাপার কাজে নিয়োজিত শিল্পী ও কারিগরদের চাহিদা। তখন জীবিকার প্রয়োজনে এ দেশীয় কর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকাররা সেই চাহিদা পূরণ করেছে। নিম্নবর্গীয় দরিদ্র এসব মানুষ মূল পেশার পাশাপাশি কিছু বাড়তি আয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান এই ছবির বাজারে যুক্ত হয়েছিলেন। শিল্পী না হয়েও বংশপরম্পরায় অর্জিত জ্ঞান, কাঠ বা ধাতব পাতে নকশা আঁকার দক্ষতা এবং পুরনো পেশার কারিগরি নৈপুণ্যকে কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে ছবি আঁকতে সক্ষম হন তাঁরা। আস্তে আস্তে ধাতু ও কাঠ খোদাই মাধ্যমকেও নিয়ে আসেন আয়ত্তে। এদের সম্পর্কে অধ্যাপক শোভন সোম বলেছেন–

...কর্মকার, স্বর্ণকারেরা, তাঁদের বৃত্তিগত কারণেই একটু আধটু নকশা করায় দড় ছিলেন। সেইটুকু পুঁজি আর ছেনি হাতুড়ি বুলি দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাটার নৈপুণ্য নিয়ে তাঁরাই হয়ে উঠলেন কলকাতার প্রথম বুক ইলাসট্রেটর, এনগ্রেভার, প্রিন্টার, একাধারে তিন বৃত্তিতে পারঙ্গম।[২৩০]

বটতলার বহু কাজেই শিল্পীর নামোল্লেখ নেই। অজ্ঞাত এই শিল্পীরা কাজ করার জন্য হাতুড়ি, ছেনি, বুলি ইত্যাদির মতো দেশীয় যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে তাদের এই কাজ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার্জনের মাধ্যম ছাড়া খুব বেশি সম্মানজনক বলে গণ্য হয়নি সমাজে। এদের নিরলস পরিশ্রমে প্রকাশকরা বিপুল

---

[২২৭] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'খোদাই-চিত্রে বাঙালী', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬, পৃ ১৫৫

[২২৮] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ৩২

[২২৯] তদেব, পৃ ৩৩

[২৩০] অধ্যাপক শোভন সোম, 'সাকিন কলকাতা পটের পিছনে পটুয়া', দ্র. নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, *ঐকতান*, ৫ম বর্ষ, শারদসংখ্যা, ১৯৯১, পৃ ৯৩

বিত্তের অধিকারী হলেও তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কোনো মতে জীবনধারণ ছাড়া শিল্পীর সামাজিক সম্মানটুকুও লাভ করতে পারেননি জীবদ্দশায়। বরং বটতলা হয়ে উঠেছিল একটি নিন্দাজ্ঞাপক শব্দ। শেষের দিকে বটতলার শিল্পীরা ছবির স্বত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে ব্লকে নিজেদের নাম খোদাই করতেন। তা থেকে যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন নৃত্যলাল দত্ত, বিনোদবিহারী কর্মকার, রামধন স্বর্ণকার, কার্ত্তিকচন্দ্র বসাক, হীরালাল কর্মকার, মাধবচন্দ্র দাস, গোবিন্দচন্দ্র রায়, গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, ঈশ্বরদাস কর্মকার, বিশ্বম্ভর কর্মকার, হরিমোহন রায়, গণেশচন্দ্র মান্না, গোপীনাথ স্বর্ণকার, তারিণীচরণ, রামতারণ দাস, রামচন্দ্র রায়, গোপীচরণ স্বর্ণকার, পঞ্চানন কর্মকার প্রমুখ।[২৩১]

বটতলার বই অলংকরণের জন্য মাধ্যম হিসেবে উডকাটকেই ব্যবহার করা হয়েছিল বেশি। কারণ, ধাতু খোদাই এবং লিথোগ্রাফের তুলনায় কাঠ খোদাই সহজ ও সস্তা। ফলে কাঠ খোদাইয়ের চিত্র ব্যবহৃত বইয়ের বিক্রয়মূল্যের হেরফের হতো কম। কাঠ খোদাইয়ের সাথে যুগপৎভাবে কোথাও কোথাও ধাতু-নির্মিত টাইপও ব্যবহৃত হয়েছে। 'রোজ উড'-এর মতো নরম কাঠের ব্লকের সাথে ধাতব টাইপ যোগ করে একত্রে বেঁধে কীভাবে তারা যে হাজার হাজার কপি ছেপেছেন, তা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মুদ্রণ-প্রকৌশল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং গভীর জ্ঞান ছাড়া এ কাজ অসম্ভব। কাঠ খোদাইয়ের সাথে কিংবা আলাদাভাবে ধাতু খোদাই কিছু ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও লিথোগ্রাফের প্রচলন বটতলায় কমই ছিল বলে জানিয়েছেন সুকুমার সেন। তবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা বই অলংকরণের জন্য লিথো-পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও বাংলা ছাপার জন্য মাধ্যমটি সরাসরি খুব কমই হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে। '...লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে বইপত্র ছাপার কাজ বেশি চলে উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে। তার কারণ অবশ্য পারসিক লিপির আকার-প্রকার। সে লিপি ওই পদ্ধতিতেই ছাপাতে সুবিধা।'[২৩২] বটতলায় লিথোর প্রচলন দেরিতে এবং এর ব্যবহার কম হওয়ায় এর নমুনাও কিছুটা দুর্লভ। তা সত্ত্বেও এ মাধ্যমে ছবির রূপায়ণও যে তাঁরা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। *হনুমানের বস্ত্রহরণ*, *শাহানামা*, *বাষ্পীয়কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে* ইত্যাদি হলো এ সম্পর্কিত নমুনার উদাহরণ।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত কলকাতার পাঠশালাগুলোতে মুদ্রিত কোনো বই পড়ানো হতো না। পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার আগ পর্যন্ত এ দেশে শিক্ষা অর্জনের একমাত্র উপায় ছিল গুরুকেন্দ্রিক। বই বলতে ছিল হাতে লেখা পুঁথি। সেটাও থাকত পাঠশালার পণ্ডিতের হাতে। আর তার সাথে সাথেই সমস্বরে ছাত্রদের পড়ে পাঠ মুখস্থ করতে হতো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় লোকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও সুলভে বিক্রির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'। এ দেশে সচিত্র বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত

---

[২৩১] অধ্যাপক শোভন সোম, 'সাকিন কলকাতা পটের পিছনে পটুয়া', দ্র. নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, *ঐকতান*, ৫ম বর্ষ, শারদসংখ্যা, ১৯৯১, পৃ ৯৩

[২৩২] শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ১০৭

হওয়ার এক বছর পর অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় ‘কলিকাতা স্কুল সোসাইটি’। স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কিছু স্কুলও তাদের অধীনে স্থাপিত হয়। ফলে স্কুল বুক সোসাইটি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা পূরণের জন্য মুদ্রণশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। বই প্রকাশ, বিক্রি এবং অক্ষর নির্মাণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খোদাইচিত্র বা তক্ষণশিল্পের প্রবর্তন এবং উন্নতি সাধনেও সোসাইটি তৎপর ছিল। সোসাইটির এই কর্মকাণ্ডে শিল্পী হিসেবে কাশীনাথ মিস্ত্রী, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার ছাপ ছবির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। তিনি তাঁর দাদু পঞ্চানন কর্মকার এবং পিতা মনোহর কর্মকার সৃষ্ট অক্ষরের ধরনে বৈচিত্র্য আনেন। এ ছাড়া তিনি পঞ্জিকা প্রকাশ (নূতন পঞ্জিকা), অলংকরণ এবং বিষয়বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ দেশে আনুষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরুর আগেই তিনি ছাপচিত্র চর্চায় অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নিজের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বই অলংকরণের উদ্দেশ্যেই তিনি ছাপচিত্র চর্চায় মনোযোগী হন। তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি চিত্রের নিচে ‘শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত’ স্পষ্টভাবে মুদ্রিত আছে (চিত্র ২৬)। কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশিত পঞ্জিকাটিতে অনেক পূর্ণপৃষ্ঠা কাঠ খোদাই চিত্র থাকত, ফলে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। পঞ্জিকার প্রকাশ বটতলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। এই পঞ্জিকা কথাটা এসেছে ‘পঞ্চাঙ্গ’ থেকে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ আর করণ– এই পাঁচ অঙ্গ থাকে বলে এর নাম পঞ্চাঙ্গ। ঠিক কী ধরনের এবং কতটা উন্নত ছিল তা জানা না গেলেও বৈদিক যুগ হতে যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুরা পঞ্জিকা ব্যবহার করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৩৩] উনিশ শতকে কলকাতার বই-বাজারে সর্বাধিক বিক্রীত বই হলো এই পঞ্জিকা। জেমস লঙের দেওয়া তথ্য মতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে শুধু কলকাতার বাজারেই নাকি এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কপি পঞ্জিকা বিক্রি হয়েছিল।[২৩৪] পঞ্জিকার এরূপ জনপ্রিয়তার কারণ হলো, সর্বস্তরের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্বকোষের মতো এমন বই তখন কলকাতার বাজারে দ্বিতীয়টি ছিল না। সঠিক দিন-তারিখের উল্লেখ না থাকলেও বিশ্বকোষের তথ্য মতে কুলটী নিবাসী হলধর বিদ্যানিধি জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত স্যান্ডার কোং (Sanders Co.) থেকে প্রথম বাংলা পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন।[২৩৫] চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এ পর্যন্ত প্রথম ছাপা যে পঞ্জিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার প্রকাশক ছিলেন জনৈক রামহরি এবং সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ প্রণীত ১২২৫ সনের (১৮১৮-১৮১৯ ইং) বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[২৩৬] পঞ্জিকা

---

[২৩৩] ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, ‘কাল-বিভাগের ধারা’, *প্রবাসী*, ৪৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫১, পৃ ৩১৭

[২৩৪] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ২৩

[২৩৫] শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *বিশ্বকোষ* (দশম খণ্ড), পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, দিল্লী, বি আর পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ ৬৫৫

[২৩৬] Mofakhkhar Hussain Khan, *The Bengali Book History of Printing and Bookmaking*, Dhaka, Bangla Academy, 2001, p. 78

প্রকাশের শুরু থেকেই এতে ছবি সংযুক্ত হলেও ১৮৪০-এর দিকে তাতে নতুন রং লাগে। জমকালো হতে থাকে প্রকাশনা। যোগ করা হয় নানা ধরনের পালা-পার্বণের ছবি। দেব-দেবীর ছবি সমেত প্রকাশিত পঞ্জিকার ছবিতে বিষয়বস্তু এবং কাঠামোর তেমন কোনো পরিবর্তন তেমন পরিলক্ষিত হয়নি দীর্ঘদিন পর্যন্ত।[২৩৭] তবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় পরিবর্তন লক্ষণীয়। উৎসব ও পার্বণের গৎ-বাঁধা রীতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস দেখা যায়। এমনকি আজ-কালকার পঞ্জিকাগুলোতেও উৎসব-পার্বণ এবং দেব-দেবীর যেসব ছবি ছাপা হয়, তা-ও আগেকার ছবির মতোই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পঞ্জিকাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে।[২৩৮] কারণ উনিশ শতকে আর কোনো মাধ্যমে এত মানুষের কাছে পৌঁছানো বা পণ্যের গুণাগুণ জানানোর সুযোগ ছিল না। লিথো ও কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা এসব বিজ্ঞাপনে পণ্যের গুণাগুণ বিচারের জন্য লেখা ও ছবি যোগ করা হতো। ক্রেতাদের নিজেদের পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্যে ফেরিওয়ালাদের বক্তব্য বা বিজ্ঞাপনের গৎ-বাঁধা বয়ানের সাথে পণ্যের আকর্ষণীয় উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। পঞ্জিকাতে প্রায় সব ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপন লক্ষণীয়, যেমন– স্ত্রী-পুরুষের গোপন রোগের ওষুধ, বাতের ওষুধ, বইপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পঞ্জিকা ছাড়াও সমকালীন সংবাদ ও সাময়িকপত্রেও প্রচুর সংখ্যায় এসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি শুধু বিজ্ঞাপনই অনেক সংবাদ-সাময়িকপত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেকালের প্রকাশনার মধ্যে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সামযিক ঘটনা অবলম্বনে সর্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের অবতারণা করেন।[২৩৯] এরপর 'হরবোলা ভাঁড়' (১৮৭৪), 'বসন্তক' (১৮৭৪), 'পঞ্চা-নন্দ' (১৮৮৫) ইত্যাদি সাময়িকপত্রে এ ধরনের ছবি ছাপা হতো বলে জানা যায়। তবে ব্যঙ্গচিত্রের এই সংখ্যাকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায় আদিরসাত্মক বিভিন্ন ধরনের বই ও ছবির প্রকাশনা। বটতলার প্রকাশনার প্রাথমিক পর্ব থেকেই এসব বই ছাপা হচ্ছিল। সম্ভবত গঙ্গাকিশোরই প্রথম এ ধরনের বই প্রকাশ করেছিলেন।[২৪০] বইয়ের বাজার তিনি ভালোই বুঝতেন। শুরু থেকেই ওসব বইয়ের চাহিদা এতটাই ছিল যে, সরকারকে তা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন পর্যন্ত করতে হয়েছিল। জেমস লঙের মতে, আইন হওয়ার আগেই এ ধরনের একটি বই ত্রিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল।[২৪১] যেখানে সাধারণ একটি বাংলা বই ছাপা হতো মাত্র পাঁচ-শ

---

[২৩৭] সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, নিউ এজ, ২০১৫, পৃ ২০৭

[২৩৮] আশিষ খাস্তগীর, 'বটতলার বইয়ের বাজার', দ্র. অদ্রীশ বিশ্বাস এবং অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাঙালির বটতলা* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩, পৃ ৮৮

[২৩৯] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র', দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭, পৃ ৫৩

[২৪০] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ ৪৪

[২৪১] তদেব

কপি। পরিস্থিতির ভয়াভয়তা যথাযথরূপে উপলব্ধি করতে সহায়তার জন্য সমাচার দর্পণে লেখা শ্রী যথার্থ বাদিন : এর লেখা চিঠির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো–

> ...সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরস ঘটিত যে ২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্র তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধ মাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য।। আধ টাকার উর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরসজ্ঞানে হস্তে ধারণ করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন...।[২৪২]

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, যৌবন বটতলায় ছাপাখানা নিয়ে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সেদিন। এই ধরনের কিছু বই হলো– আদিরস, রতিমঞ্জরী, রতি বিলাস, রসমঞ্জরী (চিত্র ২৭), কামশাস্ত্র, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন বিলাস, প্রেম অষ্টক, প্রেম বিলাস, প্রেমনাটক, প্রেমতরঙ্গ, প্রেম রহস্য, বেশ্যা রহস্য, সম্ভোগ রত্নাকর, রমণী রঞ্জন, রস তরঙ্গিনী, রতিকেলি, রসরত্নাকর, শৃঙ্গার রস, স্ত্রীচরিত্র ইত্যাদি।[২৪৩] এসব আদি রসাত্মক বই মূলত প্রাক্ ঔপনিবেশিক সময় ও সংস্কৃতিকেই ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে উনিশ শতকে বাঙালি উচ্চ এবং মধ্যবিত্তের যাপিত যৌনজীবন, সে সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, যৌনতা নিয়ে নানা ফ্যান্টাসি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করা যায়।

সচিত্র বইয়ের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে উপাখ্যান, উপন্যাস, সংবাদ-সাময়িকী, প্রহসন এমনকি নাটকও সচিত্র করা শুরু হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে শিশু-কিশোরদের জন্য নানা রকম সচিত্র গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' এবং 'ক্ষীরের পুতুল', যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'রাঙাছবি' এবং 'খুকুমনির ছড়া' উল্লেখযোগ্য।[২৪৪] তবে এ প্রসঙ্গে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং 'ঠাকুরদার ঝুলি'র কথা বলতেই হবে। কারণ একটা সময় ছিল যখন এই দুটি বইয়ের মাধ্যমে শৈশবে আন্দোলিত হননি এমন লোক হয়তো পাওয়াই যাবে না। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> ঠাকুরমার ঝুলি যে একটি কত বড় কাজ, যে ইহা একটি সভ্যতা! কিভাবে ইহারে পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া যায় তাহা আমাদের ভাবনাতে আসেনা, আমরা শুধু আদেখিল্লার মতন ইহা স্পর্শ করি, আমরা চেতনা ফিরিয়া পাই! বঙ্গীয় ধারার প্রতি নিষ্ঠার ঐ শেষ নিদর্শন। ...ঠাকুরমার ঝুলিতে ছবিতে নাটক আছে ঠাকুরমার ঝুলির অন্যান্য বিকট

---

[২৪২] শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ১০৩-১০৪

[২৪৩] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৫৬

[২৪৪] স্বপন বসু, 'ভূমিকা', দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭, পৃ ১৩

> উদ্ভট ছবিও এক সৃষ্টি! এখানেতে স্থাপত্য পশুপাখী বড় অভিনব! অভিব্যক্তি ছাড়া, অথচ বঙ্গীয় নানান এতাবৎ অনুসৃত ধরণ আর নাই তবু ইহা বাঙলারই।[২৪৫]

ছবিগুলোতে বাঙালিয়ানার ছাপ সকলের মনকে প্রফুল্ল করে। শিশুতোষ সচিত্র গ্রন্থ চিত্রণ এবং প্রকাশনের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়ের ভূমিকাও স্মর্তব্য।

গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমে শুরু হয় বটতলার জনপ্রিয় শিল্পরীতির। কিন্তু তারা শুধু বই অলংকরণের জন্যই কাজ করেননি, বরং এক পাতার ছাপচিত্রকে তারাই সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। প্রায় ত্রিশের দশক থেকেই কাঠ খোদাই মাধ্যমে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে এক পাতার ছাপচিত্র রচনা শুরু করেন তারা। কাঠ খোদাইকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হলো, এটি সস্তা এবং সহজ (তুলনামূলকভাবে)। ফলে উৎপাদন-খরচ এবং স্বল্প পরিশ্রমে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হতো বলে এর বিক্রয়মূল্য স্বল্প পরিমাণে নির্ধারণ সম্ভব হতো। কারণ নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ ছিল এই ধরনের ছবির প্রধান ক্রেতা। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট এসব ছবি বিভিন্ন পূজা–পার্বণে খুব সস্তায় বিকোত। সাধারণত কালো কালিতে ছাপা এই ব্রডশিট প্রিন্টগুলোর নির্দিষ্ট কোনো মাপ ছিল না। খাড়াভাবে এবং আড়াআড়ি দু-ভাবেই এগুলো ছাপা হতো। এগুলোকে রঙিন করার জন্য লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি মৌলিক রং হাতে করে যোগ করা হতো। ছাপার জন্য ব্যবহার করা হতো সস্তা ও অত্যন্ত পাতলা কাগজ। মূলত স্বল্প আয়ের মানুষদের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার জন্যই এসব ব্যবস্থা। কারণ যারা শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির তাদের জন্য হতো বৌবাজার আর্ট স্টুডিওর পট এবং তৈলচিত্র। আর বড়লোক, জমিদার শ্রেণি এবং রাজা-বাদশাদের জন্য হতো রবিবর্মা (১৮৪৮-১৯০৬) ও তাঁর মতো শিল্পীদের ছবি।[২৪৬] বিষয়বস্তুর দিক থেকে বটতলার ছবিকে পূর্ণেন্দু পত্রী তিন ভাগে ভাগ করেছেন– (১) পৌরাণিক (চিত্র ২৮) (২) ঐতিহাসিক (চিত্র ২৯) এবং (৩) সামাজিক (চিত্র ৩০)।[২৪৭] পৌরাণিক বা ধর্মবিষয়ক ছবির ধারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্য বা ধর্মীয় কাহিনির চিত্রায়ণ এবং অন্যটি হলো দেব-দেবীর চিত্রায়ণ। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক সত্য ঘটনার রূপায়ণ। যেমন: বেঙ্গল সার্কাসের সুশীলা সুন্দরীর খালি হাতে বাঘের সাথে লড়াই করা, গঙ্গার জলে স্টিমার যাত্রা, কিংবা গড়ের মাঠে বেলুনে ওড়ার মতো ঘটনা। আবার এলোকেশী-মোহন্তের মতো সামাজিক স্ক্যান্ডালও এই পর্বের অন্তর্গত হতে পারে। চিংড়ি, লাউ এবং অন্যান্য মাছ, ভাই ফোঁটা, নর্তকী প্রভৃতি সামাজিক ছবির উদাহরণ। এসব ছবিতে অলংকরণ এবং

---

[২৪৫] কমল কুমার মজুমদার, 'বঙ্গীয় গ্রন্থ চিত্রণ', দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭, পৃ ৪৭-৪৮

[২৪৬] ড. আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৯৩

[২৪৭] পূর্ণেন্দু পত্রী, 'বটতলা উডপ্রিন্টের ছবি', দ্র. *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ ১৩৭

ভলিউম যোগ করার জন্য ক্রসহ্যাচিং এবং কন্টুর রেখার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বটতলার কাঠ খোদাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাহক রাধাপ্রসাদ গুপ্তের তথ্য মতে–

> এই কাঠখোদাইগুলি খাড়াভাবে আর আড়াআড়ি দুভাবেই ছাপা হতো। খাড়া চৌকো কাঠখোদাইগুলির সাইজ সাধারণত ছিল উচ্চতায় ১৪.৫ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৯.৫ ইঞ্চি। এবং আড়াআড়ি কাঠখোদাইগুলি চওড়ায় ১৩.৫ ইঞ্চি ও উচ্চতায় ১০.৫ ইঞ্চি অথবা ১৩ ইঞ্চি আর ৯.৫ ইঞ্চি।[২৪৮]

বড় আকারের কাঠ খোদাইয়ের সংখ্যা খুব কম।[২৪৯] বটতলার অধিকাংশ কাঠ খোদাই ছবি তারিখবিহীন। এখন পর্যন্ত '১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ' তারিখ সংযুক্ত একটিমাত্র কাঠ খোদাইয়ের সন্ধান মিলেছে লেলিনগ্রাতে।[২৫০] কখনো কখনো একটি কাগজে একটিমাত্র ছবি, কখনো দুটি, কখনো চারটি, আবার এক কাগজে আটটি ছবি ছাপার নমুনাও রয়েছে।[২৫১] বটতলার শিল্পীরা কাঠ খোদাইকে একান্তই রৈখিকভাবে বিবেচনা করেছেন। কারণ দেশজ অন্যান্য লোকশিল্পও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেখাপ্রধান। বটতলার প্রিন্ট সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> The compositions of the Bat-tala prints are widely varied, though lacking perspective almost altogether in any conventional sense. In some narrative compositions, motifs are arranged in a row on a single flat picture plane, or in two consecutive rows, one behind the other or one above the other. At times, motifs are decoratively arranged all over the picture surface, the ground seen as a meandering path zigzagging across the picture-plane. While the narrative sequence is not necessarily maintained, some hierarchical order is maintained in the arrangement of motifs. In yet other compositions, there is an assumed three-dimensional space not necessarily visible in terms of perspective but indicated as open spaces that could be oceans or battlefields. Some compositions are multi-perspective and arranged in a decorative manner. Yet others display an isometric perspective as in the Maharas prints. All these methods of composition are derived from our rural pats of Bengal and Orissa and from our classical conceptions of perspective as seen in the miniature paintings of the

---

[২৪৮] পূর্ণেন্দু পত্রী, 'বটতলা উডপ্রিন্টের ছবি', দ্র. *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ ১২৬-১২৭

[২৪৯] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৮৪

[২৫০] তদেব, পৃ ৮৩

[২৫১] তদেব, পৃ ৮৪

> Rajasthani or Provincial Mughal schools where perspective is assumed rather than effectively achieved.[১৫২]

বটতলার কাঠ খোদাইয়ের বাজার তৈরি হওয়ার কিছুকাল আগেই কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে আরেকটি ছবির বাজার গড়ে উঠেছিল, যা ‘কালীঘাট পট’ নামে বিখ্যাত। সস্তা কাগজে সস্তা কালিতে আঁকা এই পটগুলো তীর্থযাত্রীরা তীর্থ দর্শনের স্মারক হিসেবে সংগ্রহ করতেন (চিত্র ৩১)। কাগজের সহজলভ্যতা একে সস্তা, সহজলভ্য এবং জনপ্রিয় করার একটি অন্যতম কারণ।[১৫৩] কালীঘাটের পটে বিষয়বস্তু স্বল্পরঙে ভীষণ সরলতার সাথে অত্যন্ত দ্রুততায় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম দিকে এরা শুধু দেব-দেবীর পট আঁকলেও ধীরে ধীরে তাদের তুলিতে সমকাল আশ্রয় নেয়। বেরিয়ে আসে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে। সামাজিক অনাচার, বাবু-সংস্কৃতি, নগরের জীবনচিত্র ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে এদের কাজে। কালীঘাটের এসব ছবি প্রভাবিত করেছিল বটতলার শিল্পীদেও (চিত্র ৩২)। এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন,

> বটতলা উডপ্রিন্ট কালীঘাটের ছবি থেকে নিয়েছিল গড়নের সারল্য। আর তারই সঙ্গে সে নিজে সংযোজিত করেছিল আবহমানব্যাপী ভারতীয় শিল্পকলার অলঙ্করণ-চাতুর্য এবং ইংরেজ-উপনিবেশ হিসেবে গড়ে-ওঠা শহর-কলকাতার সর্বাধুনিক কালচারের লক্ষণসমূহ। যে কোন জীয়ন্ত শিল্পের অভিপ্রায় এবং অন্বেষণ তো এটাই যে বহুবিধ শিল্পধারা থেকে রস নিয়েই সে নিজেকে গড়ে তুলবে সতেজ এবং পুনরাবৃত্তিহীন! অতি অল্প পরমায়ু সত্ত্বেও বটতলার ছাপাই ছবিতে সে দৃষ্টান্ত আমোঘ ও স্মরণীয়।[১৫৪]

ভারতবর্ষে প্রবহমান সামাজিক ছবির এমন তাৎক্ষণিক উপস্থাপনা এর আগে আর নজরে আসেনি। এসব ছবিতে তারা সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের অসংগতিগুলোকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। সামাজিক অবস্থানের একেবারে তলানিতে থেকে উঁচু স্তরের মানুষের লাগামহীন জীবনযাত্রার দিকে ইঙ্গিতকারী এসব ছবি থেকে তাদের রসবোধ এবং স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাপক জনপ্রিয়তার মুখে কালীঘাট পটুয়ারা মহিলাদের সহযোগিতায় উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।[১৫৫] তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যান্ত্রিক উৎপাদনের সাথে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বটতলার শিল্পীদের মতো কালীঘাটের শিল্পীরাও কাঠ খোদাই এবং লিথোগ্রাফ পদ্ধতিও ব্যবহার করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে ছাপাই মাধ্যমে ছবির বহিঃরেখা তৈরি করে নিয়ে দ্রুত রং লাগিয়ে পট প্রস্তুত করতেন তারা।

---

[১৫২] Dr. Paula Sengupta, ‘Under the Banyan Tree - The Woodcut Prints of 19th Century Calcutta’, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=under-the-banyan-tree-the-woodcut-prints-of-19th-century-calcutta&iid=34&articleid=1014 প্রেক্ষিত- ১০-০৫-২০১৫ খ্রি.

[১৫৩] Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and the Art of his times*, New Delhi, Lalitkala Academi, 1968, p. 81

[১৫৪] পূর্ণেন্দু পত্রী, ‘বটতলা উডপ্রিন্টের ছবি’, দ্র. *শিল্প সংক্রান্ত*, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ ১৪১

[১৫৫] Partha Mitter, *Indian Art*, New York, Oxford University Press, 2001, p. 173

ড্রইং আগেই তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে যে কেউই রং লাগাতে পারতেন সেসব পটে। বটতলা এবং কালীঘাটের এসব শিল্পীরাই বাংলার প্রথম পেশাদার শিল্পী। সাধারণ লোকজ শিল্পরীতির মতো এরাও একই ছবির অনেক কপি তৈরি করতেন। ফলে শিল্পকে সাধারণের নাগালে নিয়ে গিয়ে শিল্পের বাজার তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তারা। বলা হয়ে থাকে, শিল্পের চাহিদা থেকে বোঝা যায় জাতির আধুনিকমনস্কতার। সে অর্থে উনিশ শতকেই কলকাতা আধুনিক হয়ে উঠেছিল। এই শিল্প প্রকৃত অর্থেই এক নতুন ও নিজস্ব শিল্প এবং তা ছিল বাংলার ও বাঙালির। কিন্তু সম্পূর্ণ দেশীয় এসব শিল্পধারা সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিত সামাজের ধারণা ছিল নিম্নরূপ– 'বর্ত্তমান দেশীয় চিত্রকরগণ যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহা অতি কদর্য। তাঁহাদের চিত্রে আকারে সামঞ্জস্য কিম্বা চিত্র ও চিত্রিত বস্তুর সৌসাদৃশ্য কিছুই নাই।'[২৫৬] তবে কালীঘাট এবং বটতলার শিল্পীদের এসব সৃষ্টি সমকালীন শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত না হলেও ইউরোপের আধুনিক ধারার অনেক শিল্পীই নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন বাংলার এই অন্ত্যজ শিল্পীদের দ্বারা। হেনরি মাতিস, ফারনান্দ লেজে, পাবলো পিকাসো প্রমুখের কাজে বটতলা এবং কালীঘাট শিল্পশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য উদ্ভূত ত্রিমাত্রিকতা সম্পর্কে এ দেশীয় লোকশিল্পীদের ধারণা ছিল না। ইউরোপীয় শিল্পী এবং এ দেশীয় শিক্ষিত শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে তারা প্রথমত তাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> ...ভারতীয় শিল্পীরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হলো, চিত্রে ত্রিমাত্রিকতার অভাব; প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে মোটিফগুলো কম্পোজ করা, প্রত্যেকটি মোটিফকে আয়তন প্রদানকরা এবং একটি বৃহদায়তন কিছুর চলাচল কাছাকাছি বা কম গভীরতা বা দূরত্বে থাকার হিসাবে দেখান। উনিশ শতকের শিল্পীরা স্পষ্টতই গভীরতা রচনা, আয়তন এবং গতির জন্য প্রথাগত রীতিই অনুসরণ করেছিল, তবে ইউরোপ থেকে আমদানি করা ছবি দেখে তা অপর্যাপ্ত এবং অসন্তোষজনক বলে মনে হয় এবং তাঁরা ঐ ছবির প্রভাব এবং কৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেহেতু তারা "দূরত্ব-আকার" আন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিসম্পর্কীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে জানত না, তাই একটি একক উৎস থেকে আলোর প্রভাব, ভলিউম এবং দূরত্ব উদ্ঘাটন এবং আলো-ছায়ার মধ্যে শরীর অংকনের মত বিষয়গুলি কখনোই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি।[২৫৭]

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কলকাতায় শিল্প-শিক্ষায়তন সৃষ্টি এবং বই অলংকরণের বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত শিল্পীর আবির্ভাবের পর। এসব শিক্ষিত শিল্পীর মধ্যে কেউ কেই ছিলেন বংশপরম্পরায় শিল্প-উত্তরাধিকারী। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত এসব শিল্পীই বটতলা এবং বই অলংকরণের ধারায় বিষয় ও করণকৌশলগত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করেন অথচ একই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এ

---

[২৫৬] শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা, 'কলা বিদ্যা', *প্রদীপ*, ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ ৭৬

[২৫৭] Pranab Ranjan Ray, 'Printmaking by Woodblock upto 1901: A Social and Technological History', in Asit Paul edited, *Woodcut Prints of 19th Century Calcutta,* Calcutta, Seagull Books, 1983, p.87

দেশীয়দের দ্বারা ছবি ছাপার কাজ চলে আসছিল। হরফ তৈরি এবং মুদ্রণ তো চলছিল আরও আগে থেকেই। তবে তখনো পর্যন্ত এসব শেখানোর মতো কোনো উদ্যোগ এবং শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সবকিছু চলছিল দেখে দেখে এবং করতে করতে শেখার মাধ্যমেই। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি শাসনের সূচনালগ্ন থেকে এ দেশীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল শূন্যের কোঠায়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ-পার্লামেন্ট ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা খরচ করার জন্য নির্দেশ দিলেও কোম্পানি একে বেহিসেবী, ব্যয়বহুল এবং অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়। অসলে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির মূল লক্ষ্য তখন ছিল মুনাফা বাড়ানোর দিকে। সেজন্য পলাশী যুদ্ধের নায়ক ক্লাইভকে আওয়াজ তুলতে দেখি 'সময় নষ্ট করা চলবেনা; টাকা চাই–আরও টাকা' বলে।[২৫৮] এমনকি এ দেশের শাসন-ক্ষমতা কুক্ষিগত করাকে তারা বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তা ছাড়া শিক্ষিত জাতি সহজেই স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে পারে– এমন ভয়ও ছিল। কিন্তু অচেনা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য দরকার ছিল ভারতকে চেনা এবং জানারও। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশজুড়ে শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে এবং বোটানিক্যাল সার্ভে। আর এসব ডকুমেন্টশনের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে একদল দক্ষ আঁকিয়ের, যারা জরিপ ও খননকার্যে প্রাপ্ত বস্তুর হুবহু চিত্র নির্মাণ করতে পারবে। সে কারণেই প্রশাসনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কাজে ব্যবহার করানোর জন্য 'হোম' থেকে লোক আনানোর চাইতে এ দেশীয়দের প্রশিক্ষিত করে কাজ করানোটা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ছিল তাদের জন্য। তখন ইউরোপীয় সাহেবরাই নিজেদের প্রয়োজনে এ দেশীয় শিল্পী এবং কারিগরদের নিতান্তই দায়ে পড়ে শিখিয়েছিলেন এসব। ফলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের নিম্নস্তরের শ্রমসাধ্য কাজে এ দেশীয় কারিগরদের দক্ষ করে তোলার জন্য ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি 'ইন্ডিয়ারিভিউ' পত্রিকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ড. ফ্রেডরিক করবিন ইংল্যান্ডের 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন'-এর আদলে 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫৯] এ দেশে এটাই শিল্পশিক্ষার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইউরোপীয়রা বেশ আগে থেকেই এ দেশীয়দের শিল্পশিক্ষা দিয়ে আসছিলেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটিতে চোখ বোলালেই এর সত্যতা নিরূপিত হয়–

> ...রাধা বাজারের মিঃ হোন সপ্তাহে তিন দিন ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের ছবি আঁকা শেখাবেন বলে মনস্থ করেছেন। যাঁরা এই সুযোগ নিতে চান, মিঃ হোনের কাছে চিঠি লিখে বা সরেজমিনে তাঁর কাছে গিয়ে শর্তাদি জানতে পারেন।[২৬০]

---

[২৫৮] ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯, পৃ ২

[২৫৯] শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, নিউ দিল্লী, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ ৮০

[২৬০] প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা, অয়ন, ১৯৭৮, পৃ ১৩

আবার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে গেলেও ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা ব্যক্তিগতভাবে শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রাচ্যপ্রেমী ইংরেজ এবং উচ্চশিক্ষিত এ দেশীয়দের নিয়ে ভারত হিতৈষী ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের নামানুসারে গঠিত হয় 'বেথুন সোসাইটি'।[২৬১] বাংলায় নব্য শিক্ষা বিস্তার এবং বাঙালির হৃদয়ে নবচেতনার উন্মেষ সাধনে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এরা বাংলায় বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই সোসাইটির এক বিশেষ সভায় প্রকৌশলী ই গুডউইন 'বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিল্পের সমন্বয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এতে তিনি কলকাতায় একটি বিজ্ঞানসম্মত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এর ফলশ্রুতিতেই গঠিত হয়েছিল 'সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' বা শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভা।[২৬২] গুডউইন, হজসন প্রাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জেমস লং, উইলিয়াম মানি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তি এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬৩] এ দেশীয়দের জীবনের মানোন্নয়নে চারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা না ভেবে বরং তাদের জীবিকার্জন এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা-সহায়ক কারিগরি বিদ্যা শেখানোর জন্যই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এর ছাত্ররাও এই সুযোগকে নিশ্চিত কিছু করে খাবার উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছিল। প্রাথমিক অবস্থায় সাকুল্যে তিনটি বিষয় পড়ানো হতো। এর মধ্যে ধাতুপাত, কাঠের ফলক ইত্যাদিতে খোদাই করে বই প্রভৃতিতে ছবি ছাপা ও লিথোগ্রাফ বা ছাপার জন্য পাথর ফলকে আঁকার বিষয়টিও ছিল।[২৬৪] ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে এচিং, কাঠ খোদাই এবং লিথোগ্রাফ ইত্যাদি শেখানোর জন্য ইংল্যান্ড থেকে টি এফ ফাউলারকে আনা হয়।[২৬৫] ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফাউলারের মৃত্যুর পর ফ্রেজার ও বোনেট নামে দুজন শিক্ষক এসংক্রান্ত ক্লাসগুলো নিতেন।[২৬৬] ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি অধিগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় 'দি ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট'। হেনরি হোবারলক এ সময় এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এবং এর আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেন। এ সময় থেকেই আর্ট স্কুলের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে গ্রন্থচিত্রণের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

---

[২৬১] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, *বেথুন সোসাইটি*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ৩

[২৬২] অধ্যাপক শোভন সোম, 'সাকিন কলকাতা পটের পিছনে পটুয়া', দ্র. নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, *ঐকতান*, ৫ম বর্ষ, শারদসংখ্যা, ১৯৯১, পৃ ১০০

[২৬৩] রঘুনাথ গোস্বামী, 'দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩৩৫

[২৬৪] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ ৭৪

[২৬৫] Pranabranjan Ray, `Early Graphic Arts in Bengal', in Jaya Appasamy edited, *Lalit Kala Contemporary-18*, New Delhi, Lalit Kala Akademi, p. 20; অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ ১০৯

[২৬৬] Pranabranjan Ray, op. cit., p. 21; গৌতম দাশ, *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০০, পৃ ৫৮

সত্তরের দশকে লিথোগ্রাফই ছিল বাংলা গ্রন্থচিত্রণের প্রধানতম মাধ্যম। আর আর্ট স্কুলের ছাত্ররাই এ মাধ্যমে তৎকালীন গ্রন্থচিত্রণের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ শুরু থেকেই লিথোগ্রাফির চর্চাও চলছিল শিল্পবিদ্যালয়টিতে। প্রথম দিককার ছাত্রদের মধ্যে দীননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস এবং তিনকড়ি মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এঁরাই বাঙালির প্রথম লিথোস্টুডিও 'রয়াল লিথোগ্রাফিক প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৭] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ক্রমোলিথো পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়ার পর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নবকুমার বিশ্বাসকে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'। তৎকালীন গ্রন্থচিত্রণ এবং ছাপছবির বাজারে এই স্টুডিও জনপ্রিয়তা এবং পেশাদারিত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল। শিল্পশিক্ষাকে পুঁজি করে স্বাধীন ব্যবসার উদ্যোগ বাংলায় প্রথম এরাই গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিল্পের ধারায় দীক্ষিত এই শিল্পীরা ইউরোপের সাদৃশ্যধর্মী ছবির মতো এ দেশীয় দেব-দেবীর ক্রোমেলিথোচিত্র ছেপে বিক্রি করার মাধ্যমে এ দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি (চিত্র ৩৩) ছেপে বাজারে ছেড়েছিলেন তাঁরা, যা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময়। প্রথমে হাতে রং করা হলেও পরের দিকে ছবির মান বেশ উন্নত হয়।[২৬৮] ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও ছাড়াও আর্টিস্ট প্রেস, আর এন বোস কোম্পানি এবং কাঁসারি পাড়া আর্ট স্টুডিওর ছবিও বেশ ভালো মানের ছিল বলে জানা যায়। এদের ছবির একতরফা বাজার ধরার জন্য কেউ কেউ জার্মানি থেকে ওলিয়গ্রাফ (Oleograph) করিয়ে এনে বাজারে ছেড়েছিলেন। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩০) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম।[২৬৯] এ ছাড়া শীতল নামে আরও একজনের কথা জানা যায়। ওলিয়গ্রাফের কথা এলে ভারতবর্ষের আরেক মহান শিল্পী রাজা রবিবর্মার কথা বলতেই হয়। কারণ তাঁর ছবি সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে আদৃত হয়েছিল। এমনকি, ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গেও। অথচ ১৩০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মুম্বাই প্রবাসী বাঙালি ভিন্ন বাংলার সাধারণ মানুষ রবিবর্মার নামই শোনেনি।[২৭০] এর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ছাপাই ছবির কল্যাণে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। আসলে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর ছবির সীমাবদ্ধতাগুলো উৎরে যাওয়ার জন্যই তিনি বাজার ধরতে পেরেছিলেন। আজও ভারতবর্ষের সস্তা ছাপাই ছবির অন্যতম প্রতিশব্দ তাঁর নাম। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ব্যবসায়ী গোবর্দ্ধন দাস খাতান মাখনজির সহযোগিতায় মুম্বাইয়ের গিরগাঁওয়ে জার্মানি থেকে আমদানি করা বাষ্পচালিত উচ্চ

---

[২৬৭] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ ৮৮

[২৬৮] তদেব, পৃ ৯৫

[২৬৯] তদেব, পৃ ৮৯; শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, পৃ ৮৪

[২৭০] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবি বর্ম্মা', দ্র. শোভন সোম ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৮৬, পৃ ৮৩

ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি প্রেস দ্বারা 'রবিবর্মা ফাইন আর্টস লিথোগ্রাফিক প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৭১] ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এ প্রেস থেকেই *শকুন্তলার জন্ম* (চিত্র ৩৪) ছবিটি প্রথম ছাপা হয়। এ ছাড়া তিনি জার্মানি থেকেও তাঁর কাজ ওলিয়গ্রাফ করিয়ে এনেছিলেন। এ কাজের জন্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিশেষত তাঞ্জোর মাধব রাওয়ের কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করেছিলেন তিনি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাও-ই তাঁকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁর ছবির বহু প্রতিলিপি সাধারণের হাতে পৌঁছলে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনও হবে।[২৭২] তিনি যখন ওলিয়গ্রাফ শুরু করেন তখন নতুন আসা ফটোগ্রাফির দাপটে ছাপচিত্রীদের অবস্থা সঙ্গীন। সেই সঙ্গে ছিল বিদেশি ছবির জোয়ার। সেই অবস্থার মধ্যেও তিনি বাজার ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ, ইউরোপীয় সাদৃশ্যধর্মিতার সাথে ভারতীয় মিথের উপাদানের সু-সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। যেমন উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মান এরোটিক (Erotic) প্রিন্টের ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাঁর ভারতীয় নায়িকা চরিত্রের কাপড় সেমি ট্রান্সপারেন্ট করেছেন রবিবর্মা। এ সময় ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে তিনি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, ভারতীয় শিল্পের বাজারে রবিবর্মার নাম এবং স্বাক্ষর একটা ট্রেডমার্ক হয়ে ওঠে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবিবর্মার তেলচিত্র যদি ভারতীয় অভিজাতদের আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর ওলিওগ্রাফগুলো শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক রুচির পরিমার্জনার প্রতীক; যা তাদের একই সঙ্গে গৌরবান্বিতও করেছিল।

সে যা-ই হোক, উনিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতার ছবির বাজার গমগম করতে থাকে বিদেশ থেকে আসা ছবি, দক্ষিণ ভারত থেকে আসা ছবি এবং স্থানীয় প্রেসে ছাপা ছবিতে। মুদ্রণশিল্পের সাথে সম্পর্কিত এ দেশীয় ছাপাখানাগুলো তখন হিন্দু দেব-দেবী এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির নায়ক-নায়িকার ছবিই বেশি ছাপছে। সস্তা এবং বহুল-উৎপাদিত সাধারণ পণ্য হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যায় এগুলো এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতির জাতি-গোষ্ঠীর দেশে এটা সবচেয়ে কার্যকার যোগাযোগ মাধ্যমে পরিণত হয়। কম দাম এবং ব্যাপক সংখ্যায় উৎপাদিত হওয়ার কারণে তা শিল্পমূল্য এবং কলারসিকদের মনোযোগ হারালেও লাভ করে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা। শিক্ষার অভাবে মুদ্রিত পঠনযোগ্য বিষয়বস্তুর চেয়ে মুদ্রিত ছবির মতো দৃশ্যমান বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় তৃণমূল পর্যায়ে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ছবি হয়ে ওঠে পণ্যের প্রচার ও প্রসার, এমনকি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারেরও মাধ্যম। এ ছাড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির পেছনেও এসব মুদ্রিত ও সস্তা ছবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে বাইরে থেকে আসা

---

[২৭১] Erwin Neumayer and Christine Schelberger, *Popular Indian Art Raja Ravi Varma and The Printed Gods of India*, New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 51

[২৭২] Partha Mitter, *Art and Nationalism in Colonial India1850-1922: Occidental Orientations*, New York, Cambridge University Press,1994, p. 208

ছবির কারণে স্থানীয় মুদ্রক এবং শিল্পীদের কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন স্থানীয় বটতলা ও কালীঘাটের শিল্পীরা। এদের অনেকের ব্যবসাই গুটিয়ে যায় এ সময়।

ক্রমোলিথোগ্রাফির মাধ্যমে রঙিন ছবি ছাপা সম্ভব হলেও এর রং অনুজ্জ্বল এবং হালকা হওয়ায় এর ব্যবহারও সীমিত হয়ে পড়তে থাকে উনিশ শতকের শেষের দিকে। এ সময় গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যম হিসেবে জায়গা করে নেয় 'ফটো এনগ্রেভিং' বা 'প্রসেসড ব্লক' বা 'হাফটোন ব্লক'। এ মাধ্যমের সাথে জড়িয়ে আছে এক কৃতি বাঙালি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'সেকালের কথা' বইটিতে হাফটোন ব্লকে ছাপা বড় বড় ১৭টি ছবি ব্যবহার করেন।[২৭৩] আর এর মধ্য দিয়ে বাংলা গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাস নতুন যুগে প্রবেশ করে। যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মেলাতে না পারায় একে একে ধাতু খোদাই, কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি মাধ্যমকে এ সময় সরে দাঁড়াতে হয় পেছনের সারিতে। তবে প্রসেসড ব্লক ব্যবহারের সে রমরমা যুগেও আদি মাধ্যম কাঠ খোদাই একেবারে অব্যবহৃত ছিল না। সস্তার বই বিশেষত কিচ্ছা-কাহিনি বা পুঁথি-সাহিত্যের পাতায় নীরবে ঠাঁই হয়েছিল তার। কাঠ খোদাই ব্লকের একধরনের ধাতব প্রতিলিপি তৈরি করে ছাপা হত সেসব। একে বলে 'ইলেকট্রো ব্লক'। ইলেকট্রো ব্লক তৈরির জন্য কার্বন-যুক্ত একধরনের মোমের ওপর খোদিত কাষ্ঠফলকের ছাপ নিয়ে কপার সালফেট দ্রবণে ডুবিয়ে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে ইলেকট্রোপ্লেটিং করার মতো করে ধাতব ব্লক তৈরি করা হয়। ব্লকটিকে মজবুত করার জন্য রাং ও সীসার আস্তরণ দেওয়া হয়। এরপর স্ক্রু দিয়ে কাঠের ব্লকটির ওপর যুক্ত করে তা থেকে ছাপ নেওয়া হতো। সরাসরি কাঠের ব্লক ব্যবহার করে বেশি ছবি ছাপা সম্ভব হতো না বলে এই ব্যবস্থা। নৃত্যলাল দত্ত এবং কার্তিকচন্দ্র বসাক এ ধরনের ব্লক তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে জানা যায়।[২৭৪] কেচ্ছা-কাহিনি ছাড়াও পঞ্জিকা ছাপাতেও এ ধরনের ব্লকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আবার বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অনেক বিজ্ঞাপনও এই ব্লকে ছাপা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মুদ্রণের মূল ধারাটি এ সময় প্রসেসড ব্লকের দখলে চলে আসে। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত ইউরায় অ্যান্ড সন্স-এর ব্লক দ্বারা বিশ শতকে অজস্র বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টি এস অ্যান্ড কোম্পানি, দ্য প্রসেস ব্লক কোম্পানি, ইন্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও প্রভৃতি কোম্পানি এ সময়কার গ্রন্থচিত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কে ভি সেনের ব্লক তৈরির কোম্পানি ছিল 'কে. ভি. সেন অ্যান্ড ব্রাদার্স' নামে।[২৭৫] তৎকালীন গ্রন্থচিত্রণের জগতে কে ভি সেনের নাম গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২৭৩] রঘুনাথ গোস্বামী, 'দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩৩৭

[২৭৪] গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় কবার?*, কলকাতা, ছাতিম বুকস, ২০১১, পৃ ৩৯৮

[২৭৫] কমল সরকার, 'বাংলা বইয়ের ছবি', দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ ৩২৯

শুরু থেকেই কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষার মূল ধারাটিই ছিল একটু রোমান্টিক গোছের ইউরোপীয় রীতির অন্ধ অনুকরণ। কারণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এ দেশীয়দের কাছে ভারতীয় পরম্পরা গুরুত্বহীন ছিল। এ দেশীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের নিজস্ব শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন ই. বি. হ্যাভেল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।[২৭৬] সেইসাথে পদাধিকার বলে তিনি জাদুঘরের শিল্প সংগ্রহশালার কিপারও হন। তাঁর পূর্বে অধ্যক্ষ হেনরি হোবারলক শিল্পশিক্ষার আধুনিকায়নের চেষ্টা করলেও ভারতীয় শিল্পের নিজস্বতার দিকটি উপেক্ষিত থেকে যায় তাঁর কাছে। হ্যাভেলই প্রথম অনুধাবন করেন ভারতীয় শিল্প মহাকাব্যিক উচ্চতায় পৌঁছাতে না পারার পেছনে প্রচলিত শিল্পশিক্ষার ইউরোপীয় রীতিই দায়ী। সেজন্যই তিনি প্রথম শিল্পবিদ্যালয় এবং জাদুঘরের শিল্প-সংগ্রহশালায় ভারতীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> When therefore, in 1896 I took charge of the Calcutta Government Art Gallery, which up to that time had Confained only a very mediocore and miscellangeous collection of European pictures, I began an attempt to place the study of Indian art upon a proper footing by arranging a collection of Indian ornament, architecture, painting and sculpture in proper correlation as a connected whole, thus comtpleting the curious trun cated pyramid usually exhibited to the world as the art of India. The Gallery inspite of many difficulties now possesses some important materials for the study of Indian sculpture and painting.[২৭৭]

হ্যাভেল অন্য প্রাচ্যপ্রেমী এ কে কুমার স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা এবং অবনীন্দ্রনাথের সাথে মিলে ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তবে অবনীন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গীয় রীতির শিল্পধারা আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আর্ট স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রদের কাজে কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। সমকালীন বিষয়বস্তুও তাদের হাতে ছিল অনুপস্থিত। শুধু পশ্চিমী রীতির অন্ধ অনুকরণ এবং তার চমৎকারিত্ব দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন সবাই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শোভন সোম যথার্থই বলেছেন, 'আর্ট স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষায় অনুকরণের মাধ্যমে হাত তৈরির ব্যবস্থা ছিল; বোধ জাগানোর ব্যবস্থা ছিলনা।' বটতলা বা কালীঘাটের শিল্পীদের মতো সমকালীন বিষয়বস্তুর উপস্থাপন প্রথম দেখা যায় গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে (চিত্র ৩৫)। তিনিই প্রথম সমকালীন জীবন ও ঘটনাপ্রবাহকে স্থান দেন তাঁর ছবিতে। সমাজ ও রাজনীতিকে কটাক্ষ করে আঁকা তাঁর ছবিগুলো সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিচিত্রা সভায় তিনি একটি লিথোপ্রেস চালু করেছিলেন।[২৭৮]

---

[২৭৬] E. B. Havell, *Indian Sculpture and Painting*, London, John Murray, 1908, p. 17

[২৭৭] ibid

[২৭৮] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ ১৯১

> সকালবেলায় গগনেন্দ্রনাথ একটা ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। বিকেলে তা লিথোয় ছাপা হয়ে গেছে। আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছবিকে সহজপ্রাপ্য করে তোলা, জনপ্রিয় করা, কমদামে সাধারণ্যে সহজপ্রাপ্য করা; নিজের বিষয়কে, বিষয়-সংক্রান্ত মতকে ছবিতে রেখে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া; ছবির মানকে বজায় রেখে সাধারণকে ছবি-বিষয়ে উৎসাহী করা ব্যঙ্গচিত্র-বিষয়ে গগনেন্দ্রনাথ এইভাবে আধুনিক। আধুনিক প্রকৌশলের মধ্যদিয়ে নিজের মতকে, জাতীয়তাবোধকে প্রকাশে গগনেন্দ্রনাথ আধুনিক জাতীয়তাবাদী।[২৭৯]

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ কিংবা শিল্পে স্বদেশিকতা বা ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের চেয়ে সমসাময়িক বাস্তবিকতা এবং বাস্তবের অস্বাভাবিকতা প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক) প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা সভা'-র অন্যতম সংগঠকও ছিলেন তিনি। ছবি আঁকা এবং অনান্য হস্তশিল্পকর্মের সাথে এখানে লিথোগ্রাফ শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। বিচিত্রা সভায় যারা কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে, সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিত হালদার, কাশীনাথ দেবল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জাপানিশিল্পী কম্পোআরাইকেও রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পাঠিয়েছিলেন বিচিত্রা সভায় শিক্ষা দানের জন্য। আসলে বিচিত্রার কলাভবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কমতি ছিল না। তিনি আশা করেছিলেন, এখান থেকেই হয়তো এমন এক মহৎ শিল্পধারার সৃষ্টি হবে, যা সমগ্র দেশকে উপস্থাপন করবে। সে উদ্দেশ্যে তিনি এখানকার অনেক শিল্পীকেই সাথে করে বিদেশে নিয়ে গেছেন যেন তাঁরা বিশ্বশিল্পকে আত্মস্থ করে নিজস্ব শিল্পধারা সৃষ্টিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি বিচিত্রার কলাভবন। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের বাইরে গিয়ে গড়তে চাইলেও অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের হাতে বিচিত্রার কলাভবন গতানুগতিক আর্টস্কুলই হয়ে উঠেছিল। সেজন্য মাত্র দুই বছর পরই বিচিত্রার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে তিনি কন্যা মীরাদেবীকে লেখেন,

> ...আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্য কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমিতো করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাওতো প্রাণ জাগলনা। ...কিছুরই সৃষ্টি হল না, কিছুই প্রাণ পেলে না কেবল কতগুলো তুচ্ছ মালমশলা আমার মতো হীনশক্তি গোরুর গাড়িকে অবলম্বন করে আমারই বাড়ির পথ রোধ করে জমে রইল কিন্তু রাজমিস্ত্রী কোথায় যে গড়ে তুলবে; সেই বেদনা কোথায়, কল্পনা কোথায়, আত্মদান কোথায় যার জোরে বিধাতার অভিপ্রায়কে মানুষ সার্থক করে তোলে?[২৮০]

আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত এমন এক শিল্পের বিকাশ, যা সমগ্র দেশের প্রতিমূর্তি হবে। সে শিল্প সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সাধনার। আর সাধনার সে

---

[২৭৯] শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *শিল্পকথামালা*, কলকাতা, সহজপাঠ, ২০১৩, পৃ ১২-১৩

[২৮০] শোভন সোম, 'শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত', নিউ দিল্লী, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ ৩১৭-৩১৮

পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর অগ্রহ ছিল বৈদিক যুগের গুরুকেন্দ্রিক 'তপোবন' বা বৌদ্ধযুগের 'নালন্দা'র মতো কলাকেন্দ্র সৃষ্টির। সেই অভিপ্রায়কে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পূর্বে নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেককে সাথে করে বিদেশে নিয়ে এ দেশের শিল্পী ও শিল্পধারাকে সংগঠিত এবং এর অগ্রগতি সাধনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠার পর ত্রিপুরার চিত্রশিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার বিলেতে চিত্রশিক্ষা করতে যাওয়ার খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার বিলেত যাওয়ার খবর জানিয়ে লেখা চিঠির উত্তরে তিনি লেখেন,

> কল্যাণীয়েষু, তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। কিন্তু ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তুমি বিলাতে যাচ্ছ এ সংবাদে আমি কিছুমাত্র আনন্দ বোধ করচি নে। যদি বিজ্ঞান শিখতে যেতে আপত্তি করতুম না। কিন্তু চিত্রকলা? এইটেই কি প্রমাণ করতে যাবে যে এই হতভাগ্য দেশে কোনো বিভাগেই নিজের মধ্যে নিজের শক্তির উদ্ভাবন নেই! ...জ্ঞান শিক্ষায় নম্রতার প্রয়োজন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তির প্রতিভা মাথা হেঁট করার দ্বারা যে আত্মাবমাননা করে তাতে তার শক্তির হ্রাস হয়। ...কিন্তু কোন প্রলোভনে কোন মোহে তোমরা এই অগৌরবের দাগা স্বীকার করতে চললে যা'তে ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হতে থাকবে যে তোমার খ্যাতি ব্রিটিশ সামরাজ্যের খ্যাতিরই উচ্ছিষ্ট! এমনি করে নিজের প্রতিভার জাত মেরে তার পরিবর্তে অর্থ পাবে কিন্তু স্বদেশকে একবারে অন্তরে অন্তরে বঞ্চিত করবে সেকথা মনে রেখো। আমাদের আপিসে পরোপজীবীদের দল আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরের ছাত্রদের ভিড়– কিন্তু ভারতে ভারতীর রাজ্যে কোথাও কি একটা জায়গা থাকবে না যেখানে বীণাপাণির বীণার অন্ততঃ একটি তারও এখানকারই খনির খাঁটি সোনায় তৈরি![২৮১]

তাঁর আশা ছিল বীণাপাণির বীণার সেই তারটি হবে শান্তিনিকেতনের কলাভবন। তিনি ভেবেছিলেন এ শিল্পশিক্ষালয় ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের সেই অপূর্ণতা পূরণ করতে সমর্থ হবে। এখান থেকেই উদ্ভূত হবে জীবনঘনিষ্ঠ এমন এক শিল্পধারার, যা সমগ্র দেশকে উপস্থাপন করবে আপন গৌরবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতা হলো শিল্প সৃষ্টির মূল প্রেরণা। কলাভবনকে সেই স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন বলেই কোনো ধরনের পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাক্রম তিনি চালু করেননি। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সব ধরনের বাধ্যবাধকতামুক্ত এবং প্রকৃতিনির্ভর। রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন নন্দলালের ওপর। নন্দলালের হাতেই কলাভবন ভারতবর্ষের প্রথম মৌলিক, অভিনব এবং সৃষ্টিশীল কলাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই কলাভবনে ছাপচিত্র-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরাসি শিল্পী অঁদ্রে কর্পেলস শান্তিনিকেতনে আসেন এবং তাঁর হাত দিয়েই কলাভবনে কাঠ খোদাই মাধ্যমের সূত্রপাত হয়। সমসাময়িক সময়ে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' সমকালীন জার্মান বাউহাউস শিল্পীদের (প্রধানত) একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে

---

[২৮১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রকলা শিখতে বিলাত যাত্রা', *প্রবাসী*, ৪১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, পৃ ২৬৮-২৬৯

কলকাতায়। এতে ৫২টি ছাপচিত্র প্রদর্শিত হয়।[২৮২] এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ দেশীয় শিল্পীরা ছাপচিত্রকে স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে শেখেন। এর আগে তারা শুধু গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন ছাপাই মাধ্যমকে। তবে এ সময় নতুন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছাপাই ছবির চর্চার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হয়ে ওঠে ছাপচিত্র। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রথম রঙিন কাঠ খোদাই নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন বলে জানা যায় অঁদ্রে কার্পেলসকে লেখা তাঁর এক চিঠির মাধ্যমে। তিনি লেখেন,

> I am trying colour woodcut. Please give me advice how to print and which colour. Give me the address where I can get woodcut materials.[২৮৩]

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কর ইংল্যান্ড থেকে লিথোগ্রাফ এবং এচিং মাধ্যমে ছাপাই ছবির করণকৌশল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২৮৪] দেশে ফিরে তিনি বিচিত্রার লিথোপ্রেসটি শান্তিনিকেতনে এনে এখানে লিথোর চর্চা শুরু করেন। তবে অল্পকালের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ায় প্রাথমিক সেই চেষ্টা খুব ফলবতী হয়েছিল বলে জানা যায় না। মূলত নন্দলাল (চিত্র ৩৬) তাঁর দুই ছাত্র রামকিংকর (চিত্র ৩৮) এবং বিনোদবিহারীকে (চিত্র ৩৭) নিয়েই শান্তিনিকেতনে ছাপাই ছবির মূল আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে নিজস্ব রীতিতে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কাজের সহজ-সরল এবং সাবলীল উপস্থাপনায় এমন বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন, যা শান্তিনিকেতনের কলাভবনকে ভারতবর্ষের আধুনিক ছাপচিত্রের আঁতুড়ঘরে পরিণত করে। তা ছাড়া পুনরুৎপাদনের মাধ্যম থেকে বেরিয়ে এখানেই তা প্রকৃত চারুশিল্পের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এবং বিশ্বরূপ বসুও শান্তিনিকেতনে ছাপচিত্র চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তাঁরা ছাপচিত্রকে চিত্রকলার পরিপূরক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় তাঁদের কাজে ছাপচিত্রের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে চিত্রকলাসুলভ বৈশিষ্ট্যই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

মুকুল দে বিচিত্রা সভাতেই ছাপচিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ছাপচিত্র মাধ্যমে তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে (চিত্র ৩৯)। কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ছাপচিত্র বিষয়ের পুনর্গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ

---

[২৮২] শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, নিউ দিল্লী, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ ৩৫১-৩৫২

[২৮৩] Prof. Nirmalandu Das, ‘A Brif History of Printmaking at Santiniketan’, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23&articleid=593 প্রেক্ষিত ০৩-০৪-২০১৪ খ্রি.

[২৮৪] Dinkar Kowshik, *Blossoms of Light Some Reflections on Art in Santiniketan*, Calcutta, Visva-Bharati, 1980, p. 40 ; শোভন সোম, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃ ৩৭৪;

ভূমিকা পালন করেন। এরপর রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আর্ট স্কুলে যোগ দেওয়ার পর সেই ধারাকে আরও বেগবান করেন। পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ দুই শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ এবং হরেন দাশ তাঁর ছাত্র। হরেন দাশ তাঁর কাজে গ্রামীণজীবনের নানা দিক এবং পল্লি-বাংলার নিসর্গ সুনিপুণ দক্ষতায় বর্ণনা করেছেন (চিত্র ৪০)। বাস্তবের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ, আলোছায়ার বিন্যাস, পরিপ্রেক্ষিতের দক্ষ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে তিনি কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। এ ছাড়া তাঁর কাজে মাধ্যমের করণকৌশলগত দক্ষতা, ড্রইং এবং শিল্পবোধ সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করা যায়। অন্যদিকে সফিউদ্দিন আহমেদ শিল্পী জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ভারতবিভাগের পর ঢাকায় এসে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর কাজ সম্পর্কে পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে বিখ্যাত ছাপচিত্রী সোমনাথ হোড় তাঁর ছাত্র ছিলেন। সোমনাথ হোড় (চিত্র ৪১) এবং সমসাময়িক চিত্তপ্রসাদ ছিলেন বাম রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁদের কাঠ এবং লিনো খোদাইগুলোতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই বিধৃত হয়েছে। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে সনৎকর, লালুপ্রসাদ সাঁউ, পুলক দত্ত, নির্মলেন্দু দাশ, পিণাকী বড়ুয়া, অজিত শীল, সলিল সাহানী, পরাগ রায়, পলা সেনগুপ্তা, অতীন বসাক, জয়ন্ত নস্কর প্রমুখ শিল্পী ছাপচিত্র মাধ্যমকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

বাংলায় ছাপের ধারণার উৎপত্তি ঠিক কখন তা সুনির্দিষ্ট করে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই ভূ-খণ্ডটি বাংলা নামে পরিচিত হওয়ার বহু আগেই এর অধিবাসীদের ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ছিল। ছিল নানা ধরনের লোকজ ছাপরীতির প্রচলনও। এমনকি কাঠের-পাটায় অথবা ধাতব-পাতে নকশা আঁকা কিংবা ছবি খোদাই করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা থেকে ছাপ নেওয়ার ধারাও প্রচলিত ছিল। তবে এই ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের মুদ্রণ সম্পর্কিত জ্ঞান নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় ইউরোপীয় মুদ্রণ প্রযুক্তি, মুদ্রাকর এবং ছাপাই শিল্পীদের সংস্পর্শে আসার পর। যা বটতলার ছাপচিত্রের মতো কিছুটা আদিম ও মিশ্র ধাঁচের ধারার জন্ম দিয়েছিল। তবে তাদের কাছ থেকে দেখে দেখে করতে শেখার এই ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করে (ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শাসন পোক্ত করার) জাগতিক প্রয়োজনে ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো ইউরোপীয় উদ্যোগ। এর পর থেকে ব্যবহারিক শিল্পের চর্চার সমান্তরালে ধীরে ধীরে একটি সৃজনশীল শিল্পরুচিরও আবির্ভাব হয়। বস্তুত এর মধ্যেই নিহিত বাংলার আধুনিক মননশীল ছাপচিত্রের উন্মেষ। পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত পরিবেশে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ চর্চাকারীর নিরুদ্বেগ চর্চার হাত ধরে বাংলায়ও ছাপচিত্র লাভ করে শিল্পিত উৎকর্ষ। এতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সাথে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ নানা উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে শুরুতে স্বল্প পরিসরে হলেও সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত হয়ে আজ তা সমৃদ্ধিশালী এক শিল্প ধারায়

যেমন পরিণত হয়েছে, তেমনি বিশ্বপরিসরের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায়ও ছাপচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্পের স্বতন্ত্র্য এবং সৃজনশীল মাধ্যম হিসেবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প

(পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব)

বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্র তথা আধুনিক শিল্পচর্চার সূত্রপাত ঘটে একইসাথে। চল্লিশের দশকের শেষ থেকে প্রায় নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ছাপচিত্র এ দেশের শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে হাত ধরাধরি করেই যাত্রা করেছে। অর্থাৎ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে একই শিল্পীর হাতেই ছাপচিত্রও চর্চিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্পের করণকৌশলগত পার্থক্য থাকলেও আঙ্গিকের দিক থেকে তা চর্চাকারীর মূল চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের অনুগামীই থেকেছে। তাই এ দেশের আধুনিক শিল্পের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করে পৃথকভাবে ছাপচিত্র মূল্যায়ন বা অনুধাবন সম্ভব নয়। যদিও ছাপচিত্র আধুনিক শিল্পেরই অংশ কিন্তু এ অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য যেহেতু ছাপচিত্রকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় চল্লিশের দশকের শেষের দিকে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্ব অংশের কেন্দ্র ঢাকায় একটি সরকারি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রের তুলনায় পশ্চাৎপদ ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি জনপদে হঠাৎ করেই এর যাত্রা শুরু হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনা আর ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষের ইতিহাস। এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রধান কুশীলবরাও সে সংঘাত-সংঘর্ষ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সূচিত দেশ বিভক্তির জাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে এসেছিলেন এখানে। কারণ বাংলার স্বতন্ত্র সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠার পেছনে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান আগমনের (১২ শতকে) পূর্বে অর্থাৎ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব ধর্ম-মতাবলম্বীদের বসবাসের সময় থেকেও এখানে সম্প্রদায়, বর্ণ এবং গোষ্ঠীগত বিভেদ ছিল। কিন্তু কেউ কারো অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার না করার দরুন এবং দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাসের ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৌহার্দ্য এবং সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তবে অঞ্চলগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এবং রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কখনো কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহও হয়েছে এ সময়। অবশ্য সেসবের কোনোটাই ধর্মীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়নি। বাংলার শাসন-ক্ষমতা দখল করার পর মুসলমান শাসকগণ ধর্ম বিস্তারের জন্য দৃশ্যত কোনোরূপ বল প্রয়োগ করেননি। কিন্তু নিম্নবর্গীয় অমুসলিমরা কঠোর সামাজিক নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে সুফি সাধক ও পর্যটকদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে রাজশক্তি হিসেবে মুসলমানদের এ দেশে আসার পরও পূর্বের সম্প্রীতি এবং সহাবস্থান (কিছু দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত যে ঘটেনি এমন নয়) মোটামুটি বজায় ছিল। তখন অভিন্ন

ভাষা, নানা ধরনের লোকাচার, খাদ্য ও পরিধেয় সর্বোপরি নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক বন্ধন তাদের আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে থাকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশদের এ দেশে আগমন, অষ্টাদশ শতকে (১৭৫৭) রাজ-ক্ষমতা গ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে। তাদের ধারণা ছিল, ভারতীয়রা 'অসভ্য' এবং এদের 'সভ্য' করা তাদের দায়িত্ব। ফলে শ্বেতচর্মধারী বর্ণবাদী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে এ দেশীয় জনগোষ্ঠীর মনে যে ঘৃণা এবং ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, তা পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককেও তিক্ত করে তোলে।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই প্রচণ্ডভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুখ্য হয়ে উঠতে থাকে বাংলায়, এতে ঘৃতাহুতি দেয় 'বঙ্গভঙ্গ' (১৯০৫)। একই ভূ-খণ্ডের অধিবাসী কিংবা একই মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ার চেয়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়, অর্থাৎ হিন্দু না মুসলমান এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। এর প্রধান কারণ হলো, যুগ যুগ ধরে এ দেশে বাস করেও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর (বিশেষত, উচ্চ শ্রেণির মুসলমান জনগোষ্ঠীর) এ দেশীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিকে পুরোপুরি আপন করতে না পারা। এমনকি 'বাঙ্গালী' বলে পরিচয় দিতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন।[২৮৫] এ সম্পর্কে সেকালের সমাজ-বৈশিষ্ট্যের একটি ধারণা লাভ করা যায় বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'তে। ইন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরিস্থিতি বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন সেদিন 'ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ' চলছিল।[২৮৬] অর্থাৎ মুসলমান ভিন্ন অন্যরাই বাঙালি এবং মুসলমানরা বাঙালি নন। ফলে একধরনের পরিচয়হীনতার সংকট ছিল তাদের। এমনকি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কী হবে, তা নিয়েও দ্বিধা-দন্দ্ব ছিল। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এর সত্যাসত্য নিরূপিত হবে–

> হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে যে "আশরাফ-সমাজ" সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের ভাষা মনে করতেন উর্দু। ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই আশরাফ মুসলমানরা সমগ্র বাঙ্‌লা-দেশের মুসলমানদেরই মাতৃভাষা উর্দু ব'লে দাবী করতেন। এ সময় "সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাঙ্‌লা-ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, তাঁহারা বাঙ্‌লার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাঙ্‌লা নহে, 'দোভাষী-বাঙ্‌লা'ও নহে, একেবারে সরাসরি ভাবেই "উর্দু"।[২৮৭]

এমনকি ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দুকে সমর্থন দিয়েছিলেন। আবার এ কে ফজলুল হক, যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন

---

[২৮৫] সাদত আলী আখন্দ, 'বাঙ্গালী', *সওগাত*, (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), ৫৪শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৮, পৃ ৫৭

[২৮৬] শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীকান্ত*, ঢাকা, আজকাল, ২০০৪, পৃ ২

[২৮৭] ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান সাধনা*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯, পৃ ৮৩

রাজনীতিবিদ, তিনিও বাড়িতে উর্দুতে কথা বলতেন।[১৮৮] এ ধরনের উদাহরণ অদ্যাবধি এ দেশে বিরল নয়। কিন্তু এই আশরাফ বা উচ্চশ্রেণির বাইরে কোটি কোটি নিম্নবর্গীয় মুসলমান অর্থাৎ, 'আতরাফ' শ্রেণির অধিকাংশের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। আর উর্দু ও অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানরা সংখ্যায়ও কম ছিল। টাইটাসের 'ইন্ডিয়ান ইসলাম' নামক গ্রন্থের হিসাব মতে বিশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে উর্দুভাষী মুসলমান ১৭,৮০,০০০ জন; পক্ষান্তরে বাংলাভাষী ছিল ২,২২,৪৫,০০০ জন।[১৮৯] তবে আশরাফ শ্রেণির মুসলমানরা নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সবসময় ইসলামি রীতি-নীতি, ভাষা ও সংস্কৃতিকেই নিজেদের সংস্কৃতি বলে বিবেচনা করেছে। ইসলাম যে একটি ধর্ম, জাতি নয়; এ কথা ভুলে ধর্মের নামে তারা জাতীয়তাকে অস্বীকার করেছে।[১৯০] ফলে একধরনের ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছিল তাদের। অন্যদিকে হিন্দুরাও মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এ দেশীয় বলে স্বীকার করেনি। তাদের ধারণা ছিল, 'Non-Hindus are not Indians.' এবং আর্যাবর্তে একমাত্র তাদের, অর্থাৎ হিন্দুদেরই প্রকৃত অধিকার রয়েছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে এ ঘোষণা সদম্ভে প্রচারিতও হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল–

> "Hindusthan is primarily for the Hindus, who live for the preservation and development of Aryan Culture and Hindu dharma. In Hindusthan the national race, religion and language ought to be that of Hindus.'' অর্থাৎ, "হিন্দুস্থান প্রধানতঃ হিন্দুদের জন্য, আর্য-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের রক্ষা ও বিকাশের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে। হিন্দুস্থানে হিন্দুদের রেস্ (জাতি) ধর্ম ও ভাষাই জাতীয় রেস্, ধর্ম ও ভাষা হওয়া উচিত।"[১৯১]

আসলে ভারতীয় জাতীয়তা এবং স্বদেশিকতার যে ধারণা উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে অন্য ধর্মমতাবলম্বীদের কোনো স্থান ছিল না এবং কংগ্রেসের (১৮৮৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত) হাত ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে দৃশ্যত যা গড়ে উঠছিল, তা-ও এককথায় হিন্দু জাতীয়তাবাদই। তাই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবিত ও প্রচার করার সংগঠনে পরিণত হয়েছে এবং এটি মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও স্বৈরাচারী শাসন চালানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে।[১৯২] এই উপলব্ধিও মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদবিরোধী করে তোলে। এ প্রসঙ্গে সলিমউল্লাহ খানও একমত পোষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

---

[১৮৮] আহমদ ছফা, 'বাঙালী মুসলমানের মন', *সমকাল*, ১৮শ বর্ষ, নবপর্যায় ঃ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮২, পৃ ২০

[১৮৯] ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান সাধনা*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯, পৃ ৮৪

[১৯০] সাদত আলী আখন্দ, 'বাঙ্গালী', *সওগাত*, (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), ৫৪শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৮, পৃ ৫৮

[১৯১] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, 'মুসলমান বাংলার জাগরণ ঃ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ', *মাহে-নও*, ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭২, পৃ ৫০-৫১

[১৯২] কসিমউদ্দীন মোল্লা, 'মুসলমান সমাজ ও পাকিস্তান আন্দোলন', দ্র. আবদুল করিম সম্পাদিত, *ইতিহাস পত্রিকা*, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৪, পৃ ৭০

> ঊনিশ শতকের বাঙালী জাতীয়তাবাদ– যা বিশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভেতর মিশে যায়– প্রকাশিত হয় প্রবল হিন্দু প্রত্যয় ও বাগ্‌ধারার মাধ্যমে। হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন যে পুনরুজ্জীবনপন্থার উন্মেষ ঘটায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার আদলেই বিকশিত হয়। রাজনীতি সাম্প্রদায়িক পোশাক পরিধান করে। গান্ধীজী দরিদ্রের ভেতর দেবতা নারায়ণকে দেখতে পেলেন, যে রাজ্য তিনি কায়েম করতে চাইলেন তার অভিধা দাঁড়াল রামরাজ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সত্যাগ্রহীদের গলায় মাল্য, কপালে তিলক দেয়া হলো, ওড়ানো হলো আরতি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই সাম্প্রদায়িক রূপান্তর ভারত বিভাজনকে এক অর্থে অনিবার্য করে তুলেছিল।[২৯৩]

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা একথা কোনো দিন ভুলতে পারেনি যে, ইংরেজরা আসার আগে তারাই এ উপমহাদেশের শাসক ছিল, আর এ মনোভাবই আলাদা জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সর্বদা সচেষ্ট রেখেছিল।[২৯৪] সেজন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের হাতে নিজেদের শাসনক্ষমতা খুইয়ে বারবার তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য সমগ্র ইংরেজ আমল ধরেই নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ফলে মুসলমানরা ইংরেজদের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়। একপর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে রাজশক্তি দ্বারা নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে হীনশক্তি হয়ে পড়ে। সাথে যুক্ত হয় অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং কূপমণ্ডূকতা। পাশাপাশি প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নাসিকতার দরুন নানাভাবে পর্যুদস্ত হতে হতে প্রায় জড়ত্বের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার প্রাক্কালে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি, ঐক্যবোধ, অনুপ্রেরণা এবং সংকল্প তাকে একটি অনড় ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলন আরও সংঘবদ্ধ এবং কার্যকর হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনকে অকার্যকর করার জন্য 'বঙ্গভঙ্গ' করলে 'ঢাকাকেন্দ্র' হওয়া নিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মনে যে আশার সঞ্চার হয়, কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে তা রদ হলে সেই আশা চরম হতাশায় পর্যবসিত হয়। এ ঘটনার পর মুসলমান নেতারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাক-ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সম্মেলন থেকে গঠন করেন 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'।[২৯৫] এই মুসলিম লীগই মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তোলে। ফলে তখন থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা নতুন এবং চরম মাত্রা লাভ করে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের মাধ্যমে মুসলমান সমাজে যে আলোর উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ এ

---

[২৯৩] সলিমউল্লাহ খান, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জাতীয়তা না সাম্প্রদায়িকতা?', *আজকের কাগজ*, ২১-১২-১৯৯১ খ্রি., পৃ ৪

[২৯৪] কসিমউদ্দীন মোল্লা, 'মুসলমান সমাজ ও পাকিস্তান আন্দোলন', ড্র. আবদুল করিম সম্পাদিত, *ইতিহাস পত্রিকা*, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৪, পৃ ৫৯

[২৯৫] অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী, 'পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি', *মাহে-নও*, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৪, পৃ ৩৯

কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) উত্থাপিত 'লাহোর প্রস্তাব'-এর মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। পরে এই প্রস্তাবকেই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে অভিহিত করা হয়।[২৯৬] প্রস্তাবটি নিম্নরূপ–

> Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim Legue that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims Unless it is designed on the following basic principle, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial, radjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western Zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent Units shall be autonomous and sovereign.[২৯৭]

এর পর থেকে মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে পাকিস্তান অর্জন যা সর্বস্তরের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সর্বান্তঃকরণ সমর্থনও লাভ করে। এ সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রায় বৈষম্য এবং বিভেদ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে আরও প্রকট হয়ে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তান দিবসের সভা থেকে ঘটে প্রথমে কলকাতার দাঙ্গা, তৎপরবর্তী নোয়াখালী এবং বিহারের দাঙ্গা। ভয়াবহ সেসব দাঙ্গায় হতাহত হয় শিশু, নারীসহ কয়েক হাজার মানুষ। হিন্দু এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করতে থাকে দেশের বিভিন্ন অংশে। কলকাতার পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, এ ঘটনার পর পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমান জীবদ্দশায় ভয়ে আর কলকাতার পথ মাড়াননি। '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংবেদনশীল এবং মানবতাবাদী মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগের বিরুদ্ধে তা আর সম্ভব হয়নি। ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির জয় অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এর অল্প কিছুকাল পরেই মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবিতে চলে আসা দীর্ঘদিনের সংগ্রাম পরিণতিতে পৌঁছায়। এ সময় অনেক চিন্তার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে 'লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্টই দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায় ভারতবর্ষ।

ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধিকারের সাথে (বাংলা ও পাঞ্জাবের খণ্ডিত অংশ নিয়ে যথাক্রমে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম-পাকিস্তান নামের দুটি অংশ যুক্ত হয়ে গঠিত) 'পাকিস্তান' নামের নিজস্ব

---

[২৯৬] অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী, 'পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি', *মাহে-নও*, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৪, পৃ ৩৯

[২৯৭] B. R. Ambedkar, *Pakistan or the Partition of India*, (Third Edition), Bombay, Thacker & Co. Ltd., 1946, p. 3

আবাসভূমি পায় মুসলমানরা। ফলে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের পূঞ্জীভূত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তিলাভের আনন্দে উদ্বেল হয়ে লোকজন তখন পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ আবাসস্থলের চিন্তা মাথায় রেখে দলে দলে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে, হিন্দু কিংবা মুসলমান পরিচয়কে সর্বস্বজ্ঞান করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে গিয়ে পেতেছে সংসার। এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আসা নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সে দলে ছিলেন সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮০), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) এবং তাঁদের নেতা হয়ে ফিরে এসেছিলেন জয়নুল আবেদিনও (১৯১৪-১৯৭৬)। আর সেইসাথে সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ নব্য পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিল আধুনিক শিল্পসৃষ্টির প্রাথমিক উদ্যোগও। দৃশ্যত '৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বেশ আগেই। পাকিস্তান সৃষ্টির সাথেই ঢাকায় একটি শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার লোভ দেখিয়ে তৎকালীন মুসলমান শিল্পীদের পাকিস্তান আন্দোলনে ভিড়িয়েছিলেন নেতারা। সে উদ্দেশ্যে তারা সফলও হয়েছিলেন। কারণ চল্লিশের দশকে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম আর্ট এক্সিবিশনের মাধ্যমে পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তাল সময়ে শিল্পক্ষেত্রেও বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমান নেতাদের উৎসাহে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কেবল মুসলমান শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী হয়েছিল।[২৯৮] মূলত মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টির প্রয়োজনে শিল্পীদের ব্যবহার করে শিল্পক্ষেত্রে বিভক্তিকে বৈষম্যের একটা ধাপ হিসেবে দেখানোই পাকিস্তানপন্থী নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর সব পর্যায়ে ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানে শিল্পের পথচলা মসৃণ হবে না জেনেও, জয়নুল-কামরুলরা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে প্রবল উৎসাহ নিয়ে এ দেশে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে মোহভঙ্গ হতে বেশি দিন লাগেনি। রাজনৈতিক নেতাদের অসহযোগিতা এবং সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা একপর্যায়ে তাঁদের হতাশ করে তোলে। তা ছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে শিল্পশিক্ষার কোনো উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি না, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল কর্তামহল থেকে। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণা নিম্নরূপ–

> ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকাপাকিভাবে ঢাকায় চলে এলাম। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে এ সময়ে ফাইলপত্র যাওয়া-আসা করছে। ...তখনকার কোনো একজন এডিপিআই ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোজা লিখে দিয়েছিলেন "পাকিস্তান যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র, সে জন্য এ দেশে ছবি আঁকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন স্কুল হতে পারে না।" পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে যেখানে আমরা কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম আর্ট এক্সিবিশন করলাম, মাত্র কয়েক মাস পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরমুহূর্তে

---

[২৯৮] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ২৩

> আমাদের ওপর এমনই আঘাত আসবে নবপ্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কৃতি দপ্তর থেকে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।[২৯৯]

সুতরাং শিল্প যে 'বিলাসিতা নয় প্রয়োজনের' সরকারের উচ্চ মহলে এই বার্তা দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তিতে গভর্নর হাউসের বাইরে প্যান্ডেল করে পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাসকে উপজীব্য করে প্রথম পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।[৩০০] এই প্রদর্শনী সরকারের উচ্চ মহলে ব্যাপক প্রসংশিত হয় এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের গড়িমসির অবসান হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদা, তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সলিমুল্লাহ ফাহামী প্রমুখ ব্যক্তির আন্তরিক সহযোগিতায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে আর্ট স্কুল সৃষ্টির চেষ্টাটি বাস্তব রূপ লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারোন্মোচনের মাধ্যমে সূচিত হয় বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের যাত্রাও। কারণ বাংলার হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকলেও শিল্পকলা বা চিত্রকলা বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি, তার ধারাবাহিক চর্চার কোনো নমুনা আজও অনাবিষ্কৃত। প্রাপ্ত উপাত্ত মতে যা ছিল, তা হলো লোকজ রীতির পটশিল্প, দারুশিল্প এবং কারুশিল্প। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এর বাইরে পূর্ববঙ্গে (ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে) শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের সুধীসমাজ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩০১] এ ছাড়া বিশ শতকের শুরুতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনাতেও একটি কলা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্কুল অফ আর্ট থেকে পাস করা শিল্পী শশীভূষণ পাল (১৮৭৮-১৯৪৬) নিজ উদ্যোগে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম মহেশ্বরপাশায় 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অফ ফাইন আর্ট' নামের এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন।[৩০২] কলকাতার ব্রিটিশ একাডেমিক রীতির শিক্ষা পদ্ধতির অনুবর্তী এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় কলা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার দশক আগে কার্যক্রম শুরু করে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা কেন্দ্রের উজ্জ্বলতার কাছে তা ছিল বাংলার অজপাড়াগাঁয়ে প্রজ্বলিত প্রদীপশিখার মতো। প্রায় চার দশকের পথচলা শেষে শশীভূষণের মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, ডানপন্থী ইসলামিক চিন্তার ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা বার বার বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে এর অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে।

---

[২৯৯] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ২৮

[৩০০] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩১

[৩০১] নিসার হোসেন,'সমকালীন শিল্পকলায় প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ২৭০

[৩০২] শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, নিউ দিল্লী, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ ২১২

দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের এসব কেন্দ্র কখনোই বৃহত্তর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারেনি কলকাতার পর ঢাকা কেন্দ্র হয়ে ওঠার কারণে। তা ছাড়া এসব শিল্প-উদ্যোগের কোনোটাই আমাদের জাতীয় শিল্পরীতির চরিত্র গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে না পারলেও এ দেশের আধুনিক শিল্পচর্চার প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য নেহায়েত কম নয়। মূলত পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান, যা আজকের বাংলাদেশ, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও শিল্প পরিচয় অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করে। আর এর প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকায় স্থাপিত উপর্যুক্ত আর্ট স্কুল। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, জয়নুল আবেদিন ছিলেন এর মধ্যমণি। একদিকে তিনি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিল্পী, অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডশূন্য একটি সমাজে কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রধান সংগঠক। এই কঠিন সংগ্রামে তিনি পাশে পেয়েছিলেন সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, সৈয়দ আলী আহসান (ড্রাফট্‌সম্যান) (?-?), শফিকুল আমীন (১৯১৪-?), খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-?), শেখ আনোয়ার (প্রেসম্যান) (?-?), হবিবর রহমান (১৯১২-?) এবং কামরুল হাসানের মতো শিল্পী সহযোদ্ধাদের। মূলধন হিসেবে সাথে ছিল কলকাতা কেন্দ্রের ইউরোপীয় আঙ্গিকের শিল্পশিক্ষা, দক্ষতা এবং স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

আমাদের চারুকলার উষালগ্নে ব্রিটিশ শাসনাধীন আর্ট স্কুলে ইউরোপীয় একাডেমিক রীতির বাস্তবানুগ চর্চায় অভ্যস্ত, প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের কাজে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রকাশের প্রবণতা লক্ষণীয়। তা ছাড়া মুসলমান ঐতিহ্য অনুযায়ী নকশা ও অলংকরণধর্মিতা পরিহার করে ইউরোপীয় ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পরীতির আদলে তাঁরা এ দেশের পল্লি-প্রকৃতি এবং দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রকে উপজীব্য করে শিল্প রচনা করেছেন। পাকিস্তানের সামগ্রিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও সে সময় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রভাব বিরাজমান ছিল। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মূল্যায়নটি যথাযথ–

> ...নক্সা ও অলংকরণ-পরিকল্পনার যে প্রাধান্য সকল শিল্প-ক্ষেত্রেই মুসলমান শিল্পমনের বিশিষ্ট প্রকাশ বলে মনে হয়, তা ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে, এবং তার জায়গায় দেখা দিয়েছে অন্যান্য শিল্প-লক্ষণ, –বিশেষ করে বাস্তববাদ ও মানবতাবাদ, –বস্তুজগতের যথার্থ ও বিষয়মুখী (objective) রূপায়নের ইচ্ছা, এবং মানব চরিত্রের জন্য অনুভূতি। ...অবশ্য এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক জগতে শিল্প-প্রভাব ও শিল্পরীতি আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করছে এবং এই হিসেবে ইউরোপের শিল্প-কলাও আমাদের সর্বজনীন ঐতিহ্যের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অতীতের শিল্পীদের প্রভাব বর্তমান শিল্পীদের ওপর যতখানি পড়েছে, ততখানি ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রভাবও পড়েছে। ... অতএব আমাদের আজকের শিল্পে, আমাদের চিত্রকলার বিষয়-বস্তু এবং এর সমস্ত প্রেরণা এখনো এই প্রাচীন পৃথিবীর “নিরস দিবালোক” থেকে আহৃত হয়, –এখনো এ প্রেরণার

> উৎস-স্থল সম্পূর্ণ লৌকিক সাধারণ পরিপার্শ্ব। অত্যন্ত সংগতভাবেই অমাদের শিল্পীরা অধ্যাত্ম-জগত, ধর্ম ও মরমী বাদের দিকে না গিয়ে চিত্রে দৃশ্য জগতকে ফুটিয়ে তুলেছেন সমস্ত প্রাসঙ্গিক হৃদয়াবেগ সহ।[৩০৩]

মূলত পাকিস্তানি শিল্পকলার যে বৈশিষ্ট্য উপর্যুক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তার অধিকাংশই জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, খাজা শফিক আহমদ, কামরুল হাসান প্রমুখ প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের কাজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শুরু থেকেই পাকিস্তানি শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পীরা।

পূর্ব-পাকিস্তানের অগ্রদূত শিল্পী জয়নুল অবেদিনের সত্তায় প্রকৃতি ও মানুষ শাশ্বত হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুষঙ্গ অসাধারণ 'দক্ষতা'র সাথে দেশীয় রেখা এবং বিষয়বস্তুর অপূর্ব মেলবন্ধনে। তবে, পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যকে মিলিয়েমিশিয়ে একাকার করে না দিয়ে, বরং দুজনের আসল পরিচয়কে তিনি সমানভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; যাতে কেউ কারো কাছে লুপ্ত না হয়ে দুজনই এক টেবিলে বসে অতি অন্তরঙ্গের মতোই একে অপরকে রস পরিবেশন করতে পারে।[৩০৪] তাঁর 'দুর্ভিক্ষের স্কেচ'গুলো এ পর্বের সার্থক উদাহরণ (চিত্র ৪২)। স্বদেশের শোষিত, দারিদ্র্যপীড়িত এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ জয়নুলের হৃদয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মানুষের জন্য ব্যথিত হয়ে ওঠে। মানবতার এত বড় বিপর্যয়ে আপ্লুত হয়ে সমকালকে চওড়া তুলির দ্রুত টানে, বলিষ্ঠ কালো রেখায় এঁকেছেন দ্ব্যর্থহীন। দুর্ভিক্ষের এই চিত্রমালায় সমাজ সচেতনতার সাথে তাঁর আধুনিকমনস্কতার পরিচয়ও লক্ষণীয়। পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাস বিষয়ক তাঁর পোস্টার, *কায়দের মাজার অভিমুখে* (?), *কায়দে আজমের মাজার শরীফ* (ড্রইং) (১৯৪৮), *কায়দে আজমের প্রতিকৃতি* (১৯৪৮) প্রভৃতি শিল্পকর্ম বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে নির্মিত হলেও এসব শিল্পরচনার অল্পকাল পরেই ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলন সরাসরি তাঁর চিত্রপটে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। বরং পূর্বের লোকজ বিষয়বস্তুর জ্যামিতিক উপস্থাপনই তাঁর চিত্রজমিনকে পুষ্ট করেছে। যদিও ব্যক্তির মনোজগৎ নির্মাণের প্রকৃত প্রভাবক এবং তার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় ব্যাপক ভূমিকা রাখা সঠিক উপাদান ঠিক কোনটি, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জাগ্রত হওয়া জাতীয়তাবোধই যে অবচেতনে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তা স্পষ্ট হবে।

> তারপর বৃটিশ রাজত্ব শেষ হল। পাকিস্তানে এলাম, পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী ঢাকায়। বাঙালীর ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়লো অবচেতনভাবে আমারও মনে, বাঙালির লোকজ শিল্পীরীতিকে তুলে ধরতে হবে, পাশ্চাত্য প্রভাব দেখে মুক্ত থাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার একটা বিদ্রোহ হিসাবেই রচিত হলো আমার একটি চিত্রপর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে

---

[৩০৩] সৈয়দ আমজাদ আলী, 'চিত্র শিল্প', আব্দুল হক অনূদিত, দ্র. শেখ মোহাম্মদ ইকরাম সম্পাদিত, *পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, করাচি, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ১৯৫৪, পৃ ১৪৬-১৪৮

[৩০৪] কামরুল হাসান, 'পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা', *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ ৫১

> এইসব শক্তি কাজ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিগত দশকে যখন মনে হতো, যে ওরা আর আমাদের সাংস্কৃতিকে চেপে রাখতে পারবে না, তখন যেন কিছুটা মুক্ত হয়েই কিছু কিছু বিমূর্ত প্রকাশবাদী ছবি আমিও এঁকেছি, অন্যান্যরা বিশেষ করে তরুণরা যেমন এঁকেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই রীতি আমার জন্য নয়। আমার চিত্র, প্রকৃতি ও মানব নির্ভর, বিষয় নির্ভর এবং আমার ছবির উৎপত্তি রংয়ের পেছনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অংকন ধারা, লোকজ রীতিগুলো বেশী উৎসাহ জোগায়।[৩০৫]

আবার ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তাঁকে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে বলে কামরুল হাসানের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায়। এ সময় সম্পর্কে কামরুল হাসানের মন্তব্য–

> শিল্পী জয়নুল আবেদিন পাশ্চাত্য দেশ দেখে এসে যে কথা বলা আরম্ভ করলেন, সে কথা অমাদের দেশ সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবক্তা গুরুসদয় দত্তের কাছ থেকে। ...শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের চিত্রকলার বিদেশে কী মর্যাদা এবং এটাই আমাদের চিত্রকলার আসল পরিচয় বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ব্রতচারী-শিবিরে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরেছি। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫২ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৩ সালের বেশ কিছুদিন একটি সংমিশ্রিত পদ্ধতিতে অনেক ছবির খসড়া এঁকেছিলেন শিল্পী আবেদিন। পরবর্তী সময়ে তিনি তিনি আশ্চর্যজনকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।[৩০৬]

আসলে বারবার সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নানাভাবে নিজেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করলেও আবার কালো কালির মোটা রেখায় থিতু হয়েছেন শেষে। তবে সবসময় প্রকৃতি এবং প্রান্তিক মানুষই তাঁর বিষয়বস্তু থেকেছে। তাঁর মানব চরিত্ররা তেজোদীপ্ত, সংগ্রামী এবং প্রকৃতি ও নানা রাজনৈতিক সংঘাতের প্রতিকূল আবর্তে পরিশ্রান্ত– কিন্তু বিজয়ী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষেত্রে স্বল্প রঙের সাথে দ্রুতলয়ের কালো রেখার সংযোগে নিজের আবেগকে প্রকাশ করেছেন। অনান্য মাধ্যমে সমান দক্ষতা থাকলেও প্রধানত জলরঙেই বেশি কাজ করেছেন তিনি।

একাডেমিক জলরং-পদ্ধতিতে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন শিল্পী আনোয়ারুল হকও। এ মাধ্যমে নিসর্গচিত্র এঁকে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সংখ্যা স্বল্প হলেও তাতেই প্রতিভাত হয় তাঁর শক্তিমত্তা এবং সৃজন-কুশলতার অভিনবত্ব। তাঁর কাজ সম্পর্কে শিল্পসমালোচক আজরা জামানের মূল্যায়ন হলো–

> আনওয়ারুল হক তাঁর আঁকা ক্যানভাসে যেন তাঁর হৃদয়কেই অভিব্যক্ত করেন। শৈশবের হারানো আনন্দকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য তিনি অসাধারণ সুন্দরকে ক্যানভাসে বন্দী করেন। আনোয়ারুল হক তাঁর ছবিতে হাল্কা রঙ ব্যবহার করেন; তাতে করে এমন একটা পেলবতা ফুটে ওঠে যা চিত্রের অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ অনুধাবন

---

[৩০৫] নজরুল ইসলাম, 'আমি নিজে শিল্পকর্ম করে যত আনন্দ পাই, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই শিল্পকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, জীবনে প্রবিষ্ট হতে দেখলে: শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার', *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ মার্চ'৭৪, পৃ ৩৭

[৩০৬] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ৩৫-৩৬

> করতে কৌতূহলী দ্রষ্টাকে সাহায্য করে। সাধারণ দৃশ্যাবলীর বাইরে তাঁর নতুনকে খুঁজে পাবার অন্তহীন সাধনা পাকিস্তানী চিত্র শিল্পে একটা তরতাজা মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।[৩০৭]

ধর্মভীরুতার জন্য প্রথম থেকেই তাঁর চিত্রে একধরনের রহস্যাবৃত আধ্যাত্মিকতা লক্ষণীয়। বলা চলে এ দেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বিশুদ্ধ বিমূর্ত শিল্পী যার বিমূর্ততার উৎস ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ও প্রতীকবাদিতা।[৩০৮] সেইসাথে ব্যাকরণগত রীতির প্রতি ছিল গভীর নিষ্ঠা। তাঁর কাজের ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতা কম, তবে রূঢ়তাজনিত একধরনের অন্ত্যমিল লক্ষণীয়।[৩০৯] প্রধানত জলরঙে কাজ করলেও জড়জীবন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি তেলরঙেও কিছু এঁকেছেন তিনি। আবার শেষের দিকের কাজে অর্ধ-বিমূর্ত বা বিমূর্তরীতিতে পরিচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

চল্লিশের পথিকৃৎ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ। মূলত ছাপচিত্রী হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তেলরং মাধ্যমেরও কুশলী শিল্পী তিনি। ছাত্রাবস্থায় জলরঙেও কিছু কাজ করেছেন। শুরুতে বেঙ্গল স্কুলের রীতিপদ্ধতিতে প্রভাবিত থাকলেও পরের দিকের কাজে প্রতিচ্ছায়াবাদের প্রভাব স্পষ্ট। প্রতিচ্ছায়াবাদের স্পষ্ট প্রভাব দৃশ্যমান তাঁর তেলরঙের ক্ষেত্রেও। কিছু জড়জীবন এবং প্রতিকৃতি বাদে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রকৃতি এবং জনজীবনই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> জল রঙ্ আর তেল-রঙের ছবিগুলোতে প্রকৃতিই তাঁর প্রধান বিষয়বস্তু। সেখানেও দেখি বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে আভিজাত্য বর্ণবিন্যাসে চিরাভ্যস্ত দক্ষতা আর দেখি এক্স্প্রেশানিজ্ম্ ও ইম্প্রেশানিজ্মের সমন্বয়। স্নিগ্ধতা, পরিচ্ছনতা এবং বহু সাধনায় আয়ত্ত করা আঙ্গিক-গত সাবলীলতা শফিউদ্দিনকে অণুকরণীয় বৈশিষ্ট্যে অন্য পাঁচজনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।[৩১০]

প্রথম দিকের কাজে, বিশেষ করে কলকাতা পর্বের কাজে প্রকৃতি তার বিশালতায় আবির্ভূত। মানুষের অবস্থান সেখানে দূরবর্তী এবং ক্ষুদ্র। এরপর '৪৭এর ভারত ভাগের পর ঢাকা চলে আসেন তিনি। এই ঢাকাপর্বের কাজে চিত্রতলের প্রায় পুরোটা জুড়েই অবস্থান নেয় মানুষ, অর্থাৎ মানুষই মূখ্য হয়ে ওঠে এ সময়। কলকাতায় অবস্থানকালীন সময়ে যেমন আদিবাসী সাঁওতালদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্থান দিয়েছেন চিত্রতলে, তেমনি ঢাকাপর্বের জনজীবনও বিশেষভাবে বাঙালিদের।[৩১১] পঞ্চাশের মাঝামঝি নাগাদ তাঁর কাজে খানিকটা জ্যামিতিনির্ভর সরলায়িত লোকজীবনের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। *সরবতের দোকান-১*

---

[৩০৭] আজরা জামান, 'সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২, পৃ ২৬

[৩০৮] Nazrul Islam, 'Contemporary Art in Bangladesh', *Shilpakala*, Vol. 4, 1981, p. 18

[৩০৯] বুলবন ওসমান, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন ঃ সামাজিক পটপ্রেক্ষিত', *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ ১৭

[৩১০] অমিয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, 'প্রথম চিত্র-কলা প্রদর্শণী', *দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৬৪২

[৩১১] শোভন সোম, 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০৩

(১৯৫৪), *কাঠমিস্ত্রী* (১৯৫৬) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এরপর ১৯৫৬-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস থেকে শিক্ষালাভ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প-সংগ্রহশালা ঘুরে দেখার সুবাদে তাঁর জ্যামিতি আরও স্পষ্ট এবং পরিশিলীত হয়ে বিমূর্ততায় রূপান্তরিত হয়। এ সময় দৃষ্টিগ্রাহ্য জগৎকে জ্যামিতিক বিন্যাসে বিমূর্ত নকশার মতো করে চিত্রতলে স্থাপন করেছেন তিনি (চিত্র ৪৩)। সুদীর্ঘ শিল্পী-জীবনে আঙ্গিকের বদল ঘটালেও বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকৃতি এবং মানুষকেই সবসময় উপস্থাপন করেছেন ক্যানভাসে। বাংলাদেশে ছাপচিত্র চর্চার পথিকৃৎ এই শিল্পীর ছাপচিত্র নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম প্রজন্মের এই সৃষ্টিশীল শিল্পীদের মধ্যে খাজা শফিক আহমদও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এ দেশের জাতীয় শিল্পরীতি সৃষ্টিতে। ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ব্যবহারিক শিল্প বিভাগের সমৃদ্ধিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিসর্গ এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসবের ছবি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এঁকেছেন। রং ব্যবহারের মুনশিয়ানায় খাজা শফিক আহমদ গভীর যত্নের সঙ্গে গড়ে তোলেন তাঁর ক্যানভাস। ফলে তাঁর ছবিতে প্রকৃতির সহজাত আনন্দ রূপ পায়। তাঁর আঁকা দৃশ্যসমূহে তিনি ইচ্ছা করেই খুঁটিনাটি এড়িয়ে চলেন, কারণ তিনি গাছপালা স্পষ্ট করে আঁকতে গিয়ে বনভূমির সামগ্রিক সৌন্দর্যকে হারাতে চান না। যদিও আলোছায়ার হাজার রকমের লীলাসংবলিত রাজপথের দৃশ্যগুলোতে তিনি সমস্ত খুঁটিনাটি গভীর যত্নের সংগে এঁকেছেন।[৩১২] তবে প্রতিষ্ঠাকালীন শিল্পীদের মধ্যে আনোয়ারুল হক এবং খাজা শফিক আহমদ পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পচর্চায় অন্যদের মতো সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

এ প্রজন্মের সবচেয়ে বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শিল্পী হলেন কামরুল হাসান। শুধু শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, এ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কামরুল হাসান এক অবিসংবাদিত নাম। তিনিও শুরুতে ইউরোপীয় রীতি এবং নব্য-বঙ্গীয় ধারায় দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতানির্ভর শিল্প রচনা করেছেন। পরে ছাত্রাবস্থায় যুক্ত হওয়া বাম-রাজনীতি ও ব্রতচারী আন্দোলনের প্রভাবে দেশ ও মাটির দিকে চোখ ফেরান। সে পর্বে, এ দেশ এবং লোকজ শিল্প ও জীবন তাঁর চিত্রতল গড়ে তুললেও যামিনী রায়ও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। মূলত ষাটের দশক থেকে তাঁর লোক-ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ পূর্ণায়ত হয়ে নিজস্ব সৃজনশীলতায় আবির্ভূত হয়।[৩১৩] যামিনী রায়ের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই শুরু[৩১৪] করে পাশ্চাত্য শিল্পের সাথে মেলবন্ধনে এবং তৃণমূল মানুষ, লোকশিল্পের অঙ্গিক, উপাদান ও রঙকে গ্রহণ করেন শিল্প নির্মাণের অনুপ্রেরণা হিসেবে। ফলে বাংলাদেশ ও এর নিসর্গ, জনমানুষ, লোকালয়, লোকাচার, লোকালয়ের জীবন– এককথায় গণজীবনের বহমানতা, প্রতিবেশের বিচিত্র গতি, এসব ভীষণ গুরুত্বের

---

[৩১২] আজরা জামান, 'সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২, পৃ ২৬

[৩১৩] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ২৪

[৩১৪] শামসুর রাহ্‌মান, 'কামরুল হাসান ঃ তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র', দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০, পৃ ২৭

সাথে উপস্থিত হয়েছে তাঁর শিল্পে (চিত্র ৪৪)।[৩১৫] তাঁর চিত্রপট মানেই একখণ্ড বাংলাদেশের জ্বলজ্বলে উপস্থিতি। বস্তুত শিল্পী কামরুল হাসান এ দেশের লোকজীবনের গভীর মর্মার্থকে অনুভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই অবহেলিত দেশজ শিল্পরীতিকে রঙে ও রেখায় আধুনিক ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে।[৩১৬] আর উৎসবিন্দুর প্রতি মনোযোগী থাকলেও, তাতে পুরোপুরি আচ্ছন্ন না হয়ে বরং দেশজ লোক-কলার সাথে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সু-সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন।[৩১৭] শিল্পের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ। জলরং, তেলরং, গোয়াশ, অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্রের বিভিন্ন মধ্যম যেমন চর্চা করেছেন, তেমনই ভাস্কর্যও গড়েছেন স্বল্পসংখ্যক। আবার এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার শুরু থেকেই বাণিজ্যিক শিল্পের গুরুত্ব উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছেন। নিরবচ্ছিন্ন শিল্পচর্চার পাশাপাশি এ দেশের প্রায় সকল শিল্প ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথম সারিতে থেকে। মুক্তিযুদ্ধসহ গণমানুষের প্রায় সকল অন্দোলনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে তাঁর রাজনৈতিক ও অধিকার সচেতনতামূলক বিভিন্ন সৃষ্টি। আর এভাবেই এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে শিল্পী কামরুল হাসান নিজেকে ক্রমেই এক অনতিক্রম্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে তিনি আজও একা।

এ দেশের শিল্প-ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী, আকর্ষণীয়, যাযাবর ও সংগ্রামী চরিত্র শিল্পী এস এম সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪)। তরুণ বয়সে ঘরভোলা বিবাগির মতো ঘুরেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রান্ত। লিপ্ত হয়েছেন অন্ত্যজ ক্ষুধার্ত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে,[৩১৮] যা তাঁকে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধও করেছে। বোহেমিয়ান জীবনের অধিকাংশ শিল্পকৃতিতে ইউরোপীয় প্রতিচ্ছায়াবাদের স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।[৩১৯] এরপর ফিরেছেন মাটির টানে। তখন তাঁর অভিজ্ঞতা, চরিত্র, নাটকীয় জীবন, মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ইত্যাদি সরাসরি তাঁর ক্যানভাসকে প্রভাবিত করেছে। শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিছুদিন গ্রহণ করলেও, শিশু সারল্যে বা আপাত অপটুত্বে একধরনের স্মৃতিনির্ভরতায় তিনি ভরে তোলেন ক্যানভাস।[৩২০] এর মাধ্যমে সুলতান অস্বীকার করেছেন সমকালীন বৈশ্বিক আধুনিকতা এবং ঔপনিবেশিক বা কথিত উত্তর-ঔপনিবেশিক আধুনিকতা।[৩২১] কিন্তু, মৃত্তিকালগ্নতায়, ভাবনায়, মননে, অভিনবত্বে এবং অভিব্যক্তিতে তিনি আধুনিক থেকেছেন সর্বদা। তাই তাঁর চিত্রপট বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শৌর্য, সংগ্রাম, প্রতিবাদমুখর সবসময়। শিল্পের মাধ্যমে সারা জীবন মেহনতি মানুষের সপক্ষ

---

[৩১৫] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'কামরুল হাসানের চিত্রকলা', *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ ৯

[৩১৬] সন্তোষ গুপ্ত, 'শিল্পী কামরুল হাসানের ঠিকানা', দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০, পৃ ১৫

[৩১৭] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ২৪

[৩১৮] আজরা জামান, 'সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২, পৃ ২৬

[৩১৯] ড. আবু তাহের, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ ৯২

[৩২০] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০

[৩২১] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *দেশজ আধুনিকতা : সুলতানের কাজ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ ১৪

শক্তিকে আরও দৃঢ় করেছেন। বলিষ্ঠ রেখার টানে পেশিবহুল প্রান্তজনের ভেতরকার শক্তি আর অদম্য কর্মস্পৃহাকে যেন উজিয়ে দিয়েছেন চিত্রতলে। এমনকি তাঁর নারী চরিত্ররাও সুডৌল ও সুঠাম। নারীর চিরচেনা লাবণ্য-লালিত্যের পাশাপাশি শক্তিরও সুসমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ ছবিই পরিচিত মানুষ ও নিসর্গের। সেখানে অতল জলের বিস্তার, দিগন্ত ছোঁয়া নীল আকাশ, বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত, তালগাছ, নৌকা, কুঁড়েঘর আর বলিষ্ঠ, কর্মঠ মানুষের উপস্থিতিতে বাংলার গ্রামীণ সৌন্দর্যের মায়াবী পরিবেশই বিধৃত হয়েছে। সাথে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রূর বাস্তবতাও। রেখার ব্যবহার, রং তৈরি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি দেশজ এবং নিজস্ব। এই রং, রেখা, পরিপ্রেক্ষিত রচনা আর মানব অবয়বের নিজস্বতা তাঁর শিল্পকে দেশজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রথম প্রজন্মের অন্য শিল্পীদের মতো এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে সরাসরি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকলেও, শিল্পকৃতির গুণে সুলতান নিজেই হয়ে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া হবিবর রহমান (১৯১২-?), শফিকুল আমীন (১৯১৪-?) প্রমুখ শিল্পীও এ দেশে আধুনিক শিল্পের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

প্রথম প্রজন্মের এসব স্বাপ্নিক তরুণ (এস এম সুলতান ব্যতীত) অদম্য উৎসাহ, সাহস আর অন্তহীন আশা নিয়ে নতুন দেশের শিল্প ঐতিহ্য সৃষ্টির যে গুরু দায়িত্ব নিজেরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নের পথ মসৃণ ছিল না। দেশভাগের অস্থির পরিস্থিতিতে একদা কলকাতা আর্ট স্কুলের এসব স্বনামখ্যাত শিল্পীরা নতুন দেশে প্রথম দিকে বাধ্য হন বিভিন্ন স্কুলে সাধারণ চাকরি নিয়ে জীবনধারণ করতে। তবে আপাত বিক্ষিপ্ত এসব শিল্পী আবার একত্র হন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে, নবাবপুর রোডের ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের দুটি ঘর নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস'-কে কেন্দ্র করে।[৩২২] এই দুটি কামরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল প্রিন্সিপালের অফিস, স্কুলের অফিস, শিক্ষকদের বসার ঘর, ছাত্রদের ক্লাস আর স্টুডিও।[৩২৩] প্রথম বছরে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হলেও ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃহত্তর পরিসরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে থাকে। তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত বর্ণনায়–

> এই প্রতিষ্ঠানটি কায়েম হয়েছে মাত্র দুটো ঘর নিয়ে। ঘরের দিক দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকগণ খুব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।
>
> আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর থেকেই ছাত্রদের কোন হোস্টেলের বন্দোবস্ত না করাতে ছাত্রদের ঢাকার মতো শহরে দম্ আটকে যাবার জোগাড় হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের ছেলে ছাড়াও ভিন্ন যে ছেলেরা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে

[৩২২] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ২৮-২৯

[৩২৩] মাহবুব জামাল জাহেদী, 'ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট', *মাহে-নও*, ১৩বর্ষ, ৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬১, পৃ ৪০; কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ২৯

> তারাও স্কুলের প্রয়োজন মতো ক্লাস ঘর ও হোস্টেল না থাকায় বাধ্য হয়ে ইতোমধ্যে নিজ নিজ দেশে ফিরেও গেছে। এই ব্যাপারে আমরা বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ...প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকগণ প্রত্যেকেই ছেলেদের সঙ্গেই কাতারবন্দী হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।[৩২৪]

পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে উঠে আসে আর্ট স্কুল।[৩২৫] তাতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আর্ট স্কুলের জন্য একটি নিজস্ব বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার। স্থপতি মাজহারুল ইসলামের সহযোগিতায় রমনা রেসকোর্সের পশ্চিমপাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশে গড়ে ওঠে আধুনিক কেতার দালান। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আর্ট স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে (বাস্তবে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে) উঠে যায় নতুন দালানে।[৩২৬] আর্ট স্কুলের শুরুতে এর শিক্ষাক্রম চালু হয় কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির আদলে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে তত দিনে শিল্পক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তবে তার কোনো প্রতিফলন ছিল না এ দেশের শিল্পশিক্ষার প্রথম পাঠ্যক্রমে। এমনকি কলকাতার অদূরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে আধুনিকতার চর্চাও প্রভাবিত করতে পারেনি এখানকার প্রথম শিল্প শিক্ষাগুরুদের। আসলে দেশ ভাগ হলেও মানসিকভাবে পূর্বের সর্বভারতীয়তা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেননি। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম এ শিক্ষাক্রম নিয়ে শিল্পী আমিনুল ইসলাম তাঁর স্মৃতিচারণামূলক লেখায় লিখেছেন–

> প্রথমাবধি আবেদিন সাহেবসহ সকল শিক্ষকই শিল্প-শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে কলকাতার আর্টস্কুলের আদর্শকেই বেছে নিয়েছিলেন। প্রধানত বাংলাদেশের বাইরের আর্টস্কুলের নতুনতর শিক্ষক্রম সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা ছিল না বলেই। তাছাড়াও ওরা সবাই ছিল কলকাতা আর্টস্কুলেরই ছাত্র ও পরবর্তীকালে শিক্ষক। ঐ স্কুলের প্রতি মমতাবোধ গর্ববোধও ছিল ঐকান্তিক। ফলে এই নতুন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাপ্রণালিও তৈরি করেছিলেন একই মডেলে।[৩২৭]

কিন্তু প্রতিষ্ঠান চালু হলেও ঢাকায় শিল্পচর্চার পথ নির্বিঘ্ন হয়নি তখনো। রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডহীন এবং গোঁড়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিপত্যযুক্ত একটি সমাজ শিল্পচর্চার মতো প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে পারেনি। তাই লালবাগের কোনো এক ধর্ম ব্যবসায়ী ছবি আঁকার

---

[৩২৪] হামিদুর রাহমান, 'আর্ট ও পূর্ব-পাকিস্তান', *অগত্যা*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৯৫০, পৃ ৩৯-৪০

[৩২৫] বুলবন ওসমান, 'চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঃ রজত জয়ন্তীতে', 'বিচিত্রা', ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ মার্চ'৭৪, পৃ ৩২; এ প্রসঙ্গে হাশেম খান ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'জয়নুল আবেদিনের সারাজীবন' বইটির ৪১ পৃষ্ঠায় ১৯৫১ সাল এবং আমিনুল ইসলাম ১৯৫২ সালের মাঝামাঝিতে আর্ট ইনস্টিটিউটের সেগুনবাগিচার বাড়িতে ওঠার কথা জোর দিয়ে বলেছেন ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর' বইটির ৫৩ পৃষ্ঠায়। আবার মাহবুব জামাল জাহেদী 'ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট' শীর্ষক রচনায় ('মাহে-নও', ১৩বর্ষ, ৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬১, পৃ ৪১) ঘটনার সাল ১৯৫৩ বলে উল্লেখ করেছেন। মাহবুব জামাল জাহেদীর লেখাটি যেহেতু ঘটনার মাত্র আট বছর পরে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত সে হিসেবে তার তথ্যই সঠিক ধরে নেয়া উচিৎ কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পীদের আনুষঙ্গিক নানা বক্তব্যে এই সময়ের উল্লেখ থাকার ফলে জটিলতা পরিহার করার জন্য সংখ্যাগরিস্টের মতকেই প্রাধান্য দেয় হল।

[৩২৬] মাহবুব জামাল জাহেদী, 'ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট', 'মাহে-নও', ১৩ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬১, পৃ ৪১

[৩২৭] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩৩

বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রাস্তায় পোস্টারও লাগিয়েছিল।[৩২৮] এরূপ সামাজিক দুর্দশার সাথে যোগ হয়েছিল পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মতো নানা প্রতিকূল অনুষঙ্গ। এ ধরনের সামগ্রিক বিরূপ পরিস্থিতিতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সরকারি মনোযোগ আকর্ষণ এবং চারুশিল্পকে সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতার 'ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপে'র মতো আর্ট ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'।[৩২৯] ঢাকা আর্ট গ্রুপ-এর প্রথম প্রদর্শনী ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ থেকে ২৩ জানুয়ারি (ক্যাটালগে লেখা আছে ১৬-২১ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লিটন হলে' অনুষ্ঠিত হয়।[৩৩০] এই প্রদর্শনী ঢাকার নিস্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। দর্শনীর বিনিময়ে হলেও এক হিসেব অনুযায়ী, সাত দিনে প্রায় বারো হাজার দর্শক গ্যালারিতে ভিড় করেছিল ছবি দেখার জন্য।[৩৩১] সব স্তরের মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, ছবি দেখা, ছবি কেনা এবং ছবি-বিষয়ক নানারকম আলোচনা-সমালোচনা একে সামাজিক উৎসবে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণচাঞ্চল্যও দান করে। এ প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহউদ্দীপনা আরও একটি বিষয়কে নির্দেশ করে। সেটি হলো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব; উনিশ শতকের কলকাতার শিল্পসাহিত্য যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়। মাত্র কয়েক দশক আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত হওয়া মুসলমানদের চাকরি, জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে ভূমির মালিকানাপ্রাপ্তি এবং নতুন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধির কারণে মুসলমান সমাজে শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব সূচিত হয় এ সময়। এই প্রদর্শনী সম্পর্কে অবদুল্লাহ আল-মুতী বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> যে দেশে আজো ছবি আঁকার অপরাধে ছেলেকে বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, ফুটপাতে কাটে শিল্পীর অপূর্ব সম্ভাবনাময়, কঠোর সাধনার প্রথম দিনগুলি, যে দেশে এখনো প্রশ্নটা নানা ভাবে ওঠে, ছবি আঁকা সত্যিই শাস্ত্র-সম্মত কিনা– সে দেশে, হ্যাঁ, সেই দেশেরই তরুণ শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী। আশ্চর্য সফল, আশ্চর্য রূপ-কথার কাহিনীর মতো বই কি![৩৩২]

অভাবনীয় জনসমাগমের সাথে প্রচারমাধ্যমগুলোতেও ভীষণ গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয় এ প্রদর্শনীর খবর। এমনকি 'মাসিক দিলরুবা' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা 'বিশেষ চিত্রকলা সংখ্যা' প্রকাশ করে এ প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে লেখা হয়–

---

[৩২৮] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ৩০

[৩২৯] তদেব, পৃ ৩১; আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩৭

[৩৩০] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ঢাকা গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী', *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৬৩৫; কামরুল হাসান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩১; আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭

[৩৩১] আবদুল্লাহ আল-মুতী, 'শিল্প-প্রদর্শনী আমি এবং আরও অনেকে', *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৬২৭

[৩৩২] তদেব

ঢাকা আর্ট গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র-কলা প্রদর্শণী মাঘ মাসের একটি বিশেষ ঘটনা। কেউ বা কৌতূহল বশে আর কেউ বা সমঝদার হিসাবে ইহা দেখিয়াছেন আর কেউ হয়ত দেখেনই নাই। কিন্তু প্রদর্শণীটি ঢাকায় চিত্র-কলা চর্চ্চা সম্বন্ধে অনেককেই সজাগ করিয়াছে। ...এই প্রদর্শণী দিলরুবার যে সব পাঠক দেখেন নাই তাঁহারা দিলরুবার এই বিশেষ চিত্র-কলা সংখ্যার মাধ্যমে তাহা কিছুটা দেখিতে পারিবেন। ঢাকা আর্ট গ্রুপের মধ্যে যে সকল ছবিই আমরা পাইয়াছি এবং যে সবের ব্লক সম্ভব হইয়াছে সে সব এতদর্থে প্রকাশ করা হইল। আর যে সব পাঠক প্রদর্শণী দেখিয়াছেন তাঁহারাও সমালোচক চতুষ্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নূতন করিয়া দেখুন ছবিগুলির নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিবে; আর যে সকল শিল্পী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা উৎসাহিত ও কিছুটা পরিমার্জ্জিত এমনকি কিছুটা পরিবর্ত্তিতও হইতে পারেন! এ সকল উদ্দেশ্য লইয়াই দিলরুবার এই বিশেষ প্রকাশ করা হইল।[৩৩৩]

তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ প্রেক্ষিতেও প্রচার মাধ্যমের এমন আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা অকল্পনীয়। শুধু গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা বা ব্যক্তি উদ্যোগ যেভাবেই অভাবনীয় এ আয়োজনটি নিষ্পন্ন হয়ে থাকুক না কেন, তা পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনকে আরও সজীব এবং এ সম্পর্কে জাতীয় মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল নিঃসন্দেহে। প্রথম প্রদর্শনীর এরূপ আশাতীত সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকা আর্ট গ্রুপ তাদের প্রথম বর্ষপূর্তিতে দ্বিতীয় প্রদর্শনী আয়োজনের প্রাক্কালে, মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় তা কিছুটা বিলম্বিত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ তাদের দ্বিতীয় প্রদর্শনী ঢাকা জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়।[৩৩৪] সর্বমহলে এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীও পূর্বের মতো আদৃত হয়। প্রথম প্রদর্শনীতে যে সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা প্রস্ফুটিত হয়ে ভবিষ্যৎকে তার রূপে মোহাবিষ্ট করার দৃঢ় প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয় দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রথম প্রদর্শনীর সাথে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর তুলনা করতে গিয়ে শিল্পসমালোচক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী বলেছেন–

সে প্রদর্শনী আমাদের শিল্পীদের প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদিগকে উৎসাহিত করে তুলেছিল। কিন্তু এবারের চিত্র প্রদর্শনী আমাদের মনে এনে দিয়েছে স্থির বিশ্বাস। আমাদের তরুণ শিল্পীদের সম্বন্ধে আমরা এবারে সত্যি আশান্বিত হ'য়ে উঠেছি।[৩৩৫]

কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পর আর কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি এই শিল্পীগোষ্ঠীর। তবে বলা যায়, অত্যন্ত স্বল্প পরমায়ু সত্ত্বেও ঢাকা আর্ট গ্রুপ সত্যিকার অর্থেই এ দেশের শিল্পামোদী মানুষদের আশান্বিত করতে পেরেছিল এবং আর্ট স্কুলের সাথে মিলে একটি চরম প্রতিকূল আবহেও এ দেশের শিল্প-আন্দোলনকে অত্যন্ত অর্থবহ এবং বেগবান করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। প্রথম পর্বের এই শিল্পপ্রচেষ্টা কলকাতা কেন্দ্রের একটি বিস্তৃতি হলেও এ দেশের মানুষদের তা ছবি দেখতে, বুঝতে এবং ছবি বিচার করতে শিখিয়েছিল। সেসব প্রদর্শনীতে শিল্পকর্মের মান কী রকম ছিল বা তা কতটা

---

[৩৩৩] *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭

[৩৩৪] আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, 'চিত্র প্রদর্শনী', *মাসিক দিলরুবা*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ ৭৫২; আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৪৪

[৩৩৫] আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭৫২

জীবনঘনিষ্ঠ ছিল, সে প্রশ্নের পরিবর্তে বরং একটি বিরুদ্ধ সমাজ প্রেক্ষিতে এ ধরনের প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত করতে পারাটাই প্রশংসনীয়।

কিন্তু একটি বিষয়ও এ পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় প্রদর্শনী পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও শিল্পীরা সচেতনভাবেই প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেন। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, গভর্নর স্যার ফিরোজ খান নুনের স্ত্রী লেডি ভিকারুন্নেসা নুন প্রমুখ পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীর এ দেশীয় নেতৃস্থানীয়রা এ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমনকি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আর্ট কলেজের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীতেও এ জাতীয় সংকটের কোনো ছায়াও দেখা যায়নি। শিল্পীদের এই নির্লিপ্ততা স্বভাবতই ব্যথিত করেছিল সচেতন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নাগরিকদের। সেই হতাশার সুরই ধ্বনিত হয়েছে আর্ট কলেজের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী উপলক্ষে করা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে–

> গত পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় জীবনে যে, কত তাৎপর্যময় ঘটনাই ঘটে গেলো শিল্পী বন্ধুদের চিত্রে তার প্রতিফলন কোথায়? মানব জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলোর বলিষ্ঠ প্রকাশ কোথায়? দুনিয়া জোড়া শান্তিকামী জনসাধারণ শান্তির ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছে সেই শান্তিকামনার ইঙ্গিত তো আমাদের শিল্পীদের চিত্রে পেলাম না। দেশ বিভাগ, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ফলে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ রাস্তাঘাটে কুকুর বেড়ালের মত ঘুরে মরেছে এবং আজো দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরছে তার স্বাক্ষর শিল্পীদের চিত্রে কোথায়? আমাদের শিল্পীরা পোর্ট্রেট আঁকছেন অথচ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের পোর্ট্রেট তো কোথাও দেখলাম না। শিল্পীদের চিত্রে পেলাম না ভাষা আন্দোলনের মিছিলের স্বাক্ষর অথচ মহরম দিনের চিত্র তো শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ এঁকেছেন। যে শ্রমিক বন্ধুটি ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারীতে লক্ষ জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চলতি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণায় আর বিক্ষোভভরা বুকে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের পানে ছুঁড়ে দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করে গেলেন তার কোন স্বাক্ষরের ইঙ্গিত তো শিল্পী বন্ধুদের চিত্রে পেলাম না। যে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পেছনে লক্ষ লক্ষ জনতার আশা আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তার প্রকাশ তো শিল্পীবন্ধুদের চিত্রে নেই। অথচ পূর্ব বাংলার সাধারন মানুষ অসীম আগ্রহে শিল্পী বন্ধুদের পানে তাকিয়ে আছেন কবে সেই সমস্ত বিশেষ তাৎপর্যময় চিত্র তাঁরা আঁকবেন, কবে তাঁরা চিত্রকলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বুকে ও মুখে আশা ভাষা জোগাবেন।[৩৩৬]

তবে একই সাথে তারা এ দেশের চিত্রশিল্পকে নবজাতক এবং ভবিষ্যৎ হয়তো সে দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিকভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শিল্পীসমাজ নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও অনেকের ব্যক্তিসত্তাকে জাতীয় এ সংকট নাড়া দিয়েছিল এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁরা এ আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্তও করেছিলেন। বিশেষত কামরুল হাসানসহ আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১২), বিজন চৌধুরী (১৯৩১-২০১২), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), ইমদাদ হোসেন (১৯২৫-?), রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮) প্রমুখ তরুণ ছাত্ররা। তা ছাড়া

---

[৩৩৬] সিরাজুল ইসলাম, 'চিত্রকলা-প্রদর্শণী প্রসঙ্গে', *সওগাত*, ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ ২৪৯-২৫০

পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের মনেও ভাষা আন্দোলন গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এবং তাদের কাজেও তার প্রতিফলন ঘটেছে।

পাকিস্তানের শিল্পী ও শিল্পকলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার লক্ষ্যে প্রথমে লাহোরে (১৯৫০ সালে), তারপর ঢাকাতে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে) এবং সবশেষে করাচিতে (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে) 'পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল' গড়ে তোলে সরকার।[৩৩৭] পূর্ব-পাকিস্তানে আর্ট কাউন্সিলের দপ্তর হিসেবে নির্বাচন করা হয় বর্তমান বাংলা একাডেমির 'বর্ধমান হাউস'কে।[৩৩৮] এখানেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল প্রথম নিখিল পাকিস্তান চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে। পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পীদের সাথে প্রচুর সংখ্যক পশ্চিম-পাকিস্তানি শিল্পীও এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানিদের তুলনায় দু-একজন ব্যতিক্রম বাদে তাদের অধিকাংশের উপস্থিতিই খুব মলিন ছিল। বরং এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ দেশীয় তরুণ শিল্পীরা নিজেদের শিল্পপ্রতিভায় এবং মননশীলতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসানের মতামত নিম্নরূপ–

> ৫৪ সালের প্রদর্শনীতে পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীদের সৃষ্টির মৌলিকতা যে রকম সকলের কাছে সেদিন সহজভাবে রেখাপাত করেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সে ধারেও আসতে পারেনি। বরং আরো পশ্চিমের কথাই বড় করুণভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।[৩৩৯]

শুধু কামরুল হাসানই নন, সমসাময়িক পাকিস্তানি শিল্পরসিক ও সমালোচকদের কাছেও পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীরা উত্তম বলে বিবেচিত হতেন। পাঞ্জাব স্কুলের শিল্প যত প্রশংসনীয়ই হোক, তার চেয়ে পূর্ব বাংলার শিল্পীদের সৃষ্টির উৎকর্ষ বেশি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প-সমালোচক আজরা জামান। তাঁর মতে, 'তাঁদের আছে অধিকতর পরিণত দৃষ্টি, আছে প্রায় অশান্ত, আবেগপ্রবণ অনুভূতি এবং পূর্ণতর ও সকল দিক দিয়ে তুষ্টিকর জীবন।'[৩৪০] আর্ট কাউন্সিল আয়োজিত পরবর্তী প্রদর্শনীতেও পূর্ব-পাকিস্তানি শিল্পীরা একই রকম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। এ প্রদর্শনীর নানা বিষয়ে আলোকপাতের একপর্যায়ে 'প্রদর্শনীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় রচনা হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পীদের সৃষ্টি' বলে মত প্রকাশ করেছেন একজন আলোচক।[৩৪১] বস্তুত শুরু থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রদর্শনী হয়েছিল, এর মধ্যে একমাত্র ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের প্রদর্শনী ছাড়া বাকি প্রতিটির জাতীয় পুরস্কারই পূর্ব-পাকিস্তানি শিল্পীরা পেয়েছিলেন।[৩৪২] শিল্পীদের এরূপ কৃতিত্বের ফলে শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানি শিল্পীদের খ্যাতি, জনপ্রিয়তা

---

[৩৩৭] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ ৯৫

[৩৩৮] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ৪১

[৩৩৯] কামরুল হাসান, 'পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা', *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ ৫১

[৩৪০] আজরা জামান, 'সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২, পৃ ২৫

[৩৪১] চিত্রদর্শী, 'পাকিস্তানী চিত্রশিল্পীদের সাম্প্রতিক চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ১১বর্ষ, ১ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫৯, পৃ ৪৮

[৩৪২] সাঈদ আহমদ, 'বাংলাদেশের চিত্রকলা', *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ ৯০

এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের এ অংশের গুরুত্বও বাড়তে থাকে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকেই শিল্পক্ষেত্রে পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকা।

বস্তুত এই পঞ্চাশের দশকের শুরুতে একদল অত্যন্ত সৃজনশীল উদ্যোগী শিল্পীর উত্থান হয়, যারা পরবর্তী সময়ে এ দেশের জাতীয় শিল্পরুচি নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও ইউরোপীয় বাস্তবানুগ ধারায় অঙ্কিত কিছুটা রোমান্টিক ধাঁচে বাংলার নিসর্গ এবং শ্রমজীবী মানুষ বা বাংলার দৈনন্দিন জীবনচিত্রই এ দেশের শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের মধ্যে সমাজ এবং রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতা, জাতীয়তাবোধ এবং জীবনঘনিষ্ঠতাও কিছুটা লক্ষ করা যায়। মূলত ইউরোপীয় নানা অনুষঙ্গের সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু যুক্ত করে একটা দেশজ স্বাদ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তারা। আর মাধ্যম হিসেবে প্রধানত কালি-তুলি ও জলরংই ব্যবহৃত হয়েছে এ সময়। কিন্তু একই দশকের শেষার্ধে এ দেশের শিল্প নাটকীয় দিক পরিবর্তন করে ঢাকা আর্ট কলেজের প্রথম প্রজন্মের একদল তরুণ ছাত্রের হাত ধরে। হামিদুর রাহমান (১৯২৮-১৯৮৮), আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক (১৯৩২-২০০৫), রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪), কাজী আবদুল বাসেত (১৯৩৫-২০০২), সৈয়দ জাহাঙ্গীর (১৯৩৫), শামসুল ইসলাম নিজামী (১৯৩৭-২০০৪) প্রমুখ এ পর্বে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কলকাতা থেকে শিক্ষা শেষে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করা শিল্পী মো. কিবরিয়া (১৯২৯-২০১১) এ পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মূলত আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে সমসাময়িক বিশ্বশিল্পের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং আর্ট কাউন্সিলের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া পেশাদারিত্ব ও প্রতিযোগিতার আবহ নবীন শিল্পীদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে পূর্ণরূপে বিকশিত হতে ভিত্তি, উৎসাহ এবং পরিবেশ দান করেছিল।

১৯৫৩-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইতালির ফ্লোরেন্স চারুকলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষা লাভ করেন। রশিদ চৌধুরী ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে প্রথমে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে শিল্প-সমঝদারির পাঠ নেন। এরপর স্পেন সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য এবং ১৯৬০-৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে একোল দ্য বোজার্ট-এ ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য এবং ট্যাপিস্ট্রি বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। শিল্পীদের মধ্যে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ছাপচিত্র বিষয়ে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় শিল্প-সমঝদারির পাঠ নিয়ে মুর্তজা বশির ১৯৫৬-৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে চিত্রকলা ও দেয়ালচিত্রের কলাকৌশল আয়ত্ত করেন এবং প্যারিস হয়ে লন্ডন ভ্রমণ করেন। হামিদুর রাহমান ১৯৫০-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্স, ইতালি এবং ব্রিটেনে এবং ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত আমেরিকায়

শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৯-৬২ খ্রিস্টাব্দে মো. কিবরিয়া জাপানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের এসব শিল্পীদের দেশে ফিরে আসার মাধ্যমেই এ দেশীয় শিল্পে পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিকপ্রধান কিউবিজম, স্যুরিয়ালিজম এবং বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্যে চরম হতাশা, পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং পূর্ববর্তী শিল্প-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হওয়া বিমূর্ত শিল্পের তুমুল জনপ্রিয়তা তখন সারা পৃথিবী জুড়েই। মানবমনের তাৎক্ষণিক অনুভূতির ক্ষিপ্র প্রকাশ ও বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিরূপ সরাসরি উপস্থাপন প্রবণতার অবলুপ্তি এবং সরাসরি মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে এ শিল্পরীতি দ্রুতই একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। আর সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ বা দর্শন না থাকলেও শুধু একই বিশ্বের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে আমরাও সেই আন্তর্জাতিকতার নামাবলি জড়িয়েছি গায়ে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য–

> আমাদের শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের কোন সর্বগ্রাসী হতাশা ছিল না ; কিন্তু যেহেতু ইউরোপীয় ভাবধারা আমরা আকণ্ঠ পান করেছি তাই দূর সিন্ধুতটের প্রতিটি তরঙ্গাঘাত এসে পৌঁছেছে আমাদের কূলে। ...শিল্পীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতার চেয়ে ইউরোপীয় ভাবধারার সংঘাতটা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই এদেশে প্রকৃতি, মাটি, মানুষ ও পটুয়া অংকনরীতিতে হাতেখড়ি শুরু করলেও অতি দ্রুত শিল্পীরা ইউরোপের ভাবাকাশকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন।[৩৪৩]

বস্তুত ঔপনিবেশিক শিক্ষায় বিষয়বস্তুর বাস্তবধর্মী উপস্থাপনে অভ্যস্ত শিল্পরীতির উত্তরাধিকারী এবং সাম্প্রতিক বিশ্বশিল্পের প্রবণতা সম্পর্কে পুরোপরি অন্ধকারে থাকার দরুন পশ্চিমের এ অভিঘাত আমাদের তরুণ শিল্পীদের মনে আকস্মিক এবং প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে প্রথম দিকে এদের প্রায় সবাই সমাজ, রাজনীতি এবং দেশজ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তবধর্মী শিল্প সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে এসব শিল্পীর কাজে আঙ্গিকনির্ভর বিমূর্ততাই প্রতিভাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধিক সনৎকুমার সাহার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

> ...আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে টাটকা পরিচয় তাঁদের ওভাবে [বিমূর্ত রীতিতে] ছবি আঁকতে প্রেরণা জোগায়। হয়ত মহান পূর্বসূরিদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের জাহির করার ঝোঁকটাও তাতে ছিল। সদ্য শিং গজানো বাছুরের ছটফটানিও যে তাতে যোগ হয়নি, তা নয়। তবে প্রতিভার কার্পণ্য ছিল না।[৩৪৪]

বস্তুত প্রতিভাবান হওয়ার ফলে বিমূর্ত শিল্পরীতি চর্চার ব্যাপারে অনাগ্রহী প্রথম প্রজন্মের অভিভাবক শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতাদর্শগত পার্থক্য ভুলে বিমূর্তরীতির চর্চাকারী অগ্রবর্তী শিল্পীদের প্রচেষ্টাকে

---

[৩৪৩] সন্তোষ গুপ্ত, 'সমসাময়িক চিত্রকলা ও কয়েকজন শিল্পী', *মাহে-নও*, ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৬, পৃ ১২০

[৩৪৪] সনৎকুমার সাহা, 'মুক্তিযোদ্ধার শিল্পরূপ', দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুন্ডু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, নিতুন কুন্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ ৪৫

উষ্ণ অভিনন্দিতই করেছেন সবসময়। ছাত্রদের বিমূর্ত শিল্প চর্চা-সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে জয়নুল আবেদিনের কণ্ঠে অভিভাবকসুলভ প্রশ্রয়ের সুরই ধ্বনিত হয়েছে–

> আমাদের এ ধরনের শিল্পীদের অধিকাংশই কিছুটা অপরিনত বয়সে বিদেশে গিয়েছিল এবং গিয়ে সেখানে যেসব চিত্রাঙ্কন ধারা দেখেছে, তাতে তাদের চোখ আটকে গিয়েছিল এবং সেইসব ধারাকে অনুসরণ করে তারা ছবি এঁকেছে, ভালো ছবিও এঁকেছে কিন্তু আমার মনে হয় ওরা যতই পরিনত হবে, ততই আবার প্রকৃতিতে, জীবনে, জনতায় ও স্বপরিবেশের মধ্যে ফিরে আসবে, নিজ ঐতিহ্য ও নিজ জন-মানুষকে তারা জানতে পারবে এবং তাদের চিত্রকলায় তা ফুটাতেও পারবে। ওদের অনেকেরই অঙ্কন ক্ষমতা অসাধারণ, হয়তো বিভিন্ন কারণে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় নাই। জীবনবোধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই প্রকৃত আর্ট নির্মিত হয়। যে রীতিতেই শিল্পকলা নির্মিত হোক না কেন তার সাজুয্য থাকতেই হবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ সমাজ পরিবেশ বা পরিমন্ডলের সাথে।[৩৪৫]

জয়নুল আবেদিনের উপর্যুক্ত মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই। বেপথু মুসাফিরের মতো বারবার আঙ্গিক পরিবর্তন করেছেন তারা সঠিক পথের সন্ধানে। যতই পরিণতির দিকে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন, তাদের ক্যানভাস আবার সরব হয়েছে দেশি অবয়বে, নিসর্গে। কিন্তু শুরুতে অবয়ব-নির্ভর শিল্পে তাদের প্রতিভার যে স্ফূরণ দেখা গিয়েছিল, পরে তার ছিটেফোঁটাটিও আর উৎসারিত হয়নি তাঁদের তুলি থেকে। আসলে এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে অনান্য সব কিছুর মতো শিল্পদর্শন, রীতি বা ধারাও বিবর্তিত হবে। কিন্তু তা হওয়া উচিত একান্তভাবেই পূর্ববর্তী রীতি, নিজস্ব সমাজ এবং সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় সৃষ্টি হওয়া বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ শিল্প-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় অতীত ঐতিহ্যের সাথেও নিজের সংযোগ বজায় রেখেছে। কিন্তু এ দেশের বিমূর্ততা কোনো ধারাবাহিক রীতির বিবর্তনের ফল নয় এবং এ দেশীয় কারো নিজস্ব উদ্ভাবনও নয়।[৩৪৬] তাই এ দেশে বিমূর্ত আভিব্যক্তিবাদের যাত্রায় দর্শক-সমালোচকগণ স্বদেশ এবং এর সংস্কৃতিকে খুঁজে ফিরেছেন নিরন্তর, আর তাতে তাদের হতাশাই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, রশিদ চৌধুরী এবং আবদুর রাজ্জাকের আলাদা আলাদা চিত্র প্রদর্শনী সম্পর্কে করা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য–

> ...এদের ছবি দেখলে একটা কথা প্রথমেই মনে হয় : ইউরোপীয় খ্যাতনামা শিল্পীদের প্রভাব এদের ওপর বড় বেশী। অনুসরণের চাইতে অনুকরণের প্রবণতাই এখন অধিক প্রকট। শিল্পীর যে বিশেষ মেজাজ বা ব্যক্তিত্ব কোন শিল্প সৃষ্টিকে আমাদের কাছে বিশেষ স্বীকার্য করে তোলে, তার ছাপ এ সব ছবিতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেনি। আর একটি জিনিস এদের ছবিতে লক্ষ্য করবার মত : এদের ছবিতে যে ধরণের আবেষ্টনীর সৃষ্টি

---

[৩৪৫] নজরুল ইসলাম, 'আমি নিজে শিল্পকর্ম করে যত আনন্দ পাই, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই শিল্পকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, জীবনে প্রবিষ্ট হতে দেখলে: শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার', *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ মার্চ '৭৪, পৃ ৩৭

[৩৪৬] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ইত্যাদি, ২০০৭, পৃ ৮১

হয়েছে তাকে মনে হয় বিশেষ ভাবে বিদেশী। এঁদের ছবির বিমূর্ত জগত যে মূর্ত জগতকে কেন্দ্র করে হয়েছে তা যেন একান্ত ভাবে বিদেশী। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ– কোন কিছুই যেন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি এঁদের মনে। এঁদের ছবিতে ইউরোপকেই যেন দেখতে পাই আমরা।[৩৪৭]

অথচ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের আর্ট কাউন্সিল আয়োজিত প্রদর্শনীতে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পীদের ব্যর্থতা সম্পর্কে কামরুল হাসান বলেছিলেন, '...নিজেদের জীবনবোধ না থাকলে এ ব্যর্থতা আসবেই। এই খানেই পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পার্থক্য। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পীরা অধিকাংশই মোহগ্রস্ত আর আমাদের মোহ কাটছে।' বাস্তবতা হলো, মোহমুক্তি নয়, বরং মোহ তখনো ঘিরে ধরেনি পূর্ব-পাকিস্তানি শিল্পীদের। কিন্তু একই দশকের শেষ নাগাদ এ দেশীয় শিল্পীরাও নিজেদের পূর্ব-স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পশ্চিমের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন; বিশেষত, দ্বিতীয় প্রজন্মের বিদেশ-ফেরত শিল্পীরা। তাদের হাতেই বিদেশি বিমূর্তাশ্রয়ী নানা রীতি-পদ্ধতি এ দেশের শিল্পে ব্যাপক ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আর এসব শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমসাময়িক অধিকাংশ শিল্পীই বিমূর্তাশ্রয়ী হয়ে ওঠেন। ফলে লোকজ শিল্পের রস নিয়ে জয়নুল-কামরুলের হাত ধরে আমাদের শিল্পের জাতীয় চরিত্র বা আঙ্গিক গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বশেষ পাশ্চত্য শিল্পরীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং আর্ট কাউন্সিলের তৎপরতার মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া পেশাদারিত্ব ও প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে এ পাশ্চাত্য অনুগামিতা সবচেয়ে সহজ পথ বলে প্রতিভাত হয়েছিল নবীন শিল্পীদের কাছে। এসব শিল্পীর বিমূর্ততাকে আশ্রয় প্রসঙ্গে সন্তোষ গুপ্তর মতামত নিম্নরূপ–

আমাদের শিল্পীদের বিমূর্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ বা অঙ্কন পদ্ধতিতে এই বিমূর্তরীতি ব্যবহারের পশ্চাতে কোন সুনির্দিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা কাজ করেছে বা সক্রিয় আছে এমন প্রমাণ এযাবৎ মেলেনি। বিদ্রোহ যতটুকু এসেছে তা ইউরোপীয় ভাবধারার সংঘাতকে কেন্দ্র করে, ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রভাবজাত বিভিন্ন বাদের উচ্চকিত আসরে আমাদের শিল্পীদের আনাগোনার ফলশ্রুতি হিসাবে, তাই আমাদের মুষ্টিমেয় বিমূর্ত শিল্পের রূপকারগণ বিমূর্ত-রীতির কোন একটি বিশেষ শাখাকে আশ্রয় করা কিংবা বিভিন্ন শাখার মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর করার ঝোঁক অপেক্ষা সাময়িকভাবে নিজ বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে অথবা পরিষ্কার করে বলতে গেলে শিল্পীকে অঙ্কনের ক্ষেত্রে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তারই ত্বরিত সমাধান খুঁজতে গিয়ে জড় বিমূর্তবাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলে এসেছেন।[৩৪৮]

এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষকের 'পরিষ্কার করে' বলা কথাটির সাথে দ্বিমত পোষণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। কারণ বিমূর্তরীতির চর্চাকারী শিল্পীদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাকসহ অনেকেই ছাত্রাবস্থায়ই দর্শক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, বাস্তবধর্মী শিল্পে তাঁদের দক্ষতার জন্য। স্বয়ং জয়নুল আবেদিনও 'ওদের অনেকেরই অঙ্কন ক্ষমতা

---

[৩৪৭] চিত্র-দর্শী, 'চিত্র প্রদর্শনী', *সমকাল*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৫, পৃ ১২৯

[৩৪৮] সন্তোষ গুপ্ত, 'আমাদের চিত্রশিল্পের গতি-প্রকৃতি', *মাহে-নও*, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৬৬, পৃ ৫৪

অসাধারণ' বলে মন্তব্য করেছেন। আর শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই নয়; বরং পশ্চিম-পাকিস্তানেও বিমূর্ততাবাদী ধারার চর্চা শুরু হয়েছিল আরও আগে, পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে শিল্পী জোবায়দা আগার হাতে। পরবর্তীতে এ ধারায় জোয়ার আসে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ এবং সমসাময়িক সাদেকাইন, শেমজা, শাকির আলী, খালেদ ইকবাল, আজমল হুসেন প্রমুখ শিল্পীদের হাতে। সুতরাং এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের শিল্পে পঞ্চাশের শেষ থেকে পুরো ষাটের দশক জুড়ে ব্যাপকভাবে বিমূর্ততার চর্চা হয়েছে। এই একটা মাত্র ক্ষেত্রে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীদের মিল অনবদ্য এবং এর জন্য কোনো আন্দোলনসংগ্রামেরও প্রয়োজন হয়নি। কোনো কোনো শিল্পবিশ্লেষক পাকিস্তানজুড়ে বিমূর্ততার এই জোয়ার সম্পর্কে পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করলেও তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ সমকালীন নথিপত্রে কোথাও ইসলামি রাষ্ট্রনীতির জন্য শিল্প বাধাগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায় না। তবে বৃহত্তর সমাজ হয়তো ধর্মীয় কারণে বিমূর্ততাকে গ্রহণ করেছে, ফলে একধরনের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে এই শিল্পধারা। তা ছাড়া কোনোরূপ বিপত্তি ছাড়াই তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীসহ নতুন প্রজন্মের অন্য অনেক শিল্পীও বাস্তবের প্রতিনিধিত্বকারী চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে বিমূর্ততাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় তখন পাকিস্তানের দুই অংশেই সমান তীব্র ছিল। বিশেষ করে, এ পর্যায়ভুক্ত শিল্পীদের প্রচার-প্রিয়তার কারণে তাদের সৃষ্টিশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সততা নিয়েও সন্দেহ পোষণ করেছেন কেউ কেউ।[৩৪৯]

আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় বিমূর্ততা (কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকলেও) একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসা শিল্পরীতি নয়। কারণ আমাদের ঐতিহ্য যে লোকশিল্প, তাতেও আধুনিক এবং বিমূর্ত গুণাবলি বিদ্যমান। তবে আমাদের অধিকাংশ শিল্পীদের চর্চিত 'বিমূর্ত-আধুনিকতা' কতটা সেই লোকজ-বিমূর্ততা উৎসরিত, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আবার এ-ও মনে রাখতে হবে যে সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসব কিছুর মতোই পরিবর্তনশীল সময়ও সৃষ্টির ওপরে নিজের ছাপ রেখে যায়। যেহেতু প্রায় সমগ্র পৃথিবীতেই তখন এই রীতির ঝাপটা ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রভাব এখানেও পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের হতাশা কিংবা বিধ্বস্ত মূল্যবোধের মতো কোনো তীব্র আঘাত আমাদের শিল্পীদের আলোড়িত করেনি। তবে বিশ্বব্যাপী একই উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া, পণ্য বিক্রয়ের জন্য দুনিয়াজোড়া বাজারের প্রভাব থেকে এ দেশের শিল্পীরাও তো মুক্ত নন।[৩৫০] তা ছাড়া শুধু সময়ের তাৎপর্যেই নয় বরং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সৃজনশীল ক্ষেত্রে, ভিন্নরীতি বা মতবাদের সংমিশ্রণ উন্নততর রীতি বা পদ্ধতিরও জন্ম দেয়। সে অর্থে এ দেশের শিল্পধারায় বিমূর্ততার যাত্রা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিশ্চয়ই শুভ উদ্যোগ। সমকালীন সমালোচকরা

---

[৩৪৯] জালালউদ্দীন আহমদ, 'চিত্রকলা ঃ তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠী', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬২, পৃ ১১৫

[৩৫০] সন্তোষ গুপ্ত, 'আমাদের চিত্রশিল্পের গতি-প্রকৃতি', *মাহে-নও*, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৬৬, পৃ ৫৫

তাদের কাজকে আমাদের সংস্কৃতি-উদ্ভূত নয় বলে উড়িয়ে দিলেও সময়ের জটিল আবর্তে ঘুরেফিরে তাদের ছবিতে যে রং, রেখা, আকৃতি, বুনট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অবয়ব উঁকি দিয়েছে, তার বিশ্বজনীন আবেদন থাকতে পারে; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দেশজ আবার আমাদের পরিচিতও। তাদের কাজে পাশ্চাত্য-উদ্ভূত বিমূর্ততা ভিন্ন ভৌগোলিক সীমানা, ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে জারিত হয়ে কিছুটা নতুন পরিণতি লাভ করেছে দেশীয় বিষয়নির্ভর হয়ে। তাই আমাদের আধুনিক শিল্পের জাতীয় চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্ন এলেও প্রথমেই যাকে গুরুত্ব দিতে হবে, তা-ও এই বিমূর্তরীতির চর্চা-উদ্ভূত ফসল।

এই দ্বিতীয় প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি শিল্পী হামিদুর রাহমান। এ দেশের সামগ্রিক শিল্প-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ দেশের শিল্পের গতানুগতিক চর্চাবিরোধী এবং অগ্রবর্তী বিমূর্তবাদীদেরও একজন। দেশীয় শিল্পের ঐতিহ্যাশ্রয়ী রীতি বাতিল এবং বিশ্বশিল্পের সর্বাধুনিক রীতির ঘোরতর সমর্থক হওয়ার কারণে ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত। সেজন্যই সারা জীবন একপ্রকার আত্মনির্বাসিতই থেকেছেন তিনি। শুরুতে প্রতিচ্ছায়ামূলক বাস্তববাদী, পরে ইউরোপীয় রীতির প্রকাশবাদী ধারায়, জ্যামিতিক বিন্যাসে অর্ধ-বিমূর্ত, কখনো চরম বিমূর্তসহ নানা রীতি-পদ্ধতিতে তাঁর পদচারণা সাবলীল। কারণ কোনো একটি রীতির চরম উৎকর্ষ সাধন অপেক্ষা বক্তব্য প্রকাশে প্রয়োজনীয় রীতিটিই গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কাছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> তিনি ছবি আঁকেন বুদ্ধি দিয়ে, কোনো মেজাজের তিনি শিকার নন, আবেগ ও অনুভূতি সবকিছুই তিনি বুদ্ধি দিয়ে শোধন করে নেন। তাঁর কাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার রণক্ষেত্র, অনবরত এই রণে বস্তুর, নিসর্গের রূপান্তর চলছে... ।[৩৫১]

নিরীক্ষার জন্য ছাপার কালি, কাঠ, পাট, চট, বালু, সিমেন্টের মতো নানা ধরনের দেশীয় উপকরণের ব্যবহারও করেছেন তিনি। আসলে সমসাময়িক বিশ্বশিল্পের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি তাঁকে প্রভাবিত করলেও স্বদেশ তাঁর আত্মানুসন্ধানের কেন্দ্রে থেকেছে সবসময়। স্বদেশের প্রতি টান এবং এই মমত্ববোধ তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। শুরু থেকে এ দেশের শিল্পের মূল সুর ছিল 'মানবতা' ও 'প্রকৃতি'। সময়ের নানা জটিল আবর্তে হামিদুর রাহমানের কাজে তা যেন নতুন মাত্রা লাভ করেছে দেশজ বিষয়কে ভিত্তি করে। এখানেই তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন সমসাময়িকদের তুলনায়। তা ছাড়া তাঁর কাজের মূল সুর কী, সে প্রসঙ্গে তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমি কে, কোন সমাজের এইটাই প্রধান প্রতিপাদ্য।'[৩৫২] জাতীয় দুর্যোগ এবং সমস্যার মর্মস্পর্শী উপস্থাপন লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। কারণ, রাজনীতিসংশ্লিষ্টতা না থাকলেও রাজনীতি সচেতনতা বরাবরই ছিল তাঁর। শহীদ মিনার এবং এর

---

[৩৫১] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'চিত্রকলার তিন বছর', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ৪২

[৩৫২] মুহাম্মদ মালিক খসরু, 'সাক্ষাৎকার', দ্র. সাঈদ আহমদ সম্পাদিত, *হামিদুর রাহমান*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ ১২৯

গায়ের দেয়ালচিত্র (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় এটা মুছে ফেলা হয়)[৩৫৩] তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে করা তাঁর ম্যুরালচিত্রগুলো তাঁর সৃজন প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন।

এ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী কিবরিয়া জাপানে থাকার সময় মার্ক রথকো, উইলহেম ডি কুনিং, ফ্রানজ ক্লাইন প্রমুখ আমেরিকান শিল্পীর কাজ, আন্তনি তাপিজের মতো স্প্যানিশ শিল্পীর কাজ, ইতালীয় শিল্পী আলবার্তো বুড়ি আর ফরাসি শিল্পী পিয়েরে সুলাজের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[৩৫৪] এরপর ধীরে ধীরে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। এমনকি তাঁর শিল্পসম্ভারের একটা বিরাট অংশ জাপানি উদ্যান-শিল্পের প্রভাব এবং জেন দর্শনের ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছে। চিত্রকলার মাধ্যম হিসেবে তিনি তেলরঙের ব্যবহার বেশি করেছেন। প্রথম দিকে তাঁর কাজে কিছুটা জ্যামিতিক ফর্মে বিন্যস্ত বাস্তবের প্রতিনিধিত্বকারী উপস্থাপনধর্মিতা লক্ষ করা গেলেও জাপান থেকে ফেরার পর বুনট এবং রং-ই তাঁর অনুভূতি প্রকাশের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে (চিত্র ৪৫)। পরিচিত জ্যামিতিক আকারগুলো ক্রমেই অপরিচিত হতে থাকে। তখন রং নিজেই সৃষ্টি করতে থাকে আকৃতি, আবার রং-ই নির্দিষ্ট করে দেয় সৃষ্টিযজ্ঞ কোন বিশিষ্টতা লাভ করবে। সমসাময়িক অন্য সব বিমূর্তবাদীর ক্যানভাসে ঘুরেফিরে কখনো-সখনো পরিচিত অবয়ব উঁকি দিলেও তাঁর চিত্রজমিন এ ক্ষেত্রে নিরাসক্তই থেকেছে সব সময়। দেশে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী শিল্পী তিনি। বিমূর্ত শিল্পরীতির চর্চাকারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এ শিল্পী সৃষ্টির উৎকর্ষ এবং দক্ষতায় এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

এ দেশের শিল্প আন্দোলনের সাথে সরাসরি কোনো পূর্ব সংস্রব ছাড়া স্ব-উদ্যোগে পাশ্চাত্যে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করে পঞ্চাশের শেষের দিকে পাশ্চাত্য উদ্ভূত আধুনিকতার উত্তুঙ্গ স্রোতে ভাসা একমাত্র ব্যতিক্রমী শিল্পী নভেরা আহমেদ (১৯৩০?-২০১৫)। চিত্রকলার চর্চা করলেও তাঁর প্রধান খ্যাতি ভাস্কর হিসেবে। ইউরোপের বাস্তবানুগ রীতিতে শিক্ষালাভ করলেও দেশে ফিরে তিনি পাশ্চাত্য আধুনিকতার সাথে এ দেশীয় সংবেদনশীলতা, লোকজ উপাদান ও আঙ্গিকের মিলনে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। বাংলার লোকজ জীবন, পরিবার এবং এর নানা অনুষঙ্গ তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। একক ফিগার, মা ও সন্তান, মা-বাবা-সন্তান, পুরুষ ও গরু, পরিবার ও গরু, এ-ধরনের বিষয়বস্তুকে ভীষণ সহজ আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, যাকে সেমি-ফিগারেটিভ বা অবয়বভিত্তিক আধা-বাস্তবধর্মী আঙ্গিকের বলে বিবেচনা করা যায়। মাধ্যমের কারণেই আঙ্গিক বা ফিগার গড়নে সহজতা এনেছেন। আবার হেনরি ম্যুরের মতো শূন্য পরিসর (নেগেটিভ স্পেস) রেখেছেন। মানুষের মাথা আকারে বেশ খানিকটা ছোট দেখিয়েছেন,

---

[৩৫৩] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, 'হৃদয়ের মাঝে নিয়েছে ঠাঁই', *দৈনিক বাংলা*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, পৃ ৮

[৩৫৪] মাহমুদুল হোসেন, 'খ. মোহাম্মদ কিবরিয়া', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩৪২-৩৪৩

অনেকটা বাংলার মাটির পুতুলের মতো কিংবা হেনরি ম্যুরের আঙ্গিকের মতোও বলা যায়।[৩৫৫] উপাদান হিসেবে দেশে সহজলভ্য কাঠ, প্লাস্টার, স্থাপত্য নির্মাণের উপাদান লোহার রড, সিমেন্ট, বালু ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ধাতব ভাস্কর্যও নির্মাণ করেছেন কয়েকটি। শিল্পী হামিদুর রাহমানের সাথে ভাষা আন্দোলনের অমর কীর্তি শহীদ মিনারের যৌথ নকশাকারী শিল্পীও তিনি। এ দেশের প্রথম আধুনিক ভাস্কর এবং প্রথম নারী ভাস্করও তিনি। পঞ্চাশের বিরুদ্ধ পরিবেশে একজন নারীর ভাস্কর্যচর্চা খুব সাহসী এবং চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ হলেও শুধু সময়ের তাৎপর্যেই নয়, বরং একজন সার্থক প্রতিভাবান শিল্পীর মর্যাদায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ।

এ দেশের সামগ্রিক শিল্প-আন্দোলন এবং বিশেষত বিমূর্ত শিল্প-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্পী আমিনুল ইসলাম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই অত্যন্ত মেধাবী শিল্পী হিসেবে শিল্পী, দর্শক ও সমালোচকদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। অসাধারণ ড্রইং, স্বচ্ছ জলরং, সর্বোপরি শিল্প সৃষ্টিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দেশজতার প্রাধান্য তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনায় আমিনুল ইসলামের কাজ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করবে–

> এবারের চিত্র প্রদর্শনীতে তরুণ শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি ছবিই স্বচ্ছ এবং neat, তুলির উপর কতোখানি অধিকার থাকলে যে এমন সৃষ্টি সম্ভব– তা সহজেই অনুমেয়। ... ক্ষুধিত এবং দুঃখী জনতার বুকের বেদনাকে তুলে ধরতে হ'লে যে অশ্রু জলের দরকার– সে অশ্রু আমিনুলের আছে।[৩৫৬]

আবার তিনিই এ দেশে চেনা-পরিচিত বিষয়বস্তুর বাস্তবধর্মী উপস্থাপনে অভ্যস্ত দৃষ্টির সামনে, অপরিচিত, বিমূর্ত অথবা অর্ধ-বিমূর্ত বিষয়বস্তুর সাহসী উপস্থাপন শুরু করেছিলেন। মূলত ইউরোপ প্রত্যাগত হওয়ার পর থেকেই তাঁর কাজে বিমূর্ততার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রায় পুরো ষাটের দশকই তাঁর চিত্রপটজুড়ে বিমূর্ততাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কখনো রং, রেখা এবং আকৃতির ছন্দোবদ্ধ উপস্থিতি, আবার কখনো শুধু রংই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে আপন মহিমায়। মনোভঙ্গির দিক থেকে আমিনুল ইসলাম আধুনিক। কলাকৌশলের ব্যবহারে সচেতন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ ক্লান্তিহীন। মনোলোকের জটিল পথে, স্মৃতির নানা তীর্থে কিংবা কল্পনার নানা লোকে ঘুরে বেড়ানোতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই।[৩৫৭] তাঁর মেজাজ কখনো কিউবিক, কখনো অর্ধ-বিমূর্ত, কখনো বিমূর্ত, আবার কোনো

---

[৩৫৫] নজরুল ইসলাম, 'নভেরা আহমেদ', *শিল্প ও শিল্পী*, http://www.shilpaoshilpi.com/নভেরা-আহমেদ/ , প্রেক্ষিত ০৩-১২-২০১৫ খ্রি.

[৩৫৬] আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, 'চিত্র প্রদর্শনী', *মাসিক দিলরুবা*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ ৭৫৪

[৩৫৭] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'চিত্রকলার তিন বছর', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ৪২

কোনো সময় পরাবাস্তববাদে থিতু হয়েছে। তাঁর কাজের অভিনবত্ব সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য এরূপ–

> প্রতিবারেই প্রতি প্রদর্শনীতে তিনি নতুন কিছু দেন এবং কোনোবারেই তাঁর নতুন ছবিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। এই গতিশীলতা শিল্পীর উৎকর্ষ-সাধনের মানসিক প্রচেষ্টার লক্ষণ। এবং সৃষ্টি-ধর্মী শিল্পীর একটি বিরাট গুণ এই গতিশীলতা।[৩৫৮]

বস্তুত শিল্পীজীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের রীতি বা শৈলীতে নিজের উপস্থাপন বদলে নেওয়ার সাহসী পদক্ষেপ যেমন তিনি নিয়েছেন, তেমনি মাধ্যম ব্যবহারের ভিন্নতাও তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তেলরং-জলরঙের পাশাপাশি অ্যাক্রেলিক, কোলাজসহ ম্যুরালও রচনা করেছেন তিনি। প্রথাবিরুদ্ধ হওয়ায় এ দেশে বিমূর্তার জন্য প্রচুর সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

আবদুর রাজ্জাক চিত্রশিল্পী হলেও ভাস্কর্য এবং ছাপচিত্র মাধ্যমেও দক্ষ রূপকার তিনি। প্রকৃতি তাঁর শিল্পানুপ্রেরণার উৎস। বাস্তবতা উৎসারিত একধরনের নাটকীয় অর্ধ-বিমূর্তায়ন তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য। চিত্রজমিন নির্মাণের জন্য ব্রাশের বিশেষ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট 'ছদ্ম কুঠুরি'গুলো উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী সেজানের চিত্রতলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এর ভেতরেও ড্রয়িং এবং কম্পোজিশনের দক্ষতা নজর কাড়তে সক্ষম। তাঁর কাজে সবুজ, নীল এবং লালের চমৎকার অভিনিবেশ বিষয়বস্তুর রোমান্টিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরিণত অবস্থায় তাঁর চিত্রপট প্রকৃতি ও নিসর্গের বিভিন্ন রূপকে রং, রেখা এবং অপরিচিত অকৃতি সন্নিবিষ্ট করে দৃশ্যমান জগতের নির্যাসকে তুলে ধরে (চিত্র ৪৬)। প্রকৃতিতে সব কিছু যেমন ভারসাম্যপূর্ণ এবং ধীরে ধীরে গাছের ফুল পাতা যেভাবে রং-রূপ বদলায়, পরিপূর্ণতা পায়, শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের পেইন্টিং অনেকটা সেভাবেই নির্মিত হয়, বা বলা যায়, পূর্ণতা পায়।[৩৫৯] শিল্পে স্পেস এবং বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সন্নিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এ দেশে ভাস্কর্যশিল্পের শিক্ষা এবং চর্চার পথ সুগম করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবশ্য স্বীকার্য। অন্যান্য মাধ্যমের মতো ভাস্কর্য মাধ্যমেও প্রথম দিকে তিনি বাস্তবের আদলে সরলীকৃত অর্ধ-বিমূর্ত এবং পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন। এ সময়ে রচিত তাঁর ভাস্কর্যসমূহকে স্পষ্টত দুটি প্রবণতায় ভাগ করা যায়। কাঠ খোদাইনির্ভর ভাস্কর্যগুলোতে জৈবিক (organic) গুণাবলির প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যদিকে খুঁজে পাওয়া বস্তুনির্ভর (found object) লোহা ও ইস্পাতের ঝালাই ভাস্কর্যগুলোতে তিনি মূলত জ্যামিতিক বিন্যাস এবং শূন্য পরিসরে গড়নের ভূমিকাকেই গুরুত্ব

---

[৩৫৮] মাহবুব জামাল জাহেদী, 'সমকালীন চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, পৃ ৩৭

[৩৫৯] নজরুল ইসলাম, 'আবদুর রাজ্জাক: বহুমাত্রিক আধুনিক শিল্পী', দ্র. *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ ১৩১

দিয়েছেন।[৩৬০] তবে যখন যে মাধ্যমেই এবং যে রীতিতেই কাজ করেন না কেন, পাশাপাশি বাস্তব রীতিচর্চাও তাঁর সঙ্গী ছিল বরাবর।

প্রথাবিরোধী এবং আধুনিক শিল্পদর্শন ও রীতি-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও, শিল্পী রশিদ চৌধুরীর শিল্পভাষা পরিণতি লাভ করেছে বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে। অন্য সব সমকালীন শিল্পীদের মতো তাঁর নিজস্ব শিল্পস্বকীয়তাও বিদেশ প্রত্যাগত হওয়ার পর থেকে স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু শুরু থেকেই রং-রেখার রূপবন্ধে বিষয় বা আকারের অর্ধ-বিমূর্তায়নের জন্য নিজের অস্তিত্ব আলাদাভাবে জানান দেন। মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমসাময়িকদের থেকে তিনি আলাদা। মাধ্যম হিসেবে প্রধানত বেছে নিয়েছেন ট্যাপেস্ট্রির মতো অপ্রচলিত ও সময়সাধ্য মাধ্যমকে। এ মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পের উৎকর্ষ তাঁকে এ দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীতে পরিণত করেছে। তবে তেলরং, জলরং, টেম্পেরা, গোয়াশ এমনকি ছাপচিত্রেও তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। মেজাজের ক্ষেত্রে তিনি পরাবাস্তববাদী। রোমান্টিক, স্বপ্নবিলাসী শিল্পী সব কিছুকে অতিরঞ্জন করে দেখতে চান। তাঁর ছবির উপাদান আমাদের সংস্কার, ভয়, বিশ্বাস। এগুলোকে অতিরঞ্জিত করে দেখতে তিনি ভালোবাসেন– ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্তি হিসেবে কুসংস্কার ও কল্পনায় আশ্রয় নিতে মানুষের যে সদা-প্রস্তুতি, তাকে আদর্শায়িত করাই রশীদ চৌধুরীর লক্ষ।[৩৬১] বিদেশ থেকে ফেরার পর পিয়েত মন্দ্রিয়ান, মার্ক শাগাল প্রমুখ ইউরোপীয় শিল্পীর প্রভাব তাঁর কাজে দেখা যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে বাংলার লোকায়ত বিষয়, ইউরোপীয় অনুষঙ্গে বাঙ্ময় হয়ে তাঁর শিল্পের নিজস্বতা দান করেছে। তবে অন্য শিল্পীদের মতো রশিদ চৌধুরী লোকশিল্পের দৃশ্যজ মোটিফ, আঙ্গিক বা প্রকৃতিকে বিশেষ ব্যবহার করেননি। তাঁর গ্রহণের ধরনটি অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ, রূপকাশ্রিত ও রূপান্তরিত।[৩৬২] তুলির আবেগী টানে রেখা ও রঙের রূপবন্ধে বিষয়বস্তুর নিরাভরণ উপস্থাপনই তাঁর মূল লক্ষ। তাঁর শিল্পকর্মে হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র, দেবদেবী, সরাচিত্র প্রভৃতি তথা বাংলার লোকজ অনুষঙ্গের নানা রূপের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপন লক্ষ করা যায় (চিত্র ৪৭)। ফলে তাঁর কাজ দেশজ, জীবনঘনিষ্ঠ এবং একই সঙ্গে আধুনিকও। শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, একজন শিল্প সংগঠক হিসেবেও তিনি স্মরণীয়। এ দেশের মানুষের জীবন-মানকে উন্নত করার জন্য শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো–

> শিল্পকলার শিক্ষা মানুষকে শিল্পী করে না, তাকে বিবেকসম্পন্ন সামাজিক দায়িত্ব বোধের অধিকারী স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ করে তোলে, শ্রমে আনন্দের সন্ধান দেয়, বেঁচে থাকা অর্থবহুল হয়ে ওঠে। তাই আমি বলতে চাই শিল্পের সংজ্ঞা বিদেশি কায়দায় শুধুমাত্র বিনোদন মাধ্যম নয়, বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরির জন্যেও নয়। এর প্রয়োজন বিবেকের জন্যে, জীবনের জন্যে। আমাদের জাতি গঠনের প্রকৃতি এবং নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিশু শিক্ষা থেকে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। নইলে শুধুমাত্র শ্রমমুখী সমাজে বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদন হয়তো

---

[৩৬০] নাসিমুল খবির, ‘প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সমকালীন ভাস্কর্য’, *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ ৩২

[৩৬১] মাহবুব জামাল জাহেদী, ‘সমকালীন চিত্রকলা’, *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, পৃ ৩৭

[৩৬২] আবুল মনসুর, *রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩৩

> বৃদ্ধি পাবে ঠিকই, কিন্তু তা পরে শ্রমদাসের সমাজে রূপান্তরিত হবে এবং এধরনের সমাজ মানুষের জন্য নাও হতে পারে।[৩৬৩]

তাই মানবিক বোধসম্পন্ন পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শিল্পী রশিদ চৌধুরীর উদ্যোগে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ স্থাপিত হয়,[৩৬৪] যা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের যে সকল শিল্পী দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতাকে সরাসরি ক্যানভাসে আঁকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, মুর্তজা বশীর তার মধ্যে অগ্রগণ্য নাম। তিনি মনোভঙ্গির দিক থেকে আধুনিক, কিন্তু দেশজ রীতির সঙ্গে সমন্বয়ের পক্ষপাতী। তাই তাঁর বহু কাজে মনোভঙ্গির আধুনিকতা স্নিগ্ধ এক আমেজ এনেছে দেশজ রীতির পথ ধরে।[৩৬৫] অন্য সবার মতো দৃশ্যমান বিষয়ের ত্রিমাত্রিক উপস্থাপন দিয়ে শুরু করলেও বিদেশ থেকে ফেরার পর ক্রমে ক্রমে দ্বিমাত্রিকতা ও বিমূর্ততা দখল করেছে তাঁর চিত্রপট। তবে পরিচিত পরিপার্শ্ব থেকে তাঁর অন্তর্ধান যেন ক্ষণিকের। বিমূর্ততার সে যাত্রা দ্রুত শেষে করে, বারবার ফিরেছেন পরিচিত বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনে। এমনকি চরম বিমূর্ত পর্যায়ের উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত *দেয়াল সিরিজ*ও (চিত্র ৪৮) বিমূর্ত আঙ্গিকে বাস্তব বস্তুর উপস্থাপন লক্ষণীয়। এখানে শিল্পী দেয়ালের আড়ালে নিজের অব্যাখ্যাত একাকিত্বের কথা বলেছেন। পটে অনুজ্জ্বল, মেটে, অন্ধকার রঙে প্রকাশ করেছেন সেই অস্পষ্ট সময়কে।[৩৬৬] বস্তুত এই *দেয়াল সিরিজ* মুর্তজা বশীরের শিল্পচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেখানে একই সাথে মূর্ত-বিমূর্ততাকে, বাস্তব-অবাস্তবতাকে, বস্তু ও নির্বস্তুকতাকে হয়তো শিল্পী উদ্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিংবা নিরেট দৃশ্য অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, যা আমাদেরকে নিয়ে যায় অদৃশ্য অবয়বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিতে।[৩৬৭] শুধু দেয়াল সিরিজের ক্ষেত্রে নয়, বরং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশ কাজেই এমন মূর্ত-বিমূর্ততারই সার্থক রূপায়ণ লক্ষণীয়। তিনি নিজে এ ধরনের কাজকে 'বিমূর্ত বাস্তববাদী' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৬৮] কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কখনো। তবে নারী চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। তাঁর কাজের আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো, ধর্মীয় বিষয়ের রূপায়ণ। দু-একজনের শিল্পকর্ম বাদে, এ দেশের সামগ্রিক শিল্পচরিত্র মোটামুটিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। সংবেদনশীলতা, আবেগ এবং অস্থিরতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গ। ফলে এক

---

[৩৬৩] রশিদ চৌধুরী, 'এ যুগে শিল্পকলার ব্যবহার', বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী '১২, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটালগে প্রকাশিত

[৩৬৪] ফয়েজুল আজিম, 'রশিদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রামে শিল্পান্দোলন', *শিল্পকলা*, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ ২৫-২৬; আবুল মনসুর, *রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ২৪

[৩৬৫] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'চিত্রকলার তিন বছর', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ৪২

[৩৬৬] M. H. Rashid, `Murtaja Baseer : The odyssey of a lonely soul', *Shilpakala*, Vol. 2, 1979, p. 25

[৩৬৭] ঢালী আল মামুন, 'চ. মুর্তজা বশীর', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩৬৯

[৩৬৮] তদেব, পৃ ৩৭০

মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে, এক রীতি থেকে অন্য রীতিতে তাঁর অস্থির পদচারণা লক্ষ করা যায়। শুধু চিত্রকলা নয়, একজন ছাপচিত্রী, ভিত্তিচিত্রী হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া সাহিত্য রচনা, গবেষণা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

'মধ্যবিত্ত মানসের শিল্পী' খ্যাত দেবদাস চক্রবর্তীর ক্যানভাস এ দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে মিলিয়েছে পশ্চিমের সাথে; কখনো অর্ধ-বিমূর্ত, কখনো বিমূর্ত আঙ্গিকে। শোকে, দুঃখে, বেদনায় আর বিদ্রোহে তাঁর ক্যানভাস ভাষা পেয়েছে এ দেশের জনজীবনকে ঘিরে। সেখানে তাঁর ছবি যেমন একাত্মতা প্রকাশ করেছে শোকে, তেমনই প্রতিবাদের ভাষাও জুগিয়েছে। যদিও তাঁর যাত্রা বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের দিকে, তবু তিনি নারী-পুরুষের অব্যাখ্যাত নানা সম্পর্কের অতি সরল উপস্থাপনও করেছেন চিত্রপটে খানিকটা স্বপ্নীল ভাবালুতায়। অপরদিকে নগরসভ্যতার বিষাদময়তায়, প্রকৃতি ও মানবতার অপমৃত্যুর দিকটিও তিনি দেখেছেন সযত্নে। আধুনিকতার নামে মূল্যবোধ বিবর্জিত পৃথিবীর রূপও তিনি প্রকাশ করেছেন শৈল্পিক নির্লিপ্ততায়। কুৎসিত, কদাকার কিংবা অদ্ভুতের প্রতি আধুনিক মেজাজের যে পক্ষপাতিত্ব, তার বদলে তাঁর ছবিতে কখনো দেখা মেলে সুন্দরের, বিষয়ের প্রতি তাঁর এই সাইকো-রোমান্টিকভঙ্গি তাঁর চেতনার দ্বৈততার দিকে ইঙ্গিত দেয়।[৩৬৯] আসলে বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্নতার ফলে শিল্পীর মনোজগতের অনুভূতি পরিবর্তনের তীক্ষ্ণ দ্বান্দ্বিক উপস্থাপন তাঁর শিল্প-মেজাজে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> তার উচ্চারণ চীৎকৃত বা প্রচণ্ড গতিময়তাপূর্ণ নয়, বরং তিনি নিজস্ব কষ্টে লীন একজন যন্ত্রণাদগ্ধ মনোগত জগতের অধিবাসী, শুধু অসহায় তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখেন এবং জ্বালা ও যন্ত্রণাময় সেইসব মুহূর্তের খণ্ড খণ্ড ছবি আঁকেন রং-এর বিচিত্র অনুষঙ্গে। মানুষের কষ্টের বিপরীতে, দুঃখের বিরুদ্ধস্রোতে তিনি অবগাহন করেন উজ্জ্বল রং-এর অলিন্দে, তার সঙ্গে থাকে আকারের যা নৈর্ব্যক্তিক, নির্বস্তুক আবার কখনো বা আধা-বিমূর্তের বাস্তবধর্মী গঠনের। বিষয়ের সারবস্তুকে অনুসন্ধান করার জন্যে শিল্পী ক্যানভাসের সারাটি ভূমি জুড়ে ছুটে বেড়ান আরাধ্য বস্তুকে নিজের অভিজ্ঞতার সংগে মেলাতে। তাই একটি রং অন্য আর একটি রং-এর সংগে, একটি আকার অন্য আর একটি আকারের সংগে সাবলীল মিলে মিশে যায়।[৩৭০]

রাজনীতি-সচেতনতা ও জীবনঘনিষ্ঠতা এবং রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্রবের ফলে তাঁর কাজের সমাজবাস্তবতা সমসাময়িকদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। তাঁর বিষয়বস্তু জীবনবোধে উৎসারিত এবং এ দেশের প্রকৃতি, মাটি, আলো, হাওয়ার নির্যাসটুকু থেকে গড়া। সমসাময়িকদের তুলনায় উচ্চকিত রঙের ব্যবহারও তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রংকে নির্দিষ্ট কোনো শক্ত অবয়ব বা আকৃতিতে সীমাবদ্ধ না করে তাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দিয়েছেন তাঁর শিল্পে। ফলে

---

[৩৬৯] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'চিত্রকলার তিন বছর', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ৪২

[৩৭০] রবিউল হুসাইন, 'দেবদাস চক্রবর্তী', দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ১২৩

প্রগাঢ় জীবনতৃষ্ণা, সামাজিক বঞ্চনা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তাঁর অন্তর্দহ আবেগ বলিষ্ঠ মাত্রা লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রতিনিধিত্বকারী দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী হয়েও কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রতলজুড়ে সবসময় স্নিগ্ধ, সরল বাংলাদেশের দৃপ্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অগ্রবর্তীদের দেশজতার সাথে সমকালীন পাশ্চাত্য আধুনিক অর্ধ-বিমূর্ত রীতির এক অপূর্ব সন্নিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। লোকায়ত বাংলার নকশিকাঁথা, কাঠ ও মাটির পুতুল, নকশি শিকা, নকশি পাখা, আলপনা, শাড়ির পাড়, নৌকার গলুই প্রভৃতির অলংকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরল রূপবন্ধ তাঁর চিত্রানুপ্রেরণার উৎস। অর্থপূর্ণ আকৃতিতে বাংলার নৈসার্গিক উপাদানের ব্যবহারও তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছে। তাঁর ছবিতে পারিপার্শ্বিকতা এবং প্রকৃতির অবয়বের উপস্থাপন তাঁর ব্যবহৃত রঙের মতোই গুরুত্ববাহী। ক্যানভাসে আধুনিক আঙ্গিকে এ দেশের পল্লী প্রকৃতিকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি। আঙ্গিকের সমস্যার চেয়ে সৌন্দর্য-চেতনা ও রঙের সুষম বিন্যাসই তাঁর প্রধান লক্ষ, অর্থাৎ ব্যাকরণগত রীতি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক, ধীর।[৩৭১] আবহমান বাংলার লৌকিক জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে নানা জ্যামিতিক আকারে ভেঙে দ্বিমাত্রিক তল তৈরি করে তাতে লোকজ অলংকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নকশা ও মোটিফকে আধুনিক আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে দৈনিক 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান লিখেছেন–

> ...দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময়ের শিল্প সাধনায় দেশের চারুকলার জগৎকেই সমৃদ্ধ করেননি, দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকেও রাঙিয়ে দিয়েছেন। জনরুচির নির্মাণে রেখেছেন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। ...সেখানে আমরা অভিভূত হয়ে দেখি লাল, নীল, সবুজ, হলুদের চোখজুড়ানো সন্নিবেশ। লতাপাতা, ফুল, পাখি, নৌকা, মাছ, তালপাতার পাখা, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুক চিরে বয়ে যাওয়া নদী, অবারিত আকাশ, বাংলার চিরশ্যামল প্রকৃতি। কবি জীবনানন্দ দাশ যেমন তাঁর পঙ্‌ক্তিমালায় তুলে এনেছেন রূপসী বাংলার প্রকৃতি, তেমনি করে রংতুলিতে বাংলার লাবণ্যমাধুরী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্লান্তভাবে তুলে ধরেছেন কাইয়ুম চৌধুরী।[৩৭২]

রূপসী বাংলার এই সৌন্দর্য-লালিত্য, ঐতিহ্য, দুর্যোগ-দুর্বিপাকসহ নানা ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপনে প্রথম দিকে যৌগিক পেলব রঙের ব্যবহার করলেও তাঁর শেষের দিকের কাজে মৌলিক ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। শুধু সুকুমার শিল্পেরই নয় বরং এ দেশের ব্যবহারিক শিল্পেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহারিক এবং চিত্রশিল্পের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে নকশা এবং কম্পোজিশনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ তাঁর ছবিতে স্থাপত্যসুলভ কাঠিন্য আরোপ করলেও এর পরিশীলিত ব্যবহার তাঁর ব্যবহারিক শিল্পের মানকে পৌঁছে দিয়েছে এক

---

[৩৭১] সন্তোষ গুপ্ত, 'কয়েকজন বিদ্রোহী শিল্পী ও শিল্প-চেতনা', *মাহে-নও*, ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৭, পৃ ১২৯-১৩০

[৩৭২] মতিউর রহমান, 'আমাদের কাইয়ুম ভাই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ নভেম্বর, ২০১৫, পৃ ৪

অনতিক্রম্য উচ্চতায়। সামগ্রিকভাবে ব্যবহারিক শিল্পের সাথে যোগাযোগ তাঁর শিল্পচর্চাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর নকশাকে করেছে নিরাভরণ, সরল এবং একই সঙ্গে গভীর অর্থপূর্ণ।

আব্দুল বাসেতের কাজ পরিমিতি বোধে উজ্জ্বল এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। সবসময় উচ্চকিত রঙের ব্যবহার পরিহার করে কোমল পেলব রং ব্যবহার করেছেন তিনি। শুরু থেকেই তাঁর শেকড় প্রোথিত ছিল গ্রামে। গ্রামের মানুষের যাপিত জীবনের নানা দিক তাঁর কাজের বিষয়বস্তু হয়েছে অধিকাংশ সময়। বিশেষত বাঙালি নারীজীবনের নানা ত্যাগ-তিতিক্ষা, আবেগ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেসব কাজে। প্রথম দিকে নিসর্গ এবং অবয়বকে ভেঙে রেখার জ্যামিতিক সৌন্দর্যে শিল্প গড়েছেন তিনি। এই ফিগারেটিভ বা অবয়বধর্মী ছবিতে কৌণিকভাবে ক্রমপ্রসারিত হওয়ার মধ্যে একটা ধীর লয় আছে। আর এই ধীরলয়ের কারণে ছবির মানুষের অভিব্যক্তিতে ক্লান্তি ও অবসাদের ইঙ্গিত লতিয়ে ওঠে।[৩৭৩] সে সময়কার কাজে ঘনকবাদ এবং প্রতিচ্ছায়াবাদের ছায়া স্পষ্ট। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এক যৌথ প্রদর্শনীর সমালোচনায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়–

> ...আব্দুল বাসেত মেজাজে ইম্প্রেশনিস্টিক। ফিগারেটিভ পেন্টিঙে, দেশী ঢংয়ে রঙের পরিমিত ব্যবহারে তিনি সফল। জ্যামিতিক রেখায় ছবি আঁকতে তিনি অধিক অভ্যস্ত। রংয়ের ওপর রং আরোপ ক'রে নতুনত্ব আনয়নে শিল্পী প্রয়াসী। শিল্পীর ছবিতে হৃদয়বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়।[৩৭৪]

কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্য সব বিদেশ-প্রত্যাগত শিল্পীর মতো ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফিরে তিনিও পা মেলান বিমূর্তরীতির চর্চাকারীদের দলে। এ পর্বে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছু মুছে রং, রেখা, আকৃতি এবং বুনট অদ্ভুত গীতিময়তা নিয়ে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশের ভাষা হয়ে ওঠে। তাঁর আকৃতিগুলো চেনা জ্যামিতির গণ্ডি ভেঙে একটি আরেকটির সাথে মিশে স্বতঃস্ফূর্ত এবং পরিশুদ্ধ নির্মাণের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এ পর্বেও রং পূর্বের মতো অনুচ্চ ও কোমল। তাঁর কাজ সম্পর্কে সমালোচক মাহমুদ আল জামান যথার্থই বলেছেন–

> বাসেতের ছবিতে কোন চমক নেই, আছে দীপ্তি যা চোখকে ধাঁধায় না, তৃপ্ত করে। মনকে তুষ্ট করে। তাঁর শিল্পাদর্শ এবং শিল্পদর্শন কেবলই সৌন্দর্যসৃষ্টি, যে-সৌন্দর্য আনন্দের উৎস বেদনারও উৎস।[৩৭৫]

তবে বিমূর্ততার পাশাপাশি শেষের দিকে তাঁর চিত্রজমিনে আবার পূর্বের গ্রাম্য জীবনের হৃদস্পন্দন ফিরে এসেছে। বস্তুত স্থান-কালের ভেদে প্রকাশভঙ্গির কিছু তারতম্য ঘটলেও মানুষের যাপিত জীবন এবং তার নানা অনুষঙ্গ তাঁর হৃদয়ে অন্তঃসলীলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল সবসময়।

---

[৩৭৩] মইনুদ্দীন খালেদ, 'কাজী আব্দুল বাসেত : রূপোস রূপবন্ধের শিল্পী', *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১০৫

[৩৭৪] ফখরুজ্জামান চৌধূরী, 'পূর্ব পাকিস্তানের চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ১৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬২, পৃ ৪৭

[৩৭৫] মাহমুদ আল জামান, *কাজী আবদুল বাসেত*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ ৩১

নিতুন কুন্ডু (১৯৩৫-২০০৬) প্রথম থেকেই ফর্মের দিকে ঝোঁকেন। প্রথমে মোটা বহিঃরেখায় বা কোথাও ছায়ামূর্তির (silhouette) আকারে মানবমূর্তিকে চিত্রপটে স্থান দিয়েছেন।[৩৭৬] তবে পঞ্চাশের অন্য তরুণ শিল্পীদের মতো বাস্তব ধারায় কাজ শুরু করলেও একপর্যায়ে তিনি বাংলা চিত্রকলার রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করেছেন এবং অন্যদিকে চিত্রকলার ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। আবার আমিনুল এবং তাঁর সহযোগীরা নির্বস্তুকতা ও বাস্তবতা মিলিয়ে যে ভাষা তৈরি করেছেন, সেদিকেও তিনি যাননি।[৩৭৭] রোমান্টিকতা নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিই যে আধুনিক শিল্পের প্রাণ, এই আত্মচেতনা নিতুন কুন্ডুকে নতুন ভাষা খুঁজে নিতে সাহায্য করেছে। তিনি রেখা ও রঙের বিন্যাসে স্বপ্ন, উৎসব এবং আবেগের তাৎপর্য ও গভীরতাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন (চিত্র ৪৯)। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো, 'একটি স্পেসে সময়কে ধরে রাখার চেষ্টা করি কতগুলো লাইন দিয়ে, রং দিয়ে।'[৩৭৮] তবে, বিমূর্ততার পাশাপাশি বাস্তববাদী ধারায়ও তিনি সমান সিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং এ দুই ধারায়ই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। চিত্রকলা ছাড়াও ছাপাই ছবি এবং ব্যবহারিক দ্রব্যসামগ্রী তৈরিতে তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও তাঁর প্রধান খ্যাতি মুক্তাঙ্গন ভাস্কর হিসেবে। বাংলাদেশের বৃহদাকার মুক্ত ভাস্কর্যচর্চার অত্যন্ত সীমিত গণ্ডিতে নিতুন কুন্ডু আঙ্গিক, শৈলী ও উপকরণের বৈচিত্র্যময় নিরীক্ষা ও প্রয়োগের দ্বারা এই ক্ষেত্রটিতে নান্দনিক অভিব্যক্তির এক নতুনতর মাত্রা যুক্ত করেছেন।[৩৭৯] এ ক্ষেত্রে *সার্ক ফোয়ারা*, *সাবাস বাংলাদেশ* এবং *সাম্পান* তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অনন্য নিদর্শন হয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে 'বিমূর্তশিল্প'র মতো সমকালীন আধুনিকতা এ দেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তার মতো আঘাত হেনেছিল। অগ্রজদের শিক্ষা, মূল্যবোধ তখন অতীত; সবাই ব্যস্ত আধুনিক হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টায়। কিন্তু সমকালের স্রোতে গা ভাসালেও সবার শিকড় প্রোথিত ছিল দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতায়। ফলে তাদের অধিকাংশের চিত্রপটে দৃশ্যমান জগতের এই চলে যাওয়া আর ফিরে ফিরে আসার দোলাচল স্পষ্ট। অতীত শিক্ষাই তাদের উৎরে যেতে সাহায্য করেছিল কালের পারানি নৌকোয়। সৈয়দ জাহাঙ্গীরও এর ব্যতিক্রম নন। শুরুতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে জলরঙে রোমান্টিক রীতির জনজীবন ও ভূ-দৃশ্য চর্চায় সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক জালালউদ্দীন আহমদের মতে 'ভ্রাম্যমাণ শিল্পী' জাহাঙ্গীর ঘুরে বেড়িয়ে বস্তুনিরপেক্ষ অ্যাবস্ট্রাক্ট স্টাডি থেকে শুরু করে জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের আনন্দমুখর ছবি, সবকিছু আঁকাতেই তাঁর আগ্রহ। এগুলোর মধ্যে তাঁর

---

[৩৭৬] বুলবন ওসমান, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত', *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ ২২

[৩৭৭] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'এই হচ্ছে নিতুন কুন্ডু', দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুন্ডু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, নিতুন কুন্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ ২৫

[৩৭৮] আশফাকুর রহমান গৃহীত নিতুন কুন্ডুর সাক্ষাৎকার, 'পেইন্টিং তো চিন্তার একটি ফসল – নিতুন কুন্ডু', দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুন্ডু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, নিতুন কুন্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ ২২৭

[৩৭৯] আবুল মনসুর, 'নিতুন কুন্ডুর তিনটি মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য', দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুন্ডু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, নিতুন কুন্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ ১০৫

স্বভাবজ প্রকৃতি ফুটে উঠেছে।[৩৮০] তবে একই সময় চোখে দেখার জগৎকে অস্বীকার করে আধুনিক হওয়ার প্রবণতাও তাঁর মধ্যে দৃশ্যমান। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে তাঁর একক প্রদর্শনী সম্পর্কে করা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য–

> ...এবারে কতকগুলো নতুন ছবি লক্ষ্য করলাম। দেখলেই মনে হয় হয় Experimental কাজ। এই ছবিগুলোতে শুধু রংয়ের প্রাধান্যই বেশী। চড়া রং দিয়ে বিষয় বস্তুর Expression দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য মনে হয়। ...নিজের ঐতিহ্য (...) নিয়ে খুব বেশী রকম গোঁড়া না হয়ে বরং শিল্পে আন্তর্জাতিক অগ্রতির সমর্থন করে নিজের ছবিকে কোন এক বিশেষ নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন জাহাঙ্গীর।[৩৮১]

এখান থেকে ধীরে ধীরে তাঁর যাত্রা জলরং থেকে তেলরঙের এবং মূর্ততা থেকে বিমূর্ততায় ক্রমান্বয়ে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তাঁর ক্যানভাস। পরবর্তী পর্যায়গুলো থেকে তাঁর চিত্রভাবনা হয়ে উঠেছে অনেকের চেয়ে বেশি দর্শনতাড়িত, জীবন ও জগতের বিষয়ে প্রশ্ন-ব্যাকুল। মহাবিশ্বের অজানা রহস্যময়তা তিনি ক্যানভাসে বিধৃত করতে চেয়েছেন উজ্জ্বল জাঁকোলো বর্ণে আকাশ, দিগন্ত ইত্যাদির আভাসদায়ী ফর্ম অথবা সূর্যাস্তের বর্ণবিভা ও নয়নহর আলোকচ্ছটার ইশারাময় উপস্থাপনে।[৩৮২] এ সময় বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁর রোমান্টিক কল্পনায় বিমূর্ত উপস্থাপনরীতিতে আরও প্রাণবন্ত এবং কাব্যিক হয়ে উঠেছে। তবে খানিকটা অস্পটতা থাকলেও তাঁর শিল্পকর্মের একটি ধারাবাহিকতা আছে। আছে নিজস্বতাও। এই নিজস্বতাকে শনাক্ত করা যায় তাঁর রং ব্যবহারের উদ্দামতা এবং একই সঙ্গে পরিমিতিবোধের মধ্যে।[৩৮৩] বর্তমানে অর্ধ-বিমূর্ত ভঙ্গিতে বিষয়ের অবয়বী উপস্থাপন তাঁর চিত্রজমিনকে ঋদ্ধ করছে।

শাহতাব (১৯৩৬-?) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আর্ট স্কুল থেকে পাস করেন এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পী হিসেব ষাটের দশকের শুরুতেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। চারপাশের পরিবেশ থেকেই বিষয়বস্তু উদ্ভূত হলেও খানিকটা সরল জ্যামিতিক বিন্যাসে তিনি পরিচিত অবয়বের নিজস্বতাকে ভেঙে নতুন রূপের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। বিষয়ের অন্তর্নিহিত গঠন বা মৌলিক কাঠামোতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। শাহতাবের ছবিগুলোর প্রাথমিক গুণ হলো এদের সরলতা। অনাবশ্যক জটিলতা দ্বারা ছবিগুলি ভারাক্রান্ত নয়। অঙ্কন-রীতিতে অভিনবত্ব আনয়ন করার জন্যে ফর্ম ভেঙেছেন, কিন্তু সে ভাঙাটা যথেচ্ছাচার বলে মনে হয় না।[৩৮৪] সহজ-সরল উপজীব্যের স্নিগ্ধতা এবং মৃদু কমনীয়তা বজায় থাকলেও খানিকটা নিরাশাও লক্ষণীয় তাঁর কাজে।

---

[৩৮০] জালালউদ্দীন আহমদ, ' চিত্রকলা : তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠী', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬২, পৃ ১১৯

[৩৮১] এনায়েত আলম, 'চট্টগ্রামে জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী', *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, পৃ ৩০৫

[৩৮২] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩৯

[৩৮৩] আল মাহমুদ, 'সৈয়দ জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী', *সমকাল*, ২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃ ৮২

[৩৮৪] ফখরুজ্জামান চৌধুরী, 'সাম্প্রতিক চিত্রপ্রদর্শনী', *মাহে-নও*, ১৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩, পৃ ৪৬

শামসুল ইসলাম নিজামী (?) চিত্রশিল্প এবং মৃৎশিল্প দুই ধারায়ই কাজ করেছেন। সঙ্গে শৌখিন মেজাজে কিছু ভাস্কর্যও গড়েছেন। শুরুর দিকের কাজে জ্যামিতিক বিন্যাসযুক্ত অবয়বধর্মিতা থাকলেও আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ বিমূর্ত রীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। বুনট এবং রঙের বিন্যাস তাঁর বিষয়বস্তু এবং রং সেখানে স্বাধীনভাবে পরিব্যাপ্ত। তাঁর কিছু কাজে ধর্মীয়চেতনা ও আরবি ক্যালিগ্রাফির প্রভাব লক্ষণীয়।[৩৮৫] মৃৎশিল্পে যে গুটিকয় কাজ তিনি করেছেন, তাতে নান্দনিকতা, উপযোগিতা এবং আধুনিকতার সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

কাজী আব্দুর রউফ (?) এ দেশের পরিচিত মনোলোভা নিসর্গের ছবি এঁকেছেন কিছুটা পশ্চিমী অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে। চেনা পরিচিতকে আঁকার ভেতর দিয়ে তিনি এমন এক আমেজ তৈরি করেন, যেখানে ঘরোয়া শান্তি আছে। তাঁর আধা জ্যামিতিক কাজেও উঁকি দেয় সারল্যের সেই শক্তি, চেনা পরিচিত বস্তুমালাতে যে-শক্তি স্নিগ্ধ লালিত্যের আভাস দেয়।[৩৮৬] তিনি মোটা রেখায় বক্তব্যকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যা দারুণ রকমের দৃষ্টিসুখকর না হলেও তার স্নিগ্ধ আবেদনকে সহজে অগ্রাহ্য করা কঠিন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি যৌথ প্রদর্শনীর সমালোচনায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়, 'কাজী আব্দুর রউফ পরিবেশ-ভিত্তিক শিল্পী। তিনি তাঁর ছবির উপজীব্য বেছে নেন আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে। হালকা রং ব্যবহারে শিল্পীর সহজ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ করা যায়।'[৩৮৭]

আবার সৈয়দ শফিকুল হোসেন (১৯২৭-?) ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করে জ্যামিতিক আকৃতিযুক্ত অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে বাংলার গ্রামীণ জীবনচিত্রকে ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন। জুনাবুল ইসলাম (১৯২৯-১৯৯৭) কারুশিল্প শ্রেণীভুক্ত বাটিক শিল্পকে চারুশিল্পের আওতাভুক্ত করে এর অ্যাকাডেমিক চর্চার পথ সুগম করেন। এ মাধ্যমে করা তাঁর কিছু কাজ চিত্রশিল্পের সমান মর্যাদার দাবিদার। মীর মোস্তাফা আলী (১৯৩২-২০১৭) এ দেশে মৃৎশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার পথ সুগম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মোস্তফা মনোয়ার (১৯৩৫) পাপেট এবং টেলিভিশনের নানা প্রায়োগিক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ ছাড়া ইমদাদ হোসেন (?), শুজা হায়দার (?), হোসেন জামাল (?) প্রমুখ শিল্পীও এ দেশের শিল্পে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

আমাদের শিল্প-ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম বলে স্বীকৃত এই শিল্পীরা তাঁদের কর্মকুশলতা এবং সৃজনদক্ষতায় পুরো ষাটের দশকেই নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হন। এ প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ দু-একজনব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশেরই ষাটের দশকের শিল্পকর্মে বিমূর্ততাই প্রধান আঙ্গিক হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের শেষ থেকে ষাটের পুরো দশক জুড়ে পাকিস্তানের

[৩৮৫] নজরুল ইসলাম, 'শামসুল ইসলাম নিজামীর শিল্পকর্ম', *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ ১৬৫

[৩৮৬] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'চিত্রকলার তিন বছর', *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ৪২

[৩৮৭] ফখরুজ্জামান চৌধুরী, 'পূর্ব পাকিস্তানের চিত্রকলা', *মাহে-নও*, ১৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬২, পৃ ৪৭

রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে থাকলেও এ দশকের সৃজনশীল শিল্পে সেসবের প্রভাব অনুভূত হয় না। কারণ এ সময়ে শিল্প একটি এলিট-পৃষ্ঠপোষিত ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা বৃহত্তর জনজীবনের প্রাণস্পন্দনকে ধারণ করতে পারেনি।[১৮৮] সমাজ সচেতনতা কিংবা বিষয় বা বক্তব্যনির্ভরতার পরিবর্তে প্রধানত রং, রেখা ও বুনটের মাধ্যমগত উৎকর্ষের চরমে উপনীত হওয়া এবং এর মাধ্যমে দৃষ্টি সুখকর বিন্যাস তৈরিই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তিক অনুভূতি বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে স্নিগ্ধ চিত্রতল উপস্থাপনই যেন তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এর সাথে যোগ হয় ষাটের দশকে আবির্ভূত অজ্ঞাত[১৮৯] (তৃতীয়) প্রজন্মের কর্মতৎপরতা। প্রথম দিকে সবাই বাস্তবানুগ সৃজনধর্মী রচনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ ইউরোপীয় রীতির শিক্ষার সাথে লোকশিল্পের বিন্যাস, আঙ্গিক এবং রূপবন্ধ সংযোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ একটি আঙ্গিক উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ফলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তখনকার প্রধান আঙ্গিক পঞ্চাশের বিমূর্ত রীতির একঘেয়েমির পরিবর্তে নতুনদের বিষয়বস্তু চয়ন, উপস্থাপন এবং আঙ্গিকগত ভিন্নতা কিছুটা বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। কিন্তু ভীষণ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরাও মূলস্রোতের সাথে যুক্ত হয়ে বিমূর্ত বা অর্ধ-বিমূর্ত রীতি-আশ্রয়ী হয়ে পড়েন।

ষাটের দশকের শিল্পীদের মধ্যে প্রথমে মনোযোগ দাবি করেন আবু তাহের (১৯৩৬)। শুরুর দিকে প্রতিচ্ছায়াবাদী ধারায় বাস্তবের উপস্থাপনধর্মী বিষয়বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। বিষয় হিসেবে আংশিক অনাবৃত নারীদেহ এবং নিসর্গ লক্ষণীয়। এরপর সম-বিমূর্ত ধারায় বিষয়ের জ্যামিতিক বিন্যাসযুক্ত উপস্থাপন দখল করে তাঁর চিত্রতল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে যাত্রা বিশুদ্ধ বিমূর্ততার দিকে। তবে শুরু থেকেই তাঁর চিত্রতল ভারী হয়ে উঠেছে পুরু করে লাগানো বর্ণ প্রলেপে। কিবরিয়া কিংবা আবদুল বাসেতের চিত্রতলের যে পরিকল্পিত ও সংগঠিত কাঠামো দেখা যায়, তাহেরের কাজে তা অনুপস্থিত। আবু তাহেরের ছবিতে উষ্ণতার ছাপটা অধিকমাত্রায়। রং ও আকারের গাদাগাদি ঠাঁসবুনুনি রয়েছে তাই স্বভাবত চিত্রপটে শূন্যতল বা অবকাশ কম, ফর্ম-এর মুভমেন্ট বা প্রয়োগগত পরিবর্তন এনে অথবা ফর্ম-এর আকার বা নক্‌শার বৈচিত্র্যে তিনি এই অবকাশ সৃষ্টি করেন।[১৯০] কখনো কখনো এলোমেলো রং বা আকৃতির ব্যবহার আলাদাভাবে স্পেসকে অপরিসর ঘিঞ্জি করে তুলছে বলে মনে হলেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে তা তাৎক্ষণিক অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ এবং সুসংহত বিন্যাস বলেই মনে হয়। বিমূর্ততার যাত্রায় পরিসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বিস্ফোরিত বিক্ষিপ্ত রং, রেখা ও বুনটের সংবেদনশীল উপস্থাপন তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছে। মৌলিক ও উজ্জ্বল বর্ণের প্রতি তাঁর দুর্বলতা এবং কালো বা কালচে রঙের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাজে।

---

[১৮৮] আবুল মনসুর, 'বাংলাদেশের চিত্র-ভাস্কর্য : একটি অবলোকন', *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ ১১৮

[১৮৯] ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের কারণে অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিক শিল্প উদ্যোগ যেহেতু কমছিল ফলে এ দশকের অধিকাংশ শিল্পীরই প্রকৃত কর্মতৎপরতা শুরু এবং খ্যাতিলাভ করেছেন সত্তরের দশকে। তাই এই শিল্পীদের অজ্ঞাত প্রজন্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[১৯০] মতলুব আলী, 'আবু তাহের-এর অর্জন', দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আবু তাহের*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ ২৫

সমরজিৎ রায় চৌধুরী (১৯৩৭) মেজাজের দিক থেকে রোমান্টিক শিল্পী। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক হলেও তাঁর নিজস্ব শিল্প সৌকর্যে আবির্ভাব আশির দশকে। মাধ্যম হিসেবে তেলরং, জলরং, গোয়াশ, অ্যাক্রেলিকসহ মিশ্র মাধ্যমেও কাজ করেছেন তিনি। প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী গ্রামীণ এবং নাগরিক দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন খানিকটা কিউবিক ধারায়। তবে পরিণত পর্বে সাদৃশ্যধর্মিতার পরিবর্তে ছোট ছোট ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজের সমন্বয়ে চিত্রতলকে ভেঙে বিষয়ের আভাস দিয়েছেন তিনি। তবে বিষয়বস্তু তাঁর কাছে মুখ্য নয়, ছবির বিন্যাস ও আঙ্গিকই মুখ্য।[৩৯১] আর আঙ্গিক তৈরির জন্য বিভিন্ন লোকজ বিষয়বস্তু বা তার মোটিফ, সুঁইয়ের ফোঁড়ের মতো ভাঙা ভাঙা রেখা, পাখি, ঘুড়ি, মাছ, ত্রিভুজ আকৃতির রঙিন নিশান আবার কখনো কখনো ওপর থেকে দেখা আইল দিয়ে বিভক্ত হওয়া মাঠের আদল তাঁর চিত্রতলকে সংহত করেছে। তবে শুরু থেকে উত্তরণের রাস্তায় নিজের আঙ্গিক প্রয়োজনমতো বদলে নিলেও কখনো নিজের দেশ ও সংস্কৃতির উপস্থাপন থেকে বিচ্যুত হয়নি তাঁর তুলি; বরং তা মৃত্তিকালগ্নই থেকেছে সবসময়। প্রথম দিকে মিশ্র ও হালকা রঙের ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে উজ্জ্বল ও মৌলিক রঙের ব্যবহার করেছেন। দক্ষ নকশাকার হিসেবে বাণিজ্যকলার সাথে দীর্ঘদিন জড়িত থাকার সুবাদে তাঁর কাজে বিষয়বস্তুর উপাদানের সমাবেশ এবং সন্নিবেশ বেশ সুগঠিত।

একটি কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, এ দেশের সকল শিশু হাশেম খান (১৯৪১)-এর দেখানো প্রকৃতি ও তার রূপ-বৈচিত্র্য দেখেই বাংলাদেশকে চিনতে শেখে। শিশুপাঠ্য অলংকরণে তাঁর সার্থকতা এতটাই। অলংকরণ ছাড়া তেল ও জলরঙেও দক্ষ এবং দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পী তিনি। শুরুতে গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র এবং শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প রচনা করেছেন অনন্য সংবেদনশীলতায়। যেন বাংলার রূপ, রস, রং, মাটির গন্ধ লেগে থাকে তাঁর কাজে। এভাবে মৃত্তিকালগ্ন থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা জ্যামিতিক বিন্যাসযুক্ত অর্ধ-বিমূর্ত রীতিতে প্রবেশ করেছেন তিনি। সেখানেও ভারী করে লাগানো রং, প্রাণী, মানুষ ও বস্তুর অবয়বধর্মী অর্থপূর্ণ আকৃতির ব্যবহার দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে। এ প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক আবুল মনসুর বলেছেন–

> কিছুটা জ্যামিতিক ও প্রকাশবাদী বিমূর্ত বিন্যাসের মধ্যে হাশেম খান স্থাপন করেন তাঁর প্রিয় প্রতীকসমূহ– থালা, মাছ, শ্রমজীবী মানুষ এবং পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে কাক। পক্ষবিস্তারী কাক অথবা পাখি তাঁর ছবিতে একটি প্রবল উপস্থিতি হিসেবে নিজস্ব চিহ্নে পরিণত হয়েছে।[৩৯২]

---

[৩৯১] নজরুল ইসলাম, 'সমরজিৎ রায় চৌধুরী : তাঁর পরিবর্তনশীল আঙ্গিক', *শিল্প ও শিল্পী*, http://www.shilpaoshilpi.com/সমরজিৎ-রায়-চৌধুরী-তাঁর-পর/ , প্রেক্ষিত ০৯-১২-২০১৫ খ্রি.

[৩৯২] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৪১

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ছবি উৎসবমুখর হলেও সমাজ সচেতন ও রাজনীতিঘনিষ্ঠ এ শিল্পীর চিত্রতলে জাতীয় দুর্যোগ ও সংকটের ছায়াও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য কখনো কখনো বাংলা বর্ণমালা, বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান ও বক্তব্যকে কিংবা দেশাত্মবোধক গান বা কবিতার লাইন ইত্যাদি যোগ করেছেন তাঁর ক্যানভাসে। উজ্জ্বল ও মৌলিক রঙের ব্যবহারও তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। 'শিল্পী হাশেম খান মূলত রঙের শিল্পী – ফর্ম তাঁর কাছে রঙের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। হাশেম খানের রং উজ্জ্বল তীব্র এবং মোটা স্ট্রোকে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে ধাবিত। রঙের মধ্য দিয়ে তাঁর মিতবাক-সত্তার বিকাশ ঘটে।'[৩৯৩]

এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে রফিকুন নবী (১৯৪৩) এক বহুমাত্রিক চরিত্র। ড্রইং, জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, উডকাট, এমনকি ব্যঙ্গচিত্র এবং প্রায়োগিক শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমেও তিনি নিজের মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। ষাটের দশকে ছাত্রাবস্থায়ই জলরং এবং বাস্তবধর্মী শিল্পে দক্ষতার জন্য কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন তিনি।[৩৯৪] শুরু থেকেই আবহমান বাংলার সাধারণ লোকজ জীবনের নানা অনুষঙ্গ নদী, নিসর্গ ও সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামকে খানিকটা জ্যামিতিক বিন্যাসে তুলে ধরেছেন তিনি। তবে সুচারু জ্যামিতিকতা ও পরিপাটি রূপবন্ধ তাঁর পছন্দ নয় বরং, তিনি তাঁর চিত্রপটকে গড়ে তোলেন নানান রেখার আঁকিবুঁকি এবং আঁচড় ও ছোপের সহযোগে।[৩৯৫] একধরনের বাস্তবানুগ সাবলীল রূপবন্ধ চরম মানবিকতাকে আশ্রয় করে তাঁর চিত্রজমিনকে রসোত্তীর্ণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেও বলেছেন, 'চেনা জিনিসকে আমি একেবারে ওলটপালট করে সেমি-অ্যাবস্ট্রাকশনে আনি না। আনার সাহসও করি না। ভেঙেচুরে, ফর্ম আলাদা করে অ্যাবস্ট্রাকশনে যাই না। ...একসময় অবশ্য প্রায় সেমি-অ্যাবস্ট্রাকশনে গিয়েছিলাম প্রিন্টের কিছু কাজে। তারপর আবার রিটার্ন।'[৩৯৬] মাঝে মাঝে কিছু বিমূর্ত রীতির চর্চা করলেও সামাজিক অঙ্গীকারের চেতনায় স্পন্দিত এই শিল্পীর শিল্পকর্মে সর্বদা এ দেশের সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন, তাদের সংগ্রাম সর্বোপরি দেশ, মাটি ও মানুষের অধিকার, মর্মবেদনা বিষয়বস্তু হিসেবে থেকেছে (চিত্র ৫০)। তবে যে রীতি বা মাধ্যমেই শিল্প রচনা করেন না কেন, রেখার ক্ষিপ্রতা, বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তাই সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা বাস্তবতা থেকেই উৎসারিত। রং ব্যহারের ক্ষেত্রে কোমল ও শীতল বা বিষণ্ন রঙের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গচরিত্র 'টোকাই' এক অসামান্য জনপ্রিয় চরিত্র। তা ছাড়া ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে বিষয়বস্তু ও করণকৌশলের ভিন্নমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠ খোদাইকেও উচ্চ-মর্যাদায় আসীন করেছেন। সর্বোপরি সাধনা, দক্ষতা ও নিরলস

---

[৩৯৩] রনি আহম্মেদ, 'রঙের উৎসবে রং', *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৫, পৃ ৮৩-৮৪

[৩৯৪] 'শিল্পকলা', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪র্থ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৪ মে '৭৬, পৃ ৪৩

[৩৯৫] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৪১-৪২

[৩৯৬] রশিদ আমিন, 'রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার', *শিল্প ও শিল্পী*, http://www.shilpaoshilpi.com/রফিকুন-নবীর-সাক্ষাৎকার/ , প্রেক্ষিত, ১১-১২-২০১৫ খ্রি.

পরিশ্রম, সংবেদনশীলতা, সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা এবং নান্দনিক বোধের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ে আমাদের শিল্পে তাঁর নিজস্ব জগৎ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি।

ষাটের দশকজুড়ে মূলত চিত্রকলার চর্চাই হয়েছে এবং শিল্প রচনার মাধ্যম হিসেবে প্রধানত তেলরং এবং জলরঙই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শিল্পী আনোয়ার জাহান (১৯৪০-৯৩) এই দশকে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চিত্রকলার ছাত্র হলেও ভাস্কর্য বিষয়ে আগ্রহের ফলে দশকের প্রথম দিকে কিছু ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। তাঁর অধিকাংশ কাজই অবয়বধর্মী এবং খানিকটা নিজস্ব রীতিতে খোদিত। ভাস্কর্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব অনুপুঙ্খ নয় এবং তাতে আদিম ভাস্কর্যের গুণাগুণ স্পষ্ট। মানবজীবনের দুঃখবেদনার নানা দিক তাঁর কাজে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাঠ খোদাই মাধ্যমে রচিত *জলোচ্ছ্বাস* শিরোনামের দুর্যোগে ভেসে যাওয়া মা ও শিশুর আবেগঘন রিলিফ ভাস্কর্যটির কথা, যা ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই তিনি রচনা করেন।[৩৯৭] প্রধানত কাঠ খোদাই মাধ্যমে ভাস্কর্য নির্মাণ করলেও পোড়া কাঠ, লোহা, ধাতু, সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করেও ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন তিনি।

এ প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুল মুকতাদির (১৯৩৬), গোলাম সারোয়ার (১৯৪০-১৯৯৫), প্রাণেশ কুমার মন্ডল (১৯৪১), মোহাম্মদ মোহসীন (১৯৪০), আনোয়ারুল হক পিয়ারু (১৯৪১), আব্দুল মতিন (?) প্রমুখ। ষাটের দশকে আরও অনেক তরুণ শিল্পী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেও তাদের অল্প কয়েকজনই মাত্র নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিলেন এ দশকে। তবে অন্যদের সৃজন সৌকর্য পরিশীলিত হয়ে ওঠে সত্তরের দশকে। মূলত ষাটের দশক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দশকের মতো ফলদায়ক নয়। কারণ দশকের প্রায় শুরু থেকে পুরোটা সময় এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছিল। সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাও এ সময় কার্যত স্তব্ধ থেকেছেন। ফলে নতুন দেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উজ্জীবন সূচিত হয়েছিল পূর্বের দশকে, তা ষাটের দশকে এসে বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যে সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে–

> ষাটের দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক পটভূমি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, দেশের চিত্রকলা আন্দোলনেও নেমে এলো ভাটা। প্রদর্শনীর আর তেমন চাড়া নেই, বিদেশ যাত্রার বৃত্তিরও অভাব। তাই কেমন এক শিথিলতা, কুণ্ডয়ন, কেমন এক পলায়নী মনোভাব শোনিত প্রবাহের দ্রুত ধারাকে মন্থর করে তুললো।
>
> ১৯৬৮ সালের পর থেকে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু আর প্রদর্শনী ঘরগুলোকে সরব করে তুলতে সক্ষম হলোনা। একদা যাঁরা তুখোড় সৃষ্টিশীল ছিলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় তাঁরাও পড়লেন

[৩৯৭] নাসিমুল খবির, 'প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সমকালীন ভাস্কর্য', *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ ৩০

> ঝিমিয়ে। চিত্রকলা জগতের পরবর্তী যবনিকা উত্তোলিত হলো ১৯৭২ সালের পর পরেই, যখন পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশের নামে নতুন চেহারা নিয়েছে।[৩৯৮]

মাত্র কয়েক বছর আগে সৃষ্টি হওয়া 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র নিয়ে আনন্দের প্রহর খুব দ্রুতই শেষ হয়ে আসে বাঙালির জীবনে। সর্বস্তরে ইসলামি আদর্শে জীবন গঠনের লক্ষ্যে অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইসলামি হয়ে ওঠার যে ঘোর আদর্শ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে মরিয়া ছিলেন মুসলমান নেতারা, কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই ঘোর কেটে যায়। উন্মোচিত হয় পাকিস্তানের গণবিরোধী প্রতারক চরিত্র এবং নেতারাও বুঝতে সমর্থ হন যে, আজাদ পাকিস্তানে মুক্তির নামে নতুন উপনিবেশের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন তারা। কারণ, শুরু থেকেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব চলে যায় অবাঙালি সামন্তশ্রেণির হাতে। এমনকি সরকারি আমলাতন্ত্রও গঠিত হয়েছিল তাদের নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের আমলারাও ছিলেন অবাঙালি। ফলে সার্বিকভাবে এই অবাঙালি সামন্তশ্রেণির শাসনে পূর্ব অংশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের জন্য কোনো দায় এবং মমত্ব ছিল না। তার প্রথম নমুনা প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। অনান্য প্রাকৃতিক কারণের সাথে শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতাও এ জন্য দায়ী ছিল। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার সতর্ক করার পরও সরকার খাদ্যঘাটতি নিরসনের কোনো চেষ্টাই করেনি। সরকার উদ্যোগী হলে হয়তো দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করা যেত।[৩৯৯] এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই আঞ্চলিক বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল দুই পাকিস্তানের মধ্যে। বিভেদ স্পষ্ট হয় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এবং তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পাকিস্তানি ডাকটিকিট ও মুদ্রাতে বাংলা না লেখার মাধ্যমে। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম হরতাল পালিত হয় সচিবালয়ের কর্মচারীদের ডাকে।[৪০০] সম্ভবত এই হরতালের মাধ্যমেই পাকিস্তান বিলুপ্তির প্রথম বীজ রোপিত হয়েছিল। এরপর আসে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চে জিন্নাহর সেই উদ্ধত ঘোষণা, 'এ কথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।'[৪০১] যার ফলে বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবিতে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি এই ক্ষোভ ও প্রতিবাদের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লিগের অধিবেশন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রদত্ত পল্টনের জনসভার বক্তব্য। সে জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র

---

[৩৯৮] সাঈদ আহমদ, 'বাংলাদেশের চিত্রকলা', *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ ৯১

[৩৯৯] বদরুদ্দীন উমর, 'পর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসনের প্রথম অধ্যায়', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮০, পৃ ২০

[৪০০] বদিউল আলম মজুমদার, 'হরতাল নয়, প্রয়োজন সংলাপ ও সমঝোতা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ২০১৫, পৃ ১১

[৪০১] মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯,পৃ ১৫

উর্দু;[৪০২] যা সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিদ্রোহে উত্তাল করেছিল এবং এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ঘটেছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির শোকাবহ ঘটনা। ফলে এই আন্দোলন শুধু ভাষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বাঙালির আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির উৎসমুখ বলে বিবেচিত হয়েছে। মূলত এই ভাষা আন্দোলনই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের বিদ্রোহের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। এরপর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন, ৫৬'র শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর মোনেম খানকে কালো পতাকা প্রদর্শন প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে বৈরিতা আরও প্রকাশ্য এবং বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে ওঠে।[৪০৩] শুরু থেকেই আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র ও আঞ্চলিক বিভেদ-নীতির কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে পর্যুদস্ত বাঙালি মুসলমান ধীরে ধীরে চরমভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, শুধু ধর্মের খাতিরে দুটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জনগোষ্ঠী একত্রে থাকতে পারে না। তারা এ-ও বুঝতে সক্ষম হয়, আগে তারা বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তারপর মুসলমান। বস্তুত এ সময় চরম পাকিস্তানবিরোধী মনোভাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উত্থান সূচিত হয় এবং এ দেশের বঞ্চিত মুসলমান মানসে শোষকের বিরুদ্ধে জমা হতে থাকে ক্ষোভ। এরই চরম বহিঃপ্রকাশ বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান এবং সবশেষে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম। ৪৭'র প্রথম হরতাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত সব কিছু একসূত্রে গাঁথা। আর এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তখনকার তরুণ প্রজন্ম। সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি এবং সমাজনীতি সম্পর্কে সমূহ সচেতনতা, বিশেষত মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত এই তরুণ প্রজন্ম দর্শনগতভাবে ধর্মের ভিত্তিতে জন্মানো পাকিস্তানের আস্তিত্বের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এর সাথে যোগ হয় রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও বৈষম্য, যা তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক অসাম্প্রদায়িক ভূখণ্ড গঠনে উজ্জীবিত করে। সাথে তারা লাভ করে সর্বস্তরের, সকল প্রজন্মের বাঙালির সমর্থন। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সেই জাগরণে সমাজের অগ্রসর, মুক্তবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং সংবেদনশীল অংশ হিসেবে আমাদের তরুণ শিল্পীরাও ব্যাপকভাবে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গঠন করেন 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল আন্দোলনে পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার, স্মরণিকার প্রচ্ছদ প্রভৃতি করার যে অলিখিত দায়িত্ব শিল্পীরা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, ১৯৬৮'র একুশে ফেব্রুয়ারিতে তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় শহীদ মিনারসহ শহরের রাজপথে আলপনা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে।[৪০৪] সেদিন বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ আলপনার পুনঃপ্রচলন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালির চেতনায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এর

---

[৪০২] বদরুদ্দীন উমর, 'পর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসনের প্রথম অধ্যায়', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮০, পৃ ২৩; ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, পৃ ৬৪

[৪০৩] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, পৃ ৪৪-১৩০

[৪০৪] অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক্ আলভী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার; কিন্তু শিল্পী হাশেম খান (*জয়নুল আবেদিনের সারাজীবন*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৩, পৃ ৫৯) এই সময়কালকে ১৯৬৭'র ২১ ফেব্রুয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন।

পরের বছর চিত্রশিল্পীরা শুধু আলপনা অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং বিশাল বিশাল ক্যানভাসে ছবি এঁকে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করেছিলেন শহীদ মিনারে। তাঁরা চিত্রকলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন বঞ্চনা ও স্বৈরাচারী শাসকের নিপীড়নের চিত্র। তাঁরা শুনিয়ে ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, অসাম্প্রদায়িক বোধ ও মানবিক অধিকারের কথা। প্রকৃতপক্ষে এ সময় শিল্পীরা শিল্পের একটি ধারাকে বা এর ব্যবহারিক দিকটিকে গণমানুষের বোধের সমান্তরালে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রভূত সমর্থনও লাভ করেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, ষাটের দশকে নিখাদ শিল্পচর্চায় শিল্পীরা দেশের মর্মমূল স্পর্শ করতে সর্বদা সক্ষম না হলেও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে তাঁদের প্রতিভা স্ফূরণের একটি বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।[৪০৫] এ ছাড়া ১৯৭১-এর ২৩ মার্চ 'স্বা' 'ধী' 'ন' 'তা' লেখা চার অক্ষরের চারটি প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা ঢাকায় মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে এবং ইয়াহিয়াবিরোধী পোস্টার-ফেস্টুনে সুসজ্জিত হয়ে মিছিল করেছিলেন।[৪০৬] ভয়াবহ ২৫ মার্চের আগে স্বাধীনতার মতো স্পর্শকারতর শব্দ আর কোনো মহল থেকেই এতটা প্রকাশ্যে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। এভাবে পুরো ষাটের দশকজুড়ে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শিল্পীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত শিল্পীদের নানা প্রতিবাদমূলক কর্মকাণ্ড এ দেশের মানুষের জাগরণ এবং অধিকার আদায়ের স্পৃহাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে শুধু জনগণের প্রত্যশাকে জাগ্রত এবং পরিচালিত করার মধ্যেই সীমিত থাকেনি শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের আন্দোলন। সংখ্যায় কম হলেও রং-তুলি সরিয়ে রেখে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়েও পড়েছিলেন তরুণ শিল্পীরা। এ ছাড়া রণাঙ্গনে নানাভাবে প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়েও সাহায্য করেছেন অনেকে। কেউ কেউ বিদেশে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্য করা, যোদ্ধাদের শুশ্রূষা ও উদ্দীপ্ত করা, তহবিল সংগ্রহ এবং বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণে রত ছিলেন। আবার প্রবাসী সরকারের প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তরের হয়ে (শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে) কাজ করেও শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধে রেখেছিলেন অনন্য ভূমিকা।

ষাটের দশকের এই তীব্র আন্দোলন সত্তরের দশকের প্রথম দিকে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে এবং নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের মাধ্যমে বাঙালির প্রায় আড়াই শ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অবসান হয় এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়। মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের চেতনা বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের বোধকে যে জাগ্রত করেছিল, তার প্রভাব শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ক্ষণিকের

---

[৪০৫] আবুল মনসুর, 'বাংলাদেশের চিত্র-ভাস্কর্য : একটি অবলোকন', *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ ১১৮

[৪০৬] মতলুব আলী, 'আমাদের শিল্পকলায় একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ', *শিল্পী ও শিল্পকলা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ ৮৯ (এ তারিখটি নিয়েও মতভেদ রয়েছে, শিলপী মুর্তজা বশীর ১৬-০৩-১৯৭১ বিকালে মিছিলটি হয়েছিল বলে জানয়েছেন (মুর্তজা বশীর, 'একাত্তরের মার্চে শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের কালপঞ্জি', দ্র. *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৪, পৃ ২৮৩)

জন্য হলেও কার্যকর ছিল। তা ছাড়া যুদ্ধের ভয়াবহতাও তখন শিল্পীদের মনোজগৎকে প্রভাবিত করেছে। ফলে তাৎক্ষণিক হলেও এ সময়কার প্রায় সকল শিল্পীর কাজে বিষয়বস্তুর চয়ন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বদেশের সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা লক্ষণীয়। এমনকি, পূর্ববর্তী দশকে যাদের চিত্রপটে বিশুদ্ধ বিমূর্ততা উৎসারিত হয়েছিল (দু-একজনবাদে) তারাও দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যলগ্ন হয়ে বিষয়ের অবয়বী উদ্ভাস রচনার চেষ্টা করেছেন। এ সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আবার আশার সঞ্চার হয় নিজস্ব একটা চিত্রশৈলীর, পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই যে সম্ভাবনা উপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই প্রত্যাশা পুনরায় স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় রূপান্তরিত হয়। কারণ শিল্পীরা স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হলেও, বিজয় অর্জিত হওয়ার পর স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ খুব অল্প সময়ের জন্যই এ দেশের শিল্পীদের মানসলোককে আচ্ছন্ন রাখতে পেরেছিল। কিন্তু–

> এটা প্রত্যাশিত ছিল যে স্বাধীনতাযুদ্ধ শিল্পীদের মনে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করবে যে সারা দেশ যুদ্ধের– পাক সেনাদের নির্মম-নিষ্ঠুর বর্বরতা, রাজাকার, আল-বদর, আল শামসদের লোমহর্ষক ভীতিকর পৈশাচিকতা– ছবিতে ঢেকে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিল্পীদের, জনসম্মুখে যতো কথাই বলুন না কেন এ সম্পর্কে ঔদাসীন্য, অস্পষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা জনগনকে হতাশ করলো। ...এটার কারণ হলো যে রণাঙ্গণে সামরিক তৎপরতা, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং সম্মুখ সমরে সৈন্যদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তেজস্বিতা, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, অন্ধ দুর্দমনীয়তা, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের আনন্দ-উল্লাস এবং আশাবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো শিল্পীর স্পষ্ট ধারণার অভাব।[৪০৭]

সংখ্যায় কম হলেও কারো কারো সে ধারণা বা সংশ্লিষ্টতাও যে ছিল না, তা নয়। তবে বাস্তবতা হলো, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কিছু কাজ ছাড়া (তাতেও মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি অনুভব করা যায় না) দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো সর্বব্যাপী একটা চেতনার আশানুরূপ প্রতিফলন ঘটেনি, যতটা না সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যে হয়েছে। এমনকি ৪৩'র মন্বন্তরের অসামান্য রেখাচিত্রের স্রষ্টা জয়নুল আবেদিনের হাতও কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকল মানবতার এত বড় বিপর্যয়েও। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেও যিনি 'মনপুরা'র মতো আবেগঘন ছবি এঁকেছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানবতার প্রতি শোক প্রকাশে। কিংবা মুক্তিযুদ্ধে যার অবদান সবচেয়ে স্বীকৃত কামরুল হাসান, স্বাধীন দেশে অল্প কিছু কাজ করলেও খুব দ্রুতই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাংলার রমণী লাবণ্যের আলেখ্য রচনায়। ধীরে ধীরে অন্যরাও হলেন পূর্বানুবর্তী। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এত মৃত্যু এত রক্ত এত অশ্রু পেরিয়ে যারা নতুন দেশে নতুন সূর্যোদয় দেখল, তাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হওয়ার কথা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর সে আবেগ থেকেই সৃষ্টি হতে পারত নতুন কোনো অধ্যায়ের। মূলত ষাটের দশকের শেষে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে চেতনা জেগে উঠেছিল, স্বাধীন দেশে কিছুদিনের মধ্যেই তা

---

[৪০৭] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের চিত্রকলা*, ঢাকা, ভূমিকা, ২০১৪, পৃ ৭৫

ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে। এমনকি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি শিল্পীদের শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনীতেই বাংলাদেশকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এ প্রদর্শনী সম্পর্কে ভারতীয় শিল্প-সমালোচক প্রনব রঞ্জন রায়ের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> ...বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজে এমন কিছুই দেখলাম না যাকে বিশেষ করে বাংলাদেশের বলে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিল্পকৃতিতে যে-সব ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল এবং একক, সারা পৃথিবীর শিল্পের প্রেক্ষিতে তাঁরা উজ্জ্বলতর ব্যক্তিত্বের শিল্প শৈলীর ইম্প্রোভাইজার, অনুসৃতিকার। বাংলাদেশের ইতিহাস বিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের তথা অভিজ্ঞতার যে শিল্পীতরূপ দেখা স্বাভাবিক ছিল, তা দেখলাম না কেন?[৪০৮]

এ ছাড়া উক্ত প্রদর্শনী সম্পর্কে বিজন চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীর জিজ্ঞাসাতেও এসেছে যে, জীবনই যদি শিল্প সৃষ্টির মূল প্রেরণা হয়, তবে বাঙালির সংঘাত, যন্ত্রণা, সংগ্রাম ইত্যাদি কেন তাঁদের শিল্পে ধরা পড়ল না? তাঁদের ছবি কেন এত গোছানো, সুন্দর, স্নিগ্ধ, শান্ত, ধীর এবং হিসেবি?[৪০৯] আসলে এ দেশের শিল্পে বাংলাদেশকে নিরন্তর খুঁজে চলেছে দর্শক। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় প্রদর্শনী সম্পর্কে অজ্ঞাতনামা লেখকের করা নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ–

> প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে বাংলাদেশ কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যাক। কাইয়ুম চৌধুরী এবং কামরুল হাসান বাদে ফলাফল শূন্য। এখন একজন বাংলাদেশের শিল্পীকেই যদি আমি বাংলাদেশের একজন শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের বোধহয় হতাশ হতেই হয়।[৪১০]

এ ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর দেশের অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপ্রেক্ষিত কিছুটা দায়ী বলে মনে হলেও আরও একটি ব্যাপার স্বীকার করতে হবে যে, এ দেশীয়দের চর্চিতশিল্প ব্যক্তিক বা সামষ্টিক অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের চেয়ে তা বরং কষ্টার্জিত নিজস্ব আঙ্গিক বজায় রেখে, বাজার বা চাহিদা নিবৃত্তির নিমিত্তেই তৈরি।

আগেই বলা হয়েছে, পূর্বের দশকের বিমূর্তরীতির প্রধান চর্চাকারীরা এ সময় অনান্য রীতি বা পদ্ধতির চর্চাও কেউ কেউ করেছেন। আবার সত্তরের দশকের নবীন শিল্পীদের হাতে পরাবাস্তববাদসহ অন্যান্য সমকালীন রীতি-পদ্ধতি চর্চিত হলেও বিমূর্তরীতির চর্চা এ দশকেও (বিশেষত মধ্য সত্তরের পর) একটি অন্যতম প্রধান রীতি বা প্রবণতা হিসেবে বলবৎ থাকে। যদিও বিমূর্তশিল্প এবং নবীন শিল্পীদের খুব দ্রুত বিমূর্ততাশ্রয়ী হওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে সমালোচনা অব্যাহত ছিল এ সময়েও। নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো: ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর সমালোচনায় নিম্নোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে–

---

[৪০৮] প্রনব রঞ্জন রায়, 'বাংলাদেশর চারুকলা', *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃ ১১-১২

[৪০৯] তদেব, পৃ ১২

[৪১০] 'জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী'১৯৭৬', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪র্থ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৫ মার্চ ১৯৭৬

শিল্পকর্মের এই পণ্যধর্মীযুগে এত দ্রুত কেন নতুন শিল্পীরা বিমূর্ত আর পরাবাস্তব ফর্মে নিবিষ্ট হতে চান? কেন প্রাথমিক সোপান বাস্তবধর্মিতা ক্লাসের চৌকাঠের বাইরে বারবার হোঁচট খায়? যে ইউরোপীয় শিল্পকলার আঙ্গিক আজ অন্তর্জাতিকতাধর্মী তারও তো দেশ-ভেদে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ...এখানকার শিল্পীমানস যে অবচেতন মনের কথা বলেন; সেখানে এ দেশে অতিবাহিত বাল্য পরিবেশ, দাদী-নানীর মুখের রূপকথা কি শিল্পোন্নত ইউরোপের শিশুমানস, পরিবেশ ও গ্রীক পুরোকাহিনীর পরিবেশ প্রকৃতি এক ও অভিন্ন?[৪১]

আবার ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর সমালোচনায় বিমূর্তশিল্পের দুর্বোধ্যতা ও বক্তব্যহীনতার কথা বলা হয়েছে এভাবে–

বিমূর্ত শিল্পের মধ্যেও যথেষ্ট সত্য নিহিত। কিন্তু এর একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিশিল্পী নিজস্ব ইন্দ্রিয়জনিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে মাত্র, তার যুক্তিবোধ এখানে তেমন কাজ করে না। সমাজ-সংসার ও ভূগোল এখানে অনুপস্থিত। ...চিন্তা ছাড়া শিল্পীদের কাজ কেবল সজ্জায় রূপান্তরিত হবে। শুধু পেইন্টিং নম্বর থার্টিন বা কম্পোজিশন ফরটি নাইন যার একমাত্র প্রকাশ। ...একজন শিল্পী শহরে শিল্প করছেন অথচ তার ক্ষুধার অন্ন জোগাচ্ছে গ্রামের একজন চাষী, তৈজস-পত্র জোগাচ্ছে শ্রমিক, তারা ত শিল্পীর কাছ থেকে কিছুই পেল না। কারণ, যে ভাষায় আমাদের বেশীর ভাগ শিল্পী তার বক্তব্য রাখেন তা চাষী শ্রমিক ত দুরের কথা শিক্ষিত লোকেরাও বুঝতে অক্ষম।[৪২]

একইভাবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা কবিতার তুলনায় চিত্রকলার পশ্চাৎপদতার কারণ প্রসঙ্গে কবি আল মাহমুদ বলেছেন–

...কারণটি শিল্পীদের দক্ষতা, আঙ্গিক সচেতনতা ও রংয়ের বিশ্লেষণের মধ্যে নেই। বরং রয়েছে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যে। আমাদের অনেক বড় শিল্পীরও ধারাবাহিক কাজ-কর্মে যথার্থ কোন বক্তব্য নেই। ড্রইং ও বর্ণলেপনের পারদর্শিতা পঞ্চাশ দশকের শিল্পীদের এমন মোহগ্রস্ত করে রেখেছে যে সাধারণ চিত্রকলার দর্শক ও সমজদারগণ সাহসী হয়ে আমাদের শিল্পীদের সমালোচনায় অগ্রসর হতে পারেন নি। এর ফলে ...পঞ্চাশ দশকের পরবর্তী দশকগুলোর তরুণতম শিল্পীরা, যাদের রচনায় আপাততঃ কোনো প্রগাঢ় বিষয়বস্তু ও বক্তব্য নেই ভাষা বিমূর্তরীতির এক ধরনের ধোঁয়াটে অপরিচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে হয় আত্মতৃপ্তি কিম্বা আত্মগোপন করতে চাইছেন।[৪৩]

অন্যদিকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে শিল্পে দেশজতা এবং বর্তমান প্রেক্ষিত নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে কামরুল হাসানও 'আপাততঃ তো দেখছি কম্পোজিশন নং ১, ২, ৩ ইত্যাদি। রং মাখালে আর টেক্সার তৈরী করলেই শিল্প হয় না' বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৪] আসলে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের পর বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিকসহ নানা ধরনের সম্পর্ক, এ দেশের সামনে

---

[৪১] সন্তোষ গুপ্ত, 'নবীন শিল্পী ঃ স্বভাবজ বনাম নির্দেশিত চোখের রঙ ও রূপ', *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প ঃ স্বরূপের সন্ধান*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৯৭, পৃ ৮৬-৮৭

[৪২] বুলবন ওসমান, 'চারুকলা প্রদর্শনী- ১৯৭৬ ঃ একটি সমীক্ষা', *সমকাল*, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮২, পৃ ৫৪

[৪৩] আল মাহমুদ, 'সৈয়দ জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী', *সমকাল*, ২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, পৃ ৮১

[৪৪] ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিয়র, পৃ ৯

নতুন সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচন করে। নতুন দেশে নানা ধরনের দেশীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্যান্য সহযোগিতা লাভের ফলে একটা বিত্তশালী সমাজ গড়ে ওঠে। চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাদের কাছে সামাজিকভাবে উচ্চমর্যাদা ও রুচিমান হওয়ার সহজ উপায় বলে মনে হয়েছে। ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের (যারা পূর্ব থেকেই বিমূর্তাশ্রয়ী) পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং বেশ কিছু শিল্প-প্রদর্শনশালাও গড়ে তুলেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ফলে জনসম্পৃক্ততা লাভ করতে না পারলেও ওই সব প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ঝা-চকচকে জীবনের মোহে এবং অর্থও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্তে বিমূর্তশিল্প বা বাজারমুখী প্রবণতাই মুখ্য হয়ে ওঠে তরুণদের কাছেও। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ–

> ১৯৭২ সাল থেকে যে সব নব্যধনী লুটতরাজ ও ফড়িয়াগিরির মাধ্যমে প্রভূত ধন সম্পদ অর্জন করেছেন তাঁরা শিল্পের সমঝদার না হলেও নিজ নিজ গৃহে এক বা একাধিক ছবি ঝুলিয়ে রাখাকে নব্য আভিজাত্যের পরিচায়ক হিসেবেই গণ্য করেন এবং তার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করে থাকেন। এর ফলে অঙ্কিত ছবির গুণমান যাই হোক না কেন তাঁরা তার কদর দিতে প্রস্তুত এবং এই নতুন সৃষ্ট বাজারের মহিমায় চিত্র শিল্পীরা বিশেষতঃ খ্যাতিমান শিল্পীরা, টাকার থলির দিকে তাকিয়েই তাঁদের শিল্প প্রতিভার "বিকাশ" ঘটান। এই ধরনের সুযোগ অল্প পরিচিত এবং নতুন চিত্র শিল্পীদের মনেও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই তাঁরা নিজেদের সৃষ্টি ক্ষমতাকে নিয়োজিত রাখেন।[৪১৫]

তবে এই নব্য ধনিক শ্রেণি এবং এ দেশে নিয়োজিত বিভিন্ন বিদেশি মিশনের প্রতিনিধিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে শিল্পচর্চার পথ অগের যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রসারিত হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের আশানুরূপ প্রতিফলন না হওয়া, পূর্বসূরিদের বিমূর্ততা ও সমসাময়িক বিশ্বশিল্পের প্রভাব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় সত্তরের নবীন শিল্পীরা দেশজতা আবিষ্কার ও লালনের প্রশ্নে পূর্বসূরিদের থেকে অনেক ইতিবাচক। তবে কারো কারো কাছে আবার 'বিমূর্ততা' রীতি হিসেবে আধুনিক মনে হলেও নির্দ্বিধায় গ্রহণীয় মনে হয়নি।[৪১৬] বরং, মিশ্র কোনো তৃতীয় রীতি সৃষ্টির দিকে অনেকেরই মনোযোগ ছিল। আর এই চেষ্টাকে কেন্দ্র করেই ষাটের দশকে থিতিয়ে আসা শিল্প-আন্দোলন সত্তরের দশকে আবার প্রাণচঞ্চল, কর্মমুখর, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত নানামুখী প্রচেষ্টায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। উপকরণ বা মাধ্যমগত ভিন্নতাও যোগ হয়েছে এ সময়। বিশেষ করে ভাস্কর্য এবং ছাপচিত্রে প্রথম প্রজন্মের পর নতুন চর্চাকারীদের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। দশকের শুরুতে (১৯৭৩) চট্টগ্রামে এবং শেষের দিকে (১৯৭৮) রাজশাহীতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে সারা দেশে শিল্পচর্চার পরিধি ব্যাপক আয়তন লাভ করে। আবার ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যাত্রা এবং নিয়মিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর রীতি চারুশিল্পের বিকাশের পথকে সুগম করেছে।

---

[৪১৫] বদরুদ্দীর উমর, 'বাঙলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভুমিকা', *সংস্কৃতি*, ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ ৪০

[৪১৬] হাসি চক্রবর্তী, 'আমাদের শিল্পকলা ও শিল্পদর্শন', *রেখা ও লেখায়*, ঢাকা, মুক্তধারা, ২০১৩, পৃ ১৯

শিল্পীদের দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে শিল্পচর্চার প্রবণতাও এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বেশ কিছু শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এ সময়। এ ছাড়া নতুন দেশকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া বেশ কিছু বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তিও এ সময়ের কলা-জগৎকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

সত্তরের দশকের শিল্পীদের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি নিয়ে স্পেনে পাঠ সমাপ্ত করা শিল্পী মনিরুল ইসলাম (১৯৪৩) সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক পরিসরে। এই পরিচিতি নানা মাধ্যমে তাঁর কাজের নিজস্বতা ও সৃষ্টিশীলতার জন্য। পূর্বের বোধ, দর্শনকে পশ্চিমী অভিজ্ঞতার আলোকে জারিত করে এমন এক রসায়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, যা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। একজন প্রথম শ্রেণির ছাপচিত্রী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বব্যাপী হলেও চিত্রকলায়ও তাঁর সিদ্ধি রয়েছে। শুরুতে স্বচ্ছ এবং স্বতঃস্ফূর্ত জলরঙের ব্যবহারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। এরপর ইমপ্রেশনিস্ট ঢঙে যাযাবর জীবন, বাংলার নিসর্গ এবং গ্রামীণ জীবনের আন্তঃসৌন্দর্যকে চিত্রতলে বিধৃত করেছেন তিনি। ধীরে ধীরে বিমূর্ততার দিকে ধাবিত হয়েছেন, বিশেষত মাদ্রিদে পড়ার সময় বিশ্বশিল্পের সংস্পর্শে আসা এবং দুই দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তাঁর শিল্প তল খুঁজে নিয়েছে। মানুষের মনোজগতের অন্তর্গত নানা কার্যকলাপ যেমন বাহ্য জগৎকে প্রভাবিত করে, তেমনি বাহ্য জগৎও সরাসরি হৃদয়কে তাড়িত করে শিল্পসৃষ্টির নিমিত্তে। শিল্পী মনিরুল ইসলামের কাজে আমরা মনোলোকের সাথে বস্তুজগতের সেই অন্তর্গত দ্বন্দ্বের ফলাফল দেখতে পাই (চিত্র ৫১)। 'তাঁর ছবি বাহুল্যবর্জিত, সরল ও প্রত্যক্ষ কিন্তু সার্বিকতায় পরোক্ষ অনুভবের পরিচয় দেয়। অবাস্তব বাস্তবতায় শিল্পী তাঁর ছবি সৃষ্টি করলেও সেগুলো নির্বস্তুকতার আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে। তাই সৃষ্টিগুলো চোখের সঙ্গে সঙ্গে মন, ভাবনা আর বুদ্ধি দিয়ে অবলোকন করার দাবি রাখে।'[৪১৭] পুনরাবৃত্তির ভারমুক্ত তাঁর চিত্র জগৎ। তাই বিষয়ের অবয়বী উদ্ভাসের পরিবর্তে জ্যামিতিক আঙ্গিকে রঙের বিন্দু বিন্দু ছোপ ও রেখার নানা প্রতীকী উপস্থাপন তাঁর চিত্রতলকে ঋদ্ধ করেছে। কোথাও কোথাও কোলাজের মতো কাগজ, বোর্ড, কাপড় ইত্যাদি বস্তু জুড়ে দিয়ে ছবিতে বৈচিত্র্যময় আবহ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তা ছাড়া পরিমিতিবোধও তাঁর কাজের একটি বড় গুণ। স্পেস এবং কম্পোজিশনের সামঞ্জস্য তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কখনো কখনো ক্যালিওগ্রাফির ব্যবহারও লক্ষণীয় তাঁর কাজে। এ প্রসঙ্গে একটি অনলাইন পত্রিকাকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন '...আমি এটাকে [ক্যালিওগ্রাফিকে] ছবির একটা অংশ করে তুলেছি। সেটা পড়ার জন্য নয়। সেটা ইনভেন্টেড, সেটা ছবির একটা কম্পোজিশনের মতো।'[৪১৮] বস্তুত সৃজনশীলতা আর নান্দনিকতার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে তাঁর কাজে। তাই সামগ্রিকভাবে তাঁর কাজ শিল্পামোদিদের কাছে যতটা হৃদয়গ্রাহী ঠিক ততটাই চৈতন্য প্রদায়ী।

---

[৪১৭] রবিউল হুসাইন, 'অবাস্তব বাস্তবতার রূপকার', *কালি ও কলম*, ৮ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ ১১৪

[৪১৮] http://arts.bdnews24.com/?p=6324 প্রেক্ষিত ১৮-১২-১৫ খ্রি.

পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের হাতে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের যে যাত্রা এ দেশে শুরু হয়েছিল, মাহমুদুল হক (১৯৪৫) তারই সার্থক উত্তরাধিকার। ষাটের একেবারে শেষের দিকে (১৯৬৮) আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষ করে পরবর্তীকালে জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবে নিজস্ব রীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। একাডেমিক বাস্তববাদী ধারার পরেও জ্যামিতিক অর্ধ-বিমূর্ততায় বিষয়ের অবয়বী বিন্যাস রচনা করেছেন কিছুদিন।[৪১৯] এরপর অত্যন্ত সংযতভাবে সময় নিয়ে নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিরাবয়বী করে তুলেছেন ক্যানভাস। চোখের বাস্তবতাকে অস্বীকার করলেও মনে তাঁর এই দেশ, এই দেশের প্রকৃতি ও তার নয়নাভিরাম নৈসার্গিক সৌন্দর্য। তাতে বুঁদ হয়ে থেকেছেন তিনি। এই প্রকৃতি-নিবিষ্টতা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে তাঁর কাজে। নানা ধরনের জ্যামিতিক আকার ও রঙের স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাসে অত্যন্ত সার্থকভাবে নির্মাণ করেছেন চিত্রতল। কখনো বা পরিচিত কোনো নিসর্গ বা অবয়বের উদ্ভাসও মেলে সেসব কাজে (চিত্র ৫২)। মাহমুদুল হকের শিল্পকলায় আমরা তাঁর অনুভূতিকে উপলব্ধি করি, স্মৃতির রোমন্থনতাকে আবিষ্কার করি এবং এক অজানা কল্পনা জগতের স্বাদ অনুভব করি।[৪২০] কখনো আনুভূমিক, কখনো লম্বমান এই দুই পরিসরে দৃষ্টিগ্রাহ্য নিসর্গ ও তার রূপকল্পকে নানা রূপের বর্ণিলতায় তিনি এমনভাবে উন্মোচিত করেছেন, তাতে যেন দিগন্ত-বিস্তারী প্রান্তর, আকাশের উদারতা, জলের সচলতা ধরা পড়েছে তাঁর চিত্রকলায়।[৪২১] আকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমিতি নিয়ে মুক্ত পরিসর ছেড়ে দেওয়ার কুশলী দক্ষতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। আকারকে ওপরে-নিচে, ডানে-বামে সরিয়ে আবার ওপরের অংশে ব্যাপক স্পেস ছেড়ে, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'জাপানি শিল্পভাবনায় পরিসরের বিন্যাস যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তা মাহমুদুল হককে স্থায়ীভাবে প্রাণিত করেছে এবং এমনটি ভাবা হয়তো ভুল হবে না যে, তাঁর শিল্প নির্মাণে যে কারিগরি কুশলতা ও পরিসর-ভাবনার প্রতি সযত্ন দৃষ্টিপাত রয়েছে তাতে জাপানি অভিজ্ঞতার ছাপ দৃশ্যমান।'[৪২২] অবশ্য আরও পরে রং জ্যামিতিক আকার ছেড়ে স্বাধীনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে নির্বস্তুক করে তুলেছে তাঁর ক্যানভাস। এক রঙে ভিত্তি রচনা করে তার ওপরে অন্য রং ছড়িয়ে হালকা বুনটের দ্যোতনা তৈরি করেছেন দক্ষতার সাথে। সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা, ছড়ানো-ছিটানো উজ্জ্বল রং কিংবা বিভিন্ন ঘনত্বের রঙের প্রলেপে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছেন তিনি। রং ব্যবহারে মাহমুদুল হক সবসময় পরিমিত। এমনকি দুটি বা তিনটি রঙের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন তিনি অথবা একটি ছাপিয়ে যেতে চায় আরেকটিকে, তখনো তাঁর রংকে বুনো বা অবাধ্য মনে হয় না।[৪২৩] শান্ত, স্নিগ্ধ এবং পেলব রঙের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাজে। সমাজ বা রাজনীতি সচেতনতা কিংবা বিষয় বা বক্তব্যনির্ভরতার

---

[৪১৯] অসীম রায়, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৬ অক্টোবর' ৭৯, পৃ ৯৩

[৪২০] মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'মাহমুদুল হক', *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ - ৪০*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৮

[৪২১] জাহিদ মুস্তাফা, 'আদিগন্ত নিসর্গে নির্জনতার আলো', *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ ৫৮

[৪২২] আবুল মনসুর, 'নির্বস্তুকতার ভিতর-বাহির', *কালি ও কলম*, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০১৩, পৃ ৯৭

[৪২৩] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'নিসর্গের সঙ্গে প্রাণের খেলা', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৮, পৃ ৮২

পরিবর্তে আকার, রং, রেখা ও বুনটের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন এবং এর মাধ্যমে দৃষ্টিসুখকর বিন্যাস তৈরিই তাঁর মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হয়। মূলত চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও ছাপচিত্র মাধ্যমেও এ দেশের একজন অগ্রগণ্য শিল্পী তিনি।

পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তার সুফল মেলে ভাস্কর্যচর্চার দ্বার অবারিত হওয়ার মাধ্যমে। ফলে ভাস্কর্যচর্চায় দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে। শিল্পী আব্দুল্লাহ খালিদ (১৯৪৫) এ প্রজন্মের প্রতিনিধি। চিত্রকলায় শিক্ষালাভ করলেও তাঁর খ্যাতি ভাস্কর হিসেবে। তিনি ষাটের দশকের শেষে স্নাতক হলেও রসিকজনের মনোযোগের কেন্দ্রে আসেন সত্তরের দশকে। স্বাধীনতাত্তোর দেশে ডাকসুর উদ্যোগে নির্মিত 'অপরাজেয় বাংলা' তাঁর অমর কীর্তি। এ ছাড়া আরও কিছু স্বাধীনতা স্মারক-ভাস্কর্যও তিনি নির্মাণ করেছেন, তবে প্রতিকৃতি ভাস্কর্য রচনায় তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যে কয়েকজন শিল্পী মাধ্যমের বৈচিত্র্য, সাহসী ও নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কালিদাস কর্মকার (১৯৪৬) তাঁদের অন্যতম। ষাটের দশকে শিল্পে স্নাতক হলেও, সত্তরের দশকে এসে শিল্পসৌকর্যে সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন তিনি। মাধ্যমের গৎবাঁধা নিগড়ে বাঁধা পড়েননি কখনো, বরং বিচিত্র মাধ্যমের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সব সময় প্রকাশিত। তেলরং, জলরং, টেম্পেরা, গোয়াশ, স্থাপনাশিল্প, পরিবেশনাশিল্প ইত্যাদিসহ নানা ধরনের মিশ্র মাধ্যমেও কাজ করে চলেছেন। এ ছাড়া ছাপচিত্র মাধ্যমেও তিনি একজন শক্তিশালী শিল্পী। নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছেন বালি, কাদা, প্লাস্টার, ধাতব পাত, কাঠ, সুতা, দড়ি ইত্যাদি নানা ব্যতিক্রমী উপকরণ। কাজে রং ও পরিসরের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে সময়, পৌরাণিক কাহিনি এবং ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে (চিত্র ৫৩)। কালিদাস কর্মকারের সৃষ্টিকর্মে যেমন চিহ্নিত করা যায় সমকালীন যন্ত্রণা, বিষণ্নতা আর স্পন্দন; তেমনি তাঁর প্রতীকায়ন এবং প্রকাশের অনুষঙ্গে এক জান্তব অতীতের সূত্রসমূহের অনুরণনও পাওয়া যায়।[৪২৪] মূর্ত, বিমূর্ত বা অর্ধ-বিমূর্ত যা-ই হোক, কালিদাসের শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটি হলো, এ দেশের অধিকাংশ শিল্পকর্মের মতো অনুচ্চ এবং ঢলঢলভাব বর্জিত এবং একইসঙ্গে তা উচ্চকিত, রুক্ষ ও কঠোর। শিল্পের প্রথাবদ্ধ নান্দনিকতার ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে শিল্প সৃষ্টি করেন তিনি। ছবির বিক্ষুব্ধ এবড়ো-খেবড়ো জমিন, যেন প্রতিকূল সময়ের সাথে মানবমনের অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বের প্রতীকী রূপায়ণ। ভারতীয় তান্ত্রিকদের অনুষঙ্গ ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষের মালা, তাবিজ-কবজ, কড়ি ইত্যাদি কিছুটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উঠে এসেছে তাঁর চিত্রপটে। এ প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ বলেছেন–

[৪২৪] মিজারুল কায়েস, 'কলিদাস কর্মকার : নিমগ্ন নিরন্তর', *কালি ও কলম* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৮২

'চেতনায় ঘোর লাগিয়ে তান্ত্রিক সাধকদের মতো অণিমা ও লঘিমায় থেকে কখনো সংকুচিত, কখনো বা প্রসারিত হয়ে প্রবেশ করেছেন শিল্পী শিল্পের মায়াবী প্রদেশে। সেই প্রদেশে চাঁদ, সূর্য ও সর্পিল গতির মতো অনেক জীব ভ্রমণ করছে। বৃত্তের ভিতর ত্রিভুজ, ত্রিভুজ ঘেরাও করে বর্গাকার গড়ন, বর্গক্ষেত্র ঘিরে আরো ব্যাপ্ত আরেকটি ঘর এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের তন্ত্র-মন্ত্রের খেলা জমে উঠেছে ছবিতে। বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্তের পাশাপাশি বর্ণছোপ ও অন্যান্য রৈখিক আয়োজনে শিল্পীর অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হয়েছে। জটিল পথপরিক্রমা শেষে তিনি যেন শুদ্ধ চক্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন।'[৪২৫]

বস্তুত বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ আধুনিকতার সাথে এ দেশের মানুষের যাপিত জীবনপ্রণালি, নানা ধর্মের সমন্বয় অথবা সমন্বয়হীনতা, লোকজ নানা অনুষঙ্গকে বিভিন্ন ধরনের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন তিনি। রং, রেখা, আকৃতি ও বুনটের একটি ঘননিবদ্ধ নকশাদারিত্ব তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন বিচিত্র মাধ্যম ও উপাদান ব্যবহার সত্ত্বেও এ বৈশিষ্ট্য তাঁর সকল শিল্পকর্মেই লক্ষণীয়।[৪২৬] কোথাও কোথাও বাংলা এবং আরবি ক্যালিওগ্রাফির ব্যবহার করেছেন তিনি। সাদা, লাল ও কালো রঙের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষণীয়। পুরোপুরি প্রথা বিরুদ্ধ এবং দুর্গম পথের একাকী সৈনিক হলেও তাঁর শিল্পের উন্মূলতা দৃশ্যগোচর হয় না বরং খুব সহজেই তাতে নদীবিধৌত বাংলার নিজস্বতা চিহ্নিত করা যায়।

ভাস্কর্য শিল্পে বাংলাদেশের ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের হলেও আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার ক্ষেত্রে শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের ফলে সে বাধা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ভাস্কর্য চর্চায় হামিদুজ্জামান খানের (১৯৪৬) অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত এ দেশে পূর্বসূরিদের থেকে তাঁর কাজের বৈচিত্র্য সমসাময়িকদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। শুরু থেকেই তিনি গতানুগতিক ধারার ভাস্কর্য সৃষ্টির পথকে এড়িয়ে চলেছেন। 'হামিদুজ্জামান এ দেশের শিল্পরসিকদের কাছে প্রধানত দুটি অবদানের জন্য শ্রদ্ধেয়। প্রথমত, এ দেশের ভাস্কর্যের ধীরগতিকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য এ মাধ্যমকে গ্রহণ করার সাহস সঞ্চার করা। দ্বিতীয়ত, ভাস্কর্যের গতানুগতিক পরিমণ্ডলকে ভেঙে সেখানে সমকালীন চিন্তা ও চেতনার প্রয়োগ করা, এবং পরিপার্শ্ব-নির্ভর ভাস্কর্যের প্রবর্তন করা।'[৪২৭] ষাটের দশকের শেষার্ধে তিনি চিত্রকলায় স্নাতক হন। তবে পরবর্তী সময়ে ভারতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভাস্কর্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম পর্বে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং এর ভয়াবহতা ইত্যাদি অবলম্বনে বেশ কিছু মর্মস্পর্শী ভাস্কর্য তৈরি করেন, যেমন– স্মৃতি ৭১, সংশপ্তক ইত্যাদি। বিষয়ের সাথে মাধ্যমের চরিত্রানুগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতার ফলে এসব কাজে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্তর্লীন আবেগের সবিশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি মৌলিক জ্যামিতিক আকৃতি-প্রধান বিমূর্ত ভাস্কর্য নির্মাণে ব্রতী হন। তখন 'রচনা

---

[৪২৫] মইনুদ্দীন খালেদ, 'রূপদক্ষ কালিদাস কর্মকার', *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৫২

[৪২৬] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ ৪৭

[৪২৭] নাসিম আহমেদ নাদভী, 'মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান খান', *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৪১*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৮

থেকে বিদায় নেয় বাস্তব অবয়বের প্রতিনিধিত্ব। ক্রমান্বয়ে তাঁর রচনাসমূহ নির্বস্তুক ও মৌলিক আঙ্গিক-নির্ভর হয়ে ওঠে। মৌলিক গড়নের ক্রীড়াময় বিন্যাস তাঁর ভাস্কর্যের মূল বিষয়ে পরিণত হয়। গড়ন ও পরিসরকে নানা বিচিত্র ছন্দে বিন্যস্ত করতে তিনি উপকরণগত মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন ভারী ও মোটা ধাতব পাত। ধাতব পাত কেটে ঝালাই করে সৃষ্ট নির্বস্তুক এসব বিমূর্ত ভাস্কর্যকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করতে তিনি ব্যবহার করেন লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি উজ্জ্বল, উচ্চকিত, মসৃণ রং।'[৪২৮] তবে এ পর্বে রং বিহীন চকচকে ইস্পাতও তিনি ব্যবহার করেছেন কখনো কখনো। মূলত, ভাস্কর হিসেবে খ্যাতিমান হলেও চিত্রকলা চর্চায়ও তাঁর দক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য; বিশেষত জলরং চর্চায়।

সত্তরের দশকে কারো কারো কাজে ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম টেম্পেরার ব্যবহার লক্ষণীয়। শহীদ কবির (১৯৪৭) তাঁদের একজন। শুরুর দিকে আলংকারিক অবয়বধর্মী বাউল লালন বা মরমিবাদের নানা অনুষঙ্গ এবং সামাজিক বাস্তবতার রূঢ়তাকে উপস্থাপন কারার জন্য সার্থক মাধ্যম হিসেবে টেম্পেরার ব্যবহার করেছেন।[৪২৯] পরবর্তী সময়ে তেলরঙে মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, প্রাকৃতিক দৃশ্য, লোকজ বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে বিমূর্ত এবং ঐতিহ্যবাহী রীতির এক অনবদ্য সংশ্লেষে শিল্প রচনা করেছেন তিনি। কোথাও কোথাও লিখেও বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো– ছবি এঁকে যা বলা সম্ভব হয়নি, তা তিনি ক্যানভাসে লিখে দিয়েছেন।[৪৩০] আশির দশকের প্রথম দিকে স্পেন প্রবাসী হয়ে মূলত ছাপচিত্র চর্চা করেছেন। তবে দূর স্বদেশের প্রতি স্মৃতিকাতরতা এবং সাধারণ পরিপার্শ্ব তাঁকে আলোড়িত করেছে সবসময়। পৃথিবীর সকল প্রান্তে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্রতলে। আবার কখনো কখনো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত একেবারে আটপৌরে এবং সস্তা বিষয়ও তাঁর শিল্পে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে (চিত্র ৫৪)। তবে ছবির বিষয় সামান্য, কিন্তু তাতে প্রতিফলিত অসামান্য আবেগের আন্দোলন। রং যেন বুদবুদ করে ফুটছে।[৪৩১] মলিন এবং ধূসর রঙের ব্যবহার বেশি দেখা যায় তাঁর কাজে। 'শহিদ কবীরের দ্রুত তুলি চালনায় রঙের ওপর রং লেপন করেন। ফলে উপরিভাগের রং উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও নিচের স্তরের রংটি অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। ফলে বর্ণস্তরে নানা মিশ্রিত বর্ণ সৃষ্টি হয়ে এবং ছবির রঙে অতিমিশ্রিত রঙের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।'[৪৩২] এরূপ রঙের ব্যবহার তাঁকে সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করেছে। অবার বিষয়বস্তুর মনলোভা উপস্থাপনের পরিবর্তে নিজের আবেগ এবং অভিব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বও তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছে।

---

[৪২৮] নাসিমুল খবির, 'আঁধারের রূপ সন্ধান হামিদুজ্জামান খানের বিংশতম শিল্পকর্ম-প্রদর্শনী', *কালি ও কলম*, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০১০, পৃ ৯১

[৪২৯] মুনতাসীর মামুন, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি '৮০, পৃ ৫৬; Nazrul Islam, `Contemporary Art in Bangladesh', *Shilpakala*, Vol. 4, 1981, p. 18

[৪৩০] মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃ ৫৬

[৪৩১] মইনুদ্দীন খালেদ, 'শহীদ কবীরের বর্ণপ্রপাত', *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৫৫

[৪৩২] নাহীদ আখতার, 'শহিদ কবীরের চিত্র-প্রদর্শনী', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৮, পৃ ৯০

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যে কজন তরুণ শিল্পী এ দেশের শিল্প আন্দোলনকে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করেন শিল্পী হাসি চক্রবর্তী (১৯৪৮-২০১৪) তাঁদের একজন। তাঁর কাজে শিল্প ও সমাজের প্রতি শিল্পীর দায় লক্ষণীয়। শিল্পী হাসি চক্রবর্তীর বিশেষত্ব তাঁর নম্র রঙের ব্যবহারে। মূলত ধূসর এবং দৃষ্টি-সুখকর রং ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেও রঙের ব্যবহার নিয়ে বলেছেন, 'আমি মনে করি রং আমার ছবির প্রধান উপাদান, ছবির সমস্ত রকম কলাকৌশলের সমতা রক্ষা করে রং এর সাহায্যে আবেগকে প্রকাশ করতে চাই আমি।'[৪৩৩] আঙ্গিকে কখনো তিনি স্যুরিয়েলিস্টিক আবার কখনো রোমান্টিক। সময়ের অস্থিরতা, নৈরাশ্য, প্রতিবাদ ইত্যাদি জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর চিত্রতলকে ঋদ্ধ করেছে। এসবের প্রতীকী উদ্ভাস তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষাকে, স্বপ্ন ও ব্যর্থতাকে বাস্তব এবং অর্থময়তার সংঘাতে ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। আবার আলো-ছায়ার অপূর্ব বিন্যাসে রং ও রেখার ছন্দোবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গকেও অর্ধ-বিমূর্ত প্রতীক ও আকারে তিনি উপস্থাপন করেছেন ক্যানভাসে। তাঁর ভাষায় 'প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য আমাকে আকর্ষণ করে, তাই যখনই মনে মনে একটি ছবি করতে চাই তখন তা-ই হয়ে ওঠে প্রকৃতির ছবি।'[৪৩৪] তিনি প্রাণভরে উপভোগ করেছেন প্রকৃতির রহস্যময়তাকে। এ ছাড়া বিমূর্ত ভাব-কল্পনাও তাঁকে আবিষ্ট করেছে কখনো কখনো।

শিল্পী আবদুস সাত্তার (১৯৪৮) বাংলাদেশের প্রতিভাবান প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অন্যতম। সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি শেষ করে নিজস্ব রীতিতে আবির্ভূত হন। তবে তিনি বিভিন্ন সময় নানা সামাজিক বাস্তবতাকে প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন। প্রথম দিকের শিল্পে মানব অবয়বের প্রাধান্য দেখা যায় (চিত্র ৫৫)। মূলত, প্রাচ্য রীতির শিল্পধারায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করায় তাতে এই বিশেষ রীতির অঙ্কন প্রবণতা, বিশেষত অলংকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তবে ধীরে ধীরে নিরাবয়বী হয়েছেন; বিশেষত ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে। রং, সংবেদি রেখা ও ভাসমান আকার-আকৃতির বিশেষ নির্মাণে সেখানে মাধ্যমের সমতলীয়তা ছাপিয়ে ত্রিমাত্রিকতার উদ্ভাস রচনা করেছেন তিনি। এই ছাপচিত্র মাধ্যমেরও বিশিষ্ট শিল্পী তিনি। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর ছাপাই ছবির নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে সেখানেও রেখা ও রঙের যে বিন্যাস রচিত হয়েছে, তাতে প্রাচ্য রীতির গীতলতা অবশ্য দৃষ্ট। তিনি আরবি লিপি চিত্রণের ব্যাপারেও কিছু নিরীক্ষা করেছেন।[৪৩৫] এ ছাড়া কাঠ ও মাটি দিয়ে কিছু ভাস্কর্যও গড়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের একজন স্বপন চৌধুরী (১৯৪৮)। শুরু থেকেই নিরীক্ষাপ্রবণ এই শিল্পীর ৭১-এর রণাঙ্গনেও কাগজ-কলম সঙ্গী ছিল। প্রথম দিকের কাজে পরাবাস্তববাদ

---

[৪৩৩] রবিউল হুসাইন, 'হাসি চক্রবর্তী', *কনটেম্পরারি আর্ট সিরিজ অব বাংলাদেশ-২৪*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮২

[৪৩৪] তদেব

[৪৩৫] সৈয়দ আলী আহসান, 'আবদুস সাত্তার', *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-২৯*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪

এবং লোকজ আঙ্গিকের মিশেলে জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প রচনা করেছেন।[৪৩৬] আবার কিউবিজম-উদ্ভূত ছদ্ম-জ্যামিতিক বিমূর্ততাও লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। সাথে যোগ হয় বর্ণ বিন্যাস, নকশাধর্মীনানা আকার এবং বুনট তৈরির মুনশিয়ানা। মানবজীবনের নানা অনুষঙ্গ, প্রকৃতি ও সময় তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য–

> প্রকৃতিকে দেখে দেখে আঁকা নয়, বরং কাগজে, রঙে ডুব দিয়ে নিজেকে নতুন করে অনুভব করা, আবিষ্কার করা, এই আয়োজনে নিজেকে বেঁধেছেন স্বপন চৌধুরী। তাঁর এই বিপ্রতীপ যাত্রার কারণেই মনে হয় ছবির উপাদানগুলো যেন প্রকৃতিতে যত-না সত্য, তার চেয়ে গভীর সত্য ওই ছবির জমিতে তাদের জন্ম, জন্মের উৎসব। চিত্রতলে ইমেজের জন্মোৎসব দেখি তাঁর কাজে।[৪৩৭]

চিত্রতলে তুলির মিহিন আঁচড়ে যেমন বিষয়ের উদ্ভাস রচনা করেন, তেমনি আবার চিত্রতল খুঁড়ে-ছিঁড়ে, জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করেন ভিন্ন অভিব্যক্তি। কখনো আবার স্বল্প কিন্তু শক্তিশালী রেখায়, প্রতীকধর্মী বিভিন্ন আকারে, রঙে ও বুনটে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে বিষয়ের উপস্থাপন লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও দেশজ বিষয়বস্তুর সংশ্লেষে রচিত হওয়ার ফলে দিন শেষে তা আমাদের শিল্প বলে চিহ্নিত করতে খুব অসুবিধা হয় না।

শিল্পী আবুল বারক্ আল্‌ভী (১৯৪৯) ষাটের দশকের শেষ লগ্নে আর্ট কলেজের গণ্ডি পেরোলেও নিজস্ব শিল্প আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেছেন সত্তরের দশকে। একাত্তরে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। তখন থেকেই যেন এ দেশের মানুষ ও এর স্নিগ্ধ প্রকৃতির শ্যামল মায়ায় তিনি আবদ্ধ। বিশেষত এ দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে তিনি নানা কৌশলে বিধৃত করেছেন ক্যানভাসে (চিত্র ৫৬)। তাঁর নিসর্গে আছে সবুজের বিচিত্র আশ্বাস, মাটি আর পাথরের ধূসরতা, নদী আর জলাধারের আকুলতা, সেখানে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গাও আছে আবার, বাতাসের মৃদুমন্দ চলাচলও আছে।[৪৩৮] বস্তুত রেখা ও রঙের যুগপৎ সম্মিলনে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তাঁর চিত্রতলে নতুন হৃদয়াবেগে উন্মোচিত হয়। প্রথম দিকের কাজে জ্যামিতিক বিমূর্ততায় মুক্তিযুদ্ধ এবং এর করুণ মূল্যদানের বিষয়সহ জনজীবনের নানা অনুষঙ্গকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ বিমূর্ততায় থিতু হয়েছেন। এবং সে বিমূর্ততায় রং, আকার ও তল বিভাজনের ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আঙ্গিকে তিনি বিমূর্ত প্রকাশবাদী দলের হলেও কখনো কখনো তাঁর কাজ মনে হয় যেন প্রকৃতির অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ। সমাজ বা রাজনীতি-সচেতনতা কিংবা, বিষয় বা বক্তব্যনির্ভরতার পরিবর্তে আকার, রং ও রেখার রূপবন্ধে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন এবং এর দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস তৈরিই তাঁর মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতিভাত হয়। চিত্রশিল্পের চর্চা করলেও ছাপচিত্র মাধ্যমেরও

---

[৪৩৬] চিত্রপ্রিয়, 'স্বপন চৌধুরী : চিত্রশিল্পে নতুন কণ্ঠস্বর', *রোববারের দৈনিক বাংলা*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩, পৃ ৮

[৪৩৭] মইনুদ্দীন খালেদ, 'বর্ণের মধু ও কাগজের আর্তনাদ', *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ ২৬৬

[৪৩৮] জাহিদ মুস্তাফা, 'শিল্পে বর্ণে ঐকতান', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ ১১৩

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী তিনি। রোমান্টিক এবং স্নিগ্ধ রঙের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাজে। প্রকৃতির অন্তর্লীন সৌন্দর্যের এই বর্ণানুসন্ধানই এ দেশের চিত্রশিল্পের বর্ণাঢ্য অঙ্গনে তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ষাটের দশকের একেবারে শেষলগ্নে গতানুগতিকতা পরিহার করে বক্তব্য ও মানবিক আবেদনের দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে শিল্পের নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শিল্পী মনসুরউল করিম (১৯৫০) এ দলের অন্যতম সদস্য। সত্তরের দশকের শুরুতেই তিনি সৃজনশীল তরুণশিল্পী হিসেবে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্ধ-বিমূর্ত অবয়বী উদ্ভাসে প্রথমে কিউবিজম, পরে স্যুরিয়েলিস্টিক এবং বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের অলিগলি ঘেঁটে অবশেষে শিল্পী অর্জন করেছেন তাঁর অভীষ্ট অর্ধ-বিমূর্ত আঙ্গিক। উজ্জ্বল বর্ণের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাজে। রেখা, রং ও বুনটের দক্ষ নির্মাণে প্রকৃতি ও যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর চিত্রতলকে সংহত করেছে। রং রেখার ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিজস্বতা এবং আলো ও অবয়ব বা বিষয়বস্তুর সমাবেশের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রতিসাম্য বিধান তাঁকে আলাদা করেছে। এ ছাড়া চিত্রজমিনে রং ভর্তি অবতল রেখা ও জৈব আকৃতির ব্যবহারে যে বিমূর্ততার উৎসারণ ঘটে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকেও অস্বীকার করা অসম্ভব। নিজস্ব বোধ ও প্রকাশভঙ্গিতে পশ্চিমী রীতির সাথে দেশজ ভাব-লাবণ্যের অপূর্ব সম্মিলনের সারাৎসার তাঁর ছবি। অবয়ব এবং বিমূর্ততার মিশেলে তৈরি হওয়া তাঁর ক্যানভাসে নাগরিক নানা অনুষঙ্গ যেমন যুক্ত হয়েছে, ঠিক তেমনই তাঁর শৈশবের গ্রাম, নদী এবং তাঁর স্মৃতিময় অতীত পরিবেশও তাঁকে করেছে আবেগতাড়িত। যেন স্মৃতিময় কাব্যের স্নিগ্ধ শীতলতা তাঁর চিত্রতলজুড়ে। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য–

> 'আমার চার পাশে যে পরিবেশ যে প্রতিবেশ তা আমাকে প্রলুব্ধ করে। আমার ক্যানভাসে আমি শ্যামল সুন্দর এই ধরণীর রূপকে অবগাহন করি। আলো আমাকে উজ্জীবিত করে, রং আমাকে প্রলুব্ধ করে, রেখা আমাকে তাড়িত করে। আকার আকৃতি বারবার নিয়ে যায় প্রকৃতির ঐক্যের কাছে। প্রকৃতি আমাকে প্রকৃত করে আমাকে শেখায় ঐক্যের গান। কাদামাটির গন্ধ-সুনীল আকাশ আর এই শ্যামল সবুজ ধরণী আমার ক্যানভাসে রূপবন্ধ তৈরি করে। রেখা রঙে আলোর নাচনে এবং মাঠের গল্পে আমি খুঁজি উৎসের সন্ধান।'[৪৩৯]

এই উৎস সন্ধানের বিবিধার্থক পরিণতি তাঁর সৃষ্টিসম্ভার, যা পরিশ্রমী এই শিল্পীর একেবারে নিজস্ব অর্জন, তা একই সঙ্গে বোধ ও বিবেচনার এবং প্রাচুর্য ও পরিমিতির এক সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত প্রকাশ।

এ দেশের শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী এস এম সুলতানের পর যার কাজের পুরোটাতেই এক টুকরো বাংলাদেশের দাপুটে উপস্থিতি, তিনি শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৫০)। বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রবাসী শিল্পীদের মধ্যে বিদেশে বাংলাদেশ এবং এ দেশের মুক্তিযুদ্ধকে এক অনতিক্রম্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। দুর্দমনীয় শক্তি আর প্রচণ্ড গতি নিয়ে চিত্রতল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায় শাহাবুদ্দিনের অমিততেজী মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রগুলো। শুধু মুক্তিযুদ্ধই নয় সব ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমজীবী

---

[৪৩৯] মনসুর-উল-করিম, কলকাতার চিত্রকূট গ্যালারিতে আয়োজিত 'লাবণ্য এ বাংলায়' শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

মানুষের সংগ্রামমুখর যাপিত জীবনের গতিময় দিনলিপি তাঁর শিল্পকর্ম। চলচ্চিত্রের মতো গতিশীলতাই তাঁর ছবির প্রাণ। যেন মানুষ নয়, গতিই আঁকতে চান শাহাবুদ্দিন।[৪৪০] মোটা এবং বলিষ্ঠ তুলির ক্ষিপ্র চালনায় তিনি উদ্‌যাপন করেন গতি। মানবসত্তার বিজয় ও মুক্তিই তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত। সত্তরের দশকেও যখন এ দেশের শিল্পীসমাজ বিমূর্ততা বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতির চর্চায় নিবিষ্ট হয়ে নিজেকে আধুনিক প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিমগ্ন, তখনই তিনি প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতে শুরু করেন বাস্তবানুগ শিল্পচর্চা। শুরু থেকেই বাংলার নিসর্গ-লালিত্য এবং এর জনজীবনকে শিল্পে স্থান দিয়ে মৃত্তিকালগ্ন থেকেছেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিস প্রবাসী হওয়ার পরও তিনি পাশ্চাত্য শিল্পে মোহাবিষ্ট না হয়ে বরং শিল্পে মানুষ এবং দৃশ্যমান বাস্তবের প্রতিনিধিত্বকারী বিষয়ের উপস্থাপনে অনড় থেকেছেন। পাশ্চাত্য শিল্পের দক্ষতা, আলো-ছায়া এবং অস্থিসংস্থান বিদ্যার নির্যাস নিয়ে এ দেশের কাদা ও মাটিমাখা পেশিবহুল দুর্দমনীয় তারুণ্যকে তাঁর চিত্রতলে উপস্থাপন করেছেন। তাই বিষয়ের অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও কিংবা বাস্তবের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ না হয়েও তাঁর ছবির চরিত্ররা বাস্তব এবং আধুনিক। কেননা আধুনিকতা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সাথে কনটেন্ট এবং ফর্মের মধ্যে সংগতি, যা সার্থকভাবেই তাঁর কাজে ঘটাতে পেরেছেন শাহাবুদ্দিন।[৪৪১] তাঁর মানুষেরা বাংলাদেশের অমিত তেজী তারুণ্যের প্রতিনিধি এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। রক্ত-অশ্রুস্নাত মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ গুটিকয় শিল্পীর মধ্যে তিনি অন্যতম। রণাঙ্গনে দেখা মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তিই তাঁকে সাহস জুগিয়েছে। আর মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসাই তাঁকে বলীয়ান করেছে।[৪৪২] বিষয় নির্বাচনে এই জীবন ও স্বদেশমুখীনতা, অঙ্কন ও নাটকীয় পরিসর সংগঠনের অসাধারণ দক্ষতা, রং ব্যবহারের সাবলীলতা এবং বিষয়ের গতি-উন্মুখ স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

কে এম এ কাইয়ুম (১৯৫০) শুরু থেকেই রোমান্টিক ধারার শিল্পী। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকেই অনুপুঙ্খ বাস্তবাদী হিসেবে শিল্পরসিকদের নজরে আসেন। প্রথম দিকে বাংলার গ্রামীণ জনজীবনের কিছু বিষয়কে সমতলীয় এবং সরলীকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া পরাবাস্তববাদী ঢঙে কিছু কাজের উপস্থাপনও লক্ষণীয়। ধীরে ধীরে নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব শৈলীতে থিতু হয়েছেন। তবে সবসময়ই তীক্ষ্ণ মনোযোগে বিষয়ের নিখুঁত উপস্থাপনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি বা কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রকৃতিঘনিষ্ঠ বিষয়ের বিলাসী উপস্থাপন তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এমনকি শুরুতে যখন দালির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরাবস্তববাদী ধারায় মানব অবয়বভিত্তিক শিল্পরচনা করেছেন তখনো তাঁর চরিত্রেরা প্রকৃতিলগ্ন ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়

---

[৪৪০] মইনুদ্দীন খালেদ, ‘শাহাবুদ্দিনের চিত্রশিল্প : গতির উদ্বোধন’, *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, অবসর, ২০০০, পৃ ১৭৩

[৪৪১] জাহিদ মুস্তাফা, ‘ধ্রুপদী গতির শাহাবুদ্দিন’, *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১২১

[৪৪২] নজরুল ইসলাম, ‘শৈল্পিক শক্তিমত্তায় “জয় বাংলা”’, *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯, পৃ ৮৮

মানব অবয়বের বিভিন্ন অংশের সাথে, পাখি, প্রজাপতি, গাছের শাখা-প্রশাখা কিংবা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ঝোপ ইত্যাদি। তাঁর এই প্রকৃতি-নিবিষ্টতার কথা শিল্পী রশিদ চৌধুরী বলেছিলেন এভাবে–

> ...তার দৃষ্টির সহজ সরলতা নির্বোধ প্রকৃতিকে অলৌকিক করে দর্শকের কাছে অবাক প্রশ্ন তুলে ধরে। যে-প্রশ্নের সাথে সুন্দরের সম্মোহন জড়িত। এক কথায় কাইয়ুম নিসর্গবাদী ভাবরাজ্যের প্রকৃত দয়াল শিল্পী।[৪৪৩]

জীবজগতের প্রতি এই আকর্ষণের ফলে পরের দিকে প্রকৃতিজাত অনুষঙ্গগুলোই তাঁর চিত্রতল দখল করেছে পুরোপুরি। খানিকটা স্বপ্নময় আবেশে জনমানব বিবর্জিত নিসর্গের শীতলতায় মোহমুগ্ধ হয়ে চিত্রতল গড়েছেন। আবার কোথাও বিষয়ের কোনো লম্বচ্ছেদ বা প্রস্থচ্ছেদ সদৃশ তলকে নিখুঁত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। ফলে একদিকে তা যেমন ভীষণ অনুপুঙ্খ, অন্যদিকে তেমনই অজানা অচেনা বিভিন্ন ধরনের জৈব আকৃতির রূপবন্ধ একধরনের বিমূর্ততারও উৎসারণ ঘটায়, যা সার্বিকভাবে দৃষ্টিনন্দনও। কাইয়ুমের ছবি মূলত সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। তাঁর চিত্রসম্ভার আমাদের বিক্ষত দৈনন্দিনতায় নিয়ে আসে স্বস্তিময় ও সুখপ্রদ অনুভূতি, আর দর্শনেন্দ্রীয়ের পরিতৃপ্তি।[৪৪৪]

সত্তরের দশকের শেষের দিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে নিজস্ব আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেন শিল্পী অলক রায় (১৯৫০)। চিত্রকলায় স্নাতক এবং ম্যুরাল বিষয়ে স্নাতকোত্তর হলেও ভাস্কর হিসেবেই তিনি দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। ভাস্কর্য তৈরির জন্য বেছে নিয়েছেন এ দেশের বহুল ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে সহজলভ্য উপকরণ মাটি। কিন্তু উপকরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প সৃষ্টির ফলে তাতে যোগ হয়েছে নতুনত্ব। সমাজ ও রাজনীতি-সচেতনতা এবং সংবেদনশীল মানবমনের নানা দ্বন্দ্ব ও হতাশা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর কাজে। তাঁর নিজের ভাষায়,

> আমার চিন্তা ঘিরে নীহার বানু, সালেহা হত্যা কলহ মারামারি, খুনোখুনি আমার তারাভরা আকাশের অন্ধকারে গণিকাদের ভিড়। অন্যদিকে মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙিন মুখোশ পরে। অথচ যাদের সঙ্গে কথা বলি সময় কাটাই সবাই কেমন যেন যন্ত্রণায় ভুগছে।
>
> এ যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতেই মাটিকে কেটেছি, দুমড়িয়েছি– আমার পোড়ামাটির কাজ এ মাটিরই কান্না।[৪৪৫]

ভাস্কর্য তৈরির জন্য মাটিকে রুটির মতো ছেনে এবং পরে তা বেলে সিলিন্ডার আকৃতির বিভিন্ন গড়নে রূপ দেন তিনি। প্রথম দিকে প্রকৃতি ও মানব অবয়বনির্ভর কালো ও লাল রঙের পোড়ামাটির ভাস্কর্য তৈরি করলেও ধীরে ধীরে গড়নের সাথে রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। গড়নে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে প্রতিকৃতি (পূর্বের বাঙ্ময়তা কমে সেখানে অভিব্যক্তিহীন ধ্যানস্ত ভাব বেশি প্রস্ফুটিত) এবং গ্লেজযুক্ত বিভিন্ন বর্ণ ও অলংকরণ নতুন মাত্রা যোগ করে তাঁর শিল্পে।

---

[৪৪৩] আবুল মনসুর, 'সুন্দরের সম্মোহন আর ভাবরাজ্যের দয়াল শিল্পী', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ ১০৫

[৪৪৪] তদেব, পৃ ১০৬

[৪৪৫] মুনতাসীর মামুন, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৭ মার্চ '৮০, পৃ ৩৪

বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পী নিজেদের প্রতিভা আর নবতর সৃজনী উদ্ভাস দ্বারা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন, কাজী গিয়াস (১৯৫১) তাঁদের অন্যতম। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি সে দেশে যান। তখন থেকেই জাপানে বসবাস করলেও স্বদেশের প্রকৃতি তাঁর আত্মায় জাগ্রত। ফলে অনুচ্চকিত জাপানি শিল্পদর্শনের সাথে জন্মভূমির প্রাণ-প্রকৃতি যুক্ত হয়ে তাঁর শিল্পজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি সবসময় তাঁর শিল্পানুপ্রেরণার কেন্দ্রে থেকেছে। তাঁর চিত্রকলা যেন প্রকৃতির নিরন্তর পরিবর্তনের কাব্যিক মানচিত্র। তিনি প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয়তা ও অন্তর্নিহিত বিক্রিয়ায় আগ্রহী। যে বিক্রিয়া প্রকৃতিকে নির্মাণ ও ধ্বংস করে। এই সংগঠনের সূত্রগুলোকে তিনি মূর্ত করে তোলেন জল ও রঙের এক প্রকার স্বগতোক্তিমূলক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে।[৪৪৬] তিনি জল এবং তেলরঙে সমান দক্ষতায় গড়ে তোলেন চিত্রতল। প্রথম দিকে ব্যবহৃত আকারআকৃতিতে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হলেও ধীরে ধীরে তা অপসৃয়মাণ হয়ে অজানা-অচেনা রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ করেন প্রকৃতির রং, রেখা ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন আর নিমগ্ন থেকে সৃষ্টি করেন বুনট। তারপর অমসৃণ তলে স্তরের পর স্তরে স্বচ্ছ রং চাপিয়ে রেখা এবং বুনটের সংমিশ্রণে রচনা করেন নিসর্গের মায়াবী সৌন্দর্য। তাতে ছোট ছোট স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপরিপক্ব শিশুসুলভ পরিচিত ইঙ্গিতময় ড্রইং প্রকৃতি বা স্পেসের বিশালতাকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি সংবেদনশীল বিমূর্তরীতির অনুসারী এবং প্রতীক হিসেবে বাংলা বর্ণমালা, সংখ্যা, কবিতা ও গানের লাইন ব্যবহার করেছেন কখনো কখনো। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধূসর ও অনুচ্চ হৃদয়গ্রাহী রঙের প্রাধান্যই লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। তিনি মিশ্র ও জটিল রঙে বিশ্বাসী। অপ্রচলিত রঙে তাঁর ঝোঁক বিদ্যমান। অনুজ্জ্বল রঙের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে তিনি নন্দন তৈরি করেন।[৪৪৭] এই শান্ত সমাহিত রং আর অসংখ্য বিন্দু-বুনট এবং ছোট ছোট রেখার আঁচড়ে যে সুরেলা নান্দনিক মিথস্ক্রিয়া শিল্পী রচনা করে চলেন, তা আমাদের মনোজগৎকে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অত্যন্ত অল্প বয়সে বাণিজ্যিক শিল্পের সাথে যোগাযোগের ফলে মাধ্যমের ওপর চন্দ্রশেখর দে'র (১৯৫২) নিয়ন্ত্রণ ছিল অসাধারণ। ছাত্রাবস্থায়ই সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে হাতে গোনা যে কয়েকজন শিল্পী চলমান সময়ের সাথে বারবার বদলে নিয়েছেন ক্যানভাসের হিসাব-নিকাশ, চন্দ্রশেখর তাঁদের অন্যতম। শিল্পকর্মের নিজস্ব চরিত্র দাঁড় করানো কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভের চেয়ে বক্তব্য বা নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে তাঁর মনোযোগ। তাঁর ছবি বাস্তবতার সাথে কল্পনার মেলবন্ধন। মানুষ হিসেবে নানা সামাজিক অভিঘাতের সাথে বদলেছে তাঁর প্রকাশভঙ্গি। সে হিসেবে সামাজিক বাস্তবতা এবং তাঁর আত্ম-বাস্তবতার সংশ্লেষে রচিত হয়েছে শেখরের চিত্রের বাস্তবতা বা বিমূর্ততা। কখনো জ্যামিতিক বিমূর্ততায় আবার কখনো সরলীকৃত নানা অবয়বকে

---

[৪৪৬] রনি আহম্মেদ, 'প্রকৃতির মানচিত্র', *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, পৃ ৮১

[৪৪৭] তদেব, পৃ ৮২

উচ্চকিত বর্ণ প্রয়োগে চিত্রতলে সংস্থাপন করেছেন। কখনো তা দখল করেছে নকশাধর্মী কোনো অবয়ব বা বিষয়বস্তু। তবে এত ঘন ঘন আঙ্গিক পরিবর্তনের পরও তাঁর কাজের স্বকীয়তা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি তৈরি করে না; এমনকি রিকশা পেইন্টিঙের আদলে করা কাজেও তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট।[৪৪৮]

ফরিদা জামান (১৯৫৩) সত্তরের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে (১৯৭৮) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সমকালীন শিল্পের ভুবনে আবির্ভূত হন। তাঁর সমসাময়িক অনেকের ক্যানভাসে বিমূর্ততা ভর করলেও শুরু থেকেই এ দেশের মাটি ও মানুষ এবং তার নানা অনুষঙ্গ তাঁর চিত্রপটজুড়ে থেকেছে। তিনি দৃশ্যমান বাস্তবতার এক কল্পিত উপস্থাপনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের আঙ্গিক। বিশেষত শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে তিনি শিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলার জেলে, মাছ, মাছ ধরার জাল এবং জেলেজীবনের সুখ-দুঃখের নানা ঘটনারূপ স্বতঃস্ফূর্ত রেখা এবং স্নিগ্ধ রঙের বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন তিনি। 'ইতিপূর্বে বহু-ব্যবহৃত হলেও তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি চরিত্র অর্পণ করতে সমর্থ হয়েছেন। জালের গঠনের মধ্যে যে নানান রকম ঢেউ, আঁকিবুঁকি, বুনট, সরু-মোটা, রেখা, হালকা আলোছায়ার বিন্যাস রয়েছে প্রধানত তাকে অবলম্বন করেই ফরিদা গড়ে তোলেন তাঁর পট।'[৪৪৯] এর মাধ্যমে তিনি যেন নারীজীবনের আশা-অকাঙ্ক্ষা এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামরত প্রান্তিক মানুষের নিয়ত প্রচেষ্টার প্রতীকী উদ্ভাস রচনা করেছেন। এ ছাড়া বিড়াল, পাখি এবং বালিকা চরিত্র সুফিয়াকে নিয়েও অনেক কাজ করেছেন তিনি। জলরঙের স্বচ্ছতা তাঁকে ভীষণভাবে আবিষ্ট করেছে, ফলে যেকোনো মাধ্যমে কাজ করতে গেলেও রং চাপানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার দিকটি প্রায়ই অটুট থেকেছে। একক লাল, নীল বা খয়েরি রং ব্যবহারে আশ্চর্য পরিমিতিবোধ এবং সুমিত রেখার ব্যবহার তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

পঞ্চাশে নভেরার পর সত্তরের একেবারে শেষ লগ্নে আরেকজন নারী ভাস্করের আগমন দেখা যায়, তিনি শামিম শিকদার (১৯৫১/৫৩)। শামিম শিকদার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন ঢাকা আর্ট কলেজ এবং ইংল্যান্ডের জন ক্যাশ স্কুল অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট থেকে। এ দেশে স্বাধীনতার সপক্ষশক্তির এক চরম প্রতিকূল সময়ে তিনি টিএসসির সড়কদ্বীপে স্বাধীনতার গৌরবগাথা নিয়ে তৈরি ভাস্কর্য 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' স্থাপন করেন। '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত নানা ঘটনাবলি এখানে রিলিফ পদ্ধতিতে তিনি নির্মাণ করেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী চেতনা পরবর্তীকালে এ দেশে ভাস্কর্যচর্চার পথকে অবারিত করেছে। নানা ধরনের সৃষ্টিশীল কাজের পাশাপাশি প্রতিকৃতি তৈরিতেও তাঁর আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

---

[৪৪৮] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৪৫

[৪৪৯] তদেব, পৃ ৪৯

এ দশকের আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন– মনজুরুল হাই (১৯৪৪), মাহবুবুল আমিন (১৯৪৮-২০০১), বীরেন সোম (১৯৪৮), বনিজুল হক (১৯৪৮), আসেম অনসারী (১৯৪৮), কাজী হাসান হাবিব (১৯৪৯-১৯৮৮), মারুফ আহমেদ (১৯৫১) প্রমুখ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা এবং জাতীয় চার নেতার জেল হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার এক নিকষ অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক চরিত্রে প্রত্যাবর্তন করে সামরিক এবং স্বৈরশাসকগণের হাত ধরে। ’৭৫পরবর্তী প্রথম সামরিক শাসকের সময়ে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীনতাবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধেই দ্বিতীয় সামরিক শাসক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং পুরো আশির দশক ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে থাকেন। এই দ্বিতীয় সামরিক জান্তার শাসনকালের শেষের দিকে (১৯৮৮) প্রগতিশীল মতকে পুরোপরি উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উসকে দেওয়ার জন্য ইসলামকে বাংলাদেশের ‘রাষ্ট্রধর্ম’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তবে এ দেশের শিল্প-ইতিহাসের জন্য এটা অত্যন্ত স্বস্তির যে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা বা ক্ষমতার পালা-বদলে এক বা একাধিক ব্যক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেও শিল্পচর্চাকে তারা যেমন খুব উৎসাহিতও করেননি, তেমনি কোনোরূপ বিধি-নিষেধও আরোপ করেননি। যদিও এ সময় ভাস্কর্যশিল্পের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলদের স্পষ্ট বৈরিতাও নজরে আসে। কোথাও কোথাও ভাস্কর্য ধ্বংস করা হয়।[৪৫০] আবার দু-একজন ইসলামিক লিপিচিত্র নির্মাণ করে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করার চেষ্টাও করেছেন। তবু সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শুরু থেকে এ দেশের শিল্পের যে ধর্মনিরপেক্ষতা বা উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা এ দশকেও মোটামুটি বজায় থাকে। সাথে পূর্ববর্তী দশকে সূচিত কর্মোদ্যম এ সময়ে আরও বেগবান হয়। প্রকৃত অর্থে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে সত্তরের দশকের শিল্পচর্চার মূল সুরটিও ছিল জনবিচ্ছিন্ন বিমূর্ততা কেন্দ্রিক রোমান্টিকতা এবং গতানুগতিকতা ও পৌনঃপুনিকতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ। তবে তাঁরা পূর্বের বৈশিষ্ট্যকে আরও মসৃণ, দৃষ্টিনন্দন ও আরও মনোমুগ্ধকর করে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৪৫১] এ সময়ে ‘দেশজ প্রেক্ষাপট ব্যবহার করলেও অবশ্য শৈলীর দিক থেকে তাঁরা প্রধানত বিভিন্ন পশ্চিমা আধা-বিমূর্ত ঢংকেই ব্যবহার করেছেন বেশি। পশ্চিমা মানদণ্ডে আধুনিক শিল্পকে বিচারের প্রচলিত ধারায়ও তেমন কোনো

---

[৪৫০] সিরাজুল ইসলাম কাদির, ‘স্বল্প প্রদর্শনীর বছর’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৮ জানুয়ারি ’৮৮, পৃ ৬৯

[৪৫১] ফয়েজুল আজিম, *চারুকলার ভূমিকা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ ৮৩

ব্যত্যয় ঘটেনি। স্বদেশ অনুসন্ধানেও শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য স্বাদেশিক ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নেওয়া হয়েছে, এ দেশীয় শিল্পদর্শনের মৌলিক উপাদান নিয়ে ভাবনা হয়নি।’[৪৫২]

পশ্চিমা মানদণ্ডে শুধু আধুনিক শিল্পই নয়, বরং নিজেদের সবকিছুই বিচার করার মানসিকতা অদ্যাবধি আমাদের সমাজে বিদ্যমান এবং যা আশির দশকেও বলবৎ ছিল। তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী দশকের গতানুগতিকতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে শিল্প আশির দশকেই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমবারের মতো বৈচিত্র্যময় এবং ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াসে আরও ফলবান ও কার্যকর হয়ে ওঠে। পূর্বের কল্পনাশ্রয়ী বিমূর্ততা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে বলবৎ থাকলেও এ দশকেরই শেষার্ধে শিল্প যেমন বিষয়নির্ভর হয়ে ওঠে, তেমনি অনেক শিল্পী পূর্বের রোমান্টিসিজমের পরিবর্তে ব্যতিক্রমী প্রয়াসে সমকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিকতার প্রেক্ষাপটে চিত্রতল গড়ে তোলেন।[৪৫৩] এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধিৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে–

> সম্প্রতি নবীন চিত্রকরদের কাজের মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা উন্মুখ ও অঙ্গীকারলগ্ন কাজ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অনেকে জোরালো বক্তব্য দেবার চেষ্টা করছেন। ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও বিদ্রূপের সংমিশ্রণে এই নবীন চিত্রকরদের কাজে সীমিত অর্থে হলেও জীবনের ও সময়ের প্রখর তাপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এ-দিক থেকে সহজেই বোঝা যায় বাংলাদেশের এই নবীন চিত্রকররা সময়ের দাবিকে অস্বীকার করেননি। এদের কাজের সরল অভিব্যক্তির মধ্যেও বৈচিত্র্যের স্বরূপ বেশ জোরালো।[৪৫৪]

বস্তুত তাঁরা শিল্পের এত দিনের গৎবাঁধা নান্দনিকতার ধারণাকে পুরোপুরি ভেঙে দিতে সক্ষম হন। শিল্প আবেগ আর কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তবিকতা এবং সমালোচনামূলক নানা ব্যঙ্গ-রসাত্মক বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন-নির্ভর হয়ে ওঠে। সামরিক শাসকের নানা নির্লজ্জপনার ঘটনাও এ সময় শিল্পসৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বুদ্ধির সংশ্লেষে অনেক শিল্পীই এ সময়কে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ–

> আশির দশকে দেখি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে শিল্পে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটেছে এবং পূর্বের শিল্পী যেখানে ঐতিহ্যের বাহ্যিক মোটিফগুলোকে প্রধানত ব্যবহার করেছেন দৃষ্টিনন্দন নকশাধর্মিতায়, সেখানে আশির শিল্পী ঐতিহ্য থেকে শৈলী, বর্ণ ইত্যদিকে নিয়ে সমসাময়িক শিল্পভাষায় প্রয়োগ করতে চাইছেন। আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পধারায় যে হালকা পরিহাস ও রঙ্গরসের ব্যবহার আছে, প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিক শিল্পচর্চায় তাকে কখনো তেমন স্থান দেওয়া হয়নি। আমাদের আধুনিক শিল্প বরাবরই মোটামুটি গুরুগম্ভীর। এ ক্ষেত্রে আশির দশকের কিছু কিছু শিল্পী ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়

---

[৪৫২] আবুল মনসুর, ‘বাঙাল শিল্পীর সৃজন-উদ্যম রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক’, *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১১

[৪৫৩] সিরাজুল ইসলাম কাদির, ‘স্বল্প প্রদর্শনীর বছর’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৮ জানুয়ারি ’৮৮, পৃ ৭০; সিরাজুল ইসলাম কাদির, ‘নবম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ঃ রফিকুন নবীর একাডেমীর পুরষ্কার লাভ’, *বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৫ ডিসেম্বর ’৮৯, পৃ ৮৯

[৪৫৪] চারুবাক, ‘নবীনের কারুকাজ’, *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৬ আগস্ট ১৯৯১, পৃ ৪৬

> দিয়েছেন। তাঁদের কাজে রঙ্গ-রসিকতা, সূক্ষ্ম পরিহাস ও হালকা চালের আড়ালে দ্ব্যর্থবোধক ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে।[৪৫৫]

চিত্রকলা, ছাপচিত্র এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মাধ্যমগত নানা নিরীক্ষার সাথে অতিসাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রবণতাও এ সময়কে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলেছে। সরকারি ও বেসরকারি বা ব্যক্তি-উদ্যোগে নানাভাবে এ সময় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে পূর্বের তুলনায়। তা ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রবণতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ দেশে নিয়মিত আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজনও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ করে। প্রথম দিকে ক্ষুদ্র পরিসরে আয়োজিত হলেও তা আমাদের অধিকাংশ শিল্পীদের বহির্বিশ্বের সমকালীন শিল্পরীতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আবার দশকের প্রথমার্ধেই (১৯৮৩) খুলনার শশীভূষণ পাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়টিকে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে চারুশিল্প চর্চার ব্যাপ্তি আরও খানিকটা প্রসারিত হয়। তবে এ দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হলো বেশ কয়েকজন নারী শিল্পীর আবির্ভাব। এ দেশে শিল্পশিক্ষার প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করলেও আশির দশকের আগে দু-একজনভিন্ন কাউকেই তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু এ সময় এমন অনেকেই যাত্রা শুরু করেন, যারা পরবর্তীতে সমসাময়িক অন্য শিল্পীদের সাথে সমান গুরুত্বে অধিষ্ঠিত। এমনকি ছাপচিত্র এবং ভাস্কর্যের মতো পরিশ্রমসাধ্য এবং অপ্রচলিত মাধ্যমের চর্চায়ও নারীসহ নবীন শিল্পীদের আগমন লক্ষণীয়। তাদের অধিকাংশের কাজের বিষয়বস্তু নারীর জীবন-জগৎ। যদিও 'নারী' বিষয় হিসেবে এ দেশে শিল্পচর্চার শুরু থেকেই উপস্থিত ছিল। তার অধিকাংশই ছিল একটু রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত নারীর রূপ, লাবণ্য এবং যৌবনকেন্দ্রিক। কিন্তু এ দশকেই প্রথম নারীশিল্পীরা সেই রোমান্টিকতার বাতাবরণ ভেঙে বাস্তবতাকে চিত্রতলে উপস্থাপন শুরু করেন। এসব শিল্পী সমাজে তাঁদের অবস্থানের নানামাত্রিক উপলব্ধিকেই শিল্পে উপস্থাপন করেছেন। তাদের অধিকাংশের কাজে বিষয়ের নৈকট্য থাকলেও রূপায়ণের স্বাতন্ত্র্যই তাদের পৃথক করেছে, যা একই সঙ্গে আমাদের শিল্পকে বৈচিত্র্যমণ্ডিতও করেছে।[৪৫৬]

শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর (১৯৫২) আশির দশকের সংবেদনশীল এবং সমাজ ও আত্মসচেতন নিমগ্ন শিল্পীদের অন্যতম। তাঁর চিত্রতলে যে সমাজবাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনারই প্রতিচ্ছবি যেন। খানিকটা প্রতীকী ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে সামাজিক নানা অসংগতি, দলিত ও অন্ত্যজের প্রতি শোষণ ও বৈষম্যকে বিষয়বস্তু করে তিনি শিল্প রচনা করেন। একইভাবে নারীর প্রতি শ্রেণি-বৈষম্য, সামাজিক অসমতা এবং পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁকে নারীবাদীও করেছে। নারীর সামাজিক অবস্থান তাঁকে পীড়িত করেছে। ফলে খানিকটা পরাবাস্তববাদী ধারায় যেন বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর যাপিত

---

[৪৫৫] আবুল মনসুর, 'বাঙাল শিল্পীর সৃজন-উদ্যম রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১১

[৪৫৬] আবুল মনসুর, 'নারীভাবনা, অন্তর্দর্শন ও পরম্পরা', *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ ৪৯০

জীবনের দিনপঞ্জি রচনা করে চলেছেন ক্যানভাসে। তাতে একধরনের উদ্বেগমিশ্রিত শ্লেষের সাথে শিল্পীর অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয় বলিষ্ঠভাবে। আপাতভাবে তাঁর ছবির কাঠামো বা বিন্যাসকে স্বভাবসরল মনে হলেও কেউ যদি এই বিন্যাসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে পরখ করেন, তাহলে তিনি মুখোমুখি হবেন সুনিয়ন্ত্রিত এক শৃঙ্খলার– যার একটি বড় অংশ উৎসারিত হয়েছে ধ্রুপদি শিল্পের মৌল কাঠামো থেকে।[৪৫৭] ছবির রচনা-কৌশলে তিনি সরল ও বাস্তবানুগ হলেও, প্রকাশভঙ্গিতে যে ধরনের পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার তিনি করেন, তা-ই সমসাময়িকদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-সুখকর রঙের ব্যবহার করেন তিনি, যদিও তাঁর কাজের মধ্যে একধরনের বিষাদময়তা বিদ্যমান সবসময়।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে প্রথম থেকেই ব্যতিক্রমী শিল্পী হিসেবে দীপা হকের (১৯৫৩-১৯৯৯) বিশেষ স্থান তৈরি হয় বোদ্ধা মহলে। অবয়বধর্মিতা তাঁর ছবির প্রধান গুণ। 'ঢাকা পেইন্টার্স'-এর সদস্য হিসেবে শুরু থেকেই ঝুঁকেছিলেন প্রকাশ ও পরাবাস্তববাদী ধারার প্রতি। অধিকাংশ সময় মানুষই সেখানে বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে। বিশেষত প্রতিকূল সমাজবাস্তবতায় নারীজীবনের অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-স্বপ্ন, ব্যর্থতা ও হতাশার কথা বলেছেন তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে এবং তুলির দৃপ্ত আঁচড়ে। আবার অসাধারণ রেখাচিত্রে ফিরে ফিরে দেখেছেন নিজেকে। তবে প্রকৃতি ও পরিবেশও উপেক্ষিত থাকেনি তাঁর শিল্পে। ব্যালকনির ফুল, গাছ আর ফুলের টবও বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তাঁর। মারণ রোগের সাথে যুদ্ধ করে প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক রেখেছেন শিল্পের সাথে। যাতে একইসঙ্গে শিল্পের প্রতি স্বল্পায়ু এ শিল্পীর অসামান্য দায়বদ্ধতার প্রমাণও ফুটে ওঠে।

এ কে এম আলমগীরের (১৯৫৩) মূল পরিচয় ছাপচিত্রী হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু চিত্রকলায়। শুরুটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার উপস্থাপনধর্মী হলেও খুব দ্রুতই নির্বস্তুক হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রপট। সেখানে চড়া রঙের বৈচিত্র্যের সাথে রেখার সংযোগে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি (চিত্র ৫৭)। প্রধান অবলম্বন হিসেবে তিনি তাঁর কাজে গ্রহণ করেছেন প্রধানত রঙের জৌলুস বৈচিত্র্য ও বর্ণ-বিভার চমৎকারিত্বের দিকগুলো, দ্বিতীয়ত রেখা ও আকার-সকলের গতিশীল ও ছান্দিক রূপ-চারিত্র্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ।[৪৫৮] আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী হলেও তাঁর কোনো কোনো কাজে আকারে, গড়নে কিংবা রেখাচিত্রে চেনা পরিচিত নানা বিষয়বস্তুর আদল ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। বাস্তবের আভাসদায়ী এসব ভাঙা ভাঙা রেখাচিত্রগুলোতে শিশুচিত্রের সাযুজ্য ও সারল্য লক্ষ করা যায়।

মোমিনুল রেজা (১৯৫৩) প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ জিনিসপত্র যেমন ঘুড়ি, কাপড় শুকানোর ক্লিপ, হ্যাঙ্গার ইত্যাদিকে ব্যবহার করে দৃষ্টি-সুখকর সব বিন্যাস রচনা করেছেন।

---

[৪৫৭] ঢালী আল মামুন, 'বাস্তবতা যেন উপাখ্যানের সমান্তরাল', *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৫, পৃ ৮৩

[৪৫৮] মতলুব আলী, 'রঙ ও রেখায় আলমগীরের শিল্প-অন্বেষা', ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সাজু আর্ট গ্যালারিতে শিল্পীর ১২১ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ক্যাটালগে প্রকাশিত

নাইমা হক (১৯৫৩) যেন কখনো বিশুদ্ধ বিমূর্ত আবার কখনো অর্ধ-বিমূর্ত রীতির সূক্ষ্ম দোলাচলে শিল্প রচনা করেন। হালকা বর্ণ প্রলেপের সাথে সামান্য রেখার আঁকিবুঁকিতে পরিচিত কোনো বিষয়ের আদল ছেড়ে যান বক্তব্যের সপক্ষে। কখনো কখনো লোককলার রীতিতে নারীর যাপিত জীবনের গল্পও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর তুলিতে। এ ছাড়া তিনি কোলাজ মাধ্যমেও প্রচুর শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশে বিমূর্ত চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনে পরবর্তী প্রজন্মের যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ ইউনুস (১৯৫৪) অন্যতম। শুরুতে দৃশ্যমান বাস্তবের অনুপুঙ্খ বাস্তবায়নে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। সে পর্বে তেলরঙে শৈশবের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে শুরু করে ভগ্নপ্রায় স্থাপত্যের বিভিন্ন অংশ, ব্যালকনি, গলি-ঘুঁপচি ইত্যাদি সুনিপুণ দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে বিষয়ের জ্যামিতিক বিন্যাসে বিমূর্ততার দিকে তাঁর যাত্রা। রং, রেখা এবং বুনট তৈরির মুনশিয়ানার সাথে কখনো বা পরিত্যক্ত এবং খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ঘটিয়েছেন তাঁর কাজে। তবে চারপাশের প্রকৃতি এবং পরিবেশজাত অভিজ্ঞতালগ্ন থেকেছেন সবসময়। তাঁর বিমূর্ততায় রোমান্টিকতার সাথে কখনো কখনো হঠাৎ বাস্তবের ছায়াও লক্ষ করা যায়। এই দেশ– তার প্রকৃতি, বৈপ্লবিক ইতিহাস এবং বর্তমানই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে শিল্পীর চেতনায়। রং, রেখা এবং বুনটের যূথবন্ধনে তিনি এসবেরই কাব্য রচনা করে চলেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতিভাবান শিল্পীদের অন্যতম শিল্পী তরুণ ঘোষ (১৯৫৪)। ছাত্রাবস্থায়ই বাস্তবরীতির কাজে দক্ষতার জন্য শিল্পরসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমকালীন বিশ্বশিল্পের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি, বিশেষত স্যুরিয়েলিজম তাঁর চৈতন্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় সমাজবাস্তবতা এবং জীবনের নানা অনুষঙ্গকে উপজীব্য করলেও পরবর্তীকালে লোকজীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে লোকজ বিষয়-নির্ভর শিল্প রচনা করেছেন। এই লোকশিল্পের সারল্যই ধীরে ধীরে তাঁকে বিমূর্ততায় উত্তরিত হতে সাহায্য করেছে। আমাদের দেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যলগ্ন হয়ে নিরন্তর শিল্প সৃষ্টি করেছেন তিনি। বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন বেহুলা ও মনসার মতো ঐতিহ্যাশ্রয়ী জনপ্রিয় চরিত্রকে। বেহুলার ফর্মে আছে অবয়বের আভাস, চোখের চাউনি, ছন্দোময় রেখার ইতিউতি, আর অসংখ্য রেখা ও বিন্দুর প্রয়োগ, আর কিংবদন্তির হিংস্র মনসাকে তিনি সুন্দর ও কামনা-মদির করে সৃষ্টি করেছেন।[৪৫৯] বস্তুত কাহিনিকে সরাসরি না এঁকে, এসবের মধ্যে তিনি এঁকেছেন বোধ ও অনুভূতিকে। কাজে রেখার বলিষ্ঠতা, আকার-আকৃতি, বুনট ও রঙের ব্যবহার তাঁর শিল্পকে অনন্য করেছে। কিংবদন্তির সাথে সমকালীন আধুনিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া সমমনা বন্ধুদের সাথে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা পেইন্টার্স' গঠন করে সংগঠক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

---

[৪৫৯] জাহিদ মুস্তাফা, 'কিংবদন্তি নিয়ে শিল্পের পথচলা', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৯৪

খেয়ালি শিল্পী কাজী রকিব (১৯৫৫) কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে নিবদ্ধ না হয়ে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ছাপচিত্রের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন, এমনকি স্থাপনা এবং সূচিশিল্পও করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা শৈলী তাঁর অভীপ্সা নয়। শিল্পের কুটিল রাস্তায় প্রতিষ্ঠা লাভের মোহ নয়, বরং খেয়ালি মনের সৃষ্টির তাড়নাকে প্রসব করে আনন্দ লাভই তাঁর যাত্রার লক্ষ। তাই শিল্প রচনার মাধ্যম নিয়ে যেমন নিরন্তর নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তেমনি বক্তব্য বা বিষয়ের প্রয়োজনে আঙ্গিকের পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন অনায়াসে। বিমূর্ত, অর্ধ-বিমূর্ত, বাস্তববাদী, পরাবাস্তববাদী বিভিন্ন রীতিতে তাঁর বিচরণ দেখা যায়। কখনো কখনো শুধু রং ও রেখার বিন্যাসের চেয়ে কোনো বক্তব্য বা গল্প বলার প্রবণতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন; আবার কখনো রং-ই সয়ম্ভূ। সেজন্য বিশেষ কোনো ছকে বা রীতি-পদ্ধতিতে তাঁকে নির্দিষ্ট করা সহজ কাজ নয়। তাই সমালোচক আবুল মনসুর বলেছেন, 'এর মধ্যে হয়তো একটি ঐক্যসূত্র লক্ষ করা যেতে পারে– সেটি হচ্ছে কাজী রকিবের অনুসন্ধিৎসা এবং নিরীক্ষাপ্রবণতা'।[৪৬০] তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু দেশ-কাল ও সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত।

জামাল আহমেদের (১৯৫৫) বিশেষত্ব তাঁর রেখাচিত্র এবং জলরঙের স্বাতন্ত্র্যে। মাধ্যমের অভিনব প্রয়োগ ও সৃষ্টিশীলতার চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এ দেশের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর বিষয়বস্তুর সহজ-সরল উপস্থাপন খুব সহজেই সব শ্রেণির দর্শককে আকর্ষণ করে। শ্যামল বাংলার অনবদ্য নৈসার্গিক সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে এবং আলো-আঁধারির মায়ায় ক্যানভাসে সাধারণ মানুষের সাদামাটা যাপিত জীবনের মহাকাব্য রচনা করেন তিনি। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে মানুষই তাঁর বিষয়বস্তু থেকেছে অধিকাংশ সময়। রং-রেখায় নগরের ফুটপাতের প্রান্তিক বাসিন্দা থেকে অভিজাত সুন্দরী রমণী পর্যন্ত তাঁর তুলিতে আশ্রয় লাভ করেছে। নারীর সৌন্দর্যে তিনি যে কতটা বিমোহিত, তা তাঁর শিল্পকর্ম দেখলে বোঝা যায়। নারীদেহের অতীন্দ্রীয় সৌন্দর্যকে তিনি বর্ণনা করেছেন মুগ্ধচিত্তে। যেন নিজের অন্তর্গত বাসনা বা অভিজ্ঞতা প্রকাশে তিনি নিঃসঙ্কচিত্ত। এ প্রসঙ্গে মইনুদ্দীন খালেদের মন্তব্য–

> নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, কাদাজলমাখা কর্মিষ্ঠ মানুষ আর বিশেষ করে নারী দেহের বিচিত্র ব্রীড়ায় মোহাবিষ্ট হয়ে আছেন জামাল। তার তুলি রূপের জন্য তৃষ্ণার্ত। সেই তুলি থেকে নানা খেয়ালে রং ঝরে পড়ে। কখনো তার চিত্রতলে নারীর ব্রীড়া ও ভঙ্গিতে যৌবন-জ্বালা উচ্চকিত, কখনো বা কামবাসনা-উত্তীর্ণ অধরা মাধুরীও সংগুপ্ত রয়েছে তার কাজে।[৪৬১]

বস্তুত কম্পোজিশনে ঠাসবুনুনি এবং বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁকে দর্শকপ্রিয় করেছে।

---

[৪৬০] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৫০

[৪৬১] মইনুদ্দীন খালেদ, 'বাসনার রক্তিম রূপায়ণ', *জামাল*, ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০১০, পৃ ৩৭

সত্তরের শেষে ছাত্রাবস্থা থেকেই খানিকটা লোকজ রীতিপুষ্ট নকশাধর্মী শিল্প সৃষ্টি করলেও দৃষ্টি-সুখকর নানান রং ও রেখার বিন্যাসে শিল্পী রণজিৎ দাস (১৯৫৬) সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন আশির দশকের শুরুতেই। তাঁর শিল্পজগৎ বাস্তবতা-বিবর্জিত নয়। আমরা যে সমাজে বসবাস করছি, আমাদের জীবনে রয়েছে যে অনিশ্চয়তা, নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট, জীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসা– সবকিছু রণজিৎ ধারণ করেছেন তাঁর শিল্পে।[৪৬২] প্রথম দিকে শহুরে জীবনের নানা অনুষঙ্গ, বিশেষত ঘনসন্নিবিষ্ট ঘর এবং তার পরিবেশকে মোটা তুলির দ্রুতচালে ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। খানিকটা বিমূর্ত ঘরানার সে চেষ্টায় মানুষের অস্তিত্ব উপেক্ষিত হলেও স্থাপত্যিক কাঠামোর বিন্যাসে যে জ্যামিকতার প্রতিভাস রচিত হয়েছে, পরবর্তীতে তা যেমন স্পষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি লাভ করেছে, তেমনি সেখানে অনিবার্যভাবেই এসেছে মানুষ বা মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। তাঁর শিল্পকর্মে সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ রূপকধর্মী বক্তব্যও লক্ষ করা যায়। ছোট ছোট জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা মানব অবয়বের বিভিন্ন অংশ যেন মানুষের জীবনযন্ত্রণা, প্রাপ্তি ও হতাশার নানা খণ্ডচিত্রকে তুলে ধরে। সমকালের বিশ্লিষ্ট, বিক্ষত, বিখণ্ডিত ও বহুমাত্রিক জীবনের একটি শক্তিমান রূপক যেন প্রতিভাত হয়ে ওঠে এ ধরনের উপস্থাপনায়। চিত্রকলার দ্বিমাত্রিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যক্তিমানসের আর্ত অবস্থান এতে যেন একটি জুতসই অভিব্যক্তি পায়।[৪৬৩] প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিলেও হাতি, ঘোড়া, কুকুরসহ নানা প্রাণীর সাবলীল উপস্থিতিও দেখা যায়। তেলরঙের স্বতঃস্ফূর্ত আঁচড়ে, দক্ষ প্রবহমান ও বলিষ্ঠ রেখায় এবং ঘননিবদ্ধ বুনটে তিনি নিজের নির্মাণকে বাঙ্ময় করে তোলেন।

নাসরীন বেগম (১৯৫৬) প্রথম দিকে প্রাচ্য রীতির প্রথানুগ শিল্প রচনা করলেও খুব দ্রুতই নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিকে প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রাচ্যরীতির অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তাঁর কাজের পার্থক্য এই যে, তাঁর প্রকৃতি এবং মানব চরিত্ররা এই মাটির, এই প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা; স্বর্গের সুর-সুন্দরী বা নন্দনকাননের কিছুই তাতে নেই। বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে খানিকটা রোমন্টিক ভাবালুতা এবং একধরনের আলংকারিকতা বিদ্যমান। প্রকৃতি এবং মানুষই তাঁর ছবির প্রাণ। এই বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুই শিল্পী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেন। তা থেকে বাদ যায় না অতি ক্ষুদ্র ফুলের রেণু, পানির ফোঁটা, ঘাস, পাতা, শামুক, ঝিনুক এমনকি পিঁপড়ারাও। যেন নিমগ্নচিত্তে শিল্পী এ বিশাল প্রকৃতি ও মানবজীবনের রহস্যময়তার স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ ঘটিয়ে চলেছেন। তবে প্রাচ্যরীতির ব্যাকরণগত পদ্ধতি মেনে চলার ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক, ধীর। প্রতিটি রেখা, রং এবং আকার-আকৃতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর মনোযোগ অভ্রান্ত। তাঁর স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল জলরঙের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ এবং অন্তর্গত চেতনার বিন্যাস শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করে। ঐতিহ্যের সাথে সমকালীন জীবনবোধের যুগপৎ সম্মিলন, যা বর্ণিলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর তুলির ছোঁয়ায়।

---

[৪৬২] সিরাজুল ইসলাম কাদির, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৪ আগস্ট'৮৯, পৃ ৫৬

[৪৬৩] আবুল মনসুর, 'রণজিতের চিত্রকর্ম : পশ্চাৎভূমি ও অবয়বের সম্পর্কসূত্র', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৯, পৃ ৮৬

রুহুল আমিন কাজল (১৯৫৬) প্রথমে মৃৎশিল্পে এবং পরে চিত্রকলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শুরু থেকেই শিল্পের গতানুগতিক সৌন্দর্যের রীতিকে পাশ কাটিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তিনি। কিছুটা ফোভিস্টদের মতো, তবে বাহুল্যহীন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে প্রথম দিকে শিল্প রচনা করেছেন।[৬৬৪] পরবর্তীতেও অনেকদিন একই ধারার অনুবর্তী থেকেছেন। সমাজ এবং মানুষই বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে তাঁর কাজে। মানব অবয়বের নানা অভিব্যক্তি, ব্যক্তির অর্ন্তগত অভীপ্সা এবং সমাজের নানা অসংগতি, ভণ্ডামি এবং ধর্ম ও রাজনীতির নানা কুটিল বিষয় তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু। ডেনমার্ক প্রবাসী হওয়ার পর তিনি 'ট্রাফিক আর্ট' করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। এজন্য গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ডেও তাঁর নাম রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি বিশাল আয়তনের সব ট্রাফিক আর্ট করে থাকেন। এ ধরনের শিল্প রচনার ক্ষেত্রে বাংলার অলংকরণ-ঐতিহ্য আলপনার আদলে উজ্জ্বল রং এবং লোকজ ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করেন। এর পাশাপাশি পাথর, কাঠ ও বাঁশের ভাস্কর্য নির্মাণ করেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভাস্কর্যচর্চা শুরু হওয়ার পর থেকেই (ভাস্কর্য তৈরির) মাধ্যম হিসেবে কাঠ খানিকটা অবহেলিতই থেকেছে। এই বিস্মৃতপ্রায় শিল্পমাধ্যমটিকে শিল্পী রাসা সিদ্দিকী (১৯৫৭) একক প্রচেষ্টায়, নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা আশির দশকে আবার সম্মানের আসনে আসীন করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক জয়ের মাধ্যমেই মূলত আলোচনায় আসেন শিল্পশিক্ষার মূল স্রোতের বাইরে থেকে আসা এ শিল্পী। প্রথমে মাটিতে শুরু করলেও খুব দ্রুতই ছন্দ খুঁজে নেন কাঠে। কাঠের বুক কুঁদে তৈরি করেন জীবনের নানা প্রতিচ্ছবি। সেসব কাজের অধিকাংশতেই মানব অবয়বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয় তাঁর কাজে। পোড়খাওয়া, মারখাওয়া সংগ্রামী মানুষ এবং তাদের সংগ্রামই তাঁর প্রধান বিষয়।[৬৬৫] কাঠ ছাড়া মাটি, সিমেন্ট, বালি, লোহা ও পাথরের কুচি দিয়েও তিনি শিল্পকর্ম রচনা করেছেন।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে যারা এ দেশের শিল্পভুবনকে নিরন্তর সমৃদ্ধ করে চলেছেন, রোকেয়া সুলতানা (১৯৫৮) তাঁদের অন্যতম। 'নারী শিল্পী' বলে যে করুণামিশ্রিত সম্মান আমাদের কলাজগতে প্রচলিত আছে, সে সম্মানের ধারাপাতকে ছুড়ে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছেন 'শিল্পী' পরিচয়ে। ছাপচিত্রী হিসেবে শুরু করলেও খুব দ্রুতই নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ চিত্রী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তেল ও জলরঙে কাজ করলেও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় টেম্পেরাতে। মাধ্যমের অস্বচ্ছতার দুর্নাম ঘুচিয়ে জলরঙের মতো স্বচ্ছতায় টেম্পেরার ব্যবহার করেছেন। ছন্দোময় রেখা ও রং ব্যবহারের নিজস্বতা তাঁকে বিশিষ্ট্য করেছে। আর বিষয়বস্তু হিসেবে নারী এবং মাতৃত্বের সাথে প্রকৃতি, জগৎ এবং

---

[৬৬৪] সলিমুল্লাহ খান, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১১ জুলাই, ১৯৮৬ (পৃ নং সেলাইয়ের মধ্যে পড়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।)

[৬৬৫] শওকত আলী, 'রাসা', *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ*-৩৭, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৭

নানা জটিল মানবিক সম্পর্কের উদ্ভাস রচনা করেন তিনি খানিকটা রোমান্টিক ভাবালুতা ও উজ্জ্বল বর্ণবিভায় (চিত্র ৫৮)। বিভিন্ন রঙের পরতের পর পরত জমে সৃষ্টি হওয়া বিমূর্ততার মাঝে ললিত রেখায় ভেসে ওঠে তাঁর চরিত্ররা। বিশেষত তাঁর নারী চরিত্ররা সাহসী ও নিঃশঙ্কচিত্তে এসেছে জায়া ও জননীর ভূমিকায়। যাপিতজীবনের প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া জীবনবোধ তাঁকে তাড়িত করে বলেই তাঁর সৃষ্টিও হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী।

আশির দশকে পূর্ববর্তীদের রোমান্টিক ধাঁচের বিমূর্ত এবং নকশাভিত্তিক শিল্পকে পুরোপুরি অস্বীকার করে উন্মাতাল সময়কে বিবেচ্য করে শিল্প রচনাকারী 'সময়' শিল্পীদলের অন্যতম সদস্য ঢালী আল মামুন (১৯৫৮)। শুরু থেকেই প্রথাগত বাস্তবতাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করার পরিবর্তে নিয়ত তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর সৃষ্টি লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা। প্রকাশভঙ্গির এই ভিন্নতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। সামাজিক নানা অসংগতি ও রাজনৈতিক নির্লজ্জতার বিভিন্ন ঘটনাকে শিল্পোপজীব্য করে নিজের রাজনীতি ও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী। আবার এ দেশীয় লৌকিক আখ্যানকে যেমন স্থান দিয়েছেন, তেমনি অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধমান-নিপীড়িত মানুষের চিত্রকেও ক্যানভাসে তুলে এনে নিজের শিল্পসত্তাকে মানবকল্যাণ ও সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[৪৬৬] মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। আয়তাকার ক্যানভাস বা বহুল ব্যবহৃত দ্বিমাত্রিক পটকে পরিহার করে শিল্পী সময়ের সাথে সাথে বারবার বদলে নিয়েছেন তাঁর শিল্প সৃষ্টির মূল উপাদানকে। বর্তমানে তিনি চিত্রকলা ছাড়া আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র, শব্দ এবং আলোক প্রক্ষেপণকেও ব্যবহার করছেন বক্তব্যের যথার্থ প্রকাশ এবং নিজেকে অতিক্রমের প্রয়াসে।

সুলতানুল ইসলাম (১৯৫৮) শুরু থেকে বাস্তবানুগ ধারায় ভাস্কর্য রচনা করেছেন। শিশুদের বিষয়বস্তু করে কাজ করার জন্য আশির দশকে পরিচিতি লাভ করেন এই শিল্পী।

মৃণাল হক (১৯৬০) শুরুতে চিত্রকলার চর্চা করলেও মূল পরিচয় একজন ভাস্কর হিসেবে। নানা ধরনের খুঁজে পাওয়া ধাতব সামগ্রী যুক্ত করে শিল্প নির্মাণ করে প্রশংসিত হয়েছেন। বিশেষত সাইকেলের চেইন এবং পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে নগরের শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র তৈরি করেছেন। এ ছাড়া নানা ধরনের ফরমায়েশি কাজও লক্ষ করা যায় তাঁর।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং মাধ্যমের কৌশলগত দক্ষতায় যারা নিজেদের আলাদাভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন জি এস কবির (১৯৬০) তাদের একজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তিনি শিল্পবোদ্ধাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। শুরু থেকেই নিরীক্ষাপ্রবণ এই শিল্পী প্রথম দিকে সমাজের পঙ্কিলতা ও মানবিকতার অবক্ষয়ের নানা দিক তাঁর

---

[৪৬৬] নাসিমুল খবির ডিউক, 'যোগ ও বিয়োগের যুগলবন্দী', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, পৃ ৯০

চিত্রতলে উপস্থাপন করেছেন।[৪৬৭] চিত্রের পটভূমি প্রস্তুতের জন্য মসৃণ সমতলীয় রঙের তলের ওপরে কখনো ক্রমশ বিলীয়মান অন্য রঙের আস্তরণ ব্যবহার করেছেন। কখনো বা তাতে যোগ করেছেন বুনট এবং বাস্তব উপকরণের আদল কিংবা বিমূর্ত কোনো রেখাচিত্র বা আকৃতি, যা একই সাথে একধরনের নাটকীয়তারও জন্ম দেয়। রং ব্যবহারের এই পরিমিতি এবং প্রয়োগরীতি তাঁকে সমকালীনদের থেকে আলাদা করেছে।[৪৬৮] পরবর্তী সময়ে রং, রেখা এবং বুনটের সুসংহত বিন্যাসে পুরোপুরি বিমূর্ত হয়ে উঠলেও তাঁর চিত্রজমিন সবসময় পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতালগ্ন থেকেছে।

শিশির ভট্টাচার্য (১৯৬০) প্রচলিত রীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা আশির দশকের নন্দিত শিল্পীদল 'সময়'-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সময়ের অন্য সদস্যদের মতো তিনিও শুরু থেকে দৃষ্টিসুখকর শিল্প নির্মাণের এ দেশীয় রীতির বিরোধিতা করেছেন এবং সমাজ ও মানুষের প্রতি শিল্পের দায়কে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব আঙ্গিক। তাঁর কাজ চিত্রশিল্পের আপাত গাম্ভীর্যকে ভেঙে কৌতুক সৃষ্টি করে। ছবিতে মানব শরীরের আদলে সৃষ্ট তাঁর চরিত্ররা কল্পিত ও অতিরঞ্জিত এবং হাস্যরস উৎপাদক। চিত্রপটে উপকরণ ছড়িয়ে দিয়ে চিত্রে 'ফোকাল পয়েন্ট' নির্মাণের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করেন তিনি। সরাসরি ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও বিদ্রূপের সংমিশ্রণে অন্যায়, অবিচার, অসংগতির বিরুদ্ধে বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন নিজস্ব শৈলীতে। তবে সমাজবাস্তবতা তাতে উপেক্ষিত থাকে না। বরং তাঁর অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমাজের তীব্র অন্ধকারের মধ্যে এমন বৈসাদৃশ্য খুঁজে ফেরে, যা একাধারে বাস্তবতার আলেখ্যে আলোকোজ্জ্বল আবার অন্যদিকে অপার কৌতুকপ্রবণ।[৪৬৯] জীবনের ও সময়ের নানা অসংগতি, রাজনীতির নানা নির্লজ্জ ও কুটিল হিসাব-নিকাশের বিভিন্ন বিষয়কে শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিজের সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতি-সচেতনতারও পরিচয় রেখেছেন তিনি। আর এভাবে নিজেকে একজন সচেতন মানবতাবাদী শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু, বিক্ষুব্ধ একসময়ের প্রতিনিধি শিল্পী দিলারা বেগম জলি (১৯৬০)। ফলে রাজনীতি এবং সমাজ-সচেতনতা বরাবরই তাঁর শিল্পকর্মে উপস্থিত। বৈশ্বিক সন্ত্রাস, আগ্রাসন, সহিংসতা বিশেষ করে নারীর সামাজিক অবস্থান, বৈষম্য, নির্যাতন, অবিচার, আনন্দ, দ্রোহ ইত্যাদি তাঁর শিল্প সৃষ্টির মূল উপজীব্য (চিত্র ৫৯)। এসবের মাধ্যমে চিত্রপটে একধরনের ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণ করেন তিনি। কখনো কখনো লোকজ আখ্যানের নানা বিষয় ও আঙ্গিক তাঁকে প্রভাবিত করে।[৪৭০] তাঁর শিল্প সৃষ্টির আঙ্গিক সরল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনুভূতিময়। শুরুতে ছাপচিত্রী হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও,

---

[৪৬৭] মতলুব আলী, 'প্রত্যাখ্যান', *শিল্পতরু*, ৩য় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ ৯২

[৪৬৮] জাহিদ মুস্তাফা, 'জি. এস. কবিরের একক', *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৯ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ ৪১

[৪৬৯] রবিউল হুসাইন, 'শিশিরের রৈখিক ভ্রমণ গীতল দৃশ্যকাব্য ও তার প্রতিরূপ', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, পৃ ৯১

[৪৭০] জাহিদ মুস্তাফা, 'শিল্পে বর্ণে ঐকতান', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ ১১৩

ধীরে ধীরে চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া তিনি ভাস্কর্য, স্থাপনা এবং পরিবেশনা মধ্যমেও শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

সমকালীন চিত্রকলায় বাস্তবানুগ রীতিতে শিল্পচর্চাকারীদের অন্যতম শিল্পী শেখ আফজাল (১৯৬০)। শুরুতে উজ্জ্বল রং এবং অর্ধ-বিমূর্তরীতি দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও জাপানে শিল্পশিক্ষা শেষে হয়ে ওঠেন নিখুঁত সাদৃশ্যবাদী। যেকোনো বিষয়ের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনই তাঁর লক্ষ হলেও মূলত নাগরিক নিম্নবিত্তদের সংগ্রাম, জীবন-যাপন ইত্যাদি সংবেদনশীলতার সাথে তুলে ধরেন। নিজের শৈশবে দেখা কৃষিপ্রধান বাংলার ভূ-প্রকৃতি, ফসলের মাঠ, নদী-নৌকা, চর ও চরের মানুষ, নারী ও শিশু ইত্যাদি তাঁর বিষয়বস্তু।[৪৭১] আরও নির্দিষ্ট করে বললে, প্রধানত শ্রমজীবী শিশু এবং নারীর উপস্থাপনা তাঁর কাজের একটি বিরাট অংশজুড়ে উপস্থিত। এর মাধ্যমে সমাজের ব্রাত্যজনের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়, তা শিল্প সম্পর্কে তাঁর সুস্থ চিন্তারই প্রতিফলন। আবার রং ব্যবহার, অঙ্কন-দক্ষতা এবং চিত্রপটে বুনট সৃষ্টির মুনশিয়ানা তাঁর শিল্পকৃত্যকে অনন্য মাত্রা দান করে। ক্যানভাসে সৃষ্ট রুক্ষ বুনটের সামনে চরিত্রকে স্থাপন করে যেন তাদের জীবনসংগ্রামের নিষ্করুণতার কথা দর্শককে মনে করিয়ে দেন তিনি। সৃজনশীল শিল্প ছাড়া দেশের প্রধানতম প্রতিকৃতি আঁকিয়েদেরও তিনি অন্যতম।

একজন গবেষক ও সমাজ/শিল্প-তাত্ত্বিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান হলেও শিল্পী হিসেবে সমাজের প্রতি শিল্পের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বরাবরই সচেতন নিসার হোসেন (১৯৬১)। 'সময়'-এর অন্য সদস্যদের মতো তিনিও জীবন ও সময়ের দাবিকে অস্বীকার করেননি কখনোই। তাই জনবিচ্ছিন্ন ও সমাজবাস্তবতা-বিমুখ রোমান্টিক ঘরানার 'নির্বস্তুক' শিল্পকে গ্রহণ করেননি কখনো। বরং প্রচলিত রীতির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বেছে নিয়েছেন অপ্রচলিত নিজস্ব আঙ্গিক। তাঁর ছবি রং-রেখার মিলিত উচ্ছ্বাসের কোনো প্রণয়োপাখ্যান নয় বরং তা যেন বাস্তবতা থেকে উৎসারিত এক ভয়ংকর সময়ের রূপকল্প। তাঁর শিল্পে জীবনের বিষাদময়তা এবং রূঢ়তার দিকটি চরমভাবে উঠে অসে। নিষাদকালের যাত্রী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতাই যেন চিত্রতলে নেমে আসে ভয়াল দানবের মতো। যেন এক দানবীয় ধ্বংসাত্মক সময়ের নির্মম রূপ তিনি ফুটিয়ে তোলেন ক্যানভাসে, জাগতিক অস্তিত্বের সকল মানবীয় বোধ যেখানে লুপ্ত।[৪৭২] অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সুন্দরের তীব্রতার ক্ষুধাকে দর্শকের বোধে জাগিয়ে তোলার জন্য সাম্প্রদায়িকতা, অমানবিকতা এবং অসুন্দর অপশক্তিকে আঁকেন তিনি। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এক অসাম্প্রদায়িক মানচিত্র নির্মাণই উদ্দেশ্য এই স্ব-কাল সচেতন শিল্পীর।

---

[৪৭১] জাহিদ মুস্তাফা, 'বাস্তবানুগ ছবির অনন্য জগৎ', *শিল্পসাহিত্য* (দৈনিক প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র), ২২ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ ২

[৪৭২] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৫৩

ছাপচিত্র মাধ্যমের সুপরিচিত শিল্পী হলেও একইসঙ্গে চিত্রকলা, ধারণানির্ভর শিল্পেরও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান (১৯৬১)। শুরুতে 'সময়'-এর অন্য সদস্যদের মতো সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ও দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের সরাসরি উপস্থাপন-নির্ভর শিল্প রচনা করলেও কিছুকালের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পশিক্ষা অনুরণিত করে তাঁর শিল্পভাবনাকে। জেন দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ধীরে ধীরে নির্বস্তুক হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রতল। এ ছাড়া ভারতীয় দর্শনের 'ত্যাগ' ভাবনা, বাউলদের জীবন্ত মরার ধারণা ও আধুনিক শিল্পের মিনিমালিজমের ধারণাই ওয়াকিলের চিত্রতল বিনির্মাণের মূল উপাদান।[৪৭৩] ছোট ছোট জ্যামিতিক আকৃতির সাথে যৎসামান্য রং আর রেখার আঁকিবুঁকিতে বিধৃত করেন মানুষে মানুষে সম্পর্ক, প্রাত্যহিক জীবন যাপন এবং সময়কে। সব মিলিয়ে একধরনের শূন্যতার ধারণাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পে (চিত্র ৬০)।

নিলুফার চামান (১৯৬২) এ দশকের শেষ নাগাদ আবির্ভূত সাহসী শিল্পীদের অন্যতম। শুরুর দিকে জ্যামিতিক বিন্যাসে বাস্তব অবয়ব-নির্ভর সাদাকালো কিংবা একরঙে বেশি শিল্প রচনা করলেও ব্যতিক্রমী উপস্থাপনভঙ্গির জন্য কলারসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। ধীরে ধীরে তাঁর কাজে রঙের তীক্ষ্নতা ও ঔজ্জ্বল্য যেমন বেড়েছে, তেমনি সাথে যোগ হয়েছে কম্পোজিশন এবং ড্রইংয়ের সারল্য। বিষয়ের গড়নও আরও পরিণত হয়েছে ত্রিমাত্রিক থেকে দ্বিমাত্রিক হয়ে। দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে ভাসমান সরল সব জৈবিক বা প্রতীকধর্মী আকার-আকৃতির উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নান্দনিকতার প্রথাবদ্ধ রীতিকে উপেক্ষা করে বক্তব্য প্রকাশের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া সমসাময়িক স্থাপনা ও পরিবেশনা শিল্পমাধ্যমেও তিনি মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস, আনন্দ-বেদনা এবং সামাজিক নানা অসংগতি ফুটিয়ে তোলেন।

অবার নাসিম আহমেদ নাদভী (১৯৫৪) নিসর্গ দৃশ্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থাপনে মগ্ন বরাবরই। শুরুতে রঙিন হলেও ধীরে ধীরে সাদা-কালোয় থিতু হয়েছেন তিনি। আহমেদ শামসুদ্দোহা (১৯৫৬) শুরু থেকেই ভূ-দৃশ্য বা বাংলাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ করে খ্যাতি লাভ করেন। পরে তাতে পরাবাস্তববাদী বৈশিষ্ট্য সহযোগে নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করেছেন। শাহাদাত হুসেন (১৯৫৫) শুরুতে ছাপচিত্রী হিসেবে শুরু করলেও প্রবাসী হওয়ার পর চিত্রশিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তাজুদ্দিন আহমেদ (১৯৫৫) প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা বিষয়াবলি, লোকজ রীতির নানা রূপবন্ধ এবং বিমূর্ত আকার-আকৃতি ব্যবহার করে বিমূর্ত এবং অর্ধ-বিমূর্ত রীতিতে শিল্প রচনা করেছেন।[৪৭৪] তাৎক্ষণিক প্রকাশরীতিতে মুর্শিদা আরজু আলপনা (১৯৬১) সময় ও প্রকৃতিলগ্ন থেকেছেন সবসময়। এ ছাড়া এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের মধ্যে শওকাতুজ্জামান (১৯৫৩-২০০৫), ফারেহা জেবা (১৯৬১), ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা (১৯৬১), আতিয়া ইসলাম অ্যানি (১৯৬২), গৌতম চক্রবর্তী (১৯৬৫), ফকরুল

---

[৪৭৩] ওয়াকিলুর রহমানের বক্তব্য, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি কায়ায় অনুষ্ঠিত 'ওমিশন অ্যান্ড এডিশন' শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে প্রকাশিত

[৪৭৪] সিরাজুল ইসলাম কাদির, 'প্রদর্শনী', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২২ ডিসেম্বর '৮৯, পৃ ৫৫

ইসলাম (১৯৬৪-?), খালিদ মাহমুদ মিঠু (১৯৬০-২০১৬), গোলাম ফারুক বেবুল (১৯৫৮), তৌফিকুর রহমান (১৯৫৯), লালা রুখ সেলিম (১৯৬৩) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আশির দশকের প্রথম থেকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন সমকালীন আন্তর্জাতিক প্রবণতা এ দেশীয় শিল্পীদের প্রভাবিত করলেও মূলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়, এ দেশের শিল্পে তার সামগ্রিক অভিঘাত পরিলক্ষিত হতে শুরু করে নব্বইয়ের দশক থেকে। তা ছাড়া বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দুই পরাশক্তির মধ্যে চলমান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির আদর্শিক দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট স্নায়ুযুদ্ধের অবসানও হয় এ সময়ে। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে, পৃথিবীব্যাপী তথ্যপ্রবাহের অবাধ সুযোগ পৃথিবীকে বিশ্বগ্রামে (Global village) পরিণত করে। (যদিও বিশ্বায়নকে দিন-তারিখের নিরিখে নির্দিষ্ট করা চলে না বরং, এটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া) বিশ্বায়নের এই চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা বদলের নানা রাজনৈতিক হিসেব-নিকেষের ধারায় আবারও বদলে যায় এ দেশের রাজনৈতিক পট-প্রেক্ষিত। দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ পদার্পণ করে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায়। সে উত্তরণের সাথে সাথে সমাজ-কাঠামো এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও আসে নানা পরিবর্তন। তার কিছু যেমন ইতিবাচক, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সে পরিবর্তন বেশ নেতিবাচকও হয়। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে সরকারের অনেক কার্যক্রম এবং পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হয়ে যায় রাতারাতি। এ ছাড়া অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের সুখ-স্বপ্নের পরিবর্তে দুঃস্বপ্নের মতো স্বার্থলোলুপতা, রাজনৈতিক কলুষতা, সংঘাত, হানাহানি এবং হত্যা-সন্ত্রাসের মতো বিভীষিকা সমাজকে ঘিরে ধরে। সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের শিল্পীরাও জড়িয়ে পড়তে থাকে এসব দুষ্টচক্রে। এ দেশে জীবনধারণের জন্য সমাজলগ্ন না থেকে স্বাধীন শিল্পী হিসেবে জীবিকার্জন অত্যন্ত দুরূহ ছিল সবকালেই, যদিও পৃষ্ঠপোষকতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা-হোক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বায়নের সামগ্রিক প্রভাব, তথ্য-প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি এ দেশীয় শিল্পীদের ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক প্রবণতামুখী করে তোলে। (যদিও এই 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নিজস্বতাকে সুকৌশলে ধ্বংস করে দিচ্ছে অথবা নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই আমাদের শিল্পও কখনোই পশ্চিমমুখীনতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারেনি।) ফলে বৈশ্বিক সমকালীনতা বা গ্লোবাল ভিলেজে যুক্ত হওয়ার যে প্রক্রিয়া আশির দশক থেকে সূচিত হয়, নব্বইয়ের দশকজুড়ে তা একটি ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়ায়। বিশেষত নব্বইয়ের মধ্যবর্তী সময় নাগাদ এখানে শিল্প সার্বিক অর্থেই সকল মাধ্যমকে একীভূত করতে থাকে। অর্থাৎ এত দিন শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের যে পার্থক্য ছিল, সেটা

ক্রমেই কমে আসতে থাকে এবং শিল্প হয়ে ওঠে মিশ্র। কোলাজ, আলোকচিত্র, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, কাঠ, ধাতু, বোর্ড, আলো ও শব্দসংযোজন, চলচ্ছবি, নড়াচড়া করা ভাস্কর্য ইত্যাদিরও ব্যবহার শুরু হয়।[৪৭৫] আবার শিল্পী নিজেই শিল্পবস্তুতে পরিণত হয় কখনো কখনো। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ–

> বিংশ শতকেরই শেষ কয়েকটি দশক ধরে পশ্চিমের চারুশিল্পীরা ধারণাপ্রধান যে-সব শিল্পকর্ম উপস্থাপন করেছেন, তার মাধ্যমে শুধুমাত্র চারুশিল্পের মাধ্যমভিত্তিক বিভাজন যে বিলুপ্ত হচ্ছে তা নয়, ভিজুয়াল আর্ট এবং পারফরমিং আর্টের মধ্যকার ব্যবধানও প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে। চারুশিল্পীরা এখন ইনস্টলেশন বা স্থাপনাশিল্পের পাশাপাশি করছেন ভিডিওচিত্র, পারফর্মেন্স, সাইট-স্পেসিফিক আর্ট, হ্যাপেনিং ইত্যাদি নানাবিধ সংস্থাপন ও উপস্থাপন। শিল্পের এসব প্রকাশশৈলীকে এখন আর প্রচলিত বিভাজনের কুঠুরির মধ্যে ফেলে বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে চিত্রকলা, ছাপচিত্র, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, তৈরিবস্তু, শব্দ, আলো, চলচ্চিত্র, অভিনয় সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যা উপহার দিচ্ছে, তাকে এককথায় বলা যেতে পারে “শিল্পবস্তু” বা “আর্টপিস”।[৪৭৬]

নব্বইয়ের দশক থেকে আমাদের তরুণ শিল্পীরাও ব্যাপকভাবে এই আন্তর্জাতিক প্রবণতালগ্ন হয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত খানিকটা উত্তরাধুনিকতার রীতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হলেও আশির দশকের সাধারণ শিল্প প্রবণতাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে এ দশকেও। বিষয়বস্তু হিসেবে গতানুগতিক জনজীবন, নিসর্গ, পুরনো বিমূর্ত রীতি-পদ্ধতির চর্বিতচর্বণ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মতো জাতীয় আবেগপ্রবণ বিষয়ের পাশাপাশি লোকশিল্প, সমকালীন সমাজ, স্বদেশও উপস্থাপিত হয়েছে সচেতন ও তরুণ শিল্পীর নিরীক্ষাধর্মিতায়।[৪৭৭] এ ছাড়া আশির দশকের ধারাবাহিকতায় এ দশকেও নারীর প্রতি সমাজের নানা বৈষম্য এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের বিপরীতে বহুসংখ্যক নারীশিল্পীর নারীবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্প সৃষ্টিও অব্যাহত থাকে।

বর্ষীয়ান শিল্পী আবদুস শাকুর শাহ (১৯৪৭) সত্তরের দশক থেকেই নিয়মিত কাজ করলেও নিজস্ব শৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন নব্বইয়ের দশক থেকেই। পূর্বে অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে ট্যাপেস্ট্রি, মিশ্ররীতির উলম্ব স্থাপনা, দেয়ালসজ্জা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্প রচনা করলেও নব্বইয়ের দশক থেকে নিজস্ব চিত্রভাষা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।[৪৭৮] তাঁর চিত্রভাষা বাংলার লোকজ সংস্কৃতি, গ্রামীণ জীবনধারা আর প্রাচীন কাব্যানুপ্রেরণায় সৃষ্ট। টেরাকোটা, নকশিকাঁথা এবং পটচিত্রের মতো

---

[৪৭৫] নজরুল ইসলাম, ‘সমকালীন নন্দন চৈতন্যে আত্ম অন্বেষা : দ্বাদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ১৯৯৬, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১৭ জানুয়ারি ’৯৬, [আর্কাইভে সংরক্ষিত বিচিত্রার এ সংখ্যার পৃষ্ঠা নম্বর সেলাইয়ের ভেতরে পড়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি]; আবুল মনসুর, ‘গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল’, দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৫৫; আবুল মনসুর, ‘বাংলাদেশের চিত্র-ভাস্কর্য : একটি অবলোকন’, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ ১২১

[৪৭৬] আবুল মনসুর, ‘গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল’, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৫

[৪৭৭] আবুল মনসুর, ‘বাঙাল শিল্পীর সৃজন-উদ্যম রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক’, *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১২

[৪৭৮] নজরুল ইসলাম, ‘আবদুস শাকুরঃ লোকজ-আধুনিক ধারার শিল্পী’, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ ২০৭

লোকশিল্পকলা থেকে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের রূপবন্ধের সাথে, লোক-উপাখ্যানের বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব ও জনপ্রিয় চরিত্র এবং লেখা যুক্ত করে চিত্রতল নির্মাণ করেন তিনি। সাথে সমতলীয় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার একধরনের দৃষ্টিসুখকর অনুভূতি দান করে। লোকজ শিল্প-উপাদানের এই আধুনিক ব্যবহার পদ্ধতি তাঁকে বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পীতে পরিণত করেছে।

স্বশিক্ষিত শিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী (১৯৪৮) জীবনের নানা সংঘাত-সংবেদ অতিক্রম করে আশির দশকে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করলেও বৃহত্তর পরিসরে তাঁর আগমন ঘটে নব্বইয়ের দশকে। ঘর সাজানোয় মূল্যবান সামগ্রীর পরিবর্তে সহজলভ্য জিনিসের ব্যবহার কীভাবে বাড়ানো যায়, তা অনুসন্ধান থেকেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির শুরু।[৪৭৯] আর সে উদ্দেশ্যেই ঝরা পাতা, গাছের মরা ডাল-গুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে ভাস্কর্য সৃষ্টি করে শিল্পরসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কাঠ খোদাই করে ভাস্কর্য না গড়ে বরং চিরচেনা প্রকৃতির মাঝে বিষয়ের আভাস অনুসন্ধান করেন তিনি। এরপর উপাদানের যোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন অভীষ্ট সৌন্দর্যের। গাছের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার গতি ও রং অটুট থাকে বলে তাঁর শিল্পে অরণ্যের আদিম শক্তি, গতিময়তা আর সম্মোহনী ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে।[৪৮০] প্রকৃতির বিপুল সৃষ্টি-সাম্রাজ্য থেকে আহরিত উপকরণ তাঁর পরিমিতি বোধ আর নির্মাণশৈলীর গুণে সৃজন বৈশিষ্ট্যে হয়ে ওঠে অসামান্য।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পীদের অন্যতম শিল্পী কনকচাঁপা চাকমা (১৯৬৩)। আশির দশকের একেবারে শেষলগ্নে শিল্পক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেও মূলত নব্বইয়ের দশকে এসে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শুরু থেকেই তিনি পাহাড়ের উত্তরাধিকারই বয়ে চলেছেন ক্যানভাসে। স্বতন্ত্র রং, বুনট আর রেখার আঁচড়ে নিয়ত জীবন্ত করে তোলেন পাহাড়ি জনপদের মানুষ, প্রকৃতি ও জীবনকে। সেসব ছবিতে জীবনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি তাদের সংগ্রামমুখর রূঢ়তাও উপস্থিত হয় একইসঙ্গে। তাঁর ক্যানভাস যেন পাহাড়ি জীবন ও জীবনযাত্রার বিবিধ অনুষঙ্গের সমার্থক। যেন শিল্পের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্ব, উত্তরাধিকার এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চান তিনি, যা ইতিমধ্যে এ দেশের শিল্পে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

অশোক কর্মকার (১৯৬৩) নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকেই শিল্পানুরাগী ও শিল্পসমালোচকদের মনোযোগ লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ, দেশ, রাজনীতি, সমসাময়িক সময় ও জীবন এবং নানা অসংগতিকে তুলে ধরেন তাঁর সৃষ্টিতে। ছাত্রজীবন থেকেই বাণিজ্যিক শিল্পের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার দরুন তাঁর কাজে মাধ্যমের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করলেও

---

[৪৭৯] সেলিম এম রফিক, ‘ঝরাপাতা আমি তোমারই দলে’, *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৬, পৃ ৮৫-৮৬

[৪৮০] ইনাম আল হক, ‘এর চেয়ে সহজ সম্ভব আর কিছু দেখেছি কি?’, *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৭, পৃ ৮৬

স্থাপনা ও পরিবেশনার মতো সমসাময়িক শিল্পচর্চার মাধ্যমেই তাঁর পদচারণা সাবলীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমের সমন্বিত প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই 'আর্টপিস' বা 'শিল্পবস্তু'।

ফকরুল ইসলাম (১৯৬৪-?) শুরুতে মৃৎশিল্পী হিসেবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও শিল্পবোদ্ধাদের আগ্রহের কেন্দ্রে অসেন চিত্রকলা চর্চার মাধ্যমে। প্রকৃতিই তাঁর শিল্পের প্রাণ। সে প্রকৃতি দূরবর্তী এবং পরিসরের বিশালত্ব নিয়ে প্রকাশিত। মনোক্রমিক রঙে রেখা এবং অসংখ্য বিন্দু সংযোগে বিশুদ্ধ বিমূর্ত আবহে তিনি সৃষ্টি করেন আমাদের পরিচিত কোনো দৃশ্যপট। এমনকি লম্বা গড়নের কিছু ফর্মেও আলোছায়ার আবিলতায় ফুটকির বিস্তার যেন জনরোষ প্রকাশের মিছিলসদৃশ মনে হয় অনেকটা; পাখির চোখে দেখা জনতার মহাসমাবেশের মতো।[৪৮১] মাধ্যমের কৃৎ-কৌশলে নিজের দক্ষতার প্রমাণের চেয়ে হৃদয়ের গহিনের সুপ্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই তাঁর অভীষ্ট। ফলে তাঁর শিল্প রাজনীতি, সমাজবাস্তবতা ও তত্ত্বকথার কচলানিমুক্ত; শুধুই উপভোগ্য।

লায়লা শার্মিন (১৯৬৪) মূলত রোমন্টিক ধারার প্রকৃতিবাদী শিল্পী। কোমল ও দৃষ্টিসুখকর রঙে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের গীতল বিন্যাস রচনা করেন তিনি। খানিকটা বিমূর্ত আবহে সেখানে পরিচিত কাঠামো বা বিবিধ বস্তুর উদ্ভাসও উঁকি দেয়। তাঁর প্রকৃতি দূর ও কাব্যানুবর্তী। কোথাও কোথাও সরাসরি কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিও যুক্ত করার ফলে কাব্যিক আবহ সৃষ্টি হয় তাঁর চিত্রতলে, যা যুগপৎ নান্দনিক ও অভিনিবেশযোগ্য (চিত্র ৬১)।[৪৮২]

মো. ফারুখ আহাম্মদ (১৯৬৭) শিল্প সৃষ্টির জন্য বাংলার হাজার বছরের পুরনো শিল্পমাধ্যম কাঠ খোদাইকে বেছে নিয়েছেন। এ মাধ্যমে তিনি লো-রিলিফ ভাস্কর্য সৃষ্টি করে কলারসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন নব্বইয়ের শেষার্ধে। খানিকটা রোমান্টিক আবহে প্রকৃতি ও বাংলার লোকায়ত জীবনধারাকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। প্রকৃতি ও মানুষের পাশাপাশি নানা ধরনের লোকজ রূপবন্ধও তিনি ফুটিয়ে তোলেন কাঠের বুক কুঁদে। তারপর বিভিন্ন তাপমাত্রায় সেগুলো পুড়িয়ে তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো ধাতব পাত যোগ করার পর তাতে রং যোগ করলে তা আর ভাস্কর্য বা চিত্রকলার বিশুদ্ধতা ধারন না করে বরং সামগ্রিকভাবে শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে।

নিরীক্ষাধর্মী শিল্পের জন্য মোহাম্মদ ইকবাল (১৯৬৭) নব্বইয়ের প্রথম দিকেই এ দেশের কলাজগতে নিজের অবস্থান পোক্ত করেন। মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ দক্ষতা, রঙের দক্ষ ও আবেগী প্রলেপে ইকবালকে খুব সহজেই আলাদা করা যায় অন্যদের থেকে। খানিকটা প্রতীকধর্মী ও আধ্যাত্মিকতায় তাঁর কাজে বারবার এসেছে শিশু ও সন্ন্যাসীর মুখ, পূর্ণ ও খণ্ডিত মানব অবয়ব, প্রাণী ও নাগরিক

---

[৪৮১] জাহিদ মুস্তাফা, 'সাদাকালোর আলো-আঁধার', *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৬, পৃ ৮৪; জাহিদ মুস্তাফা, 'বর্ণনিরপেক্ষতার নিবিড় প্রকাশ', *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ ১০২

[৪৮২] রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের নারীশিল্পী', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১১৪

উপকরণের নানা খণ্ডাংশ।[৪৮৩] এর মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ, পরিবেশ ও সমাজের ওপর মানবিক সংঘাত ও যুদ্ধের প্রভাবও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে যেন। স্বল্প আঁচড়ে আলোছায়ার নির্মাণ ও বুনট তৈরির মাধ্যমে অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে তিনি মানুষ ও তার যাপিত জীবনের নানা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলেন চিত্রপটে। এই অভিব্যক্তি শুধু মানবিক তাৎপর্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তাতে সমকালের চকচকে প্রতিবিম্বই যেন যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়।

লোহা, ইট, কাঠ আর পাথর দ্বারা নির্মিত নগরে যাপিত জীবনের নানা ক্ষয়িষ্ণু অভিজ্ঞতার এক আখ্যান যেন বিপুল শাহ-র (১৯৬৭) ছবি। সরল পরিসর বিভাজনের মাধ্যমে অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে নির্মাণ করেন বিষয়ের দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস। ভারী রঙের আস্তরণে, রেখা এবং বুনট নির্মাণের দক্ষতায় তিনি তুলে ধরেন সাধারণ মানুষ, মরচে পড়া টিন, ভাঙা জানালা, শেওলা জমা দেয়াল, ক্ষয়ে যাওয়া কাঠ বা পথচলতি নাগরিক জীবনের নানা অনুষঙ্গের আদল। রং ব্যবহারের দক্ষতা এবং করণকৌশলের অভিনবত্বে নিজের অভিজ্ঞতাকেই উপস্থাপন করেন শিল্পিত নির্মাণে। চিত্রশিল্প ছাড়া বাণিজ্যিক শিল্প, স্থাপনা ও পরিবেশনা শিল্পেও তাঁর বিচরণ লক্ষ করা যায়।

নব্বইয়ের শিল্পীদের মধ্যে মাহবুবুর রহমান (১৯৬৯) অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী। দেশীয় শিল্পরীতির গতানুগতিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে, ব্যতিক্রমী শিল্প সৃষ্টি করে দেশের অন্যতম মৌলিক শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। তাঁর কাজে সমসাময়িক বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, গতি-প্রকৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়কে আন্তর্জাতিক আঙ্গিকের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর অধিকাংশ কাজ মানব অবয়ব-ভিত্তিক হলেও বিষয়ের অসংগতি, ভয়াবহতা ও হিংস্রতা প্রকাশের জন্য তাঁকে অতিরঞ্জিত, বীভৎস ও জান্তব রূপে প্রকাশ করেন। পটের জমিনজুড়ে ক্ষুব্ধ-কম্পিত নানা আকৃতি, আঁকিবুঁকি এবং চীৎকৃত বর্ণ প্রয়োগের ফলে তা আলাদা মাত্রা লাভ করে।[৪৮৪] তাঁর শিল্পকর্মে বিষয়ের মতো মাধ্যমগত বৈচিত্র্যও ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। চিত্রকলায় শিল্পশিক্ষা শেষ করলেও ভাস্কর্য, স্থাপনা, পরিবেশনাসহ নানা ধরনের সমসাময়িক মাধ্যমেও সমান সাবলীল তিনি। এ ছাড়া সংগঠক হিসেবেও তিনি এ দেশের শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

তৈয়বা বেগম লিপি (১৯৬৯) প্রথম দিকে চিত্রকলা ও ছাপচিত্রের মতো দ্বিমাত্রিক পরিসরে কাজ করলেও ধীরে ধীরে তিনি মিশ্র, স্থাপনা ও পরিবেশনামূলক শিল্প নির্মাণে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজ তাঁর আত্মোপলব্ধিরই সারাৎসার যেন। একজন নারী হিসেবে স্মৃতি ও বর্তমানের দুঃসহ অনুভূতির দোলাচল এবং বহুমাত্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর যাপিত জীবনের বিভিন্ন পর্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর

---

[৪৮৩] মাহমুদ আল জামান, 'শান্তির অন্বেষায় শিল্পী', *কালি ও কলম*, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, পৃ ৮২

[৪৮৪] আবুল মনসুর, 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৫৭

বেদনাকে সরল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন শিল্পের শক্তিতে। সেখানে নারী কখনো পুতুল আবার কখনো কঠিন কোনো গার্হস্থ্য ফ্রেমে বন্দি মানুষ।[৪৮৫] তিনি শিল্পে নারীর সামাজিক অবমাননা বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য ব্লেড, সেফটিপিন ইত্যাদির মতো অপ্রচলিত উপাদানকেও ব্যবহার করেছেন। শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, একজন সংগঠক হিসেবেও তিনি এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

জাহেদ আলী চৌধুরী (১৯৭০) নব্বইয়ের শেষ লগ্নে আবির্ভূত শিল্পীদের একজন। শুরুতে মলিন রঙে বিষণ্নতাবোধকে উপস্থাপন করলেও অচিরেই উজ্জ্বল ও বর্ণিল হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রতল। এ দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নানা আঙ্গিক, রং, ফর্ম এবং নকশার সাথে বর্তমানের নানা অনুষঙ্গ, যেমন: মানবিক সম্পর্ক, সমসাময়িক স্বদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি, কল্পকাহিনির জনপ্রিয় চরিত্র ইত্যাদি যুক্ত হয়ে তাঁর চিত্রতল নির্মিত হয়। নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিক নির্মাণের জন্য তিনি যেমন শতবর্ষী ঐতিহ্য মোগল অণুচিত্র-শৈলীর দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তেমনি এ দেশের প্রচলিত শিল্পরীতির আয়তাকার ও সমতল চিত্রপটের গতানুগতিক ধারাকে অগ্রাহ্যও করেছেন। চিত্রতল কেটে জোড়া দিয়ে অসমতল পৃষ্ঠ এবং প্রয়োজনীয় আকৃতি গঠন করেছেন, যা তাঁকে বিশিষ্ট্য করে তুলেছে। চিত্রকলা ছাড়া স্থাপনা ও পরিবেশনা শিল্পেও তিনি সমান সাবলীল।

রনি আহমেদ (১৯৭১) বাংলাদেশে চর্চিত গতানুগতিক শিল্পধারার প্রতিকূলে নিজের শিল্প-আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন। সেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতা, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদির সরাসরি উপস্থাপনকে উপেক্ষা করে পরাবাস্তববাদী ধারায় অভিজ্ঞতার সাথে রূপক ও আখ্যানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাতে স্থান-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর অন্তর্লীন মনোজগৎ এবং কল্পিত কিম্ভূত কোনো প্রাণীর অবভাস সৃষ্টি করেন তিনি। তাঁর উদ্ভট তামাশার জগতের ধাক্কায় শিল্পের কপট গাম্ভীর্য এক লহমায় ভেঙে খানখান হয়ে যায়।[৪৮৬] অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর সৃষ্টি স্থান-কাল ও লিঙ্গনিরপেক্ষ, যা ছবিতে নতুনত্ব যোগ করে।[৪৮৭] রনি শিল্প সৃষ্টির জন্য করণ-কৌলগত দক্ষতাকে উপেক্ষা করে শিশুসুলভ সরলতায় সৃষ্টির আনন্দই যেন উদ্‌যাপন করেন। নিয়ত পরীক্ষণ-প্রয়াসী এই শিল্পী চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপনাশিল্প এবং পরিবেশনা শিল্পমাধ্যমেও সমান দক্ষতায় সৃষ্টি করেন হেঁয়ালি ও প্রহেলিকাময় জগৎ।

শিল্পী অলক রায়ের পরবর্তী প্রজন্মে মৃৎশিল্প মাধ্যমে ভাস্কর্য নির্মাণকারী শিল্পীদের অন্যতম হলেন শিল্পী দেবাশীষ পাল (১৯৭১)। শুরুতে প্রাচীন শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম পোড়ামাটির ফলকে আধুনিক রীতির রেখাচিত্র এবং স্বল্প রঙের ব্যবহারে অনুকরণীয় শিল্পশৈলী নির্মাণে সমর্থ হন তিনি। পরবর্তীকালে গ্লেজ, কাঁচ, পাথর ও সমকালীন খবরাখবর সংবলিত লেখা যোগ করে ভাস্কর্য নির্মাণ করে প্রশংসিত হয়েছেন।

---

[৪৮৫] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'আমাদের চিত্রকলায় নারীভাবনা', *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ৯৯

[৪৮৬] জাহিদ মুস্তাফা, 'অচেনালোকের অচিন শিল্পকলা', *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৬, পৃ ৮৬

[৪৮৭] শাহমান মৈশান, 'সমকালীন শিল্পের ঐকতান', *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৬, পৃ ৮৩

বস্তুত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার সাথে শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁকে করে তুলেছে আরও পরিশীলিত। তাঁর কাজে পরম্পরাগত লোকজ ঐতিহ্যের সাথে সমসাময়িক সমাজ এবং মানুষের সুসংবদ্ধ সম্মিলন লক্ষণীয়।

তাসাদ্দুক হোসেন দুলুর (১৯৭১) শিল্প সৃষ্টির বিষয়বস্তু প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস। ঝুলন্ত পর্দা ও কাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদির ওপরে নকশাধর্মী জীবজন্তু, পাখি, পুতুল ইত্যাদির অবয়ব ফুটিয়ে তুলে নিজস্ব শিল্পজগৎ নির্মাণ করেছেন তিনি। আমাদের চেনা-পরিচিত জগতে অশুভের জান্তব উপস্থিতি কখনো কখনো যেমন স্বপ্ন আর বাস্তবের দ্বান্দ্বিক অবস্থান নির্মাণ করে, তার সার্থক উপস্থাপন লক্ষ করা যায় দুলুর কাজে। কখনো বা অতিপরিচিত এবং তুচ্ছ কোনো উপকরণ যেমনঃ বাল্ব, মগ, সকেট, পানির ট্যাপ ইত্যাদির পরিবর্তিত কোনো অবয়ব চিত্রপটে তুলে ধরে অসংগতিপূর্ণ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আভাস। প্রকৃতপক্ষে নিছক ফ্যান্টাসির বাইরে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমাজবাস্তবতাও প্রতিফলিত হয় সেসব কাজে।

সুলেখা চৌধুরীর (১৯৭২) চিত্রতল নারীভাবনা, সামজিক দায় ও যন্ত্রণার সরাসরি উপস্থাপনে ঋদ্ধ। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর ক্যানভাসে সমসাময়িক সমাজবাস্তবতা জায়গা করে নিয়েছে, যা তাঁকে একই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। বিশেষ করে, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নারীর অবস্থানই তাঁর প্রিয় বিষয়। পারিবারিক জীবনে নারীর কষ্ট, অন্তর্বেদনা, একাকিত্ব এবং নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য, নিস্পেষণ ইত্যাদি গল্পকে স্পষ্ট ভাষায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রপটে উপস্থাপন করেন তিনি। পারিবারিক আবহ বোঝাতে উপকরণ হিসেবে নারী-অবয়বের সাথে ব্যবহার করেন স্যান্ডেল, পুতুল, আপেল, ব্লেড, ক্লিপ, দড়ি, কাঁটাতার প্রভৃতি।[৪৮৮]

এ ছাড়া এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ময়নুল ইসলাম পল (১৯৬৬), আবদুস সালাম (১৯৭১), সাইদুল হক জুঁইস (১৯৬০), আহমেদ নাজির (১৯৬৪), শ্যামল চৌধুরী (১৯৬২), ওসমান পাশা (১৯৬৩), প্রদীপকুমার চক্রবর্ত্তী (১৯৬০), গুলশান হোসেন (১৯৬২), নজরুল ইসলাম (১৯৬৩), সমীরন চৌধুরী (১৯৬৩), প্রশান্ত কর্মকার বুদ্ধ (১৯৬৫) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছয় দশকের নাতিদীর্ঘ এই পথচলায় বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের অর্জন প্রসংশনীয়। দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট এ দেশের শিল্পের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে। তবে বিরুদ্ধ পরিবেশে হলেও চল্লিশের দশক থেকে একটু একটু করে আমাদের শিল্প এগিয়েছে পরিণতির দিকে। শুরুতে এ দেশের শিল্প লোকজ আঙ্গিকের সাথে রূপায়ণে পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতির প্রাধান্য থাকলেও শিল্পের বিষয়বস্তু এবং এর সমস্ত প্রেরণার উৎসস্থল সম্পূর্ণ লৌকিক

---

[৪৮৮] রনি আহমেদ, 'নারীর বিনির্মাণ', *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ ৮৬

সাধারণ পরিপার্শ্ব। এরপর পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের হাত ধরে যোগ হয় 'বিমূর্ততা'। যা পঞ্চাশ ও পরবর্তী ষাটের দশক জুড়ে প্রধান রীতি হিসেবে চর্চিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোরকালে বিমূর্ততার সাথে সমসাময়িক বিশ্বশিল্পের মিশ্ররীতির দিকেই নবীন প্রজন্মের প্রবণতা ধাবিত হয়। আবার আশির দশকে শিল্প আবেগ আর কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে স্বদেশ চেতনা এবং সমালোচনামূলক নানা ব্যঙ্গ-রসাত্মক বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন-নির্ভর হয়ে ওঠে। আর বৈশ্বিক সমকালীনতায় যুক্ত হওয়ার যে প্রক্রিয়া পূর্বে সূচিত হয়, নব্বইয়ের দশকজুড়ে তা একটি ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়ায়। এই লোকজ আধুনিকতা, পাশ্চাত্য-উদ্ভূত বিমূর্ততা, পাশ্চাত্যের নতুন রীতি-পদ্ধতি ও ব্যক্তিশিল্পীর সাথে স্বদেশচেতনা, জাতীয়তাবোধ, লোকশিল্পের নানা উপাদানের সাথে বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে আমাদের শিল্প সামগ্রিকভাবে যে বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয়েছে (অনেকখানি পশ্চিমমুখী হলেও), সার্বিক বিবেচনায় আজ তা আমাদেরই। সবচেয়ে বড় কথা, একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে এ দেশে শিল্পচর্চায় হাজার প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এর পরিধি, পৃষ্ঠপোষতা এবং নিবিষ্ট চর্চাকারীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সম্মান অর্জন করেছেন। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতিই যখন পশ্চাৎমুখী, তখন এ অর্জনকে নিশ্চয়ই খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের ছয় দশকের সৃজনশীল ছাপচিত্র

'ছাপচিত্র' শিল্পের একটি অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম হলেও সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যম হিসেবে এর স্বীকৃতি খুব বেশি দিনের নয়। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা আরও স্বল্প। তবে ছাপের এবং ছাপা বস্তু বা উপকরণের প্রচলন বাংলায় সুদীর্ঘকাল ধরেই ছিল। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে চর্চিত শিল্পের কোনো সামগ্রিক লিখিত ইতিহাস না থাকার দরুন এর চর্চার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আজ নিশ্চিত করে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এবং লোকজ জীবনযাত্রার নানা অনুষঙ্গ বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায় যে, প্রাত্যহিক জীবন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টির রীতি প্রচলিত ছিল এখানে। ছিল বস্ত্র অলংকরণ, আলপনা, কড়ির ছাপ কিংবা সতী অথবা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপের মতো নানা ধরনের লোকজ ছাপরীতির প্রচলনও। আবার শখের বশে মাটির ফলকে, কাঠের পাটায় অথবা ধাতব পাতে নকশা আঁকা কিংবা ছবি খোদাই করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা থেকে ছাপ নেওয়ার মতো নমুনা বিরল হলেও দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এসব নানা ধরনের ছাপ-পদ্ধতির দেশীয় সংস্করণ প্রচলিত থাকার পরও বাংলাদেশে মুদ্রণশিল্প ব্যাপকতা লাভ করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি আগমনের পর। কলকাতা ছিল তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ও সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র; এমনকি মুদ্রণ-সংস্কৃতিরও। ফলে সেখানকার মুদ্রণ-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ছাপাই ছবির একটি জনপ্রিয় এবং নাগরিক চর্চারীতিও গড়ে উঠেছিল। যার ধারাবাহিকতায় প্রথমে ইউরোপীয় একাডেমিক রীতির সাদৃশ্যধর্মী ছাপাই ছবির ধারা এবং পরে তা থেকেই বিশ শতকের প্রথমভাগে ছাপচিত্র চর্চার আধুনিক ধারাও গড়ে ওঠে সেখানে। স্বল্পপরিসরে হলেও কলকাতার ধারাবাহিকতায় পূর্ব-বঙ্গের ঢাকায়ও মুদ্রণকেন্দ্রিক ছাপাই ছবির একটি বাজার গড়ে উঠেছিল। অনেকখানি কলকাতানির্ভর এবং খুব শক্ত অবকাঠামোগত ভিত্তি না থাকলেও কেতাবপট্টির মতো বাজার এবং পুস্তক মুদ্রণ ও অলংকরণের সঙ্গে জড়িত সীতানাথ বসাক কিংবা কেশবের মতো দু-একজন শিল্পীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে এ-ও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এর মধ্যে কেউ কেউ দক্ষ ছাপচিত্রীও ছিলেন। কিন্তু ঢাকার বা ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ যা আজকের বাংলাদেশ, তার মূলধারার ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের সেই দক্ষতা সরাসরি খুব বড় ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ বিশ শতকের মধ্যভাগের আগে মূলধারার ছাপচিত্র বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তা চর্চিত হওয়ার কোনো তথ্য-প্রমাণ আজ অবধি এ দেশে পাওয়া যায়নি।

এ দেশে শৈল্পিক মাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্র চর্চার মূলধারার প্রবর্তন হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা, ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে। এ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সফিউদ্দিন আহমেদ নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই সফিউদ্দিন আহমেদ, হবিবর রহমান, শেখ আনোয়ারকে (প্রেসম্যান) নিয়ে গঠন করা হয় ছাপচিত্র বিভাগ। সফিউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দিয়ে শুরু থেকেই আর্ট ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছাপচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে তাঁর হাত ধরেই মূলত যাত্রা শুরু করে এ দেশের মূলধারার ছাপচিত্র চর্চা। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এ দেশে ছাপচিত্র মাধ্যমের চর্চা ও বিস্তারে তাঁর গৃহীত নানা পদক্ষেপ এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষে ছাপাই-ছবি মাধ্যমে তাঁর তারকাখ্যাতি, মাধ্যমটি সম্পর্কে এ দেশীয় তরুণদের আগ্রহী করে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য তাঁকে এ দেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলেও অভিহিত করেন কেউ কেউ। সূচনালগ্নে জয়নুল আবেদিনের সহযোগিতা এবং সফিউদ্দিন আহমেদ ও হবিবর রহমানের মতো শিল্পী শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা এ দেশে মাধ্যমটির চর্চা ও বিস্তারে যথেষ্ট গতির সঞ্চার করে।

চল্লিশের দশক অর্থাৎ এ দেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের ধৈর্য, নিষ্ঠা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যেমন শুরু করা সম্ভব হয়েছিল চারুশিল্পের প্রাথমিক যাত্রা, তেমনি ছাপচিত্র চর্চার শুরু এবং এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে তাঁদের অসামান্য অবদান। শুরুর প্রায় সকল শিল্পী যেমন– জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, হবিবর রহমান প্রমুখরা চিত্রশিল্পের পাশাপাশি ছাপচিত্র নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

প্রথম প্রজন্মের এই পথিকৃৎদের মধ্যে শিল্পী হবিবর রহমান (১৯১২-?) (মতান্তরে হাবিবুর রহমান) কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন এবং পরের বছরই (১৯৩৭) একই প্রতিষ্ঠানে উডকাটের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কলকাতা আর্ট স্কুলে তিনি উডকাটের শিক্ষক ছিলেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের।[৪৮৯] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসা শিল্পীদের দলে ছিলেন তিনিও। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে উডকাটের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে (ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটসে) অনুষ্ঠিত ১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, তখন পর্যন্ত তিনি 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস'এ শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকায় আর্ট কলেজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি কিছুদিন তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন।[৪৯০] তাঁর শিল্পী ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়

---

[৪৮৯] আব্দুল মতিন সরকার, 'একজন শিল্পীর প্রতিকৃতি ঃ শফিউদ্দীন আহমেদ', *শিল্পকলা*, ৬ষ্ঠ-১০ম বর্ষ (যুক্তভাবে), ১ম-২য় সংখ্যা (সকল বর্ষের যুক্তভাবে), ১৩৮৯-১৩৯৪, পৃ ৩৫

[৪৯০] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩০

না। ১৯৬৫ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ অনুযায়ী *সান্ধ্যভোজন* (?), *পুসি* (?), *ভেড়ার পাল* (?), *বাগান* (?) এবং *ফুল* (?) শিরোনামের পাঁচটি কাঠ খোদাইচিত্র উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে প্রথমোক্ত *সান্ধ্যভোজন* (চিত্র ৬২) ও *পুসি*র মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং বাগানের চারটি মোরগকে বিষয়বস্তু করে নির্মাণ করা কাঠ খোদাই চিত্রে (নাম অজানা) বিষয়ের সাদৃশ্যধর্মী উপস্থাপন লক্ষণীয়। যাকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ছাপছবির ব্রিটিশ একাডেমিক রীতিপন্থী বলে ধারণা করা যায়। প্রকৃতি কিংবা গৃহাভ্যন্তরের নানা অনুষঙ্গ থাকলেও প্রধানত এগুলো প্রাণীরই চিত্র। নরম আলোছায়ার প্রয়োগে বিষয়ের কোমল ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনই এখানে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি কাঠ খোদাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেই নির্মাণ করেছেন ছবি। প্রথম প্রজন্মের প্রায় সকলের সম্পর্কে কিংবা তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে তৎকালীন সংবাদ সাময়িকীতে কম-বেশি লেখালেখি হলেও তাঁর কিংবা তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে কোনো লেখালেখি নজরে আসে না। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনীর ক্যাটালগটি না থাকলে হয়তো তাঁর শিল্পীসত্তা সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না। ক্যাটালগটি ছাড়া আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম দিকের ছাত্রদের বিবরণই শুধু প্রচারবিমুখ ও নির্বিবাদী এই মানুষটির অস্তিত্বের জানান দেয়। বস্তুত তাঁর সময়ের অন্য তারকা শিল্পীদের খ্যাতির আড়ালে থেকে এবং প্রচণ্ড বিরুদ্ধ পরিবেশেও দৃঢ় মনোবল নিয়ে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে নিরন্তর শ্রমশীল থেকেছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ কাজই এখন আর পাওয়া যায় না, তবে স্বল্পসংখ্যক যে নমুনা (প্রতিলিপি) আমরা দেখি, তাতে তাঁর সৃজনদক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

শুধু হবিবর রহমানই নন, ছাপচিত্রের চর্চা স্বল্পপরিসরে করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও। ছাত্রাবস্থা থেকে সাঁওতাল পরগনা দুমকায় যাওয়া-আসা ছিল জয়নুলের। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু হয়েছে দুমকার ভূ-দৃশ্য, শালবন, সাঁওতাল নারী ও পুরুষ কিংবা তাদের জীবনের নানা অনুষঙ্গ। চল্লিশের দশকের বিভিন্ন সময়ে করা তাঁর বেশ কিছু ছাপাই ছবিরও সন্ধান পাওয়া যায়। এতে দুমকার জীবনচিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। *মহিষের পিঠে বালক* (১৯৪০), *অপেক্ষা* (১৯৪০) এবং *সাঁওতাল মা ও শিশু* (১৯৪০) এ পর্বের কয়েকটি কাজ। আবার ছাত্রাবস্থায় করা একটি কাঠ খোদাইয়ের নমুনাও পাওয়া যায়। *বিচিত্রতা* (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত) শিরোনামের কাজটিতে সারা শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি চরিত্রকে জঙ্গলের মধ্যে গাছের ফাঁকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। জমাট কালো পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে তীব্র সাদার স্বল্প রেখায় উৎকীর্ণ পরিবেশ এবং অনির্ণেয় অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখাবয়ব একধরনের রোমান্টিক ও রহস্যময় আবহ সৃষ্টি করেছে। এচিং মাধ্যমে করা *মহিষের পিঠে বালক* ছবিতে দেখা যায় দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি রাখাল বালক মহিষের পিঠে চড়ে বসেছে। মহিষের হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে আছে ঘাসে। *অপেক্ষা*তে চিত্রপটের সম্মুখভাগে একজন সাঁওতাল রমণী ঘরের দুয়ারের মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পথের দিকে চেয়ে কারো বা কিছুর প্রতীক্ষায় রত। অসমতল ভূ-রেখা পেরিয়ে দূরে

দীর্ঘ বনানির শীর্ষদেশ দৃশ্যমান। নারী চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি এবং সাজসজ্জা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। আর লিনো খোদাই মাধ্যমে ছাপা *সাঁওতাল মা ও শিশু*তে কোলের ওপর বসিয়ে শিশুকে দু-হাতে আদর করছেন মা। আরও একটি অনামা লিনো খোদাই ছবিতেও (চিত্র ৬৩) (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত) মা ও শিশুর উপস্থিতি দেখা যায়। চারদিকে ঘন অন্ধকারের আপাত বৃত্তের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে ছায়ামূর্তির (silhouette) আকারে উপস্থাপিত মা তার উলঙ্গ শিশুসন্তানকে হাত ধরে আলোর উৎসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শিশুর কাঁধে একটি মাছ ধরার ছিপ্ এবং মায়ের মাথায় ভারী কিছুর অস্তিত্ব। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো মোটা কাপড় পরিহিতা মা, আর কোমরে নিমফুলের ছোট ছোট ঝুনঝুনিতে উপস্থাপিত এই শিশু এ দেশের অগণন সাধারণ শ্রমজীবী মা ও শিশুর প্রতিনিধি যেন। ছবিগুলোর প্রতিটিই বাস্তবধর্মী রীতিতে নির্মিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোছায়ার বাস্তবধর্মী বিন্যাস অনুপস্থিত। মহিষের গলার ঘণ্টা, রাখালের গলার তাবিজ, সাঁওতাল রমণীর হাতের হাঁসুলি, খোঁপার ফুল কিংবা মোটা কাপড়ের আঁচলের মতো ছোট ছোট উপাদান এ কাজগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রায় সব কাজেই মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরো চিত্রপটের বেশির ভাগ অংশজুড়ে বড় করে দেখিয়েছেন শিল্পী।

বস্তুত, জয়নুলের ছবিতে বিষয়বস্তু হিসেবে অধিকাংশ সময়ই এসেছে মানুষ। মানব-বর্জিত কিংবা মানুষের সামান্য উপস্থিতি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কিছু আঁকেননি, এমন নয়। তবে তার সংখ্যা খুবই অল্প। বেশিরভাগ কাজেই মানুষের বিশালত্বকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> মানুষ ও প্রকৃতির টানাপড়েনে মানুষই তাঁর কাছে বরাবর বড় হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। মানুষবিহীন নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি তাকে তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। এমনকি নিষ্পিষ্ট পরাজিত মানুষও তাঁর পট জুড়ে একটি শক্তিমান উপস্থিতি হয়ে বিরাজ করে। দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্রমালায় যেমন ক্লিষ্ট মানুষগুলো এক মন্যুমেন্টাল অবস্থিতি গ্রহণ করে তেমনই 'মনপুরা' চিত্রের দলিত মৃতদেহগুলো পর্যন্ত যেন পুঞ্জ পুঞ্জভাবে ঊর্ধমুখে ফুঁসে উঠতে চায়। এই পরাভব না-মানা শাশ্বত মানবের ছবি তাঁর মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালোবাসার পরিচায়ক।[৪৯১]

শিল্পে সবসময় তিনি চারপাশের সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, তাদের কষ্ট ও সংগ্রামমুখরতার কথা বলেছেন। খেটে খাওয়া এসব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। কারণ খুব সাধারণ একটি পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। একদিকে পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আর্ট কলেজে পড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তাঁকে করতে হয়েছে কঠোর সংগ্রাম, অন্যদিকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা– এ দুইই তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখতে শিখিয়েছিল জীবনকে। আর জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রভাবিত করেছিল তাঁর চিত্রপট। সেখানে দেশ, সমাজ ও আপন গোষ্ঠীর প্রতি এবং

---

[৪৯১] আবুল মনসুর, 'জয়নুল আবেদিন : তাঁর শিল্পভুবন', দ্র. *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ ৩৮৪

সর্বোপরি মানুষের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই দায়বদ্ধতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায়। চোখের সামনে উন্মূল ক্ষুধার্তের নির্মম মৃত্যু ভীষণ আন্দোলিত করেছিল তরুণ জয়নুলকে। তরুণ হৃদয়ের সেই ক্ষোভ আর আর্তিকে কালো কালির মোটা রেখায় এঁকেছেন নির্নিমেষ। যা আজও মন্বন্তরের ভয়াবহতাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। সমকালেও তার আবেদন এতটাই ছিল যে, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার আরেক রূপকার নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য কলেজ স্ট্রিটের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখে বলে উঠেছিলেন–

থাকতো জয়নুল আবেদীনের তুলি, লেখনী ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।[৪৯২]

মূলত রেখাচিত্রের জন্য খ্যাতিলাভ করলেও দুর্ভিক্ষকে ভিত্তি করে ছাপাই ছবিও করেছেন কিছু। যা রেখাচিত্রকে ছাপিয়ে একক বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ মর্যাদায় চিহ্নিত হয়নি কখনো।[৪৯৩] এর অধিকাংশই লিনোকাট মাধ্যমে করা হলেও ড্রাইপয়েন্ট ও লিথোগ্রাফও রয়েছে। ড্রাইপয়েন্ট চিত্রটিতে ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে নতমস্তক এক মানুষকে পটের পুরোটা জুড়ে উপস্থাপন করেছেন তিনি। কিন্তু সে মজ্জাগত শক্তিতে লাঠিতে ভর দিয়ে শক্তিহীন কঙ্কালসার শরীরকে সোজা রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত। যেন মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ কোনোভাবেই কাম্য নয় তার। দুর্ভিক্ষের অন্য রেখাচিত্রের মতো সামান্য টোনালভ্যালু যোগ করলেও আলোছায়ার বিন্যাসকে স্পষ্ট করেননি। আবার বিষয়ের সমাবেশ এবং রেখার দৃঢ়তা এতে একধরনের কাঠিন্যও যোগ করেছে। অনেকটা একই রকম বিষয়বিন্যাস লক্ষ করা যায় সমসাময়িক সময়ে করা লিনো খোদাই চিত্রটিতেও। এখানেও দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি। চারদিকে কালো রঙের প্রবল প্রাধান্যের মাঝখানে একজন নতশির শীর্ণকায় বুভুক্ষুর জান্তব উপস্থিতি পটজুড়ে (চিত্র ৬৪)। চওড়া কালো রেখা আর অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার শরীরের সুসংবদ্ধ কাঠামো বিন্যাসে অভিব্যক্তিবাদী সরলতার উপস্থাপন। বস্তুত জয়নুল আবেদিনের করা লিনো এবং কাঠ খোদাইগুলোর অধিকাংশেই সাদার চরম বৈপরীত্যের সাথে কালো রঙের প্রবল আধিক্য লক্ষণীয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে করা দুটি লিনো খোদাইতেও (একটি অবশ্য লিনোলিয়াম বোর্ড) বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে দুর্ভিক্ষ। একটিতে ফুটপাতে শায়িত অনাহারক্লিষ্ট মায়ের স্তন্য পান করছে শিশু। অন্যটিও ফুটপাতে শায়িত ক্ষুধাজীর্ণ একটি পরিবারের ছবি। শেষোক্ত ছবিটিতে আলোছায়ার আংশিক বিন্যাস লক্ষণীয়।

---

[৪৯২] সন্তোষ গুপ্ত, ‘বাংলাদেশের সাহিত্য ও চিত্রকলার পারস্পারিক সম্পর্ক’, দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্পঃ স্বরূপের সন্ধান*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৯৭, পৃ ৯

[৪৯৩] মতলুব আলী, ‘ঐতিহ্যের পটভূমিতে আবেদিনের চিত্রশিল্প ঃ জলরঙে তাঁর উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকসমূহ’, *শিল্পকলা*, ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ ১৫

পঞ্চাশের দশকে এসে চিত্রকলার মতো তাঁর ছাপাই ছবির আঙ্গিকেও আসে পরিবর্তন। এ সময় খানিকটা রোমান্টিক আবহে এঁকেছেন *চন্দ্রালোকে অনুধ্যায়ী* (?)।[৪৯৪] পুরো পটজুড়ে একজন রমণীকে হাঁটুতে মুখ রেখে স্মৃতিরোমন্থনরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এতে (চিত্র ৬৫)। তার শিয়রে চাঁদের প্রতীকী উপস্থিতি। আবার ফোঁটা ফোঁটা সাদায় সৃষ্টি করেছেন তারার আলোও। শরীরের তুলনায় নারী অবয়বটির মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট। চোখ-মুখের গড়নও সরল এবং কিছুটা জ্যামিতিক। অনেকটাই যেন আমাদের লোকজ রীতির মাটির পুতুলের আদল। আবার পূর্বের সকল ছবির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনভঙ্গি থেকে এর উপস্থাপনভঙ্গিও আলাদা। পঞ্চাশের দশকে তাঁর চিত্রপটে লোকজ আঙ্গিকের যে প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, এটা যেন তারই ধারাবাহিকতা। প্রথাগত পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতি এবং বিষয়ের নিবিড় বিন্যাসও লক্ষ করা যায় এতে। তা ছাড়া পূর্বের সকল ছাপাই ছবি থেকে এর রেখাও বৈশিষ্ট্যসূচক। পূর্বের মতো বলিষ্ঠ নয় বরং কিছুটা ভাঙা ভাঙা। যদিও লিনো ছাঁচের উপাদানগত তারতম্যের কারণেও এমনটা ঘটে থাকতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বারবার সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নানাভাবে নিজেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন '...সত্যি বলতে কি, এই রীতি আমার জন্য নয়'। তাই আবার কালো কালির মোটা রেখায় থিতু হয়েছেন শেষে। সত্তরের দশকে লিথোগ্রাফ মাধ্যমে দ্রুতলয়ের রেখার সংযোগে নিজের আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সবিশেষ। হালকা হলুদাভ রঙের জমিনে কালো রেখায় এঁকেছেন *মুখ* (১৯৭৫) শীর্ষক লিথোচিত্রটি। চারদিকের মোটা বহিঃরেখার মধ্যে ভীষণ সংক্ষিপ্ত রেখা আর রঙে আঁকা মুখাবয়বটির রেখায় আবার চল্লিশের দশকের সরলতা এবং বলিষ্ঠতা দৃশ্যমান। যা তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকও বটে।

ছাত্রাবস্থায় ত্রিশের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত করা জয়নুলের এ সমস্ত ছাপচিত্রের মধ্যে এক অসামান্য শিল্পীর পথপরিক্রমা লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু তাঁর চিত্রপটে সরলায়িত ও সাদৃশ্যধর্মী হয়ে ধরা দিলেও ঐতিহ্য, বুদ্ধি আর মানবিকতার সুচারু মেলবন্ধনে তা আমাদের বিস্মিত করে তোলে। অল্প স্পর্শের মাধ্যমে তাঁর ছবি কতটা জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তা-ও এতে উলব্ধি করা যায় সহজেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হওয়ার পরও তাঁর কাজে আর্ট কলেজে চর্চিত রীতি অনুপস্থিত। জটিল আলোছায়ার বিন্যাস কিংবা সূক্ষ্ম সরু রেখার পরিবর্তে একধরনের সরলতা-উত্তীর্ণ তাঁর চিত্রতল। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে খানিকটা অভিব্যক্তিবাদী ধারা প্রভাবিত এই সরলতা হয়তো তাঁর রেখাচিত্র থেক

---

[৪৯৪] ছবিটির বৈশিষ্ট্য থেকে এটি পঞ্চাশের দশকের কোন-এক সময়ে করা বলে অনুমেয় হলেও Skira এবং Bengal Foundation থেকে প্রকাশিত Rosa Maria Falvo ed. `Great Masters of Bangladesh Zainul Abedin' বইটির ১৪১ পৃষ্ঠায় এ ছবিটিকে চল্লিশের দশকের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে কিছু অসংগতি লক্ষণীয়। বই অনুযায়ী জয়নুলের কাজে লোকজ আঙ্গিকের প্রভাব দৃশ্যমান হয় চল্লিশের দশক থেকেই। কিন্তু বিচিত্রায় জয়নুল অবেদিনের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিকের মতামত অনুযায়ী এ সময়কাল পঞ্চাশের দশক। তা ছাড়া *আয়না নিয়ে বধূ* (১৯৫৩) এবং *অনুধ্যায়ী* (১৯৫৩) শীর্ষক কাজ দুটির সাথে এর বিষয়বস্তুর খানিকটা মিলও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাজটিকে পঞ্চাশের দশকের বলে ধরে নেওয়াই সমীচীন। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক আবুল মনসুরও এটিকে পঞ্চাশের দশকে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। (২০-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী)

উদ্ভূত হতে পারে অথবা তৎকালীন সময়ের সমাজবাদী ভাবধারার ব্যাপক উত্থানের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত অলংকরণ বা পোস্টার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটাও অস্বাভিক নয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে ছাপচিত্র চর্চায় বেশ অনিয়মিতই বলা যায়। মাধ্যমটি একটু সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে, আবার প্রাতিষ্ঠানিক নানা ব্যস্ততাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। তবে শুধু ছাপচিত্রই নয়; বরং আর্ট ইনস্টিটিউটকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে নিয়ত পরিশ্রম তাঁর সামগ্রিক শিল্পচর্চাকেও ব্যাহত করেছে। তবে ছাপচিত্রের জনবান্ধব চরিত্রের জন্য এ মাধ্যমের বিস্তৃতি এবং চর্চার পরিবেশ নির্বিঘ্ন করতে তিনি সর্বাত্মক নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। শিল্পকে গুটিকয়েক শিল্পরস-নির্বোধ বিত্তবানের বিলাস-সঙ্গী করে না রেখে বরং দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদনকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে এবং সমাজের সকল স্তরের শিল্পচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লন্ডনে অবস্থানকালেও তিনি ছাপাই মাধ্যমের নানা করণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।[৪৯৫] তাঁর বিশ্বাস ছিল এচিং, লিথো, কাঠ খোদাই প্রভৃতি ছাপাই ছবির প্রকরণসমূহ কাপড়ের পরিবর্তে ধাতুর পাত, পাথর বা কাঠের ওপরে হয় বলে একটি ব্লক থেকে অগণিত সংখ্যায় অনুরূপ ছেপে জনসাধারণের হাতে নামমাত্র মূল্যে তুলে দিতে পারলে এ দেশের শিল্প-আন্দোলনে বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠীকেও যুক্ত করা সম্ভব হবে। না হলে আমাদের মতো নিতান্ত গরিব দেশে সীমিত ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর হাতে তেল-রং, জলরঙের-মতো ব্যয়বহুল ছবি ব্যাপকভাবে পৌঁছে দিয়ে শিল্পের সাথে বৃহত্তর জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি সত্যিই অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং এতে শিল্পচর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ব্যাহত হতে পারে। তাই এ দেশে শিল্পের পথচলায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মাধ্যমের বিস্তৃতি এবং এ দেশে এর চর্চা নিরবচ্ছিন্ন করতে সর্বদা সচেষ্ট রেখেছিলেন নিজেকে।

চল্লিশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে কামরুল হাসানও ছাপাই মাধ্যমে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্প রচনা করেছেন। বিশেষত সত্তরের দশকে করা ছাপচিত্রগুলো আলাদা করে মনোযোগ দাবি করলেও সাতচল্লিশপূর্ব এবং পঞ্চাশের শেষ নাগাদ করা কয়েকটি শিল্পকর্মও একই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সত্তরের দশকে করা ছাপছবিগুলো সাতচল্লিশপূর্ব সময়ে করা ছবির ধারাবাহিক উত্তরণের ফসল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, তাঁর ছাপাই ছবির হাতেখড়ি হয় কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায়। সে সময় ফাইন আর্টের ছাত্রদের কাঠ খোদাইও করতে হতো।[৪৯৬] সে সুবাদেই তাঁর জানা হয়ে যায় ছাপাই ছবির করণকৌশল। তবে একাডেমির বাইরে বৃহত্তর পরিসরে ছাপচিত্রের সঙ্গে তাঁর সংযোগটা ঘটেছিল তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কামরুল হাসান কলকাতার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিল্পচর্চার প্রবল বিরুদ্ধ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য নানা ধরনের

[৪৯৫] আব্দুল্লাহ আল-মুতী, 'শিল্পী জয়নুল আবেদীন', *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫২, পৃ ৪২-৪৩

[৪৯৬] শোভন সোম, 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২, পৃ ৯৩

ফরমায়েশি কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়েছে তাঁকে। তা ছাড়া চরিত্রগত দিক থেকে প্রাণবন্ত এ শিল্পীর নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথেও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে ভারত বিভক্তি এবং পূর্ব-পাকিস্তানে অভিবাসী হওয়ার পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হওয়ার সূত্রে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে রিলিফ পদ্ধতিতে করেছিলেন কিছু পোস্টার। এর মধ্যে *পলিটিক্যাল প্রিজনার্স* (১৯৪৬), *শান্তিশিবির* (১৯৪৮) এবং *রেলওয়ে ধর্মঘট* (১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য। রাজবন্দিদের নিয়ে মোট তিনটি এবং ভারতীয় রেলওয়ে ধর্মঘটের পক্ষে দুটি পোস্টার করার কথা জানা যায়।[৪৯৭] এর মধ্যে একটিতে দেখা যাচ্ছে চিত্রপটের পুরোটা জুড়ে ক্ষুব্ধ এক শ্রমজীবী দু-হাতে একজন নারীর গুলিবিদ্ধ দেহ নিয়ে প্রতিবাদী ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান (চিত্র ৬৬)। মুখে কামড় দিয়ে ধরে আছে তার রুটি-রুজির সম্বল (কমিউনিস্ট প্রতীকও) হাতুড়ি। অভিব্যক্তিতে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে যুগপৎ। নিচে একজন তরুণের হাতে রক্তাক্ত একখণ্ড কাপড়। পেছনে আন্দোলনরত মানুষের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছুরি নিয়ে আক্রমণোদ্যত প্রশাসন। দণ্ডায়মান তরুণের ঠিক পেছনে 'মানুষের মত বাঁচতে চাই... ১৪৪ তুলতে... রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' লেখা প্লাকার্ডের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক তরুণী। লাল ও কালো রঙে কাঠ খোদাই মাধ্যমে ছাপা এই পোস্টারে ভারত বিভাগপূর্ব বাংলার বিদ্রোহোন্মত্ততার উত্তাপ কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। কাঠ খোদাই মাধ্যমে লাল আর কালো রঙে ছেপেছিলেন রেলওয়ে ধর্মঘটের পোস্টারও। চিত্রপটের সম্মুখে এগারজন শিশু, নারী এবং পুরুষের মুখ। অবাক হওয়ার মতো কিছু একটা সবার অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। ভিড়ের মধ্যে একজন একটি প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে থাকলেও তাতে কিছু লেখা নেই। পেছনে থেমে থাকা রেলগাড়ি এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত ও লাল ঝান্ডার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট সংশ্লিষ্টতার। আর সাদা-কালোতে ছেপেছিলেন *শান্তিশিবির* শীর্ষক পোস্টার। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে এই পোস্টারে। এখানে দেখা যাচ্ছে চীনের লালফৌজ শান্তিশিবির লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এগিয়ে আসছে আর ভারতীয় শ্রমিক তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তার বাঁ-হাতে হাতুড়ি এবং এক পায়ের নিচে কংগ্রেস ও অন্য পায়ের নিচে ব্রিটিশ সরকার। পাশে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে মার্কিন শকুন।[৪৯৮]

এই শিল্পকর্মগুলোর বিষয়বস্তু ভারতীয় রাজনীতি ঘনিষ্ঠ হলেও এর বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক রীতির বাইরে গিয়ে তিনি এগুলো রচনা করেছিলেন। যার প্রভাব তাঁর পরবর্তীকালে করা ছাপাই ছবিতেও দৃশ্যমান। তখন আর্ট কলেজের ছাপছবির ধারাটি ছিল থমাস বেউইক চর্চিত রীতিপন্থী অর্থাৎ সুন্দর ও সূক্ষ্ম সাদা রেখায় বিষয়ের সাদৃশ্যধর্মী উপস্থাপন-নির্ভর। কিন্তু কামরুল হাসান তাঁর রচনায় যে শৈলী ব্যবহার করেছেন, তা অভিব্যক্তিবাদী। বলিষ্ঠ ড্রইংয়ের সাথে সাদা-কালোর চরম বৈপরীত্যে নির্মিত এ-সমস্ত কাজ। কোনো

---

[৪৯৭] শোভন সোম, 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২, পৃ ৮৯, ৯৬

[৪৯৮] তদেব, পৃ ৯৬

কোনো ক্ষেত্রে অবয়ব বা উপাদানের রেখায় আয়তনের অবভাস থাকলেও আলোছায়ার সুস্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত। এ শিল্পকৃতিসমূহে আকারের বলিষ্ঠতা ও সরলতার সাথে সুষম পরিসরবিন্যাস একে অভিব্যক্তিবাদী সরলতায় উত্তীর্ণ করেছে। তবে ছাত্র হওয়ার পরেও আর্ট কলেজের প্রচলিত রীতিপন্থী না হয়ে বরং অভিব্যক্তিবাদী হওয়ার পেছনে তাঁর কমিউনিস্ট-ঘনিষ্ঠতা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমাজবাদী ভাবধারা উত্থানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল ছাত্রমহলে তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এদের অধিকাংশই তখন সোভিয়েতপন্থী সমাজবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের কাছে এ ভাবধারায় লিখিত বিভিন্ন বইপত্রের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আসা এসব বই ও পোস্টারের চিত্রায়ণ সাদা-কালোর বৈপরীত্যে অভিব্যক্তিবাদী ধারায় নির্মাণ করা হতো। কামরুল হাসান এসব পোস্টার ও চিত্রায়ণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সমসাময়িক কমিউনিস্টপন্থী অনেক শিল্পীর ওপরেও প্রভাব পড়েছিল এর। কেউ কেউ আবার সোভিয়েত পোস্টার ছাড়া চায়নিজ পেপার কাটিংয়ের সূক্ষ্মতার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কামরুল হাসান ছিলেন অভিব্যক্তিবাদী সরলতা এবং বলিষ্ঠতাপন্থী।[৪৯৯] এই সরলতা ও বলিষ্ঠতার ছাপ বজায় ছিল পরবর্তীকালে করা *মাছধরা* (১৯৫০) শীর্ষক তেলচিত্রে। অনেকটা জ্যামিতিক আধুনিকতার সাথে খানিকটা লোক আঙ্গিকতাও যেন স্পষ্ট এতে। এর সার্থক ক্রমপরিণতি লক্ষ করা যায় তাঁর *বসে থাকা রমণী* (১৯৫২) শীর্ষক লিথোচিত্রটিতে। কলম হাতে কোনো কিছু লেখায় রত নারী চরিত্রটি বলিষ্ঠ কালো চওড়া রেখায় নির্মিত। চিত্রপটের একেবারে সম্মুখে প্রায় পুরোটা জুড়ে তার উপস্থিতি। গৃহাভ্যন্তর পেরিয়ে পেছনের বাড়ির ছাদে একটি মোরগ দৃশ্যমান। প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপনে জ্যামিতিকতার সাথে লোকজ সরলতাও উপস্থিত। যা যামিনী রায়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়, কিংবা একইসঙ্গে কালীঘাটের পটচিত্রকেও। একই আঙ্গিক লক্ষণীয় তাঁর *স্নানশেষে* (১৯৫৮) শীর্ষক লিথোচিত্রটিতে। এখানে একজন নারীকে স্নান পরবর্তী চুল মোছার ভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে অনাবৃত নারী-সৌন্দর্য বিধৃত করেছেন শিল্পী। মহিলার শরীর ত্রিভুজের ভঙ্গিতে নোয়ানো, উন্মুক্ত বক্ষ, মুখের আদলে আধাবিমূর্ত সহজীকরণ।[৫০০] পূর্বের মতো চিত্রতল নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত পুরু তুলির টানে, সাদা ও কালোর বৈপরীত্যে। কালোর প্রবল প্রাধান্য লক্ষ করা যায় পুরো কম্পোজিশনে। ছবিটির রেখা মোটা ও কালো এবং বিষয়ের কাঠামোবিন্যাস বেশ সরল ও খানিকটা জ্যামিতিক হলেও ভবিষ্যতের আধুনিক ও লোকজ শিল্পের রীতিসমন্বিত কামরুলের উন্মেষও যেন উঁকি দিচ্ছিল রমণীর নাকে, চোখে আর দেহভঙ্গিতে।

---

[৪৯৯] শোভন সোম, 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২, পৃ ৯৪-৯৬

[৫০০] নজরুল ইসলাম, 'কামরুল হাসানের চিত্রকলায় নারী', *সংবাদ*, ৪৫শ বর্ষ, ২৫৬ তম সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ প্রাপ্ত নমুনায় উল্লেখ নেই

ভারত বিভক্তি-উত্তোর সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে স্থায়ী আবাস গড়ার পর তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুতে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তৃণমূল বাংলার নানা অনুষঙ্গ। শুধু বিষয়বস্তুতে নয় বরং শৈলীতেও বাংলার লোকশিল্পের প্রভাব দৃশ্যমান হতে থাকে এ সময় হতে। বস্তুত পূর্বের কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্টতা তাঁকে টেনে এনেছিল বাংলার তৃণমূল মানুষের কাছে আর গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দলোন তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে।[৫০১] তবে বাংলার লোকজ নানা বিষয়ের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল বাঙালি রমণীকূলের কোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। তাঁর সারা জীবনের শিল্পকৃতিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে খানিকটা একই ভঙ্গিতে *স্নান* (১৯৬৬) শীর্ষক তৈলচিত্রে প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতির অনুসরণ করলেও ছাপছবির বেলায় থেকেছেন অভিব্যক্তিবাদীই। এ ধারায় তাঁর শিল্পকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হলা সত্তরের দশকে করা *রায়বেঁশে নৃত্য* (১৯৭৪)। এতে ছবির কেন্দ্রে একজন ঢুলি ঢোল বাজাচ্ছে আর তার সাথে কাঁসর বাজাচ্ছে অন্য একজন। এই দু-জনের চারপাশ ঘিরে নাচছে উদোম গায়ের কৃষককূল। ফলে একধরনের কেন্দ্রাভিমুখী আবর্তন গতির সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র তলজুড়ে। প্রতিটি মানবদেহের আভিব্যক্তিতে নাচের আনন্দের বিচ্ছুরণও ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক শোভন সোম। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

> এই "রায়বেঁশে নৃত্যে"র ছবিটিতে শাদাকালোর বণ্টনে যদিও এক্‌প্রেশনিস্টদের অনুরূপ কাঠখোদাইয়ের কথা মনে পড়ে, তবু পাঠক/দর্শক লক্ষ করুন যে, এই ছবির কম্পোজিশন আদৌ ইয়োরোপীয় নয়। এই ছবিতে মাঝখানে, কেন্দ্রে মূল নর্তক মাদল বাজাচ্ছে আর তাকে ঘিরে বলয়ের মতো, হ্যাঁ বলয়ের মতো বৃত্তছন্দে ঘুরে ঘুরে অন্য নর্তকেরা উদ্দাম নাচ নাচছে। লক্ষ করুন এই ছবির পার্সপেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আদৌ ইয়োরোপীয় নয় এবং এতে ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা বিলয়বিন্দুর ব্যবহার নেই। ছবিটিকে ঘোরান, দেখবেন ছবি ঘুরছে, নর্তকেরা ঘুরে ঘুরে নাচছে, আপনি যেন বিহঙ্গদৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দৃশ্যটা দেখছেন। লক্ষ করুন, এই ছবিতে ত্রিমাত্রিকতার অধ্যাস নেই। ...এই ছবির কম্পোজিশন বা বিন্যাস দ্বিমাত্রিক কাঁথার মতো, আলপনার মতো, মণ্ডলের মতো। কাঁথায়, আলপনায় কেন্দ্রকে ঘিরে চারপাশের নকশার যে বৃত্তাকার আবর্তন লক্ষ করা যায়, সেই বাঙালি-বিন্যাস কামরুল এই লিনোকাটে করেছিলেন। ...কাঁথার কম্পোজিশন বা বিন্যাস, কাঁথার স্ট্রোবোস্‌কোপিক ভিশন বা দৃক্‌ভ্রমি দৃষ্টি, কাঁথার অসাধারণ দ্বিমাত্রিকতা, যা ইয়োরোপের শিল্পীদের ভাবনাতেই আসেনি, তা কামরুল তাঁর এই লিনোকাটে দেখিয়েছেন।[৫০২]

তবে অবয়বের ক্ষেত্রে সাতচল্লিশপূর্ব বলিষ্ঠ কাঠামো-বিন্যাসের পরিবর্তে এখানে লোকজ ধারালগ্নতার আভাস চোখে পড়ে কিছুটা। ছোট ছোট রেখার অর্থপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। কাঠামোর একই রকম বিন্যাসের উপস্থিতি গুনটানার দৃশ্য-সংবলিত একটি কাঠ খোদাইতেও। *রূপকল্প* (১৯৭৪) শীর্ষক

---

[৫০১] শোভন সোম, 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২, পৃ ৮৯, ৯০

[৫০২] তদেব, পৃ ৯৯

ছবিটির পুরো পটজুড়ে নদীতীর দিয়ে একজন শ্রমজীবীর গুন টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ভাঙা ভাঙা রেখায় নির্মিত হয়েছে পাশের নদীর রুপালি জলের ঝিলিক।

ষাটের দশক থেকে কামরুল হাসান মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের রীতি-বৈশিষ্ট্যের সু-সমন্বয়ে নিজস্ব রীতিতে প্রকাশমান হয়ে ওঠেন। একই সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থায় যোগ দেওয়ার ফলে (১৯৬০) বাড়তে থাকে তাঁর লোকশিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠতা। ফলে তাঁর শিল্পে লোককলার প্রভাব আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। যদিও গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততা তাঁকে আগেই চিনিয়েছিল বাংলার লোকসংস্কৃতিকে। তবে ষাটের দশকে সে বন্ধন আরও প্রগাঢ় হয়। এ সময় লোকজধারার প্রকৃতিনির্ভর স্বতঃস্ফূর্ত রেখার সঙ্গে কিউবিক রীতির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখার সম্মিলনে নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করেন তিনি।[৫০৩] চিত্রকলায় ষাটের দশক থেকে এর ব্যবহার শুরু করলেও স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ছাপচিত্রেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দের তাঁর প্রায় কাজগুলোই ছিল কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা। এসব কাজে অনেক ক্ষেত্রে দেশি প্লাইউড ব্যবহার করে তৈরি করেছিলেন বুনটও।[৫০৪] বস্তুত শিল্পী কামরুল হাসান এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে পা দিয়েছেন ক্রমাগত পরিশীলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে। *বৃষ* (১৯৭৪), *মহিষ* (১৯৭৪/?), *বাউল* (১৯৭৪), *কৃষ্ণকলি* (১৯৭৪), *মৎস-স্বপ্ন* (১৯৭৪) এ ছাড়া *রূপকল্প-৭৪* (১৯৭৪) শিরোনামের কয়েকটি শিল্পকর্ম এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। জমাটকালো সমতল জমিনে লতিয়ে ওঠা তীক্ষ্ণ সাদা রেখায় এসব ছবির বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। সাদা-কালোর তীব্র দ্বন্দ্ব কিংবা নেগেটিভ ও পজেটিভ স্পেসের সংঘাতে বোধের প্রখর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবেই। *বৃষ* ছবিতে লিনো খোদাই মাধ্যমে গাঢ় কালোর প্রেক্ষাপটে ছন্দায়িত সাদা রেখায় আঁকা বিশ্রামরত দুটি গরু দেখা যাচ্ছে। সামনের গরুটির পিঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরজীবীর সন্ধানে ব্যস্ত একটি ছোট পাখি। গরু দুটির চারপাশে ঘননিবদ্ধ ছোট ছোট রেখায় ঘাসের চমৎকার বুনুনি সমগ্র পরিসরকে দৃষ্টিনন্দন নকশায় উৎকীর্ণ করেছে। এখানে বিষয়ের উপাদানসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছেন শিল্পী। দুটি মহিষকে পাখির দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন *মহিষ* শীর্ষক ছবিতে। তাদের সরল আকৃতি ও লম্বা শিং বৈশিষ্ট্য নির্দেশক রূপে প্রকাশিত। আর *বাউল* শীর্ষক ছবিতে পটজুড়ে শশ্রূমণ্ডিত এক বাউলের প্রতিকৃতি এবং একটি একতারাকে উপস্থাপন করেছেন। আবার *কৃষ্ণকলি*তে উপস্থাপন করা হয়েছে এক কৃষ্ণবর্ণ তরুণীর প্রতিকৃতি। ঘোমটা মাথায় বাঙালি রমণীর সলজ্জ চাহনির অনিন্দ্যসুন্দর উপস্থাপন লক্ষ করা যায় কালো পটে সাদা রেখায় আঁকা ছবিটিতে। এতে বৈশিষ্ট্যসূচক ছোট ছোট রেখায় বিভিন্ন অলংকার, কাপড়ের নকশা ও পশ্চাদ্‌পটের নকশাও নির্দিষ্ট করেছেন। *মৎস-স্বপ্ন*-এ ডান হাতে ধরা একটি মাছের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা এক জেলের চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাছটিও তার দিকে তাকিয়ে আছে

---

[৫০৩] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসানের শিল্প ও শিল্পচেতনা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩৪

[৫০৪] মুনতাসীর মামুন, 'কামরুল হাসানের স্মৃতি', দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০, পৃ ৮১

সকরুণ দৃষ্টিতে। কৃষ্ণবর্ণ জেলের বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ রেখায় নিখুঁত ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। উপরোল্লিখিত রচনাসমূহে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিকটা রোমান্টিক স্ফূরণ লক্ষ করা গেলেও *রূপকল্প-৭৪* শীর্ষক ছাপাই ছবিগুলো সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক অনবদ্য উপস্থাপন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে এর থেকে দু-একটি ছবির বিষয়বস্তু আলোচিত হলো।

রূপকল্প-৭৪ শীর্ষক সিরিজের একটি ছবিতে (চিত্র ৬৭) পুরোটা জুড়ে এক ধূর্ত লোলুপ শিয়ালের উপস্থিতি। শিয়ালের পায়ের নিচে একটি সাপ ফণা উঁচু করে আছে। ফণার ওপরে একটি মা-পাখির পিঠে বসে আছে ক্ষুধায় মুখ হাঁ করে থাকা দুটি পাখির বাচ্চা। শিয়ালের কানে বসে থাকা আরও একটি পাখির পেছন দিয়ে সন্তর্পণে উঠে আসছে একটি হিংস্র কুমির। বাম দিকের নিচের কোনায় একটি শকুন এগিয়ে যাচ্ছে গরুর দিকে। উপরের দিকে হিংস্র বাদুড় ছুটে যাচ্ছে একটি নিরীহ কবুতরের পানে। স্বাধীনতাত্তোর দেশে শান্তি এবং মূল্যবোধকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, সুযোগসন্ধানী আর ক্ষমতাবানদের দৌরাত্ম্যকে এখানে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। আবার অন্য আরেকটি ছবিতে (চিত্র ৬৮) দেখি আনুভূমিক চিত্রতলকে তিনি মাঝ বরাবর ভাগ করেছেন একসারি কচ্ছপের উপস্থাপন দিয়ে। উপরের অংশে কয়েকজন নর-নারীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য। আর নিচের অংশে উপস্থাপন করেছেন কঙ্কালসার এক দঙ্গল বুভুক্ষ মানুষকে। সবার ওপরে চিত্রপটের মাঝ বরাবর অশুভ ইঙ্গিতবাহী একটি পেঁচা উড়ে আসছে। এই ছবিতে ধনীর নৈতিক স্খলন এবং সমকালীন সমাজব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন শিল্পী। কামরুল হাসানের অধিকাংশ কাজে নারী শান্ত-সুখী সমাজের প্রতীক হিসেবে রূপায়িত হলেও এখানে নষ্ট অস্থির সময় ও সমাজের শিকার হিসেবে তাকে উপস্থাপন করেছেন। ব্যর্থ, নষ্ট, দুষ্ট এক সময়কে শিল্পী এখানে প্রতিপন্ন করেছেন, যেখানে নারী শুধুই ভোগের বস্তু। শহুরে শিক্ষিত নারী শিয়াল সাপ আর হিংস্র জানোয়ারের আখড়ায় যেন এক অসহায় জীব।[৫০৫]

এই সিরিজের অধিকাংশ শিল্পকর্মই এমন সমকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার গরমা-গরম উপস্থাপনায় ঋদ্ধ। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিল্পসমালোচক মুনতাসীর মামুন *রূপকল্প-৭৪* সম্পর্কে বলেছেন–

> এ সিরিজ আবার প্রমাণ করেছিলো তিনি কতোটা সমাজ সচেতন। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছরের সামাজিক কলুষ তাঁকেও ব্যথিত হতাশ করে তুলেছিলো অনেকের মতো। ...সমাজ জীবনে রাজনীতিবিদ আমলাদের দৌরাত্ম্য নিষ্পেষিত জনগনের হতাশা, দুর্ভিক্ষ কবলিত মাতা শিশু এইসব হলো 'ইমেজ–৭৪-এর' বিষয়বস্তু। এখানে তিনি কর্তাদের মুখ এঁকেছিলেন পেঁচা, শৃগাল, গিরগিটি, সাপের মতো। প্রশাসনিক মন্থরতার প্রতীক

[৫০৫] নজরুল ইসলাম, 'কামরুল হাসানের চিত্রকলায় নারী', *সংবাদ*, ৪৫শ বর্ষ, ২৫৬ তম সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ প্রাপ্ত নমুনায় উল্লেখ নেই

> হিসেবে এসেছিলো কচ্ছপ। প্রতিটি কাঠ-খোদাই মনের মধ্যে তুলে ধরে এক ধরনের জ্যান্ত বীভৎস চিত্র যা কামরুল হাসানের পূর্ববর্তী সব রোমান্টিক ছবির বিপরীত।[৫০৬]

পূর্বের ব্যঙ্গচিত্রের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের আগ পর্যন্ত কামরুল হাসানের চিত্রপটে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণভাবে সংযোজিত হয়নি। তবে স্বাধীনতাত্তোর দেশে ধনীক শ্রেণির লাগামহীন দুর্নীতিপরায়ণতা, ব্যভিচারিতার মতো সামাজিক নৈরাজ্যের বিপরীতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের অবক্ষয়ও তাঁকে পীড়িত করেছিল ভীষণ। ফলে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় তাঁর ছবি হয়ে উঠেছিল সময়ের আর্তচিৎকার। তা পুরোপরি বাঙালি রমণীর লাবণ্য বর্ণনার ঢলঢল ভাববর্জিত; সমাজসচেতন, তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার। এ সময়ের কামরুল হাসান অনেকটাই পরাবাস্তবাদী। নানা ধরনের রূপক, প্রতীক আর শান্ত কিংবা হিংস্র সব প্রাণীর বিকৃত ও জান্তব উপস্থিতির মাধ্যমে দুঃসময়কে করেছেন উপস্থাপন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের পুরোটা সময় তাঁর অসংখ্য শিল্পকর্মে বিশেষত রেখাচিত্রেও স্বাধীনতাপূর্ব রোমান্টিক কামরুল হাসানের সাথে একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রামাণ্য দলিল।

শুধু শিল্পচর্চাই নয় কামরুল হাসান এ দেশের প্রত্যেক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থেকেছেন, কখনো কখনো নেতৃত্বও দিয়েছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিল্পের কাজ শুধু নান্দনিক সৌন্দর্যের মাধুর্য বর্ণনাই নয় বরং তা রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা অসাম্য, অবিচারের প্রতিবাদী হাতিয়ারও। খানিকটা অনিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাপাই ছবির ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে তিনি যেমন স্বপ্নবিলাসী আবেগ বুনেছেন চিত্রতলে, তেমনি তা আবার বিদ্রোহে ফুঁসেও উঠেছে। একজন আধুনিক শিল্পী হিসেবে সমাজের কাছে যা তাঁর দায়বদ্ধতারও প্রমাণ।

প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে হবিবর রহমান, জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান ছাপচিত্র বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও এ প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হলেন সফিউদ্দিন আহমেদ। শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাসে কিংবদন্তিতুল্য চরিত্র। চল্লিশের দশকের সফল শিল্পীদের অন্যতম তিনি। এ দেশে শিল্পশিক্ষার শুরু থেকে ছাপচিত্র মাধ্যমের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা পথিকৃতের। শুধু এ দেশের নয় বরং উপমহাদেশের আধুনিক ছাপছবির বাতাবরণ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক শোভন সোম বলেছেন–

[৫০৬] মুনতাসীর মামুন, 'কামরুল হাসানের স্মৃতি', দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*, ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০, পৃ ৮১

> সফিউদ্দিন যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখনো ভারতে মুকুল চন্দ্র দে, রমেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনারায়ণের পরের ছাপছবিতে আধুনিক ইউরোপিয়ান করণকৌশল আসেনি, সাবেক এচিং, ড্রাইপয়েন্ট চলছিল। এদিক থেকে সফিউদ্দিন কেবল বাংলাদেশেরই নয়, উপমহাদেশেরও পথিকৃৎ বলা যায়।[৫০৭]

যুগপৎ তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষ এবং ব্যক্তিত্বের ঋজুতা, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবনত হতে বাধ্য করে। তাঁর মতো নিরাসক্ত, নিভৃতচারী এবং একাগ্র শিল্পসাধকের সংখ্যা বাংলাদেশে অদ্যাবধি হাতে গোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। না তিনি হঠাৎ আসা আন্তর্জাতিকতায় গা ভাসিয়েছেন, না খ্যাতিমান হওয়ার উদগ্র বাসনায় কোনো মহলের তোষামদি করেছেন; বরং এক সচেতন বোধে উজ্জীবিত হয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব আঙ্গিক। সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন শিল্পচর্চায়, শিল্পের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। কারণ শিল্পচর্চাকে কখনোই সহজ বলে মনে করেননি তিনি। ছবি আঁকা অত্যন্ত কঠিন এবং সুদীর্ঘ একাগ্র সাধনা ছাড়া তা সম্ভব নয় বলেই বিশ্বাস ছিল তাঁর। ফলে তাঁর সকল সৃষ্টিতে সে সাধনা এবং একাগ্রতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পক্ষেত্রে আত্মোত্তরণ সম্ভব নয়, যদি না নিজের পূর্বের কাজগুলো থেকে নিরন্তর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। সেজন্য তাঁর কাছে কোনোদিন ছবি পণ্য হয়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যেকটি ছবিকে তিনি সন্তানতুল্য মমতায় গড়ে তুলেছেন এবং আগলে রেখেছেন। আর দিন শেষে তা-ই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনতিক্রম্য উচ্চতায়।

উদারচেতা মুসলিম পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক আবহেই শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ। আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়েই মুকুল দে'র আগ্রহে এবং রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও আব্দুল মঈনের উৎসাহে ছাপচিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৫০৮] চল্লিশের দশকেই তিনি তেলরং, কাঠ খোদাই এবং এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালেও তিনি রেখাচিত্রসহ চিত্রকলা ও ছাপছবির বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করলেও এই অভিসন্দর্ভে শুধু তাঁর ছাপাই ছবি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সফিউদ্দিনের সমগ্র শিল্পীজীবনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো অবিভক্ত ভারতবর্ষে কলকাতা পর্ব, দ্বিতীয়টি ১৯৪৭-৫৭ ঢাকা পর্ব এবং তৃতীয়টি ১৯৫৭ পরবর্তী সময়কাল। কলকাতা পর্বে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকেই বিষয়ের বাস্তবভিত্তিক উপস্থাপন-নির্ভর ছাপচিত্র রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি। যা তাঁকে সর্বভারতীয় খ্যাতি এনে দেয়। বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের পল্লি-প্রকৃতি ও মানুষ। তাঁর রচনায় কলকাতার বাইরের প্রান্তিক লোকালয় এবং এর বাসিন্দারা অনন্য হয়ে ধরা দিয়েছে যেন; বিশেষত সাঁওতাল পরগনা দুমকা। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

---

[৫০৭] ড. বজলুর রশীদ খান (রশীদ আমিন), 'বাংলাদেশের ছাপচিত্র: উৎস-কথা ও পরম্পরা', *ফাইন আর্ট*, ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৫, পৃ ৬৬

[৫০৮] শোভন সোম, 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০০; সৈয়দ আজিজুল হক, 'সফিউদ্দীন আহমেদ : চারুশিল্পের এক অনন্য সাধক', *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ ৭

> কলকাতার বাইরের নিসর্গ নিয়ে ১৯৩৬-৪২ কালপর্বে ছবি আঁকলেও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর নিবিড় বোধ গড়ে ওঠে সাঁওতাল পরগনার দুমকায় গিয়ে। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষ ও প্রাণীজগৎ তাঁর শিল্পে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। ...দুমকার প্রাকৃতিক পরিবেশ- তার শালবন, ময়ূরাক্ষি নদী, আদিবাসী সাঁওতাল রমণীর দেহবল্লরীসহ তাদের সামগ্রিক জীবনকোলাহল তাঁর শিল্পবোধকে যেমন জাগ্রত করে তেমনি তাঁর চিত্রের জমিনকেও করে তোলে চিত্রগুণে সমৃদ্ধ।[৫০৯]

আর্ট স্কুলের দ্বিতীয়বর্ষে পড়ার সময় থেকেই দুমকা অঞ্চলের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় লালিত সাঁওতালদের মৃত্তিকালগ্ন জীবন, আজন্ম শহরে লালিত সফিউদ্দিনকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতারই রূপায়ণ দেখি ১৯৪২-৪৭ পর্বের সাদা-কালো ছাপচিত্রে। অসমতল শুষ্কভূমি, দীর্ঘদেহী শাল-তাল, আর সাঁওতালদের সাধারণ জীবনচিত্র যেন তাঁর ছবিতে আলোছায়ার অপূর্ব খেলায় সবটুকু আবেগ নিয়ে উপস্থিত। এমনই দুটি কাজ হলো ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে করা *বাঁকুড়ার দৃশ্য* এবং *সাঁওতাল রমণী ও শিশু*। উড-এনগ্রেভিং দুটিতে দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে মধ্যদুপুরে একজন মহিলা ও একটি শিশু রাস্তা দিয়ে বাড়িঘর অতিক্রম করে সামনের দিকে যাচ্ছেন এবং অন্যটিতে কয়েকজন মহিলা ও শিশু মালামালসহ একটি মেঠোপথে হেঁটে সম্মুখের দূর গ্রামের দিকে যাচ্ছেন। পল্লি-প্রকৃতির অতিপরিচিত এই দৃশ্যদুটিতেই বৈশিষ্ট্যসূচক সূক্ষ্ম রেখায় ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠ ও অমসৃণ মেঠোপথ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাবলীলভাবে। স্পষ্ট প্রতীয়মান সাঁওতাল রমণী ও শিশুর গঠনগত বৈশিষ্ট্যও। একই রকম আরও একটা ছবি *পথে* (১৯৪৩)। দীর্ঘ শালবনের মধ্য দিয়ে মালপত্র নিয়ে দুজন রমণীর সামনের লোকালয়ের দিকে যাওয়ার দৃশ্য এটি। এই তিনটি ছবির প্রত্যেকটিতে চরিত্রগুলোর গতিশীলতা স্পষ্ট। আবার দীর্ঘ শালবনের মাঝ দিয়ে মহিষের দল ও রাখালের চলে যাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে *দুমকায় শালবনে মহিষ* (১৯৪৪) শীর্ষক ড্রাইপয়েন্টটিতে। মেঠোপথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল উঁচু শালগাছগুলোর মধ্য দিয়ে কয়েকটি মহিষ নিয়ে রাখাল আড়াআড়িভাবে ঢালু মাঠে নেমে যাচ্ছে। দূরে সূক্ষ্ম হালকা রেখায় দিগন্ত স্পষ্ট। দীর্ঘ বনানির শীতলছায়া আর চকচকে আলোর ঝিলিক দৃশ্যপটকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তবে এ পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে করা *বাড়ির পথে* (১৯৪৪)। আসন্ন সন্ধ্যায় সারি সারি তালগাছের পাশ দিয়ে মোষের পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে রাখাল (চিত্র ৬৯)। একটি মোষের পিঠেও চড়ে বসেছে একজন। তালগাছের মাথায় জমে থাকা বাহারি মেঘের উপস্থিতিতে এবং গোধূলির স্বল্প-আলোয় পুরোদৃশ্যের বাস্তবায়ন অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কাজটি সম্পর্কে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক শোভন সোম বলেছেন–

> তিনি বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মোষের পাল, রাখাল বালক, তালগাছ ইত্যাদিকে দেখেছিলেন সিলুয়েটে, আর আকাশে বাহারি মেঘ রচনা করেছিলেন নানা ধরনের রৈখিক তক্ষণ দিয়ে। জমিনে কেটে নেওয়া ধানগাছের ডগাগুলিতে বিন্দু বিন্দু আলো ফেলে তিনি ফোরগ্রাউন্ডে এক আশ্চর্য ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। ...সফিউদ্দিন তাঁর

---

[৫০৯] সৈয়দ আজিজুল হক, 'সফিউদ্দীন আহমেদ : চারুশিল্পের এক অনন্য সাধক', *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ ৭

> ছবিতে এক রোমান্টিক আবহ তৈরি করেছিলেন, যেখানে দিনের শেষে স্তব্ধ তালসারির পাশ দিয়ে মোষদের ঘরে ফেরার মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমের বৈপরীত্যজনিত টেনশন বোধ করা হয়। তাঁর এই ছবিতে সময়কে চিহ্নিত করা যায়। স্থির ভূরেখা, স্থির বৃক্ষশ্রেণীর বিপরীতে চলমান মেঘ ও মোষদের মধ্যে গতিপ্রবাহ অনুভব করা যায়।[৫১০]

এ পর্বের আরও একটি জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য কাজ হলো *সাঁওতাল রমণী* (১৯৪৬)। জঙ্গলের ভেতরের একটি জলাশয় থেকে দুজন সাঁওতাল রমণীর কলসিতে পানীয় সংগ্রহের দৃশ্য এটি। একজন উপুড় হয়ে কলসিতে জল ভরছে আর অগ্রভূমির অন্য রমণী কাঁখে এবং মাথায় কলসি নিয়ে সচকিত ভঙ্গিতে তার জলভরা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। পশ্চাদ্‌পটের গাছগাছালির মধ্য দিয়ে দুজন নর-নারী হয়তো ফিরে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। সূক্ষ্ম এবং বৈশিষ্ট্যসূচক রেখায় সাঁওতাল নারীদ্বয়ের শারীরিক গঠন এবং বেশভূষার যেমন নিখুঁত নির্মাণ করেছেন, তেমনি অস্থির জলের মধ্যে তাদের কম্পমান ছায়া ও আলোর ঝিকিমিকি মিলিয়ে জলের টলটলে ভাবটাও ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষতার সাথে। এই ছবি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক হারকোর্ট রবার্টসন লিখেছিলেন 'সফিউদ্দিনের "সাঁওতাল রমণী" কেবল একটি রসপুষ্ট চিত্রই নয়, ইহা তাঁহার মহৎ শিল্পসম্পদের একটি রূপবান নিদর্শন।'[৫১১] এ ছাড়া *দুমকা-১* (১৯৪৪), *দুমকা-২* (১৯৪৪), *ময়ুরাক্ষী* (১৯৪৪), *ময়ুরাক্ষীতীরে* (১৯৪৫), *শান্তিনিকেতনের দৃশ্য* (১৯৪৫), *কবুতর* (১৯৪৫) ইত্যাদি এ সময়কার আরও উল্লেখযোগ্য কাজ।

উপর্যুক্ত ছবিগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিষয়বস্তু হিসেবে সাধারণ গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতি এসেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিতে তিনি প্রকৃতিকে বিশাল পরিসরে তুলে ধরেছেন আর মানব চরিত্রদের করেছেন প্রকৃতির তুলনায় ক্ষুদ্র বা স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট। ফলে প্রকৃতির রুদ্র-রুক্ষ বৈশিষ্ট্য এবং তার মাঝে জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামলিপ্ত মানুষের অসহায়ত্ব যেন সহজেই প্রতীয়মান হয়। দেখার দৃষ্টিকোণ, সময়, বিষয়বস্তুর দূরত্ব ও পরিসর এবং আলোছায়ার স্পষ্ট বিন্যাস নিয়ে এ পর্বের প্রত্যেকটি ছবিতে ব্রিটিশ ছাপচিত্রী থমাস বেউইকরীতি বলে স্বীকৃত ভিক্টোরীয় একাডেমিক ধারা অনুসৃত হলেও, কারুকৃতির মুনশিয়ানায় তা নিছক নিখুঁত বহির্জাগতিক দৃশ্য হয়েই থাকেনি বরং নিজস্ব শিল্পবোধে তার সার্থক মুক্তিও ঘটেছে। তাঁর *সাঁওতাল রমণী* (১৯৪৬) ছাড়া অধিকাংশ কাজের মধ্যে প্রাণী ও মানব চরিত্রগুলো বেশ দূরবর্তী, বিষয়বস্তুর বেশ খানিকটা অভ্যন্তরে স্থাপিত এবং পেছন দিক থেকে আঁকা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ যথার্থই বলেছেন–

> জল ভরণে "সাঁওতাল রমণী"কে অকস্মাৎ খুব কাছ থেকে দেখলেন শিল্পী। দূর থেকে প্রকৃতি ও মানুষকে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন দূরের পরদা সরিয়ে একটি ক্লোজ আপ।[৫১২]

---

[৫১০] শোভন সোম, 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০১

[৫১১] মাহমুদ আল জামান, *শফিউদ্দিন আহমেদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০২, পৃ ৬০

[৫১২] মইনুদ্দীন খালেদ, 'সফিউদ্দিন : শুদ্ধতম ঋত্বিক', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ৩৮

তবে অল্প কিছু দূরবর্তী চরিত্রকে পার্শ্বীয়ভাবেও দেখানো হয়েছে কোথাও কোথাও। এ সময়কার কাজে আরও একটি আশ্চর্য লক্ষণীয় বিষয় হলো, একমাত্র কলকাতা *আর্টস্কুলের পুকুর* (১৯৪৫) ছাড়া আর কোনো কাজেই বিষয়বস্তু হিসেবে কলকাতা আসেনি। তবে সেখানেও শহর কলকাতার কোনো বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয় না বরং প্রকৃতিই স্বমহিমায় প্রকাশিত। অথচ সফিউদ্দিন আহমেদ জন্মেছেন শহরে, আজন্ম লালিতও হয়েছেন শহরে।[৫১৩] হয়তো আর্ট কলেজের নিয়মের জন্যই এমনটা ঘটেছে। সে সময়ের শহুরে শিক্ষিত শিল্পীরা কলকাতার উপকণ্ঠের গ্রাম ও সাঁওতালদের জীবনকে রোমান্টিক আবহে তুলে ধরেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।[৫১৪] সফিউদ্দিনও এর ব্যতিক্রম নন। অথবা শৈশবে পিতাকে হারিয়ে জীবনের রুক্ষ-রুদ্রতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। তাই হয়তো শুষ্কভূমির নিয়ত সংগ্রামলিপ্ত প্রান্তজনের প্রতি অনুভব করেছিলেন গভীর মমতা। যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল এ ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে। কলকাতা পর্বের এসব কাজের জন্য কয়েকটি সম্মানজনক পুরস্কারসহ খ্যাতিও লাভ করেছিলেন বিস্তর। এগুলো তাঁকে একই সঙ্গে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিপুল সম্ভাবনাময় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল।

দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল ভারতবর্ষ। নিরাপদ আবাসস্থলের স্বপ্নে সফিউদ্দিন পা মেলালেন মোজাহেরদের কাফেলায়। পেছনে পড়ে থাকল প্রিয় মাতৃভূমি, ২৫ বছরের সুখ-দুঃখের স্মৃতি, এত বছরের অর্জিত খ্যাতি, আর্ট স্কুলের চাকরি– সবকিছু। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টেই ঢাকা চলে আসেন সফিউদ্দিন। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে কলেজিয়েট স্কুলে চাকরি নেন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জনসন রোডে গভ. ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাপচিত্র বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতার পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে ঢাকায় আসতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা তাঁকে যে অনিশ্চয়তায় ঘিরে ধরেছিল, আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শিক্ষকতার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে তার অবসান হয়। যা একই সঙ্গে তাঁর পরবর্তী শিল্পীজীবনকে গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে দুমকা, শালবন, সাঁওতালদের জীবন আর ফেলে আসা জন্মভূমি তাঁকে স্মৃতিতাড়িত করেছে। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকায় আসার পর আঁকা তাঁর *মেলার পথে* (১৯৪৭) শীর্ষক কাজটি থেকে।[৫১৫]

দুটি বড় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা ছবিতে আটপৌরে সাঁওতাল জীবনের দৃশ্যপটই যেন ফুটে উঠেছে। মালপত্র বোঝাই করে একটি ঘোড়ার পিঠে ছাতা মাথায় চলেছে একজন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ছাতা

---

[৫১৩] শোভন সোম, 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০২

[৫১৪] মঈনুদ্দীন খালেদ, 'সফিউদ্দিনের চৈতন্য : আঁখিতারার ঝর্নাধারা', দ্র. *দশ বাঙালি শিল্পী*, ঢাকা, প্যাপিরাস, ২০০৩, পৃ ১০৯

[৫১৫] আমিনুল ইসলাম (আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৪৮) তাঁর স্মৃতিচারণামূলক লেখায় বলেছেন ঢাকায় বসেই সফিউদ্দিন আহমেদ এ ছবির কাজ শেষ করেছিলেন। যদিও তিনি একাজটির নাম বলেছেন *হাট থেকে ফেরা*। আবার অমিয়ভূষণও (অমিয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, 'প্রথম চিত্র-কলা প্রদর্শণী', *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৭, পৃ ৬৪১) ঢাকা গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীতে মেলার পথে কাজটিকে সাম্প্রতিক বলে অভিহিত করেছেন।

নিয়ে সামনে-পেছনে এবং পাশে অনুগামী হয়ে চলেছে আরও কয়েকজন সাঁওতাল নারী, পুরুষ, শিশু; এমনকি একটি কুকুরও। অগ্রবর্তী হয়ে গরুর গাড়িতেও চলেছে কেউ কেউ। দুটি গরুর গাড়ি ঢালু থেকে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে দূরে একইভাবে। ছবির সম্মুখভাগে বিন্দু বিন্দু আলোয় সাদা-কালোর ভারসাম্য রচনা করেছেন তিনি। এ ধরনের খুঁটিনাটি কৌশলগত দক্ষতা, অসাধারণ ড্রইং আর আলোছায়ার অপূর্ব বিন্যাস সমগ্র জীবনচিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। দেশভাগের পরও কিছুকাল পর্যন্ত সাঁওতাল জীবন, ফেলে আসা দুমকার স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট করে রাখলেও অতি অল্পকালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, জীবন ও জনপদও তাঁর সৃষ্টিতে জায়গা করে নেয়। অচেনা পূর্ববঙ্গ ক্রমেই আপন হয়ে ওঠে তাঁর, বাড়ে জানাশোনা। সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুই বাংলার প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র। ওপারের খটখটে শুষ্কতা আর ধূসরতার বদলে, এপারের ভেজা স্যাঁতসেঁতে অবহাওয়ার সাথে ঘন নীলচে সবুজের আধিক্য খুব সহজেই তাঁর চোখে ধরা দেয়। তবে উঁচু-ভূমির মানুষ হওয়ার সুবাদে অপরিচিত পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁর মনে গভীর বেদনা সঞ্চার করে, বিশেষত বন্যা। বাকি জীবনের শিল্পযাত্রায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবসঞ্চারী হয় সর্বনাশা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বনাশা বন্যা শিল্পী স্বচক্ষে দেখেছেন। বন্যার প্রচণ্ডতা তাঁর শিল্পী-মানসকে এমন গভীরভাবে নাড়া দেয় যে বন্যা তাঁর শিল্পী জীবনের পালা বদলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্যার এই প্রভাব সম্পর্কে শিল্পী নিজেও উচ্চকণ্ঠ। জয়নুল আবেদীন দুর্ভিক্ষের মধ্যে যেমন খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পী-সত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তেমনি শিল্পী সফিউদ্দীনের শিল্পী-সত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে বন্যার মধ্যে।[৫১৬]

ফলে ওপারের শাল-তাল আর সাঁওতালের পরিবর্তে এপারের নদী-নৌকা, বন্যা আর সাধারণ জনজীবন খুব সহজেই দখল করে তাঁর চিত্রপট। ঢাকায় আসার পর পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত করা *পাট পারাপার* (১৯৫১), *নদী ও নৌকা* (১৯৫৪), *বন্যা উপদ্রুত স্বামীবাগ* (১৯৫৫), *বন্যা* (১৯৫৬) প্রভৃতি ছাপাইছবিগুলো পূর্ববর্তী কলকাতা পর্বেরই সম্প্রসারিত অংশমাত্র। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর চয়ন, উপস্থাপন এবং আলোছায়ার বিন্যাসের দিক থেকে কাজগুলোতে পূর্বের ভিক্টোরীয় একাডেমিক রীতি ও কলকাতা পর্বের প্রভাব স্পষ্ট হলেও বিষয়বস্তু হিসেবে তা পূর্ববঙ্গীয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সময়ের কাজে লোকশিল্পের সরলতা এবং খানিকটা জ্যামিতিক বিমূর্ততা এলেও প্রকৃতি ও জনজীবনই বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে যথারীতি। এ পর্বের ছাপচিত্রগুলোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম *জীবন ছবি* (১৯৫৫) এবং *জড়জীবন* (১৯৫৭)।[৫১৭] এখানে প্রথম ছবিতে ভিক্টোরীয় একাডেমিক রীতির প্রধান অনুষঙ্গ আলোছায়ার ব্যাকরণসিদ্ধ উপস্থাপনকে উপেক্ষা করেছেন তিনি। মানবদেহগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে অতিরঞ্জিত, জ্যামিতিক এবং প্রকাশধর্মী করে তুলেছেন। বিষয়ের হুবহু উপস্থাপনের

---

[৫১৬] ফখরুজ্জামান চৌধুরী, 'সফিউদ্দিন আহমেদ', *মাহে-নও*, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ ৪৫ ও ৪৯

[৫১৭] চিত্রকলার ক্ষেত্রে এ পর্বে *শরবতের দোকান* (১৯৫৪), *শূন্য ঝুড়ি* (১৯৫৪), *মাছধরা* (১৯৫৪) এবং *কাঠমিস্ত্রী* (১৯৫৬) ছবিতেও নিরীক্ষার ছাপ স্পষ্ট

পরিবর্তে, তার রূপকে প্রতিষ্ঠা করাই যেন লক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জয়নুল আবেদিন বিলেত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে লোকশিল্পের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যখ্যা করার পর[৫৮] লোকশিল্পকে অঙ্গীকার করে একটা নতুন নিরীক্ষাপ্রবণতার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ দেশে। (কাছাকাছি সময়ে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং অন্য সমসাময়িকদের কাজেও প্রায় একই ধরনের নিরীক্ষা স্পষ্ট) সফিউদ্দিন আহমেদের এই শিল্পকর্মটি সম্ভবত এই নিরীক্ষারই উত্তরাধিকার। তবে অন্যদের মতো লোকজ রং, রেখা, আঙ্গিককে সরাসরি ব্যবহার না করে; বরং লোকজ জীবন বা বিষয়বস্তুকে লোকশিল্পের সরলতায় তুলে ধরেছেন তিনি। আর *জড়জীবন*টিতে দুটি সূর্যমুখীকে সমতলীয় এবং জ্যামিতিক সরলতায় উপস্থাপন করেছেন। এখানেও উপেক্ষা করা হয়েছে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খতা, আলোছায়া এবং ত্রিমাত্রিকতাকে।

ইউরোপীয় আধুনিকতার সরাসরি সংস্পর্শে আসার পূর্বে ঢাকার এই প্রথম পর্বটি মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার সরাসরি উপস্থাপন থেকে তাঁর বিমূর্ততায় উত্তরণের কাল। এ পর্বে তিনি বিষয়ের কিছুটা ভাঙচুর করলেও তাতে তার সামগ্রিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। তবে এই নিরীক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ছাপচিত্র বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। এখান থেকে তাঁর পরবর্তী জীবনের শিল্পসাধনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। ইংল্যান্ডে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট-এ। সেখানে বিখ্যাত শিল্পী মার্লিন ইভান্সের স্নেহসান্নিধ্যের সুবাদে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন জগদ্বিখ্যাত শিল্পী হেইটারের শিল্প এবং করণকৌশলের সাথে।[৫৯] হেইটারের করণকৌশলের অভিনবত্বের সাথে ভীষণ ছন্দোময় স্বতঃস্ফূর্ত রেখা তাঁকে অভিভূত এবং প্রভাবিত করে। যার প্রভাব পরবর্তীকালে নিজস্ব আঙ্গিকে উত্তরণ এবং সমসাময়িকদের থেকে তাঁর শিল্পস্বাতন্ত্র্য নির্মাণে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। বিলেতের এই শিক্ষা এবং ইউরোপের শিল্পপ্রদর্শনশালাগুলো ঘুরে দেখার সুবাদে তিনি অর্জন করেন গভীরতর আত্মবিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের বক্তব্য হলো–

> বিলেত যাওয়ায় আমার লাভ হয়েছে। ওদেরকে আমি চিনতে পেরেছি। নিজেকেও চিনতে পারলাম। নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা হলো। আমার এবিলিটি কতটা আছে, জ্ঞানবুদ্ধি কতটা আছে– তা জানতে পেরেছি, নিজেকে ভালোভাবে চিনতে পেরেছি। এটাই বড় কথা। কে ভালো বলল, কে খারাপ বলল, কে প্রশংসা করল, কে করল না– তা নিয়ে ইনফ্লুয়েন্সড হতে চাইনি। বিলেত যাওয়ার মধ্য দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে যাচাই করে

---

[৫৮] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১০, পৃ ৩৫-৩৬

[৫৯] Syed Azizul Haque, 'A pilgrim's quest for art', in Rosa Maria Falvo (ed.), *Safiuddin Ahmed*, Italy, Skira and Bengal foundation, 2011, p. 28

> নেয়া গেল– এটাই আসল কথা। আত্মবিশ্বাস আগেও ছিল, কিন্তু বিলেত যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেটা সুনিশ্চিত হলো।[৫২০]

এই আত্মবিশ্বাস তাঁর শিল্পনির্মাণে যোগ করে নবতর উদ্যম। সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার ফলে চিত্রতল গড়ার জন্য গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর জন্য সহজ হয়। বিলেতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর চিত্রতল ছিল বাস্তবানুগ, তবে প্রবাসী হওয়ার পর থেকে চিত্রতল হয়ে উঠেছে নানাবিধ পরিচিত-অপরিচিত আকার-আকৃতি, রেখা, বুনটসমৃদ্ধ এবং আঙ্গিকপ্রধান। তবে প্রয়োজনের খাতিরে শিল্পীকে বিমূর্ত হতে হলেও সুখের বিষয় হলো তাঁর বিমূর্ততার ভিত্তি বাস্তব– কঠোর বাস্তব।[৫২১] চল্লিশের অন্য প্রতিনিধিদের মতো তাঁরও বিষয়বস্তু হয়েছে প্রকৃতি এবং মানুষের নানা অনুষঙ্গ। তবে অন্যদের থেকে প্রকাশভঙ্গিতে তিনি আলাদা। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ–

> এটি লক্ষ করবার মতো যে-জীবনাচারে বা অন্যান্য বহু বিষয়ে সফিউদ্দীন মূলত চল্লিশের দশকে প্রচলিত ধারাপন্থী বলেই প্রতীয়মান হন; শিল্প-উপকরণ ও কৃৎকৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট রক্ষণশীল। কিন্তু শিল্পভাবনার বিবর্তনে তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি অনেকখানি প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তাঁর শিল্প-আঙ্গিকে। চিত্রতলকে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিবিভ্রম রচনার ও দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্র হিসেবে দেখবার দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যকে বর্জন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই একে দেখতে চেয়েছেন দ্বিমাত্রিক তলে রেখা, আকৃতি ও বর্ণের সুসামঞ্জস্য বিন্যাস হিসাবে।[৫২২]

আসলে সফিউদ্দিনের নিরীক্ষায় চিত্রতল আপাত অচেনা মনে হলেও, সবসময় দৃশ্যমান জগৎ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশই তার উৎস। তবে বস্তুজগতের সে তথ্যগুলোকে তিনি নিজস্ব বোধে জারিত করে বিন্যাসের যুক্তিতে চিত্রপটে সাজিয়ে শুধু তথ্যসত্যকে চিত্রসত্যে রূপান্তরিত করেছেন।[৫২৩] এ সময় মাধ্যম হিসেবে পূর্বের কাঠ খোদাই এবং ড্রাইপয়েন্টের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট এবং মেটাল-এনগ্রেভিংকে। পূর্বের কলকাতা এবং ঢাকা পর্বে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট করার সুবাদে মাধ্যমটি সম্পর্কে জানাশোনা থাকলেও বিলেতের শিক্ষা তাঁকে আরও শানিত ও পূর্ণাঙ্গ করে। লন্ডনে করা তাঁর *মাছ ধরার সময়* (১৯৫৭) চিত্রটিতেই এই উত্তরণের আভাস লক্ষ করা যায়। ছবিটিতে একজন জেলেকে নৌকার ওপর উপুড় হয়ে জাল টেনে তুলতে দেখা যাচ্ছে। সফট গ্রাউন্ড ব্যবহার করে জালের ঘননিবদ্ধ বুনট তৈরি করা হয়েছে এতে। ছবির বেশির ভাগ অংশজুড়েই জাল ও জলের উপস্থিতি, যা

---

[৫২০] সৈয়দ আজিজুল হক, 'সফিউদ্দীন আহমেদ : চারুশিল্পের এক অনন্য সাধক', *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ ৮-৯

[৫২১] ফখরুজ্জামান চৌধুরী, 'সফিউদ্দিন আহমেদ', *মাহে-নও*, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ ৪৯

[৫২২] আবুল মনসুর, 'সর্বশেষ কুলপতির প্রস্থান', *কালি ও কলম* (সফিউদ্দিন আহমেদ সংখ্যা), ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১২, পৃ ৭৩

[৫২৩] শোভন সোম, 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ ৩০৫

প্রায় সমগ্র দিক থেকেই কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত স্বল্প অবয়বের জেলেকে ঘিরে ধরেছে। সেই সাথে এচিংয়ের কেন্দ্রমুখী রেখা আর অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমের জমাট ঘনকালো ও স্টেনসিল করে নেওয়া হলুদের উপস্থিতি, আমাদের জানিয়ে দেয় জেলেজীবনের সংগ্রামমুখরতার কথা। এখানে আমরা ভবিষ্যতে উত্তরণের ইঙ্গিতবাহী এক অন্য সফিউদ্দিনকেই দেখি। এই উত্তরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে সফটগ্রাউন্ড এচিং এবং কপার-এনগ্রেভিং মাধ্যমে করা *হলুদ জাল* (১৯৫৭) ছবিতে। স্পষ্ট বিমূর্ত আঙ্গিকবাহী এ ছবিতে এনগ্রেভিংয়ের বলিষ্ঠ রেখার সাথে কাপড়ের বিভিন্ন ধরনের বুনট যোগ করার মাধ্যমে জালের প্রতীকী রূপায়ণ করেছেন তিনি। অধিক্রমণকারী বহুবিধ জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে চোখের মতো দুটি জৈব আকৃতিও স্পষ্ট। আর স্টেনসিল মাধ্যমে ব্যবহৃত হলুদ, কমলা এবং সবুজের উপস্থিতি এতে পরিণত ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোটা ও চিকন রেখার বলিষ্ঠতার সাথে ভিন্ন বুনটের কাপড় ব্যবহার করে তৈরি করা নিখুঁত সফট গ্রাউন্ডের বুনট, মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর মনোযোগ ও দক্ষতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সফিউদ্দিন আহমেদ শিল্পে করণকৌশলগত বিশুদ্ধতার ব্যাপারটি খুব নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁকে কখনো কখনো সতর্কও করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। যেমন–

> সবদিক দেখে শুনে মনে হয়, বিষয়বস্তুর চাইতে টেকনিকের দিকেই শিল্পীর নজর বেশি তার প্রত্যেকটা ছবিতেই একটা অতি–সতর্ক সাবধানতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষ কারুকর্ম (Craftsmanship) প্রত্যেক ভালো শিল্পীরই একটা অন্যতম গুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু ইহাই চরমফল (End) নয়, চরমফল লাভের উপায় (Means) মাত্র।[৫২৪]

তবে করণকৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও তাঁর কাজ নিছক সার্থক কারুকর্মই নয়; বরং তা সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক গুণাবলিতেও অনন্য। তাঁর বিশ্বাসও ছিল যে, সৌন্দর্যের সাথে করণকৌশলের সু-সন্নিবেশই হলো শিল্প। এ প্রসঙ্গে শিল্পী নিজেও বলেছেন–

> আমার মধ্যে সবসময় যে অতৃপ্তিটা কাজ করে তা সুন্দরের জন্য। আবার একই সঙ্গে তা উন্নত একটা টেকনিকের জন্যও। টেকনিক্যাল সাইডটাকে নিখুঁত করার দিকে আমার ঝোঁক। টেকনিককে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করাই আসল কথা। কল্পনার ঐশ্বর্য ছাড়া একটি ছবি সার্থক হতে পারে না। আমি মনে করি, ছবি হবে সুন্দর এবং সেই সঙ্গে টেকনিক্যালি সমৃদ্ধ। তবে শুধু টেকনিকসর্বস্ব নয়। অনেক ছবি আছে কেবল টেকনিকসর্বস্ব, আমার ছবি সে রকম নয়। আমার সব ছবির ভেতরে বিষয়বস্তু আছে। বিষয়বস্তু নিয়েই কাজ করি। বিষয়ের মধ্যে দেশের উপাদান থাকে। দেশের মধ্য থেকেই বিষয়টাকে গ্রহণ করি।[৫২৫]

---

[৫২৪] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ঢাকা গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী', *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৬৩৬

[৫২৫] সৈয়দ আজিজুল হক, 'সফিউদ্দীন আহমেদ : চারুশিল্পের এক অনন্য সাধক', *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ ৮-৯

কোনো না কোনোভাবে দেশ, দেশের মানুষ এবং রুদ্র প্রকৃতির বিপক্ষে তাদের জীবনসংগ্রামই সফিউদ্দিনের শিল্পের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। কঠোর সংগ্রামলিপ্ত এ দেশের মানুষের সাধারণ জীবনচিত্র তাঁর শিল্পে উপস্থিত অসামান্য দরদ নিয়ে। যেমনটা লক্ষ করা যায় বিলেতে অবস্থানকালীন সময়ে করা *গুনটানা* (১৯৫৮) শিল্পকর্মটিতে। নদীমাতৃক বাংলার মাঝি-মাল্লার দিন যাপনের খুব সাধারণ অনুষঙ্গ গুণটানার পরিশ্রম ও অভিব্যক্তিকে গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এতে। চিত্রজুড়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ ছন্দায়িত রেখার ছোটাছুটির মাঝে দুজন মাঝির আদল উপস্থিত। চারদিক থেকে তাদের আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে থাকা, কিংবা কখনো তল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া ক্ষিপ্র রেখার ভঙ্গিতে, তাদের কঠোর শ্রম আর নিষ্করুণ জীবনসংগ্রাম অনবদ্য ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। দেশ ছেড়ে দূর পরবাসে অবস্থান করলেও মন মজেছিল তাঁর দেশজতায়। ঢাকা পর্বের শুরুতে এখানকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁর মনে যে গভীর ছায়াপাত করে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখি *বন্যা-১* (১৯৫৮), *বন্যা প্লাবিত গ্রাম* (১৯৫৮), *আসন্ন ঝড়ের পূর্বে* (১৯৫৮) প্রভৃতি শিল্পকর্মে। তবে সফিউদ্দিনের আরও পরিণত উত্তরণ লক্ষ করা যায় পরবর্তীকালে করা *নেমে যাওয়া বান* (১৯৫৯), *বন্যার কবলে* (১৯৫৯), *সেতু পারাপার* (১৯৫৯) প্রভৃতি শিল্পকর্মে। শিল্পশৈলী এবং নির্মাণকৌশলের মুনশিয়ানায় এ সময়ে করা তাঁর *সেতু পারাপার* একটি অনবদ্য শিল্পকৃতি বলে স্বীকৃত। সাদা-কালো ছবিটিতে পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের অনবদ্য দক্ষতার সাথে নদী, নৌকা, স্রোত, সাঁকো, মানুষসহ সবকিছুকে প্রতীকায়িত করে দেখিয়েছেন তিনি। ছবির একেবারে সামনের অংশ থেকে সেতু অনুসরণ করে চোখ প্রবেশ করে কেন্দ্রে। চারপাশে বিভিন্ন ঘনত্বের অর্ধবৃত্তাকার কালো আকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের অসংখ্য রেখা, ঘূর্ণাবর্তের মতো কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে তলজুড়ে বিস্তৃত। ফলে অতলজলের প্রমত্ত ঘূর্ণির মধ্যে স্বল্পায়তন মানব অবয়ব এবং নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোর অসহায়ত্ব দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

আবার *মাছ ধরার সময়-১* (১৯৬২), *মাছ ধরার সময়-২* (১৯৬২), *নীল জল* (১৯৬৪), *ক্রুদ্ধ মাছ* (১৯৬৪), *ভাসমান জাল* (১৯৬৬), *জাল ও মাছ-৩* (১৯৬৭) ছবিগুলিতে সংবেদী রেখা, রং, রূপবন্ধ আর করণকৌশলের সাযুজ্য লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি ছবির বিষয় বন্যা ও নদীকেন্দ্রিক জীবনের অভিজ্ঞতাজাত (চিত্র ৭০)। এসব ছবিতে চওড়া কালো বহিঃরেখা দ্বারা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তিনি নির্মাণ করেছেন মাছ, নৌকা কিংবা জৈবিক রূপবন্ধ। আবার সূক্ষ্ম ক্রসরেখায় স্পষ্ট করেছেন জালের প্রতীকী অবস্থানকেও। অনিবার্যভাবে অধিকাংশ কাজে সাদা ছেড়ে আনুষঙ্গিক রং হিসেবে কোথাও কোথাও হলুদ, নীলাভ সবুজ বা কমলার ব্যবহার আর পরিসর বিভাজনের দক্ষতায় বিষয়ের মনোজ্ঞ বিন্যাস রচনা করেছেন তিনি। মাধ্যম হিসেবে এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, সফট গ্রাউন্ড, ডিপএচসহ ইন্টাগ্লিওর প্রায় সকল পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন এসব কাজে। তবে মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা আর বিষয়ের শিল্পিত উপস্থাপনের চরম প্রকাশ লক্ষ করা যায় *বিস্মৃত ছবি* (১৯৮২) এবং *জলের নিনাদ* (১৯৮৫) শীর্ষক ছাপ-ছবিগুলোতে। নকশাদার মাছের দুটি সরল রূপবন্ধ, কাটাকুটি রেখার জাল আর বুনট রং-শূন্য

হয়ে প্রকাশিত হয়েছে *বিস্মৃত ছবি*-তে। সাদা কাগজের বুকজুড়ে ফুলে থাকা রূপকল্প যেন রংহীন বর্তমানে অতীতের সোনালি সমৃদ্ধির ইঙ্গিতবহ। আর জাল, মাছ ও বৃষ্টির সাংগীতিক মূর্ছনার এক দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থাপন হলো *জলের নিনাদ* (চিত্র ৭১)। দীর্ঘদিন ধরে আত্মীকৃত ছাপচিত্রের নানা করণকৌশল প্রয়োগ করে দৃশ্যশিল্পের এ সাংগীতিক বাস্তবতায় উপনীত হন তিনি। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> "জলের নিনাদ" কাজটি শিল্পী সফিউদ্দিনের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির একটি বড় ঠিকানা। সঙ্গীতের চিত্রল তর্জমা এটি। প্রকৃতির চেনা কোন অনুষঙ্গ নেই। এমনকি সেই চোখের মোটিভও এখানে দুর্নিরীক্ষ। চিত্রভাষার শুদ্ধ উপাদান রেখা, বর্ণপ্রস্থ, ঘনায়মান বিন্দু, মন থেকে উৎসরিত স্বাধীন গড়ন–এইসব মিলে হৃদয় আপ্লুত করা অর্কেস্ট্রা। বৃষ্টির ফোঁটা বিভিন্ন বস্তুতে পড়ে বিভিন্ন রকম শব্দে কথা বলে। জলের ওপর জল পড়ে শব্দ হয়। কড়ি ও কোমলে অনন্তের সিম্ফনি হয়ে ওঠে শেষে। বর্ণপ্রলেপগুলো আড়াআড়িভাবে রেখা দিয়ে বেঁধেছেন শিল্পী। এই মোটিফগুলো দেখলে মনে হয় আঙুল দিয়ে একটা টান দিলে যেন বেজে উঠবে। সফিউদ্দিনের জাল, নৌকা, মাছ, জল সবকিছুর সম্মিলন করেছেন সাঙ্গীতিক ইশারায়।[৫২৬]

একসময় সফিউদ্দিনের চিত্রতলজুড়ে অবয়বী ধারার প্রাধান্য এবং বিশাল প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর অনুপুঙ্খ রূপায়ণ উপস্থিত থাকলেও পরিণতির সাথে সাথে তাঁর উত্তরণ সরলতা এবং অভীষ্ট রূপকের একক অস্তিত্বে। যার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর *কান্না* (১৯৮০), *একুশে স্মরণে* (১৯৮৭), *স্মৃতি একাত্তর* (১৯৮৮), *একাত্তর স্মরণে* (২০০২) প্রভৃতি শিল্পকর্মে। যেখানে জ্যামিতিক উদ্ভাসনায় চোখই হয়ে উঠেছে শিল্প নির্মাণের প্রধান অনুষঙ্গ (চিত্র ৭২)। সবকিছু বাদ দিয়ে তলজুড়ে শুধু চোখ আর তার অভিব্যক্তির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতাকে মর্মস্পর্শীভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি। ছোট ছোট ক্ষিপ্র রেখার পরিমার্জনায় ক্রোধ, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ যেমন জমে উঠেছে, তেমনি ভয় শোক আর আর্তিও ঘনীভূত হয়েছে যুগপৎ। এখানে পূর্বের এচিং অ্যাকোয়াটিন্টের কালো মোটা বহিঃরেখা ও মেটাল এনগ্রেভিংয়ের দীর্ঘ জটিল রেখার পরিবর্তে খাটো, বলিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম কিন্তু প্রচণ্ড গতিময় রেখায় নিজস্ব আঙ্গিকের চরম অভীষ্টে উপনীত হয়েছেন তিনি। সে রেখা কখনো একক, আবার কখনো পৌনঃপুনিক; কখনো সরল, আবার কখনো বক্র কিংবা অর্ধবৃত্তাকারও। বস্তুত তিনি নিয়ত নিরীক্ষাপ্রবণ হওয়ার কারণে মাধ্যম থেকে মাধ্যমে, আঙ্গিক থেকে আঙ্গিকে উত্তরণ সহজ ও সাবলীল হয়েছে, আর শিল্পও হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময় এবং সার্থক।

রাজনীতির নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে একদিন তিনি পা ফেলেছিলেন এ দেশে। তাই যুদ্ধ বা সংঘাতের মতো রাজনৈতিক কূটচাল তাঁকে কাঁদিয়েছে, ক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু সরাসরি সমকালীন রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্তই থেকেছে তাঁর চিত্রতল সবসময়। শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি বিষয় ও

---

[৫২৬] মইনুদ্দীন খালেদ, 'সফিউদ্দিন : শুদ্ধতম ঋত্বিক', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ৩৯

করণকৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন রক্ষণশীল ছিলেন, তেমনি পরিসর বিভাজন এবং উপাদানের ভারসাম্য নির্মাণের ব্যাপারেও খুব মনোযোগী ছিলেন। সেজন্য তাঁর ছবির কোনো অংশই অপ্রয়োজনীয় কিংবা বেশি বলে মনে হয় না; বরং কোনো একটি অংশকে বাদ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ছবির সম্পূর্ণতার জন্য তা কতটা জরুরি।[৫২৭] যে মাধ্যমে যখনই কাজ করেছেন অনেকটা সময় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করেছেন সবসময়। কালো রঙের ব্যবহার তাঁর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে চিত্রকলার ক্ষেত্রে ধূসর বা অনুজ্জ্বল রং ব্যবহার করলেও, ছাপছবির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হলুদ, কমলা, সবুজ নীল এবং নীলচে সবুজের ব্যবহার লক্ষণীয়।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের কাজে বৈচিত্র্য আছে, তাঁর আঙ্গিকে পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর আছে আর সামগ্রিক কাজে আছে এক সুসংবদ্ধ ঐক্য, এক ধ্রুপদী সংযম। মাধ্যম থেকে মাধ্যমে আঙ্গিক থেকে আঙ্গিকে তাঁর উত্তরণ ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে। ফলে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে সুসংহত, সুবিন্যস্ত এবং সুখপ্রদ।[৫২৮] আশির দশকের পরে আর নিয়মিত ছাপচিত্র নির্মাণ না (২০০২ এ শেষ কাজ করেছেন *একাত্তর স্মরণে*) করলেও শেষের দিকে করা ড্রইংয়ে ছাপচিত্রসুলভ গুণাবলি বেশ স্পষ্ট। ছাপচিত্রচর্চা বন্ধ করলেও পরবর্তী কিছুকাল তেলরং এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত রেখাচিত্র নির্মাণে নিমগ্ন থেকেছেন। তাই বিভিন্ন মাধ্যমে সমান সাবলীল হওয়ার ফলে এক মাধ্যমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজেই অন্য মাধ্যমকে প্রভাবিত করেছে। যেমন তাঁর রেখাচিত্রে ঘনকালো আকার-আকৃতির উপস্থিতির সাথে বিভিন্ন ধরনের সংবেদী রেখা আর বিষয়ের সাযুজ্যতা খুব সহজেই তাঁর ছাপছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই প্রায় সাত দশক ধরে ধ্যানস্থ ঋষির মতো সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন শুদ্ধ ও নিখুঁত শিল্প নির্মাণের জন্য। যা এ দেশের উত্তর প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পভাণ্ডার।

প্রথম প্রজন্মের মহান শিল্পীদের সমসাময়িক খাজা শফিক আহমেদ, হাবিবুল্লাহ খান (?), মুস্তফা আজিজ (?) প্রমুখ শিল্পীরাও কাঠ খোদাই, এচিং এবং লিথোগ্রাফ মাধ্যমে অনুশীলনধর্মী কিছু ছাপচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এগুলোও এ দেশে ছাপচিত্র চর্চার প্রতিষ্ঠাকালীন ধাপে বেশ গুরুত্ববহ ভূমিকা রেখেছে।

ছাপচিত্র চর্চায় প্রথম প্রজন্মের এসব শিল্পীর তারকাখ্যাতি এ দেশে মাধ্যমটির প্রাথমিক বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়। সেই সাথে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই ঢাকা আর্ট গ্রুপের দুটি প্রদর্শনীতে ছাপচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান জনমানসেও মাধ্যমটি নিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে। তবে প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদির অভাবে শুধু উডকাট ও উড-এনগ্রেভিং শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাদা-

---

[৫২৭] ফখরুজ্জামান চৌধুরী, 'সফিউদ্দিন আহমেদ', *মাহে-নও*, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ ৪৫

[৫২৮] আব্দুল মতিন সরকার, 'একজন শিল্পীর প্রতিকৃতি ঃ শফিউদ্দীন আহমেদ', *শিল্পকলা*, ৬ষ্ঠ-১০ম বর্ষ (যুক্তভাবে), ১ম-২য় সংখ্যা (সকল বর্ষের যুক্তভাবে), ১৩৮৯-১৩৯৪, পৃ ৩৪

কালো উডকাট ও উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে এ দেশে ছাপাই ছবির মূলধারার যাত্রা শুরু হলেও, অতি অল্পকালের মধ্যেই তাতে যোগ হয় অন্যান্য নতুন মাধ্যমও। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ঢাকার সচিবালয়ে পড়ে থাকা একটি লিথোগ্রাফ মেশিন আর্ট ইনস্টিটিউটকে দান করে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী আমিনুল ইসলাম তাঁর স্মৃতিচারণামূলক লেখায় উল্লেখ করেছেন–

> সেগুনবাগানে ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ঢাকার সেক্রেটারিয়েটে বহু বছর থেকে পড়ে থাকা একটি লিথোগ্রাফি মেশিন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়সূত্রে আমাদের ইনস্টিটিউটকে প্রদান করা হয়। কিন্তু এই মেশিনটিকে ব্যবহারোপযোগী করে লিথোগ্রাফিতে কাজ করার সুযোগ আমরা পাই নি।[৫২৯]

মেশিনটি ঠিক কত দিন ব্যবহার করা যায়নি অথবা আদৌ তা ব্যবহৃত হয়েছিল কি না এর কোনো স্পষ্ট ধারণা এ বক্তব্যে পাওয়া যায় না। আবার *আর্ট* (Art) শীর্ষক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বলা হয়েছে–

> In the beginning a lithograph press and some stones were collected from a press which printed journals and books in Urdu.[৫৩০]

কিন্তু *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* এ গবেষক রশীদ আমিন তাঁর *ছাপচিত্র* শীর্ষক রচনায় ছাপচিত্র বিভাগের স্থপতি শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদকে উদ্ধৃত করে বলেছেন–

> শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগেই পঞ্চাশ শতকের শেষ দিকে বিদেশ থেকে একটি এচিং প্রেস ও লিথোপ্রেস আমদানি করা হয়।[৫৩১]

কিন্তু এসব দাবির মধ্যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। কারণ ছাপচিত্র বিভাগের সংগ্রহে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে করা আমিনুল ইসলামের সহপাঠী এবং প্রথম ব্যাচের ছাত্র আলফাজ উদ্দিনের করা ভূ-দৃশ্যের দুটি লিথোগ্রাফ রয়েছে। এর একটি লিথো কন্টিতে করা প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অন্যটি কালি ও ক্রোকিল নিবে করা শহরের দৃশ্য। এই শেষোক্ত চিত্রটির নিচের বাম দিকের কোনায় ছবির মধ্যেই তাঁর স্বাক্ষর ও তারিখ লেখা আছে (১৩-১১-৫২)। এ ছাড়া ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আবু তাহেরের কালি ও ক্রোকিল নিবে করা দুটি মহিষের লিথোগ্রাফের অস্তিত্বও পাওয়া যায়, যেগুলো করা হয়েছিল পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষার শিল্পকর্ম হিসেবে। আবার লিথোতে করা শিল্পী আব্দুর রাজ্জাকের *নৌকাগুলি* (Boats) শিরোনামের শিল্পকর্মটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের। ওই একই বছর তিনি আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হন। আর উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে যান ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার অবকাশ কম যে, উপর্যুক্ত লিথোগ্রাফটি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটেই করা। তাই সঠিকভাবে নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নির্ধারণ

---

[৫২৯] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৪৮;

[৫৩০] Farhana Shifa, ‘Print-making Department’, *Art,* Vol. 4. No. 2. October-December, 1998, p. 24

[৫৩১] রশীদ আমিন, ‘ছাপচিত্র’, দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ ১৫৯; এখানে মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে পঞ্চাশ দশকের স্থলে পঞ্চাশ শতক ছাপা হয়েছে

করা সম্ভব না হলেও পঞ্চাশের দশকের শেষে নয় বরং প্রথমার্ধের কোনো এক সময়ে যে লিথোপ্রেস আর্ট ইনস্টিটিউটে স্থাপন করা হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। ঢাকায় আর্টস ইনস্টিউটের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাথমিক বিভাগ, সুকুমার কলা বিভাগ, বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগ, রেখাচিত্রণ বিভাগ নামে চারটি বিভাগ নিয়ে। প্রথম চালু হওয়া পাঁচ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্সের পাঠ্যক্রম ছিল নিম্নরূপ–

> ড্রইং, স্কেচ, জলরং চিত্র, পরিপ্রেক্ষিৎ, কাষ্ঠখোদাই ও অনুলিপি অঙ্কন (কপি ড্রইং)।[৩৩২]

ছাপচিত্র শুরুতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চর্চিত হতো সুকুমার কলা এবং বাণিজ্যিক কলা বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা। প্রথম বর্ষে কাঠ খোদাই আর দ্বিতীয় বর্ষ থেকে চর্চা করানো হতো লিথোগ্রাফের। এর ফলশ্রুতিতে পঞ্চাশের দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গন্ডি অতিক্রম করা ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী, অর্থাৎ আমাদের দেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ শিল্পীরাও ছাত্রাবস্থায় তো বটেই; বরং এ মাধ্যমে আগ্রহী হয়ে পরেও চর্চা করেছেন। কেউ আবার এ বিষয়ে পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্পকর্ম।

একই দশকে আবার এঁদের সাথে যোগ হয়েছেন কলকাতায় শিক্ষালাভ করে আসা শিল্পী মো. কিবরিয়াও। যা এ দেশের সামগ্রিক শিল্পচর্চাকে তো বটেই ছাপচিত্র চর্চার ধারাকেও বেগবান করেছে নিঃসন্দেহে। তাঁর দীর্ঘ ছয় দশকের আত্মপ্রত্যয়ী নিমগ্ন সাধনা এ দেশের দৃশ্যশিল্পকে কৌলীন্য দান করেছে। শিল্পচর্চায় পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রচারবিমুখ নির্বিবাদী এই মানুষটির প্রভাব এতটাই যে একে 'কিবরিয়া স্কুল' বলেও অভিহিত করে থাকেন কেউ কেউ। যদিও প্রকৃত অনুসারীর চাইতে সেখানে তাঁর অনুকারকের সংখ্যাই হয়তো বেশি।

সৃষ্টিতে কিবরিয়ার নিমগ্নতা, একনিষ্ঠতা, মনন, বোধ আর বুদ্ধির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তা বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে হয়ে উঠেছিল অনন্য। যার ফলে পঞ্চাশের দশক থেকে ধীরে ধীরে এ দেশের শিল্পকলায় বিমূর্ততার ক্ষেত্রে কিবরিয়া সম্পূর্ণ নতুন একটা মাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন। বিশুদ্ধ বিমূর্তধারার চিত্রচর্চা এবং ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে দক্ষতা আর মৌলিকতার দিক থেকে এ দেশে তাঁর সমকক্ষ শিল্পীর সংখ্যা নগণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি শুধু এ দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পীই নন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী এবং জনপ্রিয় শিক্ষকও। কিবরিয়া চিত্রকলা চর্চায় পঞ্চাশের দশকে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেও ছাপাই ছবির চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ষাটের দশক থেকে।

---

[৩৩২] ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস অনুযায়ী

একাডেমিক বাধ্যবাধকতায় কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই অন্যান্য মাধ্যমের সাথে ছাপচিত্রেও হাতেখড়ি হয়েছিল কিবরিয়ার।[৫৩৩] যদিও প্রাথমিক পর্বের সেসব শিল্পকর্মের কোনো নমুনা আজ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার জাপান যাওয়ার আগে ঢাকায়ও ছাপচিত্র (লিথো) করেছিলেন। তবু শুরুর সেসব কথা মাথায় রেখেই বলা যায় যে, ছাপাই মাধ্যমের প্রতি কিবরিয়া প্রকৃত আগ্রহী হয়ে ওঠেন জাপান প্রবাসকালে। ১৯৫৯-৬২ পর্বে। আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান (১৯৫৪) করার পর চিত্রকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তি নিয়ে জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব আর্ট অ্যান্ড মিউজিক-এ যান। এখানে প্রথম দুইবছর চিত্রকলায় এবং শেষের এক বছর ছাপচিত্রে শিক্ষালাভ করেন। কাজু ওয়াইগিতা, তেত্সুরো কোমাই এবং হিদেও হাগিওয়ারা প্রমুখ জাপানি শিল্পী-অধ্যাপকদের কাজ তাঁকে এ মাধ্যমের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মূলত এ সময় থেকেই তাঁর নিবিষ্ট নিরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে ওঠে ছাপচিত্র। এ জাপান পর্বে তাঁর সামগ্রিক শিল্প আঙ্গিকেরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। জাপান যাওয়ার পূর্বে (১৯৫০-১৯৫৯) চিত্রকলা মাধ্যমের চর্চায় তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন সমগ্র পাকিস্তানে। তখনকার মূল চর্চাও চিত্রকলা মাধ্যমকে ঘিরে। এ সময়কার অধিকাংশ কাজেই বিষয়ের মূর্ততার সাথে জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহারও স্পষ্ট। তখন কিবরিয়া আঙ্গিকগত দিক থেকে ছিলেন আধা বিমূর্তরীতির অনুসারী, যাকে খানিকটা ছদ্ম কিউবিক ঘরানারও বলা যায়। চিত্রকলায় *জলকেলি* (১৯৫৩), *অন্ধ দার্শনিক* (১৯৫৪), *গ্লাস হাতে বালক* (১৯৫৮), *গোরস্থান* (১৯৬০) ইত্যাদি উদাহরণ থাকলেও ছাপাই ছবিতে এ পর্বের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় *একটি বালকের প্রতিকৃতি* (১৯৫৬/৫৭)। এখানে দীর্ঘগ্রীব এবং দীর্ঘদেহী বালকের গঠন ছদ্ম জ্যামিতিক কুঠুরিযুক্ত। এ জ্যামিতি আরও স্পষ্ট হয়েছে *ফুল হাতে বালক* (১৯৫৯) ছবিতে (চিত্র ৭৩)। ভাঙা ভাঙা রেখায় আঁকা দীর্ঘগ্রীব বালকের হাতের ওপর ফুল নির্দেশক দুটি জ্যামিতিক আকৃতি। মানুষ কিংবা প্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে জ্যামিতি নতুনভাবে উপস্থাপিত। ঢাকা পর্বের শেষ দিকে করা রেখাচিত্রের আঙ্গিকের সাথে এটি সাদৃশ্যধর্মী। বিষয় উপস্থাপনের সরলতার সাথে একধরনের বিষণ্নতাও প্রকাশ্য এখানে। বস্তুত এ সময়কার সকল মাধ্যমে কিবরিয়ার বিষয়বিন্যাসে একধরনের নিঃসঙ্গতার আবহই যেন উদ্ভাসিত। চরিত্রেরা পতনোন্মুখ, বিষণ্ন এবং একধরনের শূন্যতা ও নিয়তি নির্ধারিত বোধে আবিষ্ট। রঙের ব্যবহারে থেকেছেন অনুজ্জ্বল ও কোমলরং ঘনিষ্ঠ। তাঁর ছবির এই বিষণ্নতা কিংবা কোমল স্নিগ্ধতার উৎস জানার জন্য চোখ ফেরাতে হবে কিবরিয়ার জাপান-পূর্ব ঢাকা ও কলকাতা পর্বের দিকে।

কিবরিয়া ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পরিবারের সম্মতিতে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে (১৯৫১) চলে আসেন পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানে। কলকাতায় যখন তিনি ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন তার অব্যবহিত আগে দুর্ভিক্ষের অপচ্ছায়া

---

[৫৩৩] মইনুদ্দীন খালেদ, 'কিবরিয়ার শিল্প মানব-অস্তিত্বের পুরাতত্ত্ব', *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ৬৭

গ্রাস করেছিল সারা বাংলাকে, যার ক্ষত তখনো বর্তমান। অন্যদিকে সবে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তবে ব্রিটিশবিরোধী নানা আন্দোলনে তখনো উন্মাতাল কলকাতা। ভর্তির কিছু দিন পরেই দেখলেন কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। যার বন্য হিংস্রতা দীর্ঘদিন সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল তাঁকে। এইসব রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ ও অনিশ্চয়তার সাথে প্রিয়জন হারানোর মতো ব্যক্তিজীবনের নানা শোকাবহ ঘটনাও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ছোটবেলায় হারিয়ে ছিলেন বাবাকে, চল্লিশের দশকে প্রায় প্রতি বছরই হারান কোনো না কোনো প্রিয়জনকে। ফলে একধরনের মৃত্যুভয়, আতঙ্কও তাঁকে ঘিরে ধরে। আবার ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দেশে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তায় দেশ ত্যাগের কারণে বিচ্ছিন্নতাবোধ, আত্মিক সংকট, নিঃসঙ্গতা এবং উন্মূলতাও যোগ হয়। সামাজিক পারিবারিক এবং রাজনৈতিক আবহ থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁর পরবর্তী জীবনাচরণ, শিল্প-আঙ্গিক সবকিছুকে প্রভাবিত করেছে। চিত্রকলায় প্রথম দিকের বিষয় নির্বাচন, রং বিন্যাসের মধ্যেও এর স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। যাকে উপর্যুক্ত বিষণ্নতা ও শূন্যতাবোধে আবিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সময়ে ব্যবহৃত রং আর জ্যামিতিই আরও পরিণত হয়ে পরবর্তীকালে কিবরিয়ার শিল্প-আঙ্গিককে ঋদ্ধ করেছে। তবে রঙের ভূমিকা সব সময়ই মুখ্য থেকেছে কিবরিয়ার ছবিতে। আর জাপান থেকে ফিরে আসার পর তো তাঁর চিত্রতলে রংই সয়ম্ভূ হয়ে উঠেছে। এর পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে জাপানি সমসাময়িক শিল্পীদের কাজ এবং পাশ্চাত্যের বিমূর্তবাদী শিল্পীদের কাজের সাথে চাক্ষুষ যোগাযোগ। বিমূর্তধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিবরিয়ার কাছে সম্ভবত অ্যান্টোনিও তাপিজ, মার্ক রথকো, রোজার হিল্টন, ক্লেফোর্ড স্টিলের আঙ্গিক প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে। একইসঙ্গে সরল পরিসর বিভাজন এবং বক্তব্যের ন্যূনতার মতো জাপানি শিল্পের বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রভাবিত করেছে।[৫৩৪] কিবরিয়া কলকাতা পর্বে শিখেছিলেন বাস্তব পৃথিবী চিত্রায়িত করার সময় বাস্তবতা-উত্তীর্ণ মাত্রা সংযোজনের কৌশল; আর জাপান শেখাল শূন্য জমিনে কয়েক ফোঁটা সুমিত রং কীভাবে গভীর শিল্পের গ্রন্থিমোচন করে।[৫৩৫] এই শিক্ষা তাঁকে আত্মপ্রত্যয়ী করেছে, তাঁর শিল্পকেও করেছে সমৃদ্ধ।

জাপানে গিয়ে নাটকীয় দিক বদল করে কিবরিয়ার শিল্প-আঙ্গিক। গেলেন তিনি অবয়বধর্মিতা নিয়ে আর ফিরে এলেন নিরাবয়বী বিশুদ্ধ বিমূর্ত হয়ে। জাপানের প্রভাব ষাটের দশকের শুরু থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে তাঁর শিল্পে। এ সময় চিত্রকলার প্রথাবদ্ধ মাধ্যমের পাশাপাশি ছাপাই মাধ্যমেও তাঁর দক্ষতা স্পষ্ট হতে থাকে, বিশেষত লিথোগ্রাফে। লিথোতে এ সময় আঁকেন *দুই ফুল* (১৯৬০), *কম্পোজিশন : কালো* (১৯৬০), *কম্পোজিশন : কালো* (১৯৬১), *কম্পোজিশন : কালো ও নীল* (১৯৬১), *কম্পোজিশন : কালো ও হলুদ* (১৯৬২) ইত্যাদি। এর অধিকাংশই লিথোর ওপর তুষের কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্ট। *কম্পোজিশন : কালো* সৃষ্টি করেছেন উলম্ব রেখায়। সাদা না কালো

---

[৫৩৪] নজরুল ইসলাম, 'মোহাম্মদ কিবরিয়া : শ্রদ্ধাঞ্জলি', *কালি ও কলম*, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ৩৫

[৫৩৫] মইনুদ্দীন খালেদ, 'কিবরিয়ার শিল্প : হৃদপুরাণের বৃত্তান্ত', দ্র. *দশ বাঙালি শিল্পী*, ঢাকা, প্যাপিরাস, ২০০৩, পৃ ১৫৩

রেখা এখানে মূল বিষয় তা যেন একধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে হাজির হয়। সাদা পরিসর রেখে যাওয়ার মধ্যে একধরনের শূন্যতার আবহ সৃষ্টি হয়। *দুই ফুল* গড়েছেন হালকা নীলচে রঙের তলে জমাট কালো রঙের দুটি গড়ন দিয়ে। অবশ্য মূল গড়ন থেকে গড়িয়ে গিয়ে কালো কিছুটা নরম আভার সৃষ্টি করেছে কোথাও বা। আর হলুদ জমিনে ছোপ ছোপ ফুল ফুটিয়েছেন *কম্পোজিশন : কালো ও হলুদে*। এ ছাড়া হালকা বাদামি আর নীলচে সবুজ তলে ছোট ছোট আঁচড় আর মিহি বুনটে নির্মাণ করেছেন সুখের অনুভূতি *আনন্দতে* (১৯৬১)। আর *কম্পোজিশন : কালো ও নীল* (চিত্র ৭৪) নির্মাণ করেছেন বিষাদ নীলকে অন্ধকারের আবেষ্টনীতে, বাদামি তলে কালো আর নীলের পারস্পরিক আলিঙ্গনে। কাজটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> ছবির বিষয় স্বপ্নিল মনের সংবেদনা। সংবেদনার তো কোন আকার নেই, আয়তন নেই। তাই তাকে আঁকতে হয় মনগড়া খেয়ালে, খুশির বর্ণ ছড়িয়ে। এখানেও কয়েক প্রস্থ ফিতের মত রেখাময় গড়ন আনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে আছে। ...হঠাৎ মনে হয় উর্মিমুখর একটুখানি নদীর অংশ।[৩৩৬]

হিদেও হাগিওয়ারার কাঠ খোদাইয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে জাপানে থাকাকালীন কাঠ খোদাইও করেছেন কিছু *সবুজ ছাপ* (১৯৬১), *তিন আকৃতি* (১৯৬১), *তিন বৃত্ত* (১৯৬১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাঠ খোদাইয়ের শুকনো খটখটে ব্যাপারটি তাঁর সঙ্গে যায় না বলে পরে এ মাধ্যম নিয়ে আর অগ্রসর হননি। জাপান থেকে ফিরে এচিং মাধ্যমে যদিও বেশি কাজ করেছেন তবুও জাপান পর্বে বেশকিছু শিল্পকর্ম এ মাধ্যমেও নির্মাণ করেছিলেন। একেবারে ন্যূনতম উপাদানের ব্যবহারে এবং অত্যন্ত সরলতায় নির্মিত *তিন আকৃতি* (১৯৬১), *তিন আকৃতি* (১৯৬১), *কম্পোজিশন* (১৯৬২) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এ পর্বের অধিকাংশ কাজ মাধ্যমগত নিরীক্ষার ফলাফল হলেও শৈল্পিক গুণাবলিতেও তা অনবদ্য। যেমন তিন আকৃতি একটিতে আকারের আপাত বিশৃঙ্খলা দর্শকের মধ্যে একধরনের স্নায়বিক চাপ তৈরি করে। অন্যটিতে ছাঁচ থেকে কিছু অংশ কেটে বাদ দেওয়ায় অনেক কিছু থাকার পরও একধরনের শূন্যতার আবহ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কিবরিয়ার এ সময়ের অধিকাংশ ছাপচিত্রে কালো রঙের ব্যবহার বেশি। এ হয়তো অতীতচারী কিবরিয়ার মানসিক রুদ্ধতার প্রকাশ। পছন্দের পাত্রে যেমন মনের অব্যক্ত সব ভার চাপিয়ে হালকা হয় মানুষ, তেমনভাবে ছাপচিত্রের সাথে তাঁর মেজাজের অন্তর্গত মিলটাই হয়তো মানসিক অবস্থার এমন প্রকাশ ঘটাতে তাঁকে উদ্দীপীত করেছে।

জাপান পর্ব মূলত কিবরিয়ার কিবরিয়া হয়ে ওঠার সময়। প্রথম থেকেই বস্তুর বাহ্যরূপের আড়ালে তার অন্তর্গত সৌন্দর্যের যে নিমগ্ন সাধনায় তিনি রত ছিলেন, জাপান পর্বে তা তাঁর আয়ত্তে আসে। এ সময় তাঁর ছবির অভিব্যক্তিবাদী গুণাবলি আরও প্রকাশমুখী হয়ে উঠেছে। তাঁর ছবির যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং

---

[৩৩৬] মইনুদ্দীন খালেদ, 'কিবরিয়ার বীক্ষণ : নিঃসঙ্গতার ব্যবচ্ছেদ', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ৭২

পরিসর গঠনের যে শক্তিশালী বিন্যাস তা-ও এসেছে এই জাপান পর্বে। এগুলো তাঁর ছবিতে এসেছে মূলত জেন দর্শন, পাথরের বাগান, জাপানিদের রুচি এবং শিল্প নির্মাণে তাদের ধৈর্য ও অভিনিবেশের পথ ধরে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন–

> When I was in Japan between 1956-62 (…) the Japanese garden made a deep impact on me. There I saw how space can enrich a design. Experience of scroll and other traditional painting also tought me to be economic in using line and colour.[৫৩৭]

জাপানের প্রবাসজীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী শিল্পীজীবনকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছে। কিবরিয়ার জাপানযাত্রা তাঁর জীবনে তো বটেই এ দেশের সামগ্রিক শিল্প ইতিহাসের জন্যও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রেও তা অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বিশেষ করে মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লিথোগ্রাফির কথা। কিবরিয়া এ মাধ্যমে কাজ শুরুর আগে মাধ্যমটি ছিল শুধু ছাত্রছাত্রীনির্ভর। আর লিথোকন্টি ব্যবহার করে কাজও হতো শুধু অনুশীলনধর্মী। তিনি জলবাহী তুষের ব্যবহার শুরু করার পর মাধ্যমটি অসাধারণ মাত্রা লাভ করে।[৫৩৮] জাপানে প্রবাসকালে কিবরিয়ার ছবিতে বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারার পর্যায়টি শুরু হয়। পূর্বের কিউবিক-উদ্ভূত জ্যামিতিকতা থেকে মুক্ত হয় তাঁর চিত্রতল। তবে জ্যামিতিকতা থেকে তাঁর মুক্তি জাপান যাওয়ার পর হঠাৎ করে ঘটেনি। বরং জাপান যাওয়ার কিছু আগে থেকেই জ্যামিতিক ছকে বাঁধা কাঠামোকে বড় বেশি শ্বাসরোধকারী বলে তা থেকে জৈব আকৃতিতে মুক্তিলাভের আকুতি জানিয়েছেন বন্ধুদের কাছে।[৫৩৯] অর্থাৎ জাপান প্রবাসী হওয়ার আগে থেকেই জ্যামিতিকতা থেকে একটি পরিবর্তনে মুক্তি খুঁজছিলেন তিনি। যার প্রয়োগ বাস্তবরূপ লাভ করে জাপান পর্বে। তখন ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ বিমূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর শিল্প-আঙ্গিক। কিবরিয়ার চিত্র বিমূর্ত হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হলো–

> কিবরিয়া অবশ্য হঠাৎ করেই বিমূর্ততায় পা রাখেননি। এ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ছিল এবং বিমূর্ততায় পৌঁছানোর আগে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজেছেন, যেমন: বিমূর্ততা কী শুধুমাত্র এক চিত্রকর সুলভ ভাষা? সময়ের চাহিদা? মহাযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর জটিল আবহের প্রতিচ্ছবি? বিমূর্ততার মধ্যে কিবরিয়া বাস্তবানুগ রূপায়নের ভার লাঘব করতে পেরেছিলেন। বিমূর্ততা তাঁকে সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা তৈরির একটা সুযোগ করে দেয়। তিনি রূপায়ন থেকে বেশী উৎসাহী ছিলেন ব্যাখ্যা তৈরিতে; কাজেই, চিত্রকর সুলভ ভাষাকে তিনি দেখতে

[৫৩৭] Interviews by Ziaul Karim, `Mohammad Kibria: A leader of Modernism', *Contemporary Art in Bangladesh Special Volume: Arts & The Islamic World*, No 34, Autumn 1999, p. 35

[৫৩৮] রফিকুন নবী, 'বর্ণান্বেষী কবির অন্তর্ধান', *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ৩০-৩১

[৫৩৯] সাদেক খান, 'তরুণ শিল্পী সম্প্রদায়ের রোজনামচার এক অধ্যায়', *সমকাল* ১ম বর্ষ, ৭-৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৪, পৃ ৪৬৪

> চেয়েছিলেন জীবনের নানা জটিলতা ও পরস্পর বিরোধিতা তুলে ধরার পাশাপশি তাঁর শিল্পদৃষ্টির নিজস্বতাকে মূর্ত করার উপায় হিসেবে।[৫৪০]

এই বিমূর্ততার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ-বেদনার নানা আখ্যান রচনা করেছেন তাঁর সৃজনীতে। জাপান থেকে ফেরার পরও বিমূর্ত আর মুক্ত বাঁধনহীন থেকেছে তাঁর চিত্রতল। এ সময় বৈশ্বিক বিমূর্ততাকে আত্মস্থ করে নিজের সময় ও দেশ-কালের প্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন নিজস্ব ভাষ্যে। তখন লিথো তাঁর হাতে পরিণত হয় জল আর তুষের নানারকম খেলার আধারে। এ সময় নির্মাণ করেন *বর্ণমালা* (১৯৬৫)। *বর্ণমালায়* দু-পাশে নীলচে সবুজ এবং মাঝে কমলা রঙের তলে মোটা তুলির ক্যালিগ্রাফি-সদৃশ রেখায় এঁকেছেন অচেনা বর্ণমালার আঁচড়। এরপর কিবরিয়ার চিত্রতল আর ফুল পাথর কিংবা বর্ণমালার মতো পারিপার্শ্বিক চেনা জগতের উপস্থাপনে আটকে থাকেনি। ক্রমেই অচেনা আর মুক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্রতল। যেন একান্ত অনুভূতির আপন প্রকাশ ঘটাতে লাগলেন চিত্রতলে, আর রংই হয়ে উঠল সেখানকার মুখ্য বিষয়। তাই আমরা দেখি *লাল, কালো ও সাদা* (১৯৬৬), *সবুজ ও কালো* (১৯৬৬), *কালো ও ধূসর* (১৯৬৬) ইত্যাদি লিথোচিত্রে রং তার নিজস্ব প্রকাশে ভাস্বর।

জাপান পর্ব থেকে অনেকটাই জ্যামিতিকতা-মুক্ত ছিল কিবরিয়ার চিত্রতল। তবে 'শ্বাসরোধক' কিউবিক উদ্ভূত জ্যামিতিকতা থেকে মুক্তিলাভ করলেও জ্যামিতি খুব দ্রুতই তাঁর চিত্রতল থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, এমন নয়। যে জৈব আকৃতিতে তিনি মুক্তি খুঁজেছেন সেখানেও কখনো কখনো উঁকি দেয় বিভিন্ন ধরনের আকার। *কালো, বাদামি ও হলুদ* (১৯৭৫), *ধূসর ও সবুজ* (১৯৭৫), *বাদামি, কালো ও হলুদ* (১৯৭৬), *কম্পোজিশন : নীল, সবুজ ও লাল* (১৯৭৬), *কম্পোজিশন : কালো* (১৯৭৬) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এ সময় তাঁর আকার অর্থময়তা এবং আরও গতিশীলতা লাভ করে। এসব ছবিতে আয়তাকার, বর্গাকার, বহুভুজাকার নানা আকৃতিতে রং ব্যবহার করেছেন তলে। একটি ছবিতে কখনো একাধিক রং, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে একই রং প্রয়োগ করেছেন। কখনো হালকা কখনো গাঢ়। কখনো উলম্ব, কখনো আনুভূমিকভাবে বিভাজিত তলে রংই পুরো সত্তা জুড়ে প্রকাশিত। কারণ, ষাটের দশকেই কিবরিয়া বুঝে গিয়েছিলেন যে রং ছাড়া ফর্ম নেই, আর ফর্ম ছাড়া রং। এবং বুনটেই অনূদিত হয়ে যায় অনির্ণেয় ও বহুস্তরী মনের অনুভূতিরাশি।[৫৪১] তাই পাথরের বুকে এসিড জলের নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়ায় নির্মাণ করেছেন সংবেদনশীল বুনট। বাংলাদেশের ছাপচিত্রে বিশেষ করে লিথোতে কিবরিয়া পর্বের আগে যা ছিল একেবারে অনুপস্থিত। এই বুনট নির্মাণের আরও দক্ষ খেলা খেলেছেন ধাতবপাতে তাঁর এচিং সমূহে। জাপান পর্বে কিছু কাজ করলেও এচিংয়ের প্রকৃত নিরীক্ষা করেছেন দেশে ফিরে সত্তরের দশকের শেষ থেকে। *কালো এবং হলুদ* (১৯৭৫) ছবিতে বিক্ষত কালো তলে উলম্বভাবে

---

[৫৪০] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'কিবরিয়া স্মরণে', ২০১১ সালে বেঙ্গল শিল্পালয় আয়োজিত 'শ্রদ্ধার্ঘ কিবরিয়া' শীর্ষক একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

[৫৪১] মইনুদ্দীন খালেদ, 'কিবরিয়ার শিল্প মানব-অস্তিত্বেও পুরাতত্ত্ব', *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ৬৯

ফিতা-সদৃশ হলুদের স্থাপন হয়তো সমসাময়িককালের অন্ধকার এবং অসুস্থতার প্রতীকী উপস্থাপন। *কালো ছাপ* (১৯৭৮) নির্মাণ করেছেন এচিং অ্যাকোয়াটিন্টের প্রথাবদ্ধ মাধ্যমে। হালকা কালো আয়তাকার তলের ওপরে আরও একটি জমাটবদ্ধ কালো আয়তক্ষেত্র একে যথার্থ অর্থে কালোছাপ করে তুলেছে এবং এই কালোছাপের মধ্যে খানিকটা আলোকযুক্ত পরিসর হেসে উঠেছে, যেন জীবনের বিক্ষত অন্ধকার সময় পেরিয়ে খানিকটা আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছে তা। *এচিং-৭* (১৯৭৯) এ মাধ্যমে তাঁর নিরীক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (চিত্র ৭৫)। অ্যাকোয়া করা ধাতব পাতে গ্রিজ মিশিয়ে তেল আর জলের বৈপরীত্যে তৈরি করেছেন ওপর থেকে নিচের দিকে কলকল করে বয়ে চলা ঝরনাধারার মতো অসংখ্য বিন্দু বুনট। নিচের দিকে কয়েকটি পাথর-সদৃশ কালো গড়ন দিয়ে পরিসরের অসামান্য ভারসাম্য বিধান করেছেন কুশলী নির্মতার মতো। গড়নের ওপরের দিকে আনুভূমিক কয়েকটি রেখা প্রস্রবণের সে ধারাকে ভূমিপোবর্তী করেছে, অর্থাৎ বিন্দু বুনটের গতিশীলতাকে কমিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা। *স্মারক-৩* (১৯৭৯) নির্মাণেও তিনি অনন্য নিরীক্ষা চালিয়েছেন ধাতব তলে। এখানে দস্তার পাতে লিথোর জলবাহী তুষ ছড়িয়ে দিয়ে স্বল্পমাত্রার এসিডে তক্ষণ করিয়েছেন। ফলে লিথোগ্রাফে যে ধরনের কাঁপা কাঁপা বুনট সৃষ্টি হয় তুষের কারণে এই এচিংয়েও একই ধরনের ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে। হঠাৎ দেখলে এচিং নয় বরং লিথোগ্রাফ বলে ভ্রম হয়। অমসৃণ দুটি উলম্ব কালো রেখা বর্গাকৃতির তলকে তিনটি আয়তাকার গড়নে ভাগ করেছে। আর তার ওপরে আনুভূমিক তিনটি আয়তাকার গড়ন যেন তিনটি স্মারক ফলকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। লিথো তুষের একই ধরনের নিরীক্ষা করেছেন *ছাপ-৮* (১৯৮০) এ। ছাইরঙা আয়তাকার তলে সাদা-কালো উলম্ব আয়তাকার গড়ন। তাকে ভেঙেছেন ত্রিভুজ-চতুর্ভুজের মতো বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকারে। যেন মানবমনের অনির্ণেয় বহুস্তরী বোধের চিত্রল প্রকাশ তা। একই ধরনের জ্যামিতিক আবেষ্টনী লক্ষ করা যায় *শিরোনামহীন* (১৯৮২) এবং *ছাপ-২৯* (১৯৮৩)-এ। শিরোনামহীনে আয়তাকার কালো দেয়ালের মাঝে মসৃণ অ্যাকোয়া নির্মিত দানাদার বুনটের আরও একটি আয়তাকার আকৃতি। যার ডান দিকের কোনায় এচিংয়ের রেখায় নির্মিত আরেকটি আকৃতি উপর্যুক্ত আকৃতিকে অংশত দখল করে অসম্পূর্ণতার বোধ নির্মাণ করেছেন, যা একইসঙ্গে খানিকটা গতিশীলতাও প্রদান করে। আর অনেকটাই বিপরীত ঘটনা দেখা যায় *ছাপ-২৯* এ। আয়তাকার হলুদ দেয়ালের মাঝে জমাট কালো আয়তক্ষেত্রের উপস্থিতি, যাকে আবার দুই ভাগ করেছে চওড়া আনুভূমিক সাদা রেখা। নিঃসীম অন্ধকারে ফিতার মতো এক টুকরো আলোর উপস্থিতি যেন। কিবরিয়ার ছবিতে জ্যামিতিক আকৃতি যা এসেছে সেখানে আয়তক্ষেত্র কিংবা বর্গক্ষেত্রের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তাঁর ছবিতে রং নিজেই আকৃতি লাভ করেছে। আর মানবমনের গোপন আর্তি প্রকাশে আশ্রয় নিয়েছেন বিক্ষত বুনটের। এই বুনট আর রংই কিবরিয়ার ছবি। *কালো এবং বাদামি* (১৯৮২), *শিরোনামহীন* (১৯৮২), *বাদামি এবং কালোর মধ্যে ছাপ* (১৯৮২) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> কিবরিয়ার দৃশ্য ভাষার মূল উপাদান বুনট, বুনটের বিন্যাস আর রং। কিবরিয়ার ছবিতে বুনট তৈরি হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আকারের সমাহারে যতটা, রেখা-রঙের জালে ঠিক ততটা নয়। আর বুনটের বিন্যাস হয় উলম্ব আনুভূমিক জ্যামিতিক ন্যাসে। অর্থাৎ চিত্রক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে।[৫৪২]

পরিসরের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কিবরিয়া ব্যাকরণগত রীতির অনুগামী। একটি আকারের সাথে অন্য একটি আকার, একটি রঙের সাথে আরেকটি রং বেশ ধীর-স্থিরভাবে সমন্বয় করেছেন শিল্পী। *সবুজ* (১৯৮৩) শীর্ষক ছবিটিতে ভারসাম্য বিধানের জন্য চারদিকে একই বুনটের একই আকৃতির কাপড় ব্যবহার করেছেন। নিরীক্ষা চালিয়েছেন নরম মোমের আস্তরণের ওপর চার টুকরা পাতলা আয়তাকার কাপড়ের বুনটের ছাপ দিয়ে মৃদু এসিডে তক্ষণ করে। ফলে চিত্রপটে যোগ হয়েছে কাপড়ের মিহি বুনট। অন্যদিকে মাঝ বরাবর উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে নির্মাণ করেছেন বিক্ষত বুনট। আবার পূর্বোক্ত জল আর তুষের খেলায় নির্মাণ করেছেন *শিরোনামহীন* (১৯৯৬)। আটটি আয়তাকার গড়নে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তুষের বুনট। আর কেন্দ্রকে করেছেন বিক্ষত কালো বুনটযুক্ত। এই জমাট কালোর সাথে সংহতি স্থাপনের জন্য ডান পাশের তল বরাবর আরও একটি ছোট কালো আয়তাকার গড়ন যুক্ত করেছেন। কখনো কখনো একই উপাদান বারবার ব্যবহার করেছেন। উপাদানের এই পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে তা তলকে বিক্ষত করে বুনটে পরিণত হয়েছে। যেমন *শিরোনামহীন* (১৯৮২), *শিরোনামহীন* (১৯৮৪) ইত্যাদি।

নব্বইয়ের দশকে এসে কিবরিয়ার অন্যান্য মাধ্যমের ছবির কাঠামো আরও সহজ হয়ে উঠলেও তাঁর ছাপচিত্রে তখনো শক্ত বহিঃরেখা দেখা যায়। তবে বর্তমান শতকের শুরু থেকেই ছাপচিত্রের কাঠামোও সহজ হয়ে ওঠে। (যদিও এ সময় তাঁর কাজের সংখ্যা খুব অল্প) ছবির রঙের আকৃতি প্রায় বহিঃরেখাহীন এবং ধোঁয়াটে হয়ে আসে। রং অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে ওঠে এবং পরিচিত আকার-আকৃতির বাইরে বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে *শিরোনামহীন* (২০০৩) ছবিটির কথা বলা যায় (চিত্র ৭৬)। তবে পুরনো বোধের জায়গাগুলোকে যে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা নয়; বরং তাকে সঙ্গী করেই এক নিরুদ্বিগ্ন সৌন্দর্যের দিকে পা বাড়িয়েছেন তিনি। বস্তুত এ সময়ই কিবরিয়ার চিত্রতল জ্যামিতিকতা থেকে প্রকৃত মুক্তিলাভ করে। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কালো এবং কালচে কিংবা শীতল রঙের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায় বরাবরই। যদিও জীবনের কোনো কোনো পর্বে খুব সামান্য সময় উজ্জ্বল রংও এসেছে তাঁর ছবিতে। তবে তা ভীষণ সাময়িক। কালোর প্রতি তাঁর আস্থা এতটাই যে, সঠিক রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা ছাত্রদেরও নির্দ্বিধায় কালো রং নির্বাচন করতে বলতেন।

---

[৫৪২] প্রণবরঞ্জন রায়, 'জিজ্ঞাসায় কিবরিয়ার ছবি', *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ২২

কিবরিয়ার ছাপচিত্রের এই নিমগ্নতা প্রভাবিত করেছে তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যকেও। যদিও অনেকের ক্ষেত্রে তা কখনো কখনো দোষণীয়ও হয়েছে। তবে ছাপচিত্রে কিবরিয়ার ক্ষেত্রে তা দোষণীয় না হয়ে বরং খানিকটা উপকৃতই হয়েছে। যেমন একরঙা কাজে নানা রকম টোনাল ভ্যারিয়েশন ও বুনট আনার ফলে তা চিত্রকলার গুণাবলি লাভ করে। অন্যদিকে ছাপচিত্রের মনোক্রোমের ব্যাপারটি প্রকারান্তরে তাঁর চিত্রকলায় সবকিছুর মিনিমাইজেশনে সহায়কই হয়ে যায়। বলা যায়, মাধ্যমগুলো পরিপূরকের ভূমিকা পালন করেছে।[৫৪৩] ছাপাই ছবির প্রতিটি মাধ্যমে কিবরিয়া তিনভাবে বিশিষ্ট–

> প্রথমত, তিনি ছাপাই ছবির প্রতিটি মাধ্যমে তাঁর প্রকরণ বা ম্যাটেরিয়ালের ওপর এমন আধিপত্য বিস্তার করেন যাতে প্রকরণ তাঁর অনুগত সহযোগীতে পরিণত হয়। ফলে প্রতিটি মাধ্যমের নিজস্বতাকে তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত, করণকৌশলগত দিক থেকে নিখুঁত থাকার ব্যাপারে তিনি খুব যত্নশীল। আর তৃতীয়ত, তাঁর ছাপাই ছবিতে পরিসর ও রেখার ব্যবহার অনেক বেশি অন্তরঙ্গ, আকারের বিন্যাস অনিবার্যভাবে ছবির কাঠামোকে গতিশীলতা দান করে। তাঁর ছাপাই ছবিতে যে বলিষ্ঠ রেখামাত্রিকতা দেখা যায়, তার উৎসও ওই কাঠামো চিন্তায়।[৫৪৪]

কিবরিয়া বাংলাদেশর দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্যতম পুরোধা শিল্পী। তাঁর শিল্পীজীবনের সামগ্রিক গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর উত্তরণ হঠাৎ করে হয়নি বরং অনেক সময় নিয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে গড়ে তুলেছেন তিনি। নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিক গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। শুধু ছাপাই ছবি নয় বরং অন্য যেসব মাধ্যমেও তিনি কাজ করেছেন তাঁর পরিপূর্ণ ব্যবহারে তিনি সর্বাত্মক নিয়োজিত রেখেছেন নিজেকে। কিবরিয়ার ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনামূলক নয় বরং ভাবমূলক। অর্থাৎ তাঁর ছবি শুধু কোনো বিষয়ের সুচিন্তিত প্রকাশই নয় বরং তা ব্যক্তির মনের অন্তর্গত টানাপড়েন, সংক্ষুব্ধতা, হতাশা ইত্যাদি অবস্থারও প্রকাশ ঘটায়। পরিমিতি তাঁর ছবির মূল সুর। এই পরিমিতির পাল্লায় মেপেই তিনি নির্মাণ করেছেন নানা অনুষঙ্গ। তাঁর ছবিতে রং ও রেখা অন্য কিছু প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে না এসে বরং স্বমহিমায় প্রকাশিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রং অনুজ্জ্বল এবং নিরপেক্ষ। কিবরিয়ার শিল্পে দেশ-কালের গতিবিধি আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত শিল্প যদি শিল্পীর যাপিত জীবনের দিনপঞ্জি হয়ে ওঠে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে কিবরিয়ার ছবিও সমকালকে ধারণ করে। কারণ অভিজ্ঞ চিত্রামোদি মাত্রই কিবরিয়ার ছবিতে তাঁর চারিত্রিক সংগতি লক্ষ করেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির সাথেও সংগতিপূর্ণ। প্রতিটি মানুষই সমকালের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানান নিজস্ব ভঙ্গিতে। আর কিবরিয়ার ক্ষেত্রে একজন নিভৃতচারী সচেতন মানুষ হিসেবে চিত্রতলেই তার সমূহ প্রকাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাঁর ছবির রং, গড়ন, বুনোটেই তাঁর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। একজন অভিব্যক্তিবাদী হিসেবে পাশ্চাত্য আধুনিকতার শুধু বাহ্যিকতাকেই তিনি গ্রহণ করেননি বরং

---

[৫৪৩] রফিকুন নবী, ‘বর্ণান্বেষী কবির অন্তর্ধান’, *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ ৩০-৩১

[৫৪৪] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *মোহাম্মদ কিবরিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ ২৩-২৪

তাকে আত্মস্থ ও নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতায় জারিত করে চিত্রতলে স্থান দিয়েছেন। যা তাঁকে একই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং গুরুত্ববহ করে তুলেছে।

এই প্রজন্মের অন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী হলেন রশিদ চৌধুরী। পিতার শিল্প-সংস্কৃতিতে আগ্রহ থাকার সুবাদে তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়ে ছিলেন ঢাকার আর্ট স্কুলে। অন্য দশজনের মতো তাঁর শুরুও হয়েছিল তেল ও জলরঙে। কিন্তু প্রচলিত এই মাধ্যমে তাঁর তৃপ্তি হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন–

> প্রচলিত তেল ও জল রং-এ আমার মন তেমন ভরতো না। এই যেমন পিয়ানো ও অর্গ্যান অপূর্ব যন্ত্র হলেও এককভাবে সঙ্গীত জগতে এদের ভূমিকা জোরালো নয়, ঠিক তেমনি শিল্প জগতেও প্রচলিত রীতির মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা। তাই আমি এমন একটি মাধ্যম খুঁজছিলাম যার মাধ্যমে দেশমাতৃকার নিসর্গ ও মানুষকে তুলে ধরতে পারি। আমার সন্ধান অবশেষে সার্থক হলো–ট্যাপেস্ট্রিতে পেলাম আমার ঠিকানা।[৫৪৫]

এই ট্যাপেস্ট্রির কুশলী নির্মাতা হিসেবেই তাঁর মূল পরিচিতি হলেও শিল্পের অপরাপর মাধ্যমেও তিনি ছিলেন দক্ষ। তেল ও জলরং ছাড়া কাজ করেছেন টেরাকোটা, ভাস্কর্য এবং ছাপাই মাধ্যমে। ছাপচিত্রে কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ, এচিং, এনগ্রেভিং, ড্রাইপয়েন্ট প্রভৃতি মাধ্যমেও তিনি দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। প্রথম প্রজন্মের অন্য ছাত্রদের মতো (ছাত্র প্রথম প্রজন্মের, আর দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী) রশিদ চৌধুরীরও ছাপচিত্রে প্রাথমিক পরিচয় ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটেই ঘটেছিল। তবে প্রাথমিক সে চর্চার পর স্পেন ও প্যারিস থেকে ফিরে আবার শুরু করেন ছাপচিত্র। অন্যান্য মাধ্যমে শিল্পচর্চার অবসরে বিরতি দিয়ে চর্চা করলেও ছাপাই মাধ্যমে তাঁর কাজের সংখ্যা খুব স্বল্প নয়। তবে সংরক্ষিত না থাকায় এবং এলোমেলো অবস্থায় নানাজনের সংগ্রহে থাকার ফলে এগুলো সংগ্রহ ও শিরোনাম শনাক্তকরণ, সময়কাল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্ণয় করা আজ সত্যিই দুরূহ। এখানে উদ্ধৃত অধিকাংশ শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সেগুলোর শিরোনাম এবং সময়কাল নির্ধারণে পণ্ডিতগণের অনুমানের ওপরই আস্থা রাখতে হচ্ছে। প্রথম পর্ব, অর্থাৎ ছাত্রাবস্থার কোনো ছাপচিত্রের নমুনা আজ আর পরিলক্ষিত হয় না। তবে ছাত্রাবস্থার পর থেকে নিজস্ব আঙ্গিকে উত্তরণের পর ও উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়ের কিছু নমুনা এখানে আলোচিত হলো, যা তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় বলে স্বীকৃত।

নিসর্গ দৃশ্য (১৯৫৪-৫৫?) লিথো চিত্রটিতে কাস্তে হাতে এক কৃষক চরিত্রকে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল উপেক্ষা করে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় দেখিয়েছেন তিনি। নিচে গৃহপালিত কয়েকটি পশু। কৃষককে ঘিরে পশুর আবর্তন গতিকে চিহ্নিত করার ফলে চিত্রপটে একধরনের ঘূর্ণায়মান কম্পোজিশন (আবর্তন

---

[৫৪৫] মাহমুদ শাহ কোরেশী, 'রশিদ চরিত-কথা', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, অক্টোবর '৮৭-মার্চ, ১৯৮৮, পৃ ৩৮-৩৯

গতি) তৈরি হয়েছে। সাদা জমিনে কালোয় ছাপা কন্টিনির্মিত চিত্রটিতে পরাবাস্তবাদী আবহ বিদ্যমান। *নিসর্গ* (১৯৫৫?) শিরোনামের একটি কাঠ খোদাই চিত্রও দেখা যায়। অর্ধবৃত্তাকার এ কাঠ খোদাই চিত্রটিতে গাছসহ নানা ধরনের জৈব আকৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এটিতেও পরাবাস্তববাদী আবহ বিদ্যমান। আবার *প্রজাপতি ও বালিকা* (১৯৬০) শীর্ষক লিথোচিত্রটিতে ডুরে শাড়ি পরিহিত একটি বালিকা দৌড়ে গিয়ে ফুলের লোভ দেখিয়ে ধরার চেষ্টা করছে একটি প্রজাপতি। নিচে ফুটন্ত ফুলসহ একটি টব। মূলত আলোছায়ার বিন্যাসহীন এবং রেখাপ্রধান চিত্রটিতে অত্যন্ত সরলতায় রূপায়িত করেছেন সবকিছু। এ সময়কার কাজের উপস্থাপনে বাস্তবানুগতা থাকলেও রূপায়ণে রয়েছে জ্যামিতিক সরলতা এবং দ্বিমাত্রিকতা। বিষয়বস্ত হিসেবে এসেছে গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ এবং মানুষ। এতে বাস্তবিকতার সাথে একধরনের ফ্যান্টাসি এবং সরলতায় যোগ হয়েছে পরাবাস্তববাদ। বস্তুত রশিদ চৌধুরী ইউরোপ প্রবাসকালে মার্ক শাগালের প্রভাবে পরাবাস্তববাদে ভীষণ প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এ সময়কার তেলরং, টেম্পেরা, জলরং ও অন্যান্য মাধ্যমের কাজেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> আমার ইউরোপ অবস্থানকালে মার্ক শাগালের প্রলয়ঙ্করী প্রভাবকে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। ইউরোপিয়ান কৃতকর্মা মহান শিল্পীর কাজকে ভুলতে পারি, শাগাল কিছুতে নয়, আজ অবধি স্মৃতিতে কতো উজ্জ্বল, থাকবে আমৃত্যু।[৫৪৬]

তবে আমৃত্যু স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকলেও শাগালের প্রভাব তাঁর শিল্পকর্মে খুব বেশিদিন ক্রিয়াশীল ছিল না। *অনামা-৪* (১৯৬০-৭০) চিত্রতেই আর দেখা যায় না সে প্রভাব বরং পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকের উদ্ভাস যেন পরিলক্ষিত হয় এতে। এখানে শিশুসরলতায় মাছের রূপবন্ধকে লোকজ নকশাসহ গড়েছেন চিত্রতলে। বাংলার গ্রামীণজীবনের উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে ত্রিকোণাকৃতির নিশানের ব্যবহার লক্ষণীয় এ শিল্পকর্মে। রশিদ চৌধুরীর নিজস্বতায় উত্তরণ পর্বের অন্য একটি কাজ *অনামা-১* (১৯৬০-৭০) শীর্ষক চিত্রটিতেও গৃহপালিত পশু ও কৃষককে চিত্রিত করেছেন। এচিং মাধ্যমের রেখায় নির্মাণ করেছেন সরল অথচ অভিব্যক্তিপূর্ণ দুজন কৃষকের প্রতিকৃতি। একজনের অভিব্যক্তিতে সন্দেহ আর অন্যজনের অভিব্যক্তিতে হতাশা স্পষ্ট। কিছু টোনাল ভ্যালু যোগ করলেও আলোছায়ার স্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত এতে। *অনামা-২* (১৯৬০-৭০) চিত্রেও দেখি শুয়োরসদৃশ কোনো প্রাণী নিচের বামপাশের কোনা থেকে মুখ ঢুকিয়েছে চিত্রতলে। আর মানুষের দুটি পা পলায়নপর ভঙ্গিতে। *বাংলায় বিদ্রোহ* (১৯৭১) এঁকেছেন প্লেটলিথোতে মুক্তিযুদ্ধের প্রক্কালে বিশেষ পরিস্থিতিতে (চিত্র ৭৭)। বিদ্রোহকে দেখেছেন খানিকটা অতিরঞ্জিত এবং পরাবাস্তববাদী ধারায়। আমাদের ভয় আর বিশ্বাসকে রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন তিনি। আনুভূমিক ছবিটির উপাদানের সমাবেশ স্মারক স্তম্ভাকৃতির। রচনায় সব

---

[৫৪৬] মাহমুদ শাহ কোরেশী, 'রশিদ চরিত-কথা', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, অক্টোবর' ৮৭-মার্চ, ১৯৮৮, পৃ ৩৮

কিছুর ওপরে 'স্বাধীনতা' লেখা একটি ত্রিকোণ নিশান হাতে একজন তরুণ পেছনের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিদ্রোহে শামিল হওয়ার জন্য। সামনে মশাল হাতে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে চলেছে এক তরুণী। নিচে আরও দু-তিনটি মানুষ আছে দেশীয় অস্ত্র উঁচিয়ে। প্রত্যেকের অভিব্যক্তিতে সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাদের সাথে বিদ্রোহে শামিল হয়েছে বাংলার সকল হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও। রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাবা উঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনে। নিচে দীর্ঘ ধারালো মুখ হাঁ করে আছে কুমির। আবার সম্মুখপটে ফণা তোলা বিষধর সাপের পেছনে ঘাড় বাঁকিয়ে তীব্র গতিতে শত্রুর মোকাবেলা করতে ছুটেছে নিরীহ হরিণ। এ ছাড়া সে দলে আছে শূকর, ষাঁড়, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীও। ছোট ছোট গতিশীল রেখায় আঁকা এ দৃশ্যে মুক্তি সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়ানো সমগ্র বাংলার বিদ্রোহে ফুঁসে ওঠার পুরো উত্তাপ আঁচ করা যায়। প্রকৃতিবাদী শিল্পী রশিদ চৌধুরীর চিত্রতলে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর শৈশবের গ্রাম্যজীবন, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের গৃহপালিত প্রাণী, প্রকৃতি, এর নানা উৎসব, লোকাচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, লোককাহিনি, পৌরাণিক বিষয়ের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> পদ্মা যেমন আমাকে দিয়েছে, গ্রামীণ জীবনও কম নয়– আমার মনবেদিকায় এদের আসন ভারি পাকা। ...এদের অবসরে আমাদের সুর করে চিত্তজয়ী সব গাথা শোনাত–লোকজ ধারায় স্নাত এসব কাহিনী আজও আমায় ভাবায়। ...মন্দির হয়েছে তো কি, আমার একটু জায়গা হয়েই যেতো সেখানে। কতো দিন কাটিয়েছি গোবর নিকনো আঙিনায়, সুধাস্পর্শী স্তোত্র উচ্চারণরত পুরোহিতের পাশে, বোষ্টম-বোষ্টুমীদের ঈশ্বরস্তুতি সংবলিত গান ও নাচের মোহন আসরে![৫৪৭]

সেজন্য নিজস্ব আঙ্গিকে প্রকাশমান হওয়ার সময় অনায়াসে তাঁকে উপকরণ গ্রহণ করতে দেখি বাংলার লোকজ শিল্পের নানা অনুষঙ্গ থেকে। স্বাধীনতাত্তোরকালে করা তাঁর অধিকাংশ চিত্রকলা এবং ট্যাপেস্ট্রির মৌলিক গড়ন বা কাঠামো তিনি নিয়েছেন বাংলা প্রতিমার রূপকল্প থেকে, যা একই সঙ্গে প্রকাশমান থেকেছে তাঁর সমসাময়িককালে করা ছাপছবিতেও। এ সময় করা তাঁর *পুতুল নাচ* (১৯৭৮) শীষর্ক শিল্পকর্মটিতে আলপনার মতো মনোজ্ঞ নকশায় উৎকীর্ণ করেছেন চিত্রতল (চিত্র ৭৮)। ক্রমশ বিলীয়মান অন্ধকারকে অপসারিত করে উৎসবের আনন্দসূচক নকশা গড়েছেন *অনামা*-৩ (১৯৭৫-৮০)-এ। আবার *অনামা*-৭ (১৯৭৫-৮০) চিত্রটিতেও তল গড়েছেন একই রকম নকশায়। অনামা-৬ (১৯৭৫-৮০) নির্মাণ করেছেন শুধু এনগ্রেভিংয়ের রেখায়। ছোট ছোট অর্থপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ রেখায় গড়েছেন প্রতিমার রূপকল্প। প্লেটকে কয়েক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন ধাপে উন্মুক্তভাবে তক্ষণ করে নির্মাণ করেছেন অনামা-৫ (১৯৭৫-৮০)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ছবির মূল বিষয়বস্তু হলো নকশা। এনগ্রেভিংয়ের বলিষ্ঠ রেখার সাথে অ্যাকোয়াটিন্টের বুনটের ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে।

---

[৫৪৭] মাহমুদ শাহ কোরেশী, 'রশিদ চরিত-কথা', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, অক্টোবর' ৮৭-মার্চ, ১৯৮৮, পৃ ৩৭

কখনো বা শুধু এনগ্রেভিংয়ের রেখায় নির্মাণ করেছেন পট। তবে এনগ্রেভিংয়ের দীর্ঘ লীলায়িত রেখার (যেমনটা পূর্বে দেখেছি শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের কাজে) পরিবর্তে ছোট ছোট কিন্তু অর্থপূর্ণ রেখায় নির্মাণ রূপ লাভ করেছে। সরল কিংবা বৈশিষ্ট্যসূচক একক রেখার পরিবর্তে তির্যক বা কাটাকুটি-সদৃশ রেখার ব্যবহার করেছেন বেশি। বিভিন্ন ঘনত্বের কালো ও সাদার খণ্ড খণ্ড এবং সুসংবদ্ধ ঐক্য তাঁর চিত্রতলকে ভিন্নমাত্রায় উৎত্তীর্ণ করেছে। সেইসাথে পরিসর বিভাজনের ক্ষেত্রে মৌলিক নকশার নিয়মগুলো সব সময় মেনে চলেছেন। পরিসরের এই সুপরিকল্পিত ব্যবহার তাঁর সৃষ্টিকে দিয়েছে এক সাংগীতিক ঐকতান। ফলে আলংকারিকতার প্রান্ত স্পর্শ করেও তাঁর ছবি নিছক নকশা হয় না, বরং চিত্রগুণের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ সৃজনশীল ক্রিয়া হয়ে ওঠে।[৫৮]

পঞ্চাশের পরিবর্তনকামী তরুণ শিল্পীদের একজন হলেও রশিদ চৌধুরীর চিত্রতল কখনোই দখল করতে পারেনি বিশুদ্ধ বিমূর্ততা। বরং রং ও রেখায় অর্ধ-বিমূর্তরীতিতে বরাবর প্রকাশমান থেকেছেন তিনি। শিল্পী রশিদ চৌধুরীর শিল্প দেশজতার সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণে মুক্তিলাভ করেছে চিত্রতলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে দেখা নানান আধুনিক শিল্প-আঙ্গিক কখনো কখনো তাঁকে প্রভাবিত করলেও তাঁর হৃদয়ে সতত প্রবহমান থেকেছে শৈশবের স্মৃতি, বিশেষত গ্রামীণজীবন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাই রশিদ চৌধুরীর নির্মিত শিল্পের কেন্দ্রে তাঁর শৈশব-কৈশোরে লব্ধ গ্রামীণজীবনের অভিজ্ঞতাই থেকে গেছে প্রধান হয়ে।

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পান্দোলনের দ্বিতীয় প্রজন্মের অগ্রগণ্য শিল্পীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন হলেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক। তৎকালীন মুসলিম সমাজব্যবস্থা শিল্পচর্চা সম্পর্কে অনেক রক্ষণশীল হলেও বাবার শিল্পচর্চা সম্পর্কে ধারণা থাকায় পারিবারিকভাবে বাধার সম্মুখীন হননি শিল্পী হওয়ার পথে। বরং এক মামা ও পিতার কাছ থেকে নিরন্তর উৎসাহ পেয়েছেন শিল্পচর্চা করার ব্যাপারে। মূলত, চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর হিসেবে তাঁর মূল পরিচিতি হলেও তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রীও। কাজ করেছেন কাঠ খোদাই, এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, লিথোগ্রাফ, এনগ্রেভিং প্রভৃতি মাধ্যমে। এ দেশে তিনিই প্রথম ছাপচিত্রে তথা সামগ্রিকভাবে শিল্পকলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকার শিল্পশিক্ষা শেষ করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে শিল্পক্ষেত্রে এ দেশের প্রথম ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান। সেখানে ছাপচিত্রে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত ছাপচিত্রী মরিসিও লেসানিস্কিকে।

তবে ছাপচিত্রে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় হয়েছিল ঢাকায় বসেই, আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র থাকা অবস্থায়। ঢাকা পর্বে করা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো *ভূ-দৃশ্য* (১৯৫০), *ভূ-দৃশ্য* (১৯৫০), *খুর লাগানো*

---

[৫৮] আবুল মনসুর, *রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ ৩৩

(১৯৫১), *স্বর্ণকার* (১৯৫২), *নৌকাগুলি* (১৯৫৪) ইত্যাদি। ছাত্রাবস্থায় কাঠ খোদাই মাধ্যমে তাঁর করা ভূ-দৃশ্যের দুটি ছবিই অনুশীলনধর্মী ও বাস্তববাদী ধারায় নির্মিত। সাদা-কালোর বৈপরীত্যে নির্মিত ছবি দুটিতে আলোছায়ার বিন্যাসও ব্যাকরণভিত্তিক। *খুর লাগানো* শীর্ষক কাঠ খোদাই চিত্রটিও উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত। *স্বর্ণকার*-এ (চিত্র ৭৯) একজন প্রবীণ স্বর্ণকার বাম হাতে মুখে বাঁশের চোঙ নিয়ে কয়লার আগুনের পাত্রে ফুঁ দিয়ে কয়লাকে তপ্ত করতে চাইছে, আর ডান হাতে একটি চিমটার সাহায্যে অভীষ্ট ধাতব পাত্রটি কয়লার ওপরে ধরে আছে। বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আলো মাটির ঘরের জানালা-সদৃশ ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে এসে পড়েছে তার গায়ে। সামনে-পেছনে রাখা আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি। সাদা-কালোর বৈপরীত্যে সৃষ্ট অনুশীলনধর্মী এ কাঠ খোদাই চিত্রটিতে তাঁর বলিষ্ঠতার ছাপ বিদ্যমান। আর নদীর ঘাটে খুঁটিতে তিনটি নৌকা বাঁধা *নৌকাগুলি* (১৯৫৪) ছবিতে। প্রথম নৌকায় ছাতার নিচে বসে আছে দুটি শিশু, দ্বিতীয়টিতে একটি শিশু বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরছে। আর অপর নৌকাটিতে পড়ে আছে একটি মাথাল। পাথরে স্ক্র্যাচ করে কন্টির টোনালভ্যালু কমিয়ে আলোছায়ার তারতম্য, ঘাস, খুঁটি, নদীর জল ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যসূচক তারতম্য বোঝানো হয়েছে। লিথোগ্রাফিতে করা এ দৃশ্যচিত্রটিতে গ্রাম্য শৈশবের দুরন্তপনার স্বাভাবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এসব চিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এগুলোর বলিষ্ঠ ড্রয়িং এবং বাস্তবধর্মিতা। বাস্তববাদী শিল্পরীতির প্রতি রাজ্জাকের এই অনুগামীতা বস্তুত শিক্ষক জয়নুল আবেদিন থেকে পাওয়া, যা আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা পর্বেও অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁর সময়ের আধুনিকতাপন্থী শিল্পীদলের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্যানভাস অনেক দিন পর্যন্ত সাদৃশ্যধর্মী ছিল। পঞ্চাশের শেষে তাঁর আমেরিকায় অবস্থানকালীন সময়ে করা রেখাচিত্র এবং ছাপচিত্রসমূহও বাস্তববাদী ধারায় করা। এমনকি ষাটের প্রথম দিকের কাজেও তিনি ফিগার অথবা প্রকৃতিনির্ভর আধাবিমূর্ততায় শিল্পনির্মাণ করেছেন।

এ দেশের শিল্প-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি আমেরিকায় শিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাঁর অন্তরে বাংলাদেশ সদা জাগরূক থেকেছে। সেজন্য প্রবাসজীবনে করা ছাপাই ছবিতেও অন্যান্যের পাশাপাশি বিষয় হিসেবে এসেছে নদী-নৌকা এবং এ দেশের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। আমেরিকায় করা তাঁর কিছু কাজ হলো *রাতের খেয়া* (১৯৫৫), *বুড়িগঙ্গা* (১৯৫৫), *খেয়াঘাট* (১৯৫৫), *আত্মপ্রতিকৃতি* (১৯৫৫), *আত্মপ্রতিকৃতি* (১৯৫৫), *আত্মপ্রতিকৃতি*-৩ (১৯৫৬), *অভ্যন্তর* (১৯৫৬), *অনামা* (১৯৫৬), *দাঁড়ানো অবয়ব* (১৯৫৭), *বালক* (১৯৫৭), *মাথা* (১৯৫৭), *ফিলিপ থমসনের প্রতিকৃতি* (?) ইত্যাদি। ঢাকা পর্বে কাঠ খোদাই ও লিথোগ্রাফ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও আমেরিকায় গিয়ে তাঁর পরিচয় ঘটে ছাপচিত্রের নতুন নতুন মাধ্যমের সাথে যেমন– এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, এনগ্রেভিং ইত্যাদি। এ সময় প্রথমবার এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যম ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন *রাতের খেয়া*। চারদিকের নিকষ অন্ধকারের ভেতরে একটি নৌকায় কয়েকজনের নদী পারাপারের দৃশ্য এটি। এখানে খুব মিহি দানার অ্যাকোয়াটিন্টের আস্তরে নির্মাণ প্রকাশলাভ করেছে। নৌকা সমেত

বুড়িগঙ্গার ঘাট নির্মাণ করেছেন একই পদ্ধতিতে। তবে তার প্রকাশ খুব সার্থক হয়েছে সে দাবি করা যায় না। বরং চিত্রে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে অনেকটাই শক্ত ও জমাটাকৃতি লাভ করেছে যেন। তবে একই সময়ে করা *খেয়াঘাট*-এ সাদামাটা রেখাচিত্রাংকনে তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশমান স্ব-মহিমায়। এই খেয়াঘাট ছবির প্লেটে শিক্ষক লেসানিস্কির পরামর্শে অ্যাকোয়াটিন্টের টোনাল ভ্যালুর সাথে বেশ কিছু উপাদান যোগ করে নতুন মাত্রায় আরও জমকালো করে উপস্থাপন করেছেন পরে। তবে এ মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধি ও শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় *আত্মপ্রতিকৃতিতে* (চিত্র ৮০)। শক্তিশালী ড্রইংয়ে এবং অপূর্ব আলোছায়ার বিন্যাসে এটি তাঁর ছাপাই ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা একটি শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মটিতে মাধ্যমের প্রতি তাঁর আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়। তীব্র আলোর প্রেক্ষাপটে ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো অবস্থায় এটি এঁকেছেন তিনি। নির্মাণের মেজোটিন্ট পদ্ধতি অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার পদ্ধতিতে ছবিটি নির্মিত। আর শুধু বলিষ্ঠ বহিঃরেখায় নির্মাণ করেছেন দ্বিতীয়োক্ত *আত্মপ্রতিকৃতিটি*। যা তাঁর রেখাচিত্র নির্মাণের দক্ষতাকে জানান দিচ্ছে সদর্পে। ধাতু খোদাই মাধ্যমে করেছেন *আত্মপ্রতিকৃতি*-৩। স্বল্প কয়েকটি গভীর রেখায় নির্মাণ করেছেন এটি। অবয়বটির কাঁধ থেকে মাথার অংশটি কিছুটা লম্বাটে, যা এল গ্রেকোর (১৫৪১-১৬১৪) কথা মনে করিয়ে দেয়। একই রকম দীর্ঘগ্রীব একটি কাজ হলো *ফিলিপ থমসনের প্রতিকৃতি*। সাদা-কালো এই কাঠ খোদাইটিতে বন্ধু ফিলিপকে এঁকেছেন বৈশিষ্ট্যসূচক রেখায়। আবার দীর্ঘগ্রীব নগ্ন নারীচরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে করা *দাঁড়ানো অবয়ব* শীর্ষক ছাপ ছবিতে। ছবিতে এক যুবতী নারী মাথার পেছনে দুই হাত রেখে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দর্শকদের থেকে সামান্য ডান দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একধরনের ছন্দ যেন উপস্থিত। দেহের একদিকে অন্ধকার অন্যদিকে আলোর উপস্থিতি। তবে মাথার সাথে শরীরের ভঙ্গিতে অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। আর *অভ্যন্তর* শিরোনামের ছবিটিতে একটি ঘরের অভ্যন্তরভাগ নির্মাণ করেছেন দক্ষতার সাথে। অত্যন্ত নিখুঁত আলোছায়ার বিন্যাসে নির্মাণ করেছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের শয়নকক্ষ। ঘরের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের জিনিস রাখা আছে, মাঝ বরাবর আছে এক নারীচরিত্র। কিন্তু আলোক-উৎসের একেবারে বিপরীতে থাকার ফলে তার মুখটি অন্ধকার হয়ে আছে। তাঁর ভঙ্গিতে কিছুটা অন্যমনস্কতা লক্ষণীয়। জানালা দিয়ে আসা আলোয় বিছানার চাদর এবং বালিশ আলোকিত হয়ে আছে। ডানপাশ দিয়ে উলম্বভাবে উঠে গেছে একটা খুঁটি। ছবিটিতে আলোর চাইতে অন্ধকার অঞ্চল বেশি হওয়ার কারণে আলোছায়ার নাটকীয়তা চরম আকার লাভ করেছে। এ ছাড়া *বালক* ও *মাথা* শিরোনামের শিল্পকর্ম দুটিতেও দুজনের প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেছেন। অত্যন্ত স্বল্প রেখায় বাস্তবানুগ ভঙ্গিতে নির্মিত এসব ছবিতে স্বল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আবার অনামা এচিংটিতে সফট গ্রাউন্ড এচিংয়ের করণকৌশল বিষয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছেন, যা বিমূর্ত দৃশ্যজ অভিজ্ঞতার ধারণা দেয় দর্শককে। তবে তিনি বিমূর্ততায় উত্তরিত হয়েছেন আরও পরে।

তাঁর সমসাময়িকরা সবাই বিদেশ ফেরত হওয়ার পর যেখানে নির্বস্তুক করে তুলেছে চিত্রজমিন, সেখানে আব্দুর রাজ্জাক গা ভাসাননি গতানুগতিকতায়। অথচ তখন ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাপকভাবে চর্চিত হচ্ছিল বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ। তাই আমেরিকা ফেরত একজন শিল্পীর পক্ষে তাঁর চর্চা করাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রাজ্জাক অপেক্ষা করেছেন বিবর্তিত হওয়ার। দেখেশুনে ধীরে ধীরে অবয়বধর্মিতা থেকে পা ফেলেছেন নির্বস্তুকতায়। তাঁর বিমূর্ত কাজসমূহে ক্লিফোর্ড স্টিল এবং মার্ক রথকোর মিশ্র প্রভাব লক্ষণীয়।[৫৪৯] *কম্পোজিশন* (১৯৭৩) (চিত্র ৮১), *কম্পোজিশন-১* (১৯৭৩) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এই শিল্পকর্মগুলো সম্ভবত তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য থেকে উৎসরিত। কারণ তাঁর সমসাময়িক চিত্রকলার মতো এসব লিথোচিত্রগুলোতেও অবয়বের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়ে না। সাদার ওপরে কালো রঙে গড়েছেন তল। মাঝে ছোট ছোট সাদা আকৃতির বিন্যাস তাতে, রেখা প্রায় অন্তর্হিত। কোথাও কোথাও হালকা বুনটেরও দেখা মেলে। বস্তুত রং ছড়ানোর আবেগই মুখ্য হয়ে উঠেছে এসব ছবিতে। আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর বেশ কিছুদিন তিনি ছাপচিত্র এবং তেলরঙেই প্রধানত কাজ করেছেন। এ সময় নিজস্ব একটি মুদ্রণযন্ত্রও নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু নানামুখী ব্যস্ততায় এ মাধ্যমে আর কাজ করাটা হয়ে ওঠেনি।[৫৫০] বিশেষ করে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সৃষ্ট ভাস্কর্য বিভাগ গড়ে তোলার কাজটা তাঁর কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। এজন্য প্রচুর সময়ও দিতে হয়েছে তাঁকে। যা তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে অন্য মাধ্যমের সাহচর্য থেকে। এ ছাড়া লেখালেখিও করেছেন কাজের পাশাপাশি। ফলে যতটা উৎপাদনক্ষম তিনি ছিলেন, তার পুরোটার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

বহুমাত্রিক উচ্চ সৃজনশীল শিল্পী মুর্তজা বশীর একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রথিতযশা হলেও শিল্পের অন্য হরেক মাধ্যমেও রয়েছে তাঁর সদর্প পদচারণা। তেল আর জলরঙের ছবির জন্য সমধিক পরিচিত হলেও তিনি পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রীও। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসেবে ছাপচিত্রের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটে তাঁর। তবে প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে অনিয়মিতভাবে হলেও এ মাধ্যমের চর্চা ছিল অব্যাহত। অনিয়মিত হওয়ার ফলে তাঁর কাজের সংখ্যা খুব বেশি নয় যদিও (তবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত অনেক ছাপচিত্রীর চেয়ে বেশি) তবু শিল্পোৎকর্ষ বিচারে ছাপচিত্রী মুর্তজা বশীরের শিল্প নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক।

শৈশবেই পিতার (জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-এর) ব্যক্তিগত পাঠাগার শিল্পের প্রতি মুর্তজা বশীরের আগ্রহ এবং মানস গঠনে সাহায্য করেছিল। এরপর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটে পড়া। ছাত্রাবস্থায় বাস্তবধর্মী বিষয়ের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে ছাপাই মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু। তবে ছবির গঠন ও বিন্যাসের সাথে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সচেতন ছিলেন সবসময়।

---

[৫৪৯] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ইত্যাদি, ২০০৭, পৃ ৩০৪

[৫৫০] নজরুল ইসলাম, 'আবদুর রাজ্জাক: বহুমাত্রিক আধুনিক শিল্পী', দ্র. *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ ১৩১

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে) অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে কয়েকটি ছাপচিত্রও প্রদর্শন করেন তিনি। এর মধ্যে *সময়ের চিহ্ন* (১৯৫১), *ওভার টাইম* (১৯৫১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লিনো খোদাই মাধ্যমে ছাপা *সময়ের চিহ্ন*তে বলিরেখাপূর্ণ এক বৃদ্ধার প্রতিকৃতি এঁকেছেন পার্শ্বীয়ভাবে। আর *ওভার টাইম*-এ (চিত্র ৮২) চিত্রপটের সম্মুখে বৈদ্যুতিক বাতির নিচে অবসন্ন এক কম্পোজিটরকে (compositor) কর্মনিমগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। অক্ষর রাখার কয়েকটি বোর্ড পেরিয়ে বাম দিকের ওপরের অংশে একটি বৈদ্যুতিক আলোক-উৎসের নিচে কর্মরত আরও দু-জন। আলো-আঁধারির অসামান্য প্রয়োগ আর চরিত্রের অভিব্যক্তিতে দীর্ঘ কর্মক্লান্তির যে স্পষ্ট ছাপ শিল্পী নির্মাণ করেছেন, তাতে সময় গড়িয়ে গিয়ে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার ক্লান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে অনবদ্য। কালো জমিনের পশ্চাদ্‌পটে সাদা রেখার এ সমস্ত ছবিতে আলোছায়ার ব্যাকরণভিত্তিক উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। এ ছাড়া ছাত্রাবস্থায় করা তাঁর আরও কয়েকটি কাজ হলো *একতারা হাতে বাউল* (?), *চশমা চোখে যুবক* (?) এবং *ঘরে ফেরা* (?)।[৫৫১]

স্কুলে পড়ার সময় থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া মুর্তজা বশীর শিল্পকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। 'আর্টিস্টের কাজ হলো শোষিত জনগণের ভাব ও দুঃখ-দুর্দশাকে চিত্রের ভেতর দিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা, যাতে সমাজে আর্ট নবজীবন সৃষ্টি করতে পারে', প্রখ্যাত সমাজবাদী নেতা ও তাত্ত্বিক ভবানী সেনের এ বাণী তাঁর ওপর খুব প্রভাব বিস্তারী হয়।[৫৫২] এ চেতনা থেকেই অন্যায়, অসাম্য আর বিবেকহীনতার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিল্পের বাস্তবধর্মী রীতির নিরিখে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে করা *রক্তাক্ত একুশে* (১৯৫২) যেন এরই সার্থক দৃষ্টান্ত। (রক্তাক্ত একুশের দুটি ভার্সন তিনি করেছিলেন। এখানে আলোচিত হয়েছে প্রথম ভার্সনটি। এটিতে এম বি লেখা এবং গুলিবিদ্ধ ছাত্রের হাতে প্ল্যাকার্ড থাকলেও দ্বিতীয়টিতে তা নেই) লিনো খোদাই মাধ্যমে করা সাদা-কালো এ ছাপছবিতে একজন ভাষা সৈনিক বন্দুকের নল আর বেয়োনেটের সামনে তীব্র আক্রোশে দাবি করছে মাতৃভাষার। একইসাথে সে কোলের ওপর দুই হাতে আগলে আছে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্ল্যাকার্ড বহনকারী গুলিবিদ্ধ ছাত্রসহযোদ্ধাকে। সম্মুখপটে পড়ে আছে বই। চিত্রতলের বাম দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত হওয়া একের পর এক যোদ্ধার প্রতিকৃতি যেন নিপীড়কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সংগ্রামী চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন এতে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

---

[৫৫১] হাসনাত আব্দুল হাই, 'ছাপচিত্রে মুর্তজা বশীর', বাংলাদেশ প্রতিদিন, http://www.bd-pratidin.com/various/2015/08/21/101256 প্রেক্ষিত ২৬-০৭-২০১৬ খ্রি.

[৫৫২] হাসনাত আব্দুল হাই, *মুর্তজা বশীর : তাঁর জীবন ও সৃষ্টি*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ ২৪

> এই লিনোকাটের কম্পোজিশনে সৈন্য ও ছাত্রজনতার মুখোমুখি লড়াইকে তুলে ধরা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে সৈনিকের রূপ ঘোষণার জন্য বেয়নেট লাগানো বন্দুক ও ব্রেনগানের নল এবং ছাত্র-জনতাকে বোঝানোর জন্য মাটিতে পড়ে থাকা খোলা বই ও একজোড়া নগ্ন পায়ের পাতা আঁকা হয়েছে।[৫৫৩]

শিল্পী মুর্তজা বশীর প্রথম দিকের অধিকাংশ কাজেই সমাজবাদী বাস্তবতার নিরিখে নির্বাচন করেছেন তাঁর শিল্পোপজীব্য। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শেষ করার পরও সাধারণ মানুষকেই শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করতে গিয়ে করা শিল্পকর্মগুলোতেও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই ধারা বজায় থেকেছে। *বিড়িওয়ালা* (১৯৫৪), *জুতা পালিশ করা বালক* (১৯৫৪) ইত্যাদিতেও দেখা যায় সাধারণ ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষকেই তুলে ধরেছেন ছবিতে। তবে এ সময় শিল্পবিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও সেখানকার সমসাময়িক খ্যাতিমান আধুনিক ধারার শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসার ফলে তাঁর শিল্পসত্তা আরও পরিণত হয় এবং আঙ্গিকেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। বিষয়ের প্রকাশ হয়ে ওঠে আরও সরল ও অনেকটাই অভিব্যক্তিবাদী। পূর্বের চমৎকার আলোছায়ার বিন্যাস এখানে অনুপস্থিত বরং, অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণের চাইতে বিষয়ের সারাৎসার উপস্থাপনই যেন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ে চিত্রপটে কালোর ব্যাপক প্রাধান্য কমে গিয়ে বরং সাদা প্রধান হয়ে ওঠে।

এরপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পিতার অর্থায়নে তিনি ইতালির ফ্লোরেন্সে যান শিল্প বিষয়ে উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে। এখানে তিনি এট্রুস্কান শিল্প এবং প্রাক-রেনেসাঁ পর্বের বেশ কিছু শিল্পী এবং পিকাসোর কাজ দ্বারা প্রভাবিত হন।[৫৫৪] এঁদের কাজের সীমিত রং, জ্যামিতি আর আকারের সরলীকরণ পরবর্তীতে তাঁর কাজকে প্রভাবিত করেছে। যদিও কলকাতায় আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করতে যাওয়ার সময়ে পরিতোষ সেনের কাজের সরলতা এবং রং ব্যবহার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত ছিলেন। মুর্তজা বশীর ফ্লোরেন্সেও শ্রমজীবী মানুষকে ঠাঁই দিয়েছেন ক্যানভাসে। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অপরিসীম ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন বাম রাজনীতিঘনিষ্ঠতার সুবাদে। একটা শোষণহীন, মূল্যবোধ সমৃদ্ধ এবং শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত মানবিক সমাজের স্বপ্ন ছিল তাঁর।

ফ্লোরেন্স থেকে লন্ডন হয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ঢাকায় ফিরে আসেন তিনি।[৫৫৫] দেশে আসার পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির সাথে এ দেশীয় বিষয় সহযোগে নিরীক্ষার মাধ্যমে মিশ্রণধর্মী শিল্প আঙ্গিকে কাজ করতে থাকেন। এ সময় (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে) জয়নুল আবেদিনের নির্দেশে তিনি লিথোগ্রাফে ছয়-

---

[৫৫৩] মুর্তজা বশীর, 'আমার একুশে চিত্রাবলী', দ্র. *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ ৬৯-৭০

[৫৫৪] আবুল মনসুর, 'মুর্তজা বশীর', দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ৫৯

[৫৫৫] ঢালী আল মামুন, 'চ. মুর্তজা বশীর', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ ৩৬৮

সাতটি কাজ করেন।[৫৫৬] তবে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র না হওয়ায় পরে আর লিথোগ্রাফ করার সুযোগ পাননি। এর মধ্যে *মাছ* (১৯৫৯) শীর্ষক লিথোগ্রাফটিতে কালোর তীব্রতা আর মাছের বলিষ্ঠ অথচ সরল রূপবন্ধের শুভ্রতার বৈপরীত্যে তল নির্মাণ করেছেন শিল্পী। এ ছাড়া *মারিয়ার প্রতিকৃতি (১৯৫৯)*, *কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিকৃতি* (১৯৫৯), *নেকলেসসহ নারীর প্রতিকৃতি* (১৯৫৯), *আত্মপ্রতিকৃতি* (১৯৫৯) প্রভৃতি এ সময়েই করা লিথোচিত্র। এগুলোর রেখা এবং আঙ্গিকে পিকাসোর অন্তর্লীন প্রভাব কিছুটা দৃশ্যমান।

ষাটের দশক শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্প বিচারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠা আর জীবন-জীবিকার জন্য যেমন অস্থির সময় পার করেছেন, তেমনি আত্মবিশ্বাসী নিরীক্ষায় নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক নির্মাণেও সফল হয়েছেন। দশকের শুরু থেকেই পূর্ববর্তী শিক্ষা আর জীবনদর্শনের আলোকে বিমূর্ত আঙ্গিকে মূর্ততার নানা রূপ নির্মাণে ব্রতী থেকেছেন। যার সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ *দেয়াল* (১৯৬৭) সিরিজ। হুবহু কোনো না কোনো দেয়ালের উপস্থাপন এই *দেয়াল* সিরিজ মানুষের বন্দিদশার প্রতীকী উপস্থাপন। বেগম বাজারে অবস্থানকালে ঢাকা জেলের উঁচু দেয়ালের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় এর অস্তিত্ব তাঁর শিল্পীমনকে প্রভাবিত করে। তিনি উপলব্ধি করেন, সমাজে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার নানা অচলায়তন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে বহির্জগৎ থেকে। তখন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের নানা টানাপড়েনে শিল্পী নির্মাণ করেছেন এই *দেয়াল সিরিজ*।[৫৫৭] আবার তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এ সিরিজ প্রাসঙ্গিক। *দেয়াল* প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে–

> এখানে "দেয়াল" প্রতীকায়িত হয়েছে বন্দী মানুষের চারিদিকের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর হিসেবে, নিষেধের ঘেরাটোপে আবদ্ধ মানুষের আত্মার আকুতি প্রতিফলিত হয়েছে ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালের দাঁত বের করা ইটে, খসে যাওয়া পলেস্তরায়, শ্যাওলা ধরা মলিনতায়, অমসৃণ টেক্সচারের কর্কশ অনুভবে। নিষেধের যে প্রাচীর রাজনৈতিকভাবেও সেদিন তৎকালীন পাকিস্তানের জনগণের টুঁটি টিপে ধরেছিল তারও একটি রূপক হিসেবে এ চিত্রমালাকে নেওয়া যায়।[৫৫৮]

ছাপচিত্র প্রসঙ্গে চিত্রকলার অবতারণা এজন্য যে, তা বশীরের চিত্রকলা চর্চার অনুবর্তী। আলাদাভাবে শুধু ছাপচিত্র মূল্যায়ন করলে প্রাথমিক পর্বের পর তা হঠাৎ বিশুদ্ধ বিমূর্ত আঙ্গিকবাহী বলেই মনে হবে। কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর পর সৃষ্ট ছাপচিত্রের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে চিত্রকলায় আঙ্গিক থেকে আঙ্গিকে উত্তরণের মাধ্যমে। অর্থাৎ ছাপচিত্র নতুন কোনো আঙ্গিকবাহী না হয়ে বরং সবসময় চিত্রকলার আঙ্গিকবাহীই থেকেছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর আকার-আকৃতিসমূহ আপাত অপরিচিত মনে হলেও তার উৎস

---

[৫৫৬] মুর্তজা বশীর, 'জীবন ও চিত্র', দ্র. *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ ৪২

[৫৫৭] সন্তোষ গুপ্ত, 'দুটি চিত্র প্রদর্শনী (একটি বিপন্ন বিস্ময় ঃ মূর্তজা বশির)', *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৬৭, পৃ ৪৬

[৫৫৮] আবুল মনসুর, 'মুর্তজা বশীর', দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ৬০

আর অপরিচিত থাকে না। *দেয়াল* সিরিজের ক্ষেত্রে মূল সিরিজ তেলরঙের হলেও ছাপাই মাধ্যমেও কয়েকটি দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন স্বাধীনতাত্তোর সময়ে। এচিং মাধ্যমে করা *দেয়াল* (১৯৭৩) সম্পূর্ণ বিমূর্ত আঙ্গিকের আভাসদায়ী (চিত্র ৮৩)। কারণ তেলরঙে হুবহু কোনো দেয়ালের প্রতিলিপি সৃষ্টি সম্ভব হলেও এচিং মাধ্যমে তা কঠিন এবং এ কাজগুলোতেও দেয়ালের হুবহু চিত্রণের চেষ্টার পরিবর্তে রং, রেখা এবং বুনট নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীর অধিক মনোযোগ এবং সংবেদনশীল আচরণ লক্ষণীয়। স্থানিকভাবে একটি রং ধাতব ছাঁচের অন্তর্লীন রেখায় ভর্তি করে এবং পৃষ্ঠতলে অন্য রং লেপন করে ছাপ গ্রহণ করার মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে এ ছবিটি। মলিন নীলচে রঙের জমিনে ঈষৎ কমলা রঙের ছোপের বুকজুড়ে বিক্ষিপ্ত আঁচড়ে বেরিয়ে আছে সাদা আর মরিচার মতো গাঢ় রং। যেন ওপরের হালকা মসৃণ রঙের প্রলেপের আড়ালে আবদ্ধ মানবসত্তার সংক্ষুব্ধ আকুতি দগদগে ক্ষত হয়ে বেরিয়ে আছে দেয়ালে। কিছুটা সময় বিরতি দিয়ে আবারও বিমূর্ত আবহে নির্মাণ করেছেন *দেয়াল* (১৯৮০)। বিশুদ্ধতাবাদী বশীর করণকৌশলগত দক্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এ ছাপছবিটিতে। শক্ত মোমের প্রলেপযুক্ত ধাতব পাতের ওপর আঠালো পদার্থ (গাম অ্যারাবিক, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি) যোগ করার পর, তাকে উত্তপ্ত করে এসিডে ক্ষয় করে বিশেষ বুনট নির্মাণ করেছেন। এসিড প্রতিরোধী মিশ্রণের সাথে পরিমিত এসিড প্রয়োগ করে কয়েকটি ধাপে নির্মাণ করেছেন ছাঁচ। এর সাথে মাত্র দু-একটি রেখা যোগ করে শেষ করেছেন পুরো ছবি। পটজুড়ে দেয়ালের ফাটল-সদৃশ বুনট দেখা গেলেও ন্যূনতমের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত এটি। এসিড প্রতিরোধী মিশ্রণের স্থানিকভাবে প্রয়োগ করার ফলে চুন আর বালি সহযোগে মূর্তিবৎ দৃশ্যজ প্রভাব যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে *দেয়াল* শীর্ষক উপর্যুক্ত ছবি দুটিতে বিমূর্ততায় উত্তরণের জন্য বিশেষ কোনো ফর্ম বা আকারের ব্যবহার শিল্পী করেননি। এখানে শিল্পী সর্বতোভাবে পরিচিত অবয়ব পরিত্যাগ করে নির্মাণ করেছেন তল। সিরিজের অন্য শিল্পকর্মগুলোর মতো এ দুটি ক্ষেত্রেও রং অনুচ্চকিত। *দেয়াল* যেন ভঙ্গুর রেখা, বুনট আর সাংঘর্ষিক রঙে বিক্ষত সমাজের অন্তর্লীন ক্ষোভের মূর্ত প্রকাশ। মুর্তজা বশীর যখন যে মাধ্যম ও আঙ্গিকে কাজ করেছেন, তার পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার জন্য সর্বাত্মক নিয়োজিত করেছেন নিজেকে। ছাপাই মাধ্যমের নিরীক্ষায়ও তাঁর বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। প্যারিসে এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক হয়েছিল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষের দিকে (নভেম্বরে) বিপদ আসন্ন জেনে সপরিবারে তিনি প্যারিসে চলে যান। এই প্যারিস পর্বে (১৯৭১-১৯৭৩) আকাদেমি গোয়েৎস্-এ ছাপাই মাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছিলেন।[৫৫৯] এ সময় অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সাথে এচিং অ্যাকোয়াটিন্টেও বেশ কিছু ছাপচিত্র রচনা করেছিলেন তিনি। শিল্পী জীবনের শুরু থেকে আশির দশক পর্যন্ত বিরতি দিয়ে বিভিন্ন সময়

---

[৫৫৯] ঢালী আল মামুন, 'চ. মুর্তজা বশীর', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ ৩৭০

ছাপচিত্র নির্মাণ করলেও প্যারিসে অতিবাহিত করা এ সময়টাই ছাপছবির ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি পর্যায়। প্যারিসে থাকার সময় মুক্তিযুদ্ধের নাম না জানা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে তেলরঙে আঁকা শুরু করেন বিখ্যাত *এপিটাফ সিরিজ* (১৯৭৩-১৯৭৭)।[৫৬০] কুড়ানো নুড়ি পাথরের আকৃতি ও খণ্ডিত পাথরের রং ও আকারের অনুকরণে এ সিরিজের রং ও আকার বিন্যস্ত করেছেন।[৫৬১] তবে বিষয় বাস্তবোৎসারিত হলেও তার বিন্যাস, নির্মাণের আঙ্গিক ও উপলব্ধিগত দিক থেকে তা বিমূর্ততাপন্থী। সাদা চিত্রতলে বিভিন্ন রকমের ভাসমান আকৃতির সাথে নরম মোলায়েম রঙের ব্যবহারে শহীদদের আত্মদানকে ভাস্মর করার চেষ্টা করেছেন। এক-একটা আকৃতি এখানে এক-একটা মুক্ত আত্মার প্রতীক। এপিটাফ সিরিজের দুটি কাজ ছাপাই মাধ্যমেও করেছিলেন সে সময়।[৫৬২] উপর্যুক্ত দেয়াল এবং এই এপিটাফের সাথে সাযুজ্যধর্মী সমসাময়িক সময়ে করা তাঁর *ইমেজ* (১৯৭১-১৯৭৩) শীর্ষক ছাপচিত্রগুলো। এখানেও বিভিন্ন ধরনের আকৃতির সহযোগে চিত্রতলকে বিমূর্ত করে তুলেছেন। জ্যামিতিক আকার-আকৃতির ব্যবহার যেমন করেছেন, তেমনি চেনা-অচেনা বিভিন্ন ধরনের জৈব-অজৈব আকৃতির ব্যবহারও স্পষ্ট। সেই সাথে রং, রেখা আর বুনট তৈরির দক্ষতা এতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এ পর্বের কাজে রয়েছে যেমন রেখার বৈচিত্র্য, তেমনি বুনট তৈরির মুনশিয়ানাও, যা তাঁর করণকৌশলগত দক্ষতার প্রতি আমাদের মনোযোগকে আকৃষ্ট করে। এচিং এবং অ্যাকোয়াটিন্টের সাথে রেখা আর বুনট নির্মাণের জন্য কখনো কখনো ড্রাইপয়েন্ট, বুরিন এবং কার্বোরেন্ডামও ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে। অ্যাকোয়া ডাস্ট (aqua-dust) ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সনাতন বাক্স পদ্ধতি এড়িয়ে হাতে রেজিন দানা ফেলে তৈরি করেছেন বিভিন্ন আয়তনের অ্যাকোয়ার বুনট। কোথাও আবার ধাপে ধাপে উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে তৈরি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন গভীরতার আকৃতি। উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে ছাঁচ নির্মাণ করে তা থেকে ছাপ নিয়েছেন রংহীনভাবে। ফলে সাদা পরিসরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে উত্তল শুভ্র নানা আকার-আকৃতির। এখানে জাগতিক বিষয়-আশয়ের বাইরে বেরিয়ে সৃষ্টির মহাজাগতিক রহস্যময়তাই যেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর উপলব্ধিতে। রঙের ব্যবহার এখানেও অনুচ্চকিত।

এ সময় কিছু রেখানির্ভর অবয়বী ছাপচিত্রও রচনা করেছেন তিনি। *বসে থাকা নগ্নিকা* (১৯৭৩), *পাখির সাথে নগ্নিকা* (১৯৭৩), *ফুল হাতে বালিকা* (১৯৭৩), *আত্ম প্রতিকৃতি* (১৯৭৩), *জুঁই* (১৯৭৩)

---

[৫৬০] মুর্তজা বশীর, ‘চিত্র পরিকল্পনা’, *ইত্তেফাক সাময়িকী* (দৈনিক ইত্তেফাকের শুক্রবারের ক্রোড়পত্র), ২৯-০৭-২০১৬, পৃ ২১; এপিটাফ প্রকৃতপক্ষে কখন শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন এই তথ্যসূত্রে তিনি দাবি করেছেন ১৯৭৩ সালে এপিটাফ শুরু, আবার *আমার জীবন ও অন্যান্য* বইয়ে এই সময়কাল ১৯৭১ বলে উল্লেখ করেছেন। (মুর্তজা বশীর, ‘ দোষ-স্বীকারপত্র’, দ্র. *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ ৩০৬) যেহেতু সব জায়গায়ই ১৯৭২ সালে দেয়াল শেষ করেছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন সেহেতু ১৯৭৩ সাল থেকে এপিটাফের শুরু ধরে নেয়া হলো। যদিও একই সঙ্গে দুটো সিরিজও চলতে পারে পাশাপাশি।

[৫৬১] আবুল মনসুর, ‘মুর্তজা বশীর’, দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ ৬১

[৫৬২] হাসনাত আব্দুল হাই, ‘ছাপচিত্রে মুর্তজা বশীর’, বাংলাদেশ প্রতিদিন, http://www.bd-pratidin.com/various/2015/08/21/101256 , প্রেক্ষিত ২৬-০৭-২০১৬ খ্রি.

ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। এ দেশে জয়নুল প্রবর্তিত শিল্পশিক্ষার একাডেমিক রীতির প্রতি ভীষণ অনাগ্রহী হলেও রেখাঙ্কনের চমৎকার দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন এখান থেকেই। ফ্লোরেন্স তাঁর দক্ষতাকে আরও শানিত করেছে। সে দক্ষতা এ পর্বেও অক্ষুণ্ন থেকেছে। ছাপচিত্রের মতো মাধ্যম, যেখানে ভুল হওয়ার নিয়ত সম্ভাবনা থাকে, সেখানে এমন বৈশিষ্ট্যসূচক নিরবচ্ছিন্ন ছন্দোময় রেখা নিঃসন্দেহে তাঁর দক্ষতারই পরিচায়ক। এ সময়ের অবয়বী ছবিগুলোতে নারী বিষয়বস্তু হয়েছে কয়েকটিতেই। তাঁর অন্যান্য ছবির নারীচরিত্রের মতো এই নারীচরিত্ররাও মাঝবয়সী এবং কিছুটা স্থূল। জীবনের বিভিন্ন সময়ে মুর্তজা বশীরের ছবিতে নারী এসেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। একধরনের জৈবিক তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন ভিন্নভাবে এঁকেছেন নারীদের।[৫৬৩] কখনো সাধারণ, বীভৎস, সুন্দর, আবার কখনো তা জ্যামিতিক কাঠামোয় আবদ্ধ। সরল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাধারণ রেখায় এঁকেছেন *পাখির সাথে নগ্নিকা*। *ফুল হাতে বালিকা* এঁকেছেন জ্যামিতিক রেখায় ছদ্ম কিউবিক ধাঁচে। এতে আলোছায়া বা কোনো ধরনের ভলিউম যোগ না করলেও তা কিছুটা করার চেষ্টা লক্ষণীয় *আত্ম প্রতিকৃতি* ও *বসে থাকা নগ্নিকা*তে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের দেশে ফেরার পর ছাপাই মাধ্যমে পূর্বোক্ত দেয়ালের মতো *এপিটাফ* (১৯৭৯) সিরিজের আরও কয়েকটি এবং *ছাপ* (১৯৮০) ও *তিন আকৃতি* (১৯৭৯) শিরোনামে সমধর্মীকিছু ছাপচিত্র রচনা করেন এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে। *এপিটাফ* দুটি এবং *ছাপ*-২ (১৯৮০) এর মধ্যে আকৃতিগত সাযুজ্য রয়েছে। আবার *ছাপ*-১ (১৯৮০)-এর সাথে *তিন আকৃতির* (১৯৭৯) সামঞ্জস্য রয়েছে। এ ছবিগুলোর তল নির্মাণের জন্য কোথাও শিল্পী এচিং অ্যাকোয়াটিন্টের প্রথাবদ্ধ রীতিতে গড়েছেন আকার, আবার কোথাও উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। কখনো বা দুই পদ্ধতিরই সমন্বয় করেছেন সার্থকভাবে। যেমন *ছাপ*-৩ (১৯৮০)। এতে এচিংয়ের রেখার সাথে অ্যাকোয়াটিন্টের বুনট দ্বারা জমিনের নিম্নাংশ আবার উন্মুক্ত তক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট আকারের উপরিতলে ক্রম বিলীয়মান রঙের সংযোগে গড়েছেন ঊর্দ্ধাংশ। তেলরঙে অঙ্কিত এপিটাফ সিরিজের মতো নুড়ির আকৃতি-সদৃশ আকার, রং, রেখা আর বুনট সহযোগেই সৃষ্ট এ সকল শিল্পকর্ম। সকল ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার নমিত। এ সময় জ্যামিতিক সরলতায় এঁকেছেন *পাখিসহ বালিকা* (১৯৭৯)। বিক্ষুব্ধ বুনটযুক্ত দ্বিমাত্রিক তলে পার্শ্বীয়ভাবে পাখি হাতে একজন নারীমূর্তির উপস্থাপন করেছেন এতে (চিত্র ৮৪)। পাখি এবং সমগ্র নারী অবয়বের গঠনে নকশাধর্মিতা লক্ষণীয়। অবয়বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে অতিরঞ্জিত, জ্যামিতিক এবং প্রকাশধর্মী করে তুলেছেন। বিষয়ের হুবহু উপস্থাপনের পরিবর্তে, তার রূপকে প্রতিষ্ঠা করাই যেন লক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে।

---

[৫৬৩] চিত্রবাক গৃহীত মুর্তজা বশীরের সাক্ষাৎকার, 'শিল্পী মুর্তজা বশীর ও বাংলাদেশের রমণী', *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৯৭৪, পৃ ৩২

নানামুখী নিরীক্ষাপ্রবণতার কারণে কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তে বা আঙ্গিক ও বিষয়ে মুর্তজা বশীর আবদ্ধ থাকেননি কখনো। শিল্প নির্মাণে নিয়ত ভাঙা-গড়ার খেলা খেলেছেন। মূর্ত, অর্ধ-বিমূর্ত হয়ে বিশুদ্ধ বিমূর্ততায়ও ছিলেন সতত সঞ্চরমাণ। সরলতা, স্বচ্ছতা, রোমান্টিকতা ও আধুনিকতা তাঁর শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। তবে শুরুতে মুর্তজা বশীরের ছাপাই ছবিতে যে সাম্যবাদী বিষয়লগ্নতা আভাসিত হয়ে উঠেছিল শেষপর্যন্ত তা আর অটুট থাকেনি। ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির জটিল প্রকাশক্ষেত্র। যদিও সমকালও তাতে প্রভাববিস্তারী ছিল। বস্তুত খানিকটা অস্থির এবং অন্তর্লীন জগতে নিঃসঙ্গ বসবাসকারী বলেই হয়তো তাঁর ছবি যাপিত জীবনের দিনপঞ্জি হয়ে উঠেছে। তবে শুরুর বাস্তববাদিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সাথে থেকেছে বিমূর্ত বাস্তববাদ নামে।

পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী নিতুন কুন্ডুও ছাপাই মাধ্যমে কিছুটা অবদান রেখছেন। চিত্রকলা চর্চায় পঞ্চাশের শেষ নাগাদ খ্যাতিলাভ করলেও ছাপচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ষাটের দশক থেকে। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সংবেদনশীল ভাস্কর ও চিত্রকর হিসেবে পরিচিত হলেও সেরিগ্রাফ, কাঠ খোদাই, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে ছাপচিত্রও করেছেন কিছু। বিশেষ করে, ষাটের দশকে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস বা ইউসিসে করা প্রদর্শনীর সেরিগ্রাফগুলো রসিকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁকে এ মাধ্যমের একজন অগ্রগামী শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর *সাঁকো* (১৯৬৩) (চিত্র ৮৫), *স্ফটিক* (১৯৬৪) ইত্যাদি ছবির কথা। রঙেরই ছবি এসব। লাল, খয়েরি, হলুদ, নীল, কালো ইত্যাদি রঙে স্তরের পর স্তর নির্মাণ করে প্রকাশ করেছেন বিষয়ের। সেরিগ্রাফির মতো অস্বচ্ছ মাধ্যমেও কোথাও কোথাও রঙের ব্যবহারে স্বচ্ছতার দরুণ নতুন রঙের সৃষ্টি হয়েছে যা তাঁর মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতার কথাই মনে করিয়ে দেয় আমাদের। ছাপাই ছবিতেও তাঁর চিত্রকলার মতো বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী ধারার প্রভাব বর্তমান। ছাপচিত্রে রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চিত্রকলার মতো একই রকম রোমাঞ্চকর ও গভীরতা দৃশ্যমান। অটবি প্রতিষ্ঠা এবং নানাবিধ ব্যস্ততায় দীর্ঘ বিরতির পর আবার শেষের দিকে কিছু ছাপচিত্র করেছেন। শেষের দিকে এসে নিজে প্রেসও বানিয়েছিলেন।[৫৬৪]

ষাটের দশকে চর্চিত বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ তাঁর শিল্পে আশির দশকে এসে জ্যামিতিক আকারে রূপান্তরিত হয়ে আরও পরিণত হয়েছে। রেখা-রঙের সম্মিলনে বিমূর্তপ্রকাশবাদিতা যেন নবরূপ লাভ করেছে এ সময়। এ পর্বে তিনি রং ব্যবহরের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের এলোমেলো ছোপযুক্ত নকশাময় তল গড়েছেন।[৫৬৫] আকৃতি, রেখা ও রঙের বিন্যাসে তিনি স্বপ্ন, উৎসব এবং আবেগের তাৎপর্য ও গভীরতাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন চিত্রকলায়। তাঁর শিল্পের গঠনশৈলী, জ্যামিতিক আকৃতির ঠাস

---

[৫৬৪] সমরজিৎ রায় চৌধুরী, 'আমাদের নিতুনদা', দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুন্ডু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, নিতুন কুন্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭, পৃ ১৬০

[৫৬৫] Syed Ali Ahsan, 'Art in Bangladesh : A short note', *Shilpakala*, Vol. 3, 1980, p. 2

বুনুনি, রঙের কোমলতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিজের আবেগের সবিশেষ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চিত্রকলায় চর্চিত এই ধারার প্রকাশ দেখা যায় কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা তাঁর *শিরোনামহীন* (২০০৬) শীর্ষক ছবি দুটিতে (চিত্র ৮৬)। ছাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার ফলে রঙের পরিপক্বতা এবং পেলবতা হয়েছে মনোমুগ্ধকর। আলোছায়ার একই ধরনের কোমল বিন্যাস দেখা যায় তাঁর এচিং অ্যাকোয়াটিন্টে করা *শিরোনামহীন* (২০০৬) ছবিটিতেও। সাদা-কালো এ ছবিটির কৃৎকৌশলও মুগ্ধ করে দর্শকদের। ছাত্রজীবন থেকে আমৃত্যু নিতুন কুন্ডুর নিয়ত বসবাস ছিল শিল্পের সাথে। শিল্পের সে যাত্রায় তিনি ছিলেন আপসহীন, নিখুঁত।

নিতুন কুন্ডু ছাড়াও পঞ্চাশের দশকের হামিদুর রাহমান, আমিনুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী, কাইয়ুম চৌধুরী, শামসুল কাদের (?) প্রমুখ শিল্পীও ছাপচিত্র মাধ্যমে কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তবে পঞ্চাশের দশকে একমাত্র সফিউদ্দিন আহমেদ ছাড়া আর কেউই ছাপচিত্র মাধ্যমে দীর্ঘদিন নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি। অন্যরা অনিয়মিত হলেও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যে স্বল্প সময়টুকু ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাতেই বাংলাদেশের ছাপচিত্রের প্রাথমিক পর্ব বেশ সমৃদ্ধই হয়েছে বলতে হবে।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' পরিবর্তিত হয়ে এটি 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' নামে পরিপূর্ণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এ সময় থেকে যে সাতটি পৃথক বিভাগ চালু হয়, ছাপচিত্র সেগুলোর একটি।[৫৬৬] পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকেই তত্ত্বীয় বিষয়ও আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয় পাঠ্যক্রমে। তখন পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে চালু হয় স্নাতক ডিগ্রি। প্রথম দুই বছর প্রি-ডিগ্রি এবং পরবর্তী তিন বছর বিএফএ ডিগ্রি।[৫৬৭] প্রি-ডিগ্রির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উডকাট এবং বিএফএ শ্রেণিতে লিথোগ্রাফি চর্চা নির্দিষ্ট করা হয়। এ সময় (১৯৬৭) সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসেবে একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'আর্ট' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার বর্ণনা নিম্নরূপ–

> The old lithograph press currently in use was received as government grant in 1967. After the education reform movement against Ayub khan in 1962 his military government tried to appease eduction institutions and students by handing out gifts to all institutes. The lithograph press was received as a past of

---

[৫৬৬] মূলত ছাপচিত্র বিভাগ পৃথক করার সিদ্ধান্ত এসময় গৃহীত হলেও এটা কার্যকর হয় ১৯৭৭ সালে ছাত্রছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে

[৫৬৭] ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস অনুযায়ী

> this. Many lithography stones were received through the co-operation of the Asia Foundation.[৫৬৮]

লিথোগ্রাফি প্রেসের পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ সংগৃহীত এচিং ছাপার যন্ত্র নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এ সময় ছাপাই মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সফিউদ্দন আহমেদ বিলেত থেকে ফিরে আসেন। আবার ষাটের দশকের প্রথম দিকে (১৯৬২) মো. কিবরিয়া জাপান থেকে ছাপচিত্রে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে ছাপচিত্র বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশের ছাপাই ছবির এই দুই মহারথীর সম্মিলনে নতুন প্রাণস্পন্দন লাভ করে ছাপচিত্র বিভাগ। বিদেশের শিক্ষা যেমন তাঁদের সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তাঁরাও দেশে ফিরে তাঁদের অধীত ও লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে ছাত্রদের সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। সে সময় ছাপাই মাধ্যমে তাঁদের অভূতপূর্ব নিরীক্ষাসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং চিত্রানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। মূলত ছাপচিত্র বিভাগের দুজন প্রতিভাবান শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদ ও মো. কিবরিয়ার উপস্থিতিই ছাপচিত্রের প্রতি নবীন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি।

আবার এই ষাটের দশক ছাপচিত্রের করণকৌশলগত দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় (১৯৬৭) নতুন মাধ্যম হিসেবে ড্রাইপয়েন্টের যাত্রা শুরু হয়। (পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে চর্চিত হয়ে থাকলেও পাঠ্যক্রমের আওতায় এ সময় থেকেই প্রথম ড্রাইপয়েন্টের ব্যবহার শুরু হয়) আবার আলাদা আলাদা পাথর কিংবা কাঠ ব্যবহার করে বহুবর্ণিল লিথোগ্রাফ এবং উডকাটের প্রচলও শুরু হয় এ দশকেই। যদিও গবেষক রশীদ আমিন তাঁর *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* এর *ছাপচিত্র* শীর্ষক রচনায় এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি চিত্রক আয়োজিত *Eminent Printmakers of Bengal* শিরোনামের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় 'Pioneers of Printmaking in Bangladesh' শীর্ষক রচনায় এ দেশে আলাদা আলাদা কাঠ এবং রং ব্যবহার করে ছবি ছাপার পদ্ধতির প্রচলন ঘটানোর কৃতিত্ব শিল্পী রফিকুন নবীকে দিয়েছেন।[৫৬৯] যা সত্তরের দশক বলে অনুমিত হয়। কিন্তু ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকেই মো. হুসনে জামাল (আনুমানিক গত শতকের চল্লিশের দশকে জন্ম) আলাদা আলাদা কাঠ এবং রং ব্যবহার করে বেশ কিছু রঙিন কাঠ খোদাই করেছিলেন যার বেশ কয়েকটি এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপচিত্র বিভাগে সংরক্ষিত আছে। আবার মো. কিবরিয়া দেশে ফেরার অল্প কিছুকাল পর থেকেই ছাপচিত্র বিভাগে রঙিন লিথোগ্রাফ ছাপার চর্চা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে কে প্রথম (কাজ) করেছিলেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও ষাটের দশকে ছাপা বেশ কিছু রঙিন লিথোগ্রাফও ছাপচিত্র

---

[৫৬৮] Farhana Shifa, 'Print-making Department', *Art*, Vol. 4. No. 2. October-December. 1998, p. 24

[৫৬৯] রশিদ আমিন, 'ছাপচিত্র', দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ ১৬৪; Rashid Amin, 'Pioneers of Printmaking in Bangladesh', ২০১২ সালে গ্যালারি চিত্রক আয়োজিত *Eminent Printmakers of Bengal* শিরোনামের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় মুদ্রিত

বিভাগের সংগ্রহে আছে। যা নিশ্চিত করে যে, সত্তরের দশকে নয় বরং ষাটের দশক থেকেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বর্ণিল ছাপচিত্র রচিত হচ্ছিল। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাপচিত্র বলতে সাদা-কালো এবং একঘেয়ে যে অনুভূতি ছিল তা-ও অপসারিত হয়। বরং চিত্রকলার কাছাকাছি ফলাফল লাভের কল্যাণে ছাপচিত্র সম্পর্কে ছাত্রদের মনে বাড়তি আগ্রহের জন্ম হয়। এ ছাড়া ষাটের দশকের শেষ নাগাদ (১৯৬৭) পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে *ইউসিস* আয়োজিত বিখ্যাত মার্কিন ছাপচিত্রী মাইকেল পন্স ডিলিয়নের একটি ছাপচিত্র কর্মশালায় পূর্ব-পাকিস্তানি শিল্পীদের (মাহমুদুল হক ও আবুল বারক্ আল্‌ভী) অংশগ্রহণও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; যা এ মাধ্যমের প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরও আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়লেও ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারায় গতির সঞ্চার হয়েছিল স্বল্প। কারণ সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে ষাটের দশক খুব বেশি ফলদায়ক হয়নি নানামুখী আন্দোলন-সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠায়। এর প্রভাব ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারার ওপরেও কার্যকর ছিল নিঃসন্দেহে। তা ছাড়া বিবিধ প্রতিকূলতায় পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকজুড়ে সফিউদ্দিন আহমেদ এবং মো. কিবরিয়া ছাড়া আর কেউই নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাপচিত্র চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি। তবে এ সময়ে শিক্ষানবিশকালীন অনেকেই এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, যা মাধ্যমটির উত্তরণে গুরুত্ববাহী হয়েছে। আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁদের অনেকেই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও মাধ্যমের করণকৌশলগত উত্তরণে তাঁদের এই নিরলস শ্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

শিল্পী মো. হুসনে জামাল এই স্বল্পসংখ্যক কৃতী শিক্ষার্থীদের অন্যতম। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ করেন। সে সময় কাঠ খোদাই মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তিনি। মো. হুসনে জামাল ছাত্রাবস্থায়ই এ দেশে কাঠ খোদাই মাধ্যমে রঙিন ছাপচিত্র নির্মাণ পদ্ধতির অবতারণা করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি (তখন পর্যন্ত) সবচেয়ে বড় (৪৯ x ৯৮ সে. মি.) আকারের কাঠ খোদাই চিত্রটি সম্পন্ন করেন। এ দেশের ছাপাই ছবির ইতিহাসে বিষয়টি তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। *মা ও শিশু* (১৯৬৭), *মহিলার প্রতিকৃতি* (?), *শীতের আলো* (১৯৬৫?) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। *মা ও শিশু* (চিত্র ৮৭) চিত্রকর্মটিতে শিশুকে স্তন্যদানরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে মাকে। নরুণ চালনার বৈচিত্র্য এতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। হলুদ, নীল ও কালো রঙের ব্যবহারে বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন তিনি। এলোমেলো রেখা আর ছোপ ছোপ রঙের ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়। মা ও শিশুর শরীরে আলোর স্বল্প উপস্থিতি থাকলেও আলোছায়ার ব্যাকরণভিত্তিক উপস্থাপন স্পষ্ট নয়। রেখা ও রঙের একই রকমের বিন্যাস লক্ষ করা যায় *মহিলার প্রতিকৃতি* শীর্ষক ছাপছবিতেও। আর *শীতের আলো* শীর্ষক দৃশ্য চিত্রটিতে শহরের রাজপথের চিত্রায়ণ লক্ষ করা যায়। দুই পাশে বড় বড় গাছের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় রিকশা, ঠেলাগাড়ি এবং পথচারীদের রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ভূ-দৃশ্যের উপকরণসমূহ খুব বেশি পৃথক করতে না পারলেও রঙিন

দৃশ্যচিত্র নির্মাণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে তা প্রশংসার দাবিদার নিঃসন্দেহে। মো. হুসনে জামালের চিত্রসমূহে বিষয়ের সাদৃশ্যধর্মী উপস্থাপন লক্ষণীয়। এ ছাড়া রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং নরুণের এলোমেলো চালনায় সৃষ্ট কাটাকুটির সমারোহ শিল্পী মো. হুসনে জামালের ওপর প্রতিচ্ছায়াবাদীদের স্পষ্ট প্রভাবের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

রঞ্জিত নিয়োগী (?) ষাটের দশকের আরেকজন কৃতী শিক্ষার্থী। তিনি ষাটের দশকের শুরুতেই ভর্তি হয়েছিলেন শিল্প বিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থায় লিথোগ্রাফিতে তিনি উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক শিল্প নির্মাণ করেছেন। *দরজার ভেতর দিয়ে* (১৯৬২), *সেতু ও নৌকা* (১৯৬২), *শেরপুর শহরের একটি রাস্তা* (১৯৬৩), *গাছের নিচে নৌকা* (১৯৬৩), *পূর্ব পাকিস্তানে ফসল তোলা* (১৯৬৩) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য লিথোচিত্র। *দরজার ভেতর দিয়ে* এবং *সেতু ও নৌকা* ছবি দুটি অনুশীলনধর্মী হলেও এতে তাঁর অঙ্কনদক্ষতা এবং আলোছায়া নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্ততা নজর কাড়তে সক্ষম। আর নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনও যে নদীকেন্দ্রিক, তা প্রস্ফুটিত হয়েছে *গাছের নিচে নৌকা* (চিত্র ৮৮) শিরোনামের ছবিটিতে। নদীর একেবারে কাছে বসতঘরের পেছনে একটি ছইযুক্ত নৌকা বাঁধা। পাশ দিয়ে আরও দুটো নৌকা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। এখানে চিত্রজমিন নির্মাণের জন্য কন্টির বিশেষ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট 'ছদ্ম কুঠুরি'গুলো উত্তর-প্রতিচ্ছায়াবাদী সেজানের চিত্রতলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ছদ্ম কুঠুরিগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে *শেরপুর শহরের একটি রাস্তা* এবং *পূর্ব পাকিস্তানে ফসল তোলা* চিত্র দুটিতে। বিশেষ করে শেষোক্ত ছবিটিতে মানুষ, গাছপালা, ফসলের ক্ষেত ও পশুর অবয়বে এতটাই সরলীকরণ করেছেন যা তাকে অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনধর্মী করে তুলেছে। এ চিত্রগুলো অনুশীলনধর্মী হলেও এতে নিরীক্ষার ছাপ স্পষ্ট, যা শিল্পী হিসেবে রঞ্জিত নিয়োগীর দক্ষতা ও সামর্থ্যের প্রমাণ তুলে ধরে।

নাসির বিশ্বাসও (১৯৩৮?) ষাটের দশকের কৃতী ছাত্র। তাঁর অঙ্কন-দক্ষতার কথা কিংবদন্তির মতো এখনো তাঁর সমসাময়িক অনেকের মুখে মুখে ফেরে। লিথো মাধ্যমে তাঁর করা কিছু শিল্পকর্মের নমুনা এখনো দৃশ্যমান। এর মধ্যে *রাস্তার নাপিত* (১৯৬৪), *নূরজাহান* (১৯৬৪-৬৬?) (চিত্র ৮৯) এবং *মায়ের কোলে শিশু* (১৯৬৬)। তিনটি ছবিই অনুশীলনধর্মী হলেও প্রথমোক্ত দুটিতে তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। ছবির পরিসর-বিন্যাস, রেখা, আলোছায়া, মডেলিং সবকিছুই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় এবং নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পীর দক্ষতা ও মাধ্যম ব্যবহারের মুনশিয়ানায় কাজগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন।

এ ছাড়া হাশেম খান, দেলোয়ার হুসেন (?), রহিত নন্দী (?), আশীষ সেনগুপ্ত (?), প্রফুল্ল রায় (?) প্রমুখ শিল্পী ছাপচিত্রে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন। কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনাময় এই শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার গণ্ডি পেরোনোর পরে অনেকেই নানা সীমাবদ্ধতায় আর ছাপাই মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেননি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষাটের দশক সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে খুব বেশি ফলদায়ক হয়নি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন দাঁনা বেঁধে ওঠায়। তবে ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন পর্যন্ত এ দেশের শিল্পী ও শিল্পকলা সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুনের সাথে ছাপচিত্রও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'বাংলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ছাপচিত্র ফোলিও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ দেশে বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুকাল পূর্বে চট্টগ্রামে (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে) শিল্পচর্চার নতুন একটি কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রের তরুণ শিল্পীরাও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে দেশের অন্য অংশের (ঢাকার) মতো সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বস্তুত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এ দেশের অধিকাংশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে এসেছে সবসময়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও সে ধারাবাহিকতার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। গৌরবের এ অর্জনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে চট্টগ্রামের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও একাত্ম হয়ে কাজ করেছিলেন।

১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করলেও, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পরদিন বিকেলে করণীয় নির্ধারণ করতে চট্টগ্রামের শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক স্বতঃস্ফূর্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্যিক আবুল ফজলের বাসভবন *সাহিত্য নিকেতনে*। আবুল ফজলের সভাপতিত্বে সে সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, ড. আনিসুজ্জামান, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ, ড. অনুপম সেন, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ডা. কামাল এ খান, চাকসুর জিএস আবদুর রব প্রমুখ। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙালি জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ সকল শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'শিল্পী–সাহিত্যিক–সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ'।[৫৭০] এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে স্বধীনতার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি। সে উদ্দেশ্যেই এবং কাজের সুবিধার্থে সংগীত, নাটক, শিল্পসহ বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এর মধ্যে মঞ্চসজ্জা ও শিল্প উপকমিটির দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী রশিদ চৌধুরী এবং ডা. কামাল এ খান। ৯ মার্চ থেকে সংগঠনের কাজ পুরোমাত্রায় শুরু হয়ে যায় চট্টেশ্বরীস্থ 'চট্টগ্রাম শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ'

---

[৫৭০] নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, 'অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১', দ্র. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, ২০১৩, পৃ ২৪৬

কার্যালয়ে। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক করা হয় ১৫ মার্চ লালদীঘির ময়দানে প্রথম জনসভার মাধ্যমে তৃণমূলে জনমত গঠনের। স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গঠন এবং একইসঙ্গে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লালদীঘির জনসভায় বিক্রির জন্য রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সংগ্রামমুখী ছবির একটি ফোলিও প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল শিল্প উপকমিটি। দৈনিক আজাদীর প্রকাশক আব্দুল মালেকের উদ্যোগে কোহিনুর আর্ট (ইলেকট্রিক) প্রেস থেকে ছেপে বেরিয়েছিল *বাংলায় বিদ্রোহ* শিরোনামের এই ফোলিও টি। এতে ছবি এঁকেছিলেন রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ্ উল আলম, আনসার আলী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং মিজানুর রহিম। দু-একজনবাদে রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ্ উল আলম, আনসার আলী সহ অধিকাংশ শিল্পীর প্লেটই তৈরি করা হয়েছিল রশিদ চৌধুরীর খুলশীস্থ ট্যাপেস্ট্রি কারখানায়। বাণিজ্যিক ছাপার দুনিয়ায় তত দিনে প্রায় অচল হয়ে আসা বলগ্রেইন্ড প্লেটের উপরে ছাপার কালি আর ক্রোকিল নিব দিয়ে সরাসরি এঁকে তাৎক্ষনিক ভাবে ছাপা হয়েছিল এগুলো। ৫০ x ৪০ সেমি. আয়তনের ফোলিওর মোড়কের গায়ে ডান দিকের নিচের কোনায় ছাপা মুখবন্ধটি লিখেছিলেন ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী। এই মুখবন্ধ থেকেও এটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খানিকটা ধারণা লাভ করা যায়। লেখাটি নিম্নরূপ–

> বাঙলায় আজ বিদ্রোহ। হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঃ বাঙলা যুগে যুগে বিদ্রোহ করেছে–অনাচার, অবিচার আর অনুশাসনের বিরুদ্ধে। জনগনের কল্যাণ কামনায়, জনমানসের মুক্তির জন্যে বাঙালীর সংগ্রাম বিরামহীন।
>
> আজকের বিদ্রোহ আমাদের আগামী দিনের বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষ আজ সার্বিক মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সে চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে, সে সংগ্রামে পূর্ণ। অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ দেশের শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবি সমাজ।
>
> চট্টগ্রামের ছ'জন বিশিষ্ট শিল্পী সক্রীয়ভাবে এই আন্দোলনের অভিযাত্রী। রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ্ উল আলম, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং আনসার আলী অঙ্কিত 'বাংলার বিদ্রোহ' শীর্ষক ছ'টি চিত্র সংগ্রামী জনমানসে নতুন অভিব্যক্তি সঞ্চার করবে বলে আশা করি।
>
> শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ, চট্টগ্রাম।

তবে মুদ্রণ জটিলতায় ১৫ মার্চ তা প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও পরবর্তী দু-এক দিনের মধ্যেই সাধারণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল দুই টাকা মূল্যমানের এই ফোলিওটি। 'শিল্পী–সাহিত্যিক–সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘে'র পরবর্তী সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে এটি প্রচুর পরিমানে বিক্রি ও আদৃতও হয়েছিল এর স্বল্পমূল্য এবং বিষয়বস্তুতে গণমুখী হওয়ার কারণে।

বাংলায় বিদ্রোহ শীর্ষক এই ছবিগুলোর প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্মেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের (যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ...) সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। শিল্পীদের রাজনীতি সচেতনতা ও

জীবনঘনিষ্ঠতার ফলে এ ফোলিওর প্রতিটি কাজ সমাজবাস্তবতা ও জীবনবোধ থেকে উৎসরিত এবং এ দেশের প্রকৃতি, মাটি, আলো-হাওয়ার নির্যাস থেকে গড়া। যদিও প্রেক্ষাপটটি পৃথক করলে এর শিল্পমূল্য নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারেন কেউ কেউ। তবে বৃহত্তর পরিসরে এগুলো নির্মাণের মাধ্যমগত কারিগরি দক্ষতা ও এর শিল্পমূল্য নিয়ে যত প্রশ্নই থাকুক না কেন এর ঐতিহাসিক গুরুত্বই একে কালোত্তীর্ণ করবে নিঃসন্দেহে। এই ছবিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর সহজবোধ্যতা এবং সমসাময়িকতা। আজ এত বছর পরও এতে সময়ের উত্তাপ উপলব্ধি করা যায় পুরোপুরি।

সত্তরের দশক এ দেশের ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের পুরোটা জুড়ে ছিল সফিউদ্দিন আহমেদ এবং মো. কিবরিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য। এর বাইরে তখন যারা ছাপচিত্র চর্চা করেছেন তার অধিকাংশই শখের বশে কিংবা ছাত্রাবস্থায়। এ অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন হয় সত্তরের দশকে। সফিউদ্দিন এবং কিবরিয়ার পর এই দশক থেকেই মূলত ছাপাই মাধ্যমের চর্চায় নিয়োজিত পরবর্তী প্রজন্মের দেখা পাওয়া যায়। তবে সত্তরের দশকের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। ঢাকার আর্ট কলেজ তখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো এ শিল্পশিক্ষালয়টিও পুনর্গঠিত হয়। এর নাম হয় 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহবিদ্যালয়'। দশকের শুরুতে চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (১৯৭০)[৫৭১] এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ (১৯৭৩) স্থাপিত হয়। এ সময় (আনুমানিক ১৯৭৫-৭৬) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে যুক্ত হয় একটি ছাপাই মেশিন, যা ঢাকার বাইরে ছাপচিত্র চর্চার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। আবার দশকের শেষের দিকে (১৯৭৮) রাজশাহীতে শিল্পবিদ্যালয় (রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়)[৫৭২] স্থাপনের ফলে সারা দেশে ছাপচিত্র চর্চার পরিধি আরও খানিকটা বৃদ্ধি পায়। এসব প্রতিষ্ঠানে শুরু থেকেই ছাপচিত্রকে চর্চার আওতায় আনা হয়। শুরুতে অন্যান্য মাধ্যমের সাথে এবং পরে স্বাধীনভাবে ছাপচিত্র চর্চিত হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। এ দেশে ছাপাই ছবির বিকাশে তারাও নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষত পুরো দশকজুড়ে দেশি এবং বিদেশি ছাপচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে এ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা। যেমন– ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম ড্রইং এবং ছাপচিত্র প্রদর্শনী, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরীয় ছাপাই ছবির প্রদর্শনী, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার সমকালীন ছাপচিত্র প্রদর্শনী এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের ছাপচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ ছাড়া ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে (?) ভারত থেকে

[৫৭১] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষার শুরু প্রসঙ্গে ড. হীরা সোবাহান তাঁর 'ছাপচিত্রকলা' শীর্ষক বইয়ে (ড. হীরা সোবাহান, *ছাপচিত্রকলা*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশন, ২০১৭, পৃ ১৩৭) লিখেছেন 'চট্টগ্রাম মূল শহর থেকে দূরে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলা অনুষদ অন্তর্ভুক্ত সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে 'চারুকলা' শিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা।' যা সঠিক নয়। ১৯৬৯ সালে বাংলা বিভাগের একটি তত্ত্বীয় বিষয় হিসেবে চারুকলা খোলা হয় এবং পরে ১৯৭০ সালে তা পূর্ণাঙ্গ বিভাগে পরিণত হয়।

[৫৭২] ১৯৭৮ খিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে

আনা একটি ছাপাই মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে ছাপচিত্র চর্চার একটি সুযোগও তারা তৈরি করে দিয়েছিল।[৫৭৩] আবার এই মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মনিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ছাপাই ছবির (এ দেশের প্রথম ছাপচিত্র কর্মশালা) এক কর্মশালা ও প্রদর্শনীরও আয়োজন কওে, যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের প্রতি তরুণদের আরও আগ্রহী করে তোলে। অন্যদিকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কাগজে-কলমে ছাপচিত্র বিভাগ হলেও তা বাস্তবায়ন হয় এই দশকের শেষের দিকে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছাপচিত্র মাধ্যমে স্বতন্ত্র বিএফএ ডিগ্রির সূচনা হয় পাঁচজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয় এবং এর মাধ্যমে ছাপচিত্র পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিভাগের স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৭৪] আবার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে চালু হয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রির।[৫৭৫] ছাপচিত্র মাধ্যমে বিএফএ ও স্নাতকোত্তোর ডিগ্রি চালুর ফলে তখন নিয়মিতভাবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে মাধ্যমটি চর্চিত হতে থাকে ছাত্রদের হাতে। ফলে পূর্বের তুলনায় বেশি সংখ্যক দক্ষ ছাপচিত্রী তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে পাঠ্যক্রমভুক্ত নতুন মাধ্যম হিসেবে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট চর্চিত হতে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে। (পূর্বে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চর্চিত হচ্ছিল) আবার পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পর বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিকসহ নানা ধরনের সম্পর্ক এ দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচন করে। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য আসে, আসে অনেক বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তির সুবিধাও, যা ছাপচিত্র মাধ্যমের সার্বিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্ববাহী হয়।

সত্তরের দশকের শিল্পীদের মধ্যে ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন শিল্পী মনিরুল ইসলাম। এ দেশের যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পী নিরন্তর সাধনা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিশ্বশিল্পের বৃহৎ পরিসরে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় উপনীত করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করেন ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে। শুরু থেকেই জলরং চিত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিচ্ছায়াবাদী আঙ্গিকে যাযাবর জীবন, নিসর্গ এবং গ্রামীণজীবনের আন্তঃসৌন্দর্যকে চিত্রতলে বিধৃত করে শিল্পপিপাসুদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ছাত্রাবস্থায় অন্য সবার মতো ছাপচিত্রে তাঁরও হাতেখড়ি হয়েছিল পাঠ্যক্রমের বাধ্যবাধকতায়। তবে পুরোদস্তুর ছাপচিত্রী হয়ে ওঠেন ষাটের শেষ লগ্নে স্পেন প্রবাসী হওয়ার পর। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেন সরকারের বৃত্তির আওতায় নয় মাসের একটি শিক্ষা কার্যক্রমে তিনি ফ্রেস্কো (fresco) শেখার জন্য স্পেনের মদ্রিদে যান। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করার পর ছাপচিত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন ও একপ্রকার নিজের চেষ্টায়

---

[৫৭৩] উপহার হিসেবে ভারত সরকার দান করেছিল না কিনে আনা হয়েছিল সে ব্যাপারটি নিশ্চিত নয়। এটি কখন এ দেশে আনা হয়েছিল সে ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ১৯৭৮ সালকে প্রাসঙ্গিক ধরা হলো

[৫৭৪] Farhana Shifa, ‘Print-making Department’, *Art*, Vol. 4. No. 2. October-December. 1998, p. 24

[৫৭৫] ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত তথ্য। বিএফএ এবং এমএফএ দুটি ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে

স্টুডিওভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে ছাপাই মাধ্যমের করণকৌশল আয়ত্ত করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি–

> শিল্প ও শিল্পীর শহর মাদ্রিদে সেই সময়ের তরুণ শিল্পী মনিরের জীবনসংগ্রাম ও নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাধনা সিনেমার নায়কের চেয়েও কম কিছু নয়। তিনি ১৯৭৩-৭৬ পর্যন্ত মাদ্রিদের একটি স্টুডিওতে ছাপচিত্রীদের কারিগরি সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। শিল্পীদের রং তৈরি ও মিশ্রণ; এচিং, ড্রাইপয়েন্ট, মেজোটিন্ট ইত্যাদি মাধ্যমের উপযোগী বিভিন্ন ধাতব পাতে রং প্রয়োগ এবং ছাপাই মেশিনের মাধ্যমে ধাতব পাত থেকে কাগজে চূড়ান্ত চিত্র প্রস্তুত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। শিল্পীদের কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থকড়ি দিয়েই চলত তাঁর জীবন ও জীবিকা। সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য নিয়ে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন নিজের সৃষ্টির জন্য, শিল্পের জন্য। প্রায়শ রাতে ছোট্ট ডেরায় ফিরে নিজের শিল্পের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন নিঃসঙ্গ এই শিল্পী। শিল্পের জন্য তাঁর প্রবল আবেগ, ধ্যান ও শ্রম বিফলে যায়নি।[৫৭৬]

পরবর্তীতে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে তিনি এচিং মাধ্যমে এমন দক্ষতা অর্জন করেছেন যা তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এরপর নানা ঘটনাপ্রবাহে ছাপচিত্র মাধ্যমের চর্চাই করেন নিয়মিত এবং স্থায়ীভাবে বাস করা শুরু করেন স্পেনে। একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর যাত্রা ষাটের দশকে শুরু হলেও ছাপচিত্রী হিসেবে তাঁর পথ চলার শুরু সত্তরের দশকের একেবারে শুরু থেকেই। তখন থেকেই মেধা-মনন আর নিরলস পরিশ্রমে আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজের অবস্থান সুসংহত করেছেন। প্রথম দিকে ড্রাইপয়েন্ট, লিথোগ্রাফ, এচিং, মেজোটিন্ট মাধ্যমে ছাপচিত্র নির্মাণ শুরু করলেও ছাপচিত্রের অপরাপর মাধ্যমের তুলনায় এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে নিজের শিল্পকৃতির গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রেখেছেন।

ছাত্রজীবন থেকে বাস্তবধর্মী রীতির প্রতি আগ্রহী হলেও স্পেন প্রবাসী হওয়ার পর থেকে বাস্তববাদিতা আর অর্ধ-বিমূর্ত আঙ্গিকের টানাপড়েন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রতলে। কিছুটা পরাবাস্তবাদিতা ও ঘনকবাদী প্রভাবও দৃশ্যমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে। *ফরাজী* (১৯৭০), *ন্যাচারাল লাভ* (১৯৭১), *ক্রিয়েশন অব অ্যা নেশন* (১৯৭১), *হোমেজ টু বাংলাদেশ এ ও বি* (১৯৭১), *দ্য বিগ ট্রাপ* (১৯৭১), *দ্য সিটি-১* (১৯৭৪), *হারমনি* (১৯৭৫), *দ্য ফ্লাইং আইস* (১৯৭৬), *বিগিনিং অব দ্য নেশন* (১৯৭৮) ইত্যাদি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ। *ফরাজী*তে (চিত্র ৯০) দৃশ্যপটের সম্মুখে চারুকলার মডেল ফরাজীকে বেহালা হাতে উপস্থাপন করেছেন অনেকটাই স্টুডিওভিত্তিক মডেলের ভঙ্গিতে। অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃশ্যপটের মাঝে মাঝে আলোর পর্দায় পলায়নপর নারী চরিত্র, ছইযুক্ত গরুর গাড়ি, আলোর উৎসমুখে হেঁটে যাওয়া বৃদ্ধসহ নানা অচেনা রূপবন্ধেরও সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মাধ্যম মেজোটিন্ট হওয়ায় আলো-আঁধারির নাটকটাও জমে উঠেছে চমৎকার। *ন্যাচারাল লাভ*-এ নানামাত্রিক ভালোবাসার উপাখ্যান বর্ণনা

---

[৫৭৬] এস এম সাইফুল ইসলাম, 'মনিরের চিত্রশিল্প রং ও রেখার মরমি কবিতা', শিল্প ও শিল্পী', http://www.shilpaoshilpi.com/মনিরের-চিত্রশিল্প-রং-ও-রে/ প্রেক্ষিত ১০-০২-২০১৭ খ্রি.

করেছেন। যেমন: মায়ের চিরন্তন ভালোবাসা সন্তানের প্রতি, শিশুদের ভালোবাসা খেলার প্রতি, পাঠকের গ্রন্থের প্রতি এবং সংগীতজ্ঞের ভালোবাসা তাঁর সুরযন্ত্রের প্রতি। সম্পর্কের এই বহুমাত্রিক বন্ধনকে তিনি একই চিত্রতলে বেঁধেছেন খানিকটা পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে আলো-আঁধারির জাদুতে। পরাবাস্তববাদী আবেগে বাংলাদেশের জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন *ক্রিয়েশন অব অ্যা নেশন* ছাপাই ছবিতে। জান্তব বৈশিষ্ট্যের কিছু চরিত্রের সাথে ফুল, পতাকা, কঙ্কাল ইত্যাদি সহযোগে কুরুক্ষেত্রের মতো ভয়ংকর এক যুদ্ধক্ষেত্র তিনি নির্মাণ করেছেন এতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থান স্পেনে হলেও জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ, ভালোবাসা আর শত্রুর প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণায় নির্মাণ সার্থক রূপ লাভ করেছে। এ ছাড়া *হোমেজ টু বাংলাদেশ-এ* ও *হোমেজ টু বাংলাদেশ-বি* শীর্ষক ছবিতেও মহান মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানি হয়েনাদের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা ও প্রিয় স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গতিশীল ছন্দোবদ্ধ রেখায় কয়েক জোড়া ক্রন্দনরত চোখের উপস্থাপন *দ্য ফ্লাইং আইস*। বেদনা নির্দেশক কালচে সবুজের সাথে সামান্য লালের উপস্থাপনে ছবির যথাযথ অর্ধবোধকতা তৈরি করেছে। বেদনার্ত চোখগুলো যেন প্রতিবাদ করছে যুদ্ধ ধ্বংস অথবা মৃত্যুর। *বিগিনিং অব দ্য নেশন*-এ কয়েকটি স্তরে বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন তিনি। সামনের স্তরে কয়েকজন ভয়ার্ত নারীর ছায়াবৎ মূর্তি। দ্বিতীয় স্তরে পটুয়াদের আদলে গড়া অথবা যামিনী রায়ের আঙ্গিকের মতো আঁকা মা ও শিশুর ছবি। একই তলে দণ্ডায়মান দুটি পুরুষ চরিত্রের অভিব্যক্তিতে কিছুটা অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। এই দুটি চরিত্রের সাথে পশ্চাতে দণ্ডায়মান তিনটি ছায়াবৎ চরিত্রের গঠনের মধ্যে লোকজ সরলতার সাথে খানিকটা ঘনকবাদী বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। সমগ্র ছবিতে দ্বিমাত্রিক আবহ এবং আলোছায়ার বিন্যাস না থাকলেও পেছনের তিনটি চরিত্রের ছায়া পড়েছে তলে। সমগ্র ছবিটিতে অতীত সুখ-সমৃদ্ধির বিপরীতে গা ছমছমে শূন্যতার আবহও যেন বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের এসব ছবি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> Monirul Islam’s etchings include the dark period around the Liberation War, which bear shades of sepia, black and white, and they capture the moment in time of the turbulent period of 1971, … These aquatints and mezzotints often bear no titles and visitors are left to imagine what they will from these semi-abstract creations. Exotic flowers, ethereal birds, crescent moon, clumps of bare trees, segments of pathways, women’s derrieres mingling with tree trunks are found in these surreal symbolic pieces. Many forms in these prints are erotic in their origin like the woods and the ptuous female forms.[৫৭৭]

---

[৫৭৭] Fayza Haque, ‘A Pageant of Unforgettable Prints’, *The Star* (a weekly publication of daily star), vol 13, issue 606, Dhaka, 2 january, 2009, p. 82

চিত্রতলে দিগন্তের হালকা আভাস দিয়ে বিশাল পরিসর নির্মাণ করেছেন *দ্য বিগ ট্রাপ* ছবিটিতে। উপকরণ ব্যবহারের বাহুল্য বর্জন করে গতিশীল মানব অবয়ব ও কয়েকটি আয়তাকার গড়নের সাথে রেখা ও রঙের ছান্দিক ব্যবহারে নির্মাণ করেছেন ছবিটি। জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর বিশেষ অবস্থান ছবিতে ত্রিমাত্রিক পরিসর সৃষ্টি করেছে। মাথায় মাথাল আর কোমরে ঝুড়ি নিয়ে সার বেঁধে চলা বঙ্গ ললনাদের গতির ছন্দোময় উপস্থাপন *হারমনি*। বিশাল আকাশের নিচে নারীদেহের সচল অভিব্যক্তি একধরনের চলমান ঐকতান সৃষ্টি করেছে। আবার আলোছায়ার চমৎকার সমন্বয়ের সাথে পরাবাস্তববাদী কল্পনার সার্থক মিশেলে সৃষ্টি করেছেন *দ্য সিটি-১* ছাপচিত্রটি। ঝোপ-জঙ্গল আর অন্ধকার সুড়ঙ্গযুক্ত একটি পরিত্যক্ত শহরের ইঁদুর-রাজত্বের অসাধারণ বিন্যাস এই চিত্রটি। রূপ ও রূপবন্ধের যথাযথ ব্যবহার এবং উপকরণ নির্মিতিতে শিল্পীর অনুপুঙ্খতা মনোযোগ আকর্ষণ করে। (একই ছাঁচ ব্যবহার করে আশির দশকে ছেপেছেন *দ্য সিটি উইথ হার্টস অ্যান্ড র‍্যাটস* (১৯৮০)। প্রথমটি সাদাকালোর সাথে সামান্য লালের উদ্ভাসে আর পরেরটা বর্ণিল এবং বেশ কিছু হৃদয়-চিহ্নযুক্ত) এগুলো ছাড়া *লাভ* (১৯৭৫), *দ্য পোয়েট* (১৯৭৬), *লুসিয়া* (১৯৭৭), *ওয়ার্ডস* (১৯৭৮), *মিনিয়েচার ১-৫* (১৯৭৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম।

প্রথম দিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সাথে মূর্ত আর অর্ধ-বিমূর্তের এই দোলাচল কাটিয়ে খুব দ্রুতই তিনি প্রবেশ করেন বিমূর্ততায়, নিজস্ব অনুভূতির দৃশ্যজ রূপ উন্মোচনে। রঙে, রেখায় বিধৃত করেন প্রকৃতি ও নিজস্ব জগতের প্রতিচ্ছবি। এ পর্বেও শিল্পানুভূতিতে মানবিকতার সাথে রোমান্টিক স্বকীয়তার আশ্চর্য মেলবন্ধনে তাঁর সৃজনশক্তি প্রকাশ লাভ করে। রং, রেখা আর বুনটের সাথে কাব্যিক পরিসর নির্মিতির অসাধরণ দক্ষতা তাঁকে নিয়ে যায় অনতিক্রম্য উচ্চতায়। তাঁর ছাপাই ছবিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কবিতার ব্যঞ্জনা। পার্থিব অনেক অনুভূতিকেই অন্য কোনোভাবে চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। আর এ সীমাবদ্ধতাই শিল্পীকে বিমূর্তাশ্রয়ী করেছে। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য হলো–

> গোলাপ সবাই আঁকতে পারে। দশজনকে আঁকতে দিলে দশজন দশভাবে আঁকবে। কিন্তু গোলাপের গন্ধ? এটাই প্রধান বিষয়। এই যে ধরাছোঁয়ার বাইরে কতগুলো ফিলিংস যেমন – আশা, দুঃখ, আনন্দ এগুলো আঁকতে গেলে বিমূর্ত ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। কারণ আশার কোন রূপ নেই। দুঃখ আনন্দেরও রূপ নেই।[৫৮]

তাই আনুভূমিক রৈখিক ও ধূসর তলে কালোর উলম্ব রেখা আর বিন্দুবৎ ছোপে শরতের বন্দনা করেছেন *অটাম মিউজিক্যাল নোটস* (১৯৭৬) ছবিতে। পরক্ষণেই উৎসবের আনন্দ প্রকাশে উজ্জ্বল বর্ণবিভায় ছেপেছেন *লা ফিয়েস্তা* (১৯৭৬)। দুই দিকে দুটি সাদা ও উপর থেকে নেমে আসা নীলাভ ক্রুসে ধর্মাশ্রয়ী উৎসবের ইঙ্গিত স্পষ্ট। পরিসরে সাদার আধিক্য ছেড়ে, দুই পাশে কচি সবুজের বিলীয়মান

[৫৮] নাসিমা হক, 'মনিরুল ইসলাম সংবেদনশীলতা মূর্ত যাঁর ক্যানভাসে', *কালি ও কলম* (চিত্রকলা সংখ্যা), ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ ১১৯

দুটি রঙের গড়নের সাথে একফোঁটা লাল আর চওড়া, শুষ্ক ও গতিশীল কালো রেখায় গড়েছেন তল। কেন্দ্রের লালের সাথে ভারসাম্য বিধানের জন্য ওপরে বাম দিকের কোনায় দিয়েছেন সূর্যের মতো লাল টিপ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণ করেছেন *দ্য ড্রাপ অব লাভ* (১৯৭৭)। কবিতার প্রতি অনুরক্তি ও তাঁর মানসলোকে এর প্রভাব গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে লাল, নীল আর হলুদের বিভিন্ন গভীরতার বর্ণস্তর দ্বারা নির্মিত এই চিত্রটিতে। জাগতিক সুখ ও মোহ আর অহংকারের মতো বিষয়গুলো যে ক্ষণস্থায়ী, তারই রূপায়ণ করেছেন চেনা-অচেনা নানান রূপবন্ধে অর্ধ-বিমূর্ত শৈলীতে। মনোমুগ্ধকর অর্ধ-বিমূর্ত উদ্ভাসন তাঁর *ক্রিয়েশান অব নেচার* (১৯৮০)-এ-ও। প্রথম যৌবনে জলরং ব্যবহারে যে অসামান্য দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তাঁরও নমুনা পাওয়া যায় এ শিল্পকর্মটিতে (চিত্র ৯১)। হলুদ, লাল ও নীলের জলরং সদৃশ অপূর্ব বিন্যাসে নানা অচেনা অনুষঙ্গের সাথে ফুল, লতা, পানির মতো প্রাকৃতিক রূপকের আড়ালে মূলত নারীর যৌনতা ও তার নতুন প্রাণ সৃষ্টির সক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন শিল্পী। আবার বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে মেঘের ছুটোছুটিতে সৃষ্ট নানা জান্তব আকৃতির বিমূর্ত উপস্থাপন *জাস্ট বিফোর দ্য রেইন* (*বাজো লা লুভিয়া*, ১৯৭৮)। বিশাল আকাশে বিভিন্ন কাল্পনিক রূপবন্ধের বিপরীতে একেবারে প্রান্ত ঘেঁষে নিচে নির্মাণ করেছেন দিগন্তরেখা। নিচের বাম দিকে প্রান্ত ছুঁয়ে লাল, হলুদ ও নীল রঙের তিনটি রূপবন্ধ ইশারা দিচ্ছে বস্তুজগতের। একই তলে দুটি আলাদা প্যানেলে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বকে প্রতীকায়িত করেছেন *হোপ কামস অ্যান্ড গোজ অ্যাওয়ে* (১৯৮৩)-তে। ধূসর বুনটযুক্ত তলে আকাশ, চিঠির খাম, অজানা রূপবন্ধ ও জ্যামিতিক আকৃতির সাথে জলরঙের মতো বিন্যাসে উজ্জ্বল নীল, লাল, খয়েরি ইত্যাদি রঙে স্বপ্ন-সম্ভাবনা যেমন নির্মাণ করেছেন তেমনি রংহীনতা ও স্বল্প রঙে দেখিয়েছেন স্বপ্নের অপমৃত্যুও। ছবির গতানুগতিক আকৃতিকে ভেঙে অমসৃণ চৌকোনাকৃতি পরিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব আকৃতির সাথে গুরুত্বপূর্ণভাবে যোগ করেছেন টেক্সট। স্বপ্ন-আশার এই যাওয়া-আসার মতো বহতা সময় ও স্রোতের প্রতীকী রূপায়ণ *টাইম অ্যান্ড টাইড* (১৯৮৪)। কম্পাস, চিঠির খাম, দিনপঞ্জির পাতার সাথে ত্রিভুজ, চর্তুভুজ, বৃত্ত, অর্ধ-বৃত্ত ইত্যাদির মতো জ্যামিতিক আকৃতির ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসে শিল্পী ধরতে চেয়েছেন সময়কে। পটের বাম পার্শ্বের জমাট উপকরণ সমাবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য ডানদিকে সূক্ষ্ম রেখার স্বল্প উদ্ভাসনে উপস্থাপন করেছেন উদোম গায়ের এক চিন্তাক্লিষ্ট পুরুষ চরিত্র। পটে গভীরতা নির্মাণ ও বিভাজনের অসামান্য দক্ষতায় উপকরণের মনোজ্ঞ সমাবেশ রচনা করেছেন শিল্পী। দ্বিমাত্রিক পটে ত্রিমাত্রিক অসীম বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন *ইনসার্চ অব লাইট* (১৯৮৫) ছাপাই ছবিতে (চিত্র ৯২)। জ্ঞানের সন্ধানে বই, পাতা, খড়ের ঘরের চালা, অঙ্কুরিত চারাগাছ, হাত, ত্রিকোনাকৃতির বস্তু-সদৃশ গড়ন, ত্রিভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি রূপবন্ধের সমন্বয়ে কিছুটা পরাবাস্তববাদী শৈলীতে চিত্রতলের বিন্যাস করেছেন। এতে উজ্জ্বল ও উষ্ণ রং ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে শীতল ও শান্তরঙে পরিবর্তিত হয়েছে চমৎকার। বিলীয়মান বিভিন্ন আকৃতিও এতে যোগ করেছে অসীমের অনুভূতি। আবার নিচের দিকে সামান্য পরিসর ছেড়ে উজ্জ্বল রঙের আশ্রয়ে অসীম আকাশের

বিন্যাস *ক্যাসেল অন দ্য বিচ* (১৯৮৬)। উলম্বভাবে বিন্যস্ত রেখাময় তলে নীল-সাদার সাথে সোনালি-হলুদাভ আভার মিশ্রণে আকাশের মনোমুগ্ধকর বিন্যাস ঘটেছে এখানে। একেবারে নিচে রেখার জটলা থেকে ঊর্ধ্বগামী রেখা এবং কয়েকটি নরম হলুদাভ ত্রিকোনাকৃতির গড়ন মাটির পৃথিবীর ঈশারাকে জাগিয়ে রেখেছে। তার সাথে ভারসাম্য বিধানের জন্য তিন দিক থেকে রৈখিক গড়ন ও রঙিন আকৃতি ঢুকে পড়েছে চিত্রতলে। সমগ্র চিত্রটিতে এক কাল্পনিক ও কাব্যিক অনুভূতি যেন দোলা জাগায় দর্শক হৃদয়ে। আবার *অন দ্য ওয়ে* (১৯৮৯) ছবিতে লাল, সবুজ, খয়েরির ছোপ ছোপ বর্ণচ্ছটার সাথে রৈখিক কাটাকুটিময় পরিসরের ওপরে গাঢ় কালোর সরল রেখাকে তুলনা করেছেন জীবন-চলার পথের সাথে। সেই সঙ্গে হাতে লেখা কিছু টেক্সটও যোগ করেছেন, যা দর্শককে জীবনের এক দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। *দ্য বার্থ* (১৯৮১), *জাপানিজ সামার* (১৯৮৪), *দ্য মুন অব মার্স* (১৯৮৪), *এল কমেটা* (১৯৮৫), *ভায়োলেন্স অ্যান্ড পিস* (১৯৮৫), *মায়াস ড্রিম* (১৯৮৬), *ড্যান্সিং ইন দ্য ফরেস্ট* (১৯৮৮) ইত্যাদি এ সময়ের অন্য উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। বস্তুত স্নিগ্ধরং, ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট রূপবন্ধ আর লতিয়ে ওঠা রেখায় জাগতিক অভিজ্ঞতার এক কাব্যিক বিনির্মাণ শিল্পী মনিরুল ইসলামের ছবি। রং ও রূপবন্ধে তিনি যেন উন্মোচিত করতে চান পৃথিবীর নানা মৌলিক উপাদানের স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> আগুনের প্রকাশ ঘটেছে তপ্ত লাল পটভূমিতে গোলাপী লম্বরেখার হলকায়। কালো কয়লার উৎস থেকে গোলাপীর আলোর উৎস। নীল ও সবুজের অনাবিল প্রলেপ প্রকাশ করেছে জল-ধর্ম। জলের মধ্যে হলুদ চাঁদ বা গোল কোন প্রতিফলন জলকে বিশ্বাসযোগ্যতার মর্ম দিয়েছে এবং ছবির রচনা নির্মিতিতে করণকৌশল উত্তীর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। হলুদ ও কালচে বর্ণ প্রলেপে মাটি আর সবুজ পরিধিতে সাদা রেখার উড্ডীন কাটাকুটিতে বাতাস সৃষ্টি করেছেন শিল্পী। মাটির ওপর রেখার আঁচড় পরিণামে মাটির আচরণকে প্রকাশ করেছে, আর লাল উৎস থেকে ধুম্রকুণ্ডলী আগুনকে নয় বাতাসকে ভাসমানতার দ্যোতনা দিয়েছে। এই মৌল উপাদান অনুভবে দীপ্র ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য বিভিন্ন জ্যামিতিক কুঠুরিতে একই বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।[৫৭৯]

সত্তর ও আশির দশকেও তাঁর ছবিতে পার্থিব জগতের প্রতিনিধিত্বশীল অবয়বী গুণাবলির যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, নব্বই পরবর্তী সময়ে এসে তা অবয়বধর্মিতার গুণ আরও হারিয়ে ফেলে এবং রেখা, রং আর বুনটের গীতিময় বিন্যাস হয়ে ওঠে। ত্রিমাত্রিক, গূঢ় ও রহস্যাবৃত্ত পরিসরের অসীম বিন্যাসের পরিবর্তে তা হয়ে ওঠে অবচেতন মনের স্বতঃস্ফূর্ত ও সরল প্রকাশ। এলোমেলো কাটাকুটিময় রৈখিক পরিসরের সাথে জলরং-সদৃশ রঙের স্বচ্ছ বিন্যাসে প্রকৃতির বিবর্তন প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করেছেন *ইভ্যালুশন* (১৯৯১) ছবিতে। দ্বিমাত্রিক, সরল এবং উলম্ব পরিসরের নির্মিতিতে রেখা, রঙের ব্যবহারে থেকেছেন একেবারে অবচেতন আবেগপন্থী। ব্যবহৃত কোনো রূপবন্ধই সেখানে দৃশ্যজ গুণাবলিতে

---

[৫৭৯] মইনুদ্দীন খালেদ, 'মনিরের শিল্পকর্ম : মর্মে মরমীয়া', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৪৩

উপস্থিত নয়, আবার রং ব্যবহারেও থেকেছেন ন্যূনতাবাদী। একই ধরনের রং, রেখার বিন্যাস *ডান্সিং প্লানেট* (১৯৯২)। লাল, নীল, কালচে হলুদ ও কালোর স্বল্প উদ্ভাসনে বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে স্বল্পভূমি আর জলজ অভিজ্ঞতার নিজস্ব উপস্থাপন এতে। ঠিক পরক্ষণেই অবিরল নীলের প্রাচুর্যে গড়েছেন *ব্লু ফাউন্টেন* (১৯৯২)। নীলের আধিক্যের সাথে একটি লালচে বিন্দুবৎ গড়ন এবং কালোর জমাট ও রৈখিক বিন্যাস নীল জলরাশির সাথে প্রকৃতির দ্যোতনায় হাজির। আবার শ্বেত-শুভ্র প্রেক্ষাপটে মোটা ও সূক্ষ্ম শুভ্র রৈখিক বুনটের সাথে কালো রেখায় গড়েছেন *ওয়ে টু দ্য পিলগ্রিম* (১৯৯৪)। ধূসর ও বাদামির সাথে দু-এক ফোঁটা লালের সংযোগে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য লাভের দুর্লঙ্ঘ্য পথের আয়োজন তা। প্রায় একই রকম রং-হীনতায় গড়েছেন *হরিজোন গেইম* (১৯৯৬)। দিগন্তে খয়েরি, নীল, ধূসর আর বাদামি রঙের ভঙ্গুর আস্তরে আকাশ আর জলরাশির নিবিড় মিতালির গীতিময় ভাষ্য রচনা করেছেন। তাতে নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সীমানা ঘিরে যোগ করেছেন কিছু রেখা ও লেখা। শিনকোলের (chine-colle) মাধ্যমে যোগ করা শৃঙ্খলাবদ্ধ রৈখিক গড়নযুক্ত তলে উলম্ব রৈখিক ও জ্যামিতিক গড়নের সাথে কয়েক প্রস্থ রঙের সুমিত বিন্যাস *দ্য ট্রি অব দ্য লাইফ* (১৯৯৭)। স্বল্পরেখা আর রঙের বন্ধনে গড়া এই নকশা-সদৃশ তল বোধকে অভিনিবিষ্ট করে অসীমের সন্ধানে। অসীমের এই ব্যাপ্তি অব্যাহত *উইন্টার নাইট পোয়েমস* (১৯৯৯) শীর্ষক ছবিতেও। নীল-সাদার মাখামাখিতে সৃষ্ট অসীম আকাশের নিচে সামান্য হলুদাভ রঙে দিয়েছেন মাটির পৃথিবীর ইশারা। আকাশ আর মাটির প্রণয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কালো গোলাকার গড়ন। রঙের বিন্যাসে দিনের আবহ থাকলেও এই গোলাকার কৃষ্ণ রূপবন্ধ বিপরীতার্থক দ্যোতনা সৃষ্টি করে, যার অর্থ রাত। সাথে যোগ করেছেন কিছু বাংলা কবিতার লাইনও। লেখার পঙ্‌ক্তিগুলো ঘুরিয়ে, উল্টিয়ে ভিন্ন ব্যঞ্জনা দিতে চান শিল্পী। *ডায়লগ ইন সাইলেন্স* (২০০২) শীর্ষক ছবিটিতে টেক্সটের একই রকম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। একটি অচেনা গড়নকে ঘিরে জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে অক্ষর সংকেত। অবতল পরিসর পেরিয়ে খাড়া কোনো গড়নের দিকে ওঠার দিকনির্দেশ তাতে। খাড়া গড়নে লাল, সবুজ আর নীলের ফোঁটা ফোঁটা আভায় ইঙ্গিত লতিয়ে ওঠে পাহাড়ি প্রকৃতি। পার্থিব জগতের ইঙ্গিত বর্তমান *দ্য ফার্স্ট ম্যারেজ ডে* (২০০৪) শীর্ষক ছবিতেও। ইটের মতো লালচে আভায় পুরনো কোনো স্থাপত্যের গা ঘেঁষে কালো রেখার উদ্দাম নৃত্য, পাশে কালোর আয়তাকার গড়ন এবং হালকা নীলের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয়, আনন্দেও ঠিক বিপরীত পারেই অবস্থান বিষাদের। মনির রং রেখার সংকেতে নির্মাণ করেন প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গ। মৌনী প্রকৃতির গান হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন তোলে তাঁর। তাই রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী শিল্পী গাছের মতো জড়বৎ অনুষঙ্গকেও নৃত্যরত অবস্থায় দেখেছেন *ফরেস্ট ডান্স* (২০১১) ছবিতে (চিত্র ৯৩)। বুনট যুক্ত তলে নীল, হলুদ, সবুজ, গাঢ় খয়েরির রৈখিক নির্মাণে, আঁকাবাঁকা গাছের কাণ্ড-সদৃশ রূপককে নৃত্যরত গাছের সাথে তুলনা করেছেন তিনি। এ ছাড়া *ব্ল্যাক টিউলিপ* (১৯৯১), *উন্টার বাটারফ্লাই* (১৯৯২),

টানেল অব টাইম (১৯৯৪), *ওয়ে থ্রু দ্য গ্লোরি* (১৯৯৪), *লস্ট ওয়ার্ড* (১৯৯৪), *পেয়ার* (২০০২), *মিল্কি ওয়ে* (২০০৩), *দ্য সিটি* (২০০৬) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।[৫৮০]

রং, রেখা, বুনট আর আকার-আকৃতির সন্নিপাতে পরিসর সংগঠনের অসামান্য দক্ষতায় নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে বাংলাদেশের যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পী নিজেদের অবস্থান তৈরি করে বাংলাদেশকে করেছেন গৌরবান্বিত, শিল্পী মনিরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। শুধু বিষয়ের প্রয়োগ ভাবনার বিশেষত্বে নয়, ছাপাই ছবির বিভিন্ন করণকৌশল প্রয়োগের মুনশিয়ানাও তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। ছাপচিত্রের মতো দ্বিমাত্রিক ও কঠিন তলে জলরঙের সুষমায় বিষয়ের উদ্ভাসন মাধ্যমের ওপর তাঁর অসামান্য নিয়ন্ত্রণের কথাই জানান দেয়। চিত্রকলা থেকে ছাপচিত্রে দিগন্তরী হওয়া শিল্পী দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর ছাপাই ছবির মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন শিল্পের বিশ্বপরিসরকে। তাই একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর সৃষ্টিভুবন এ দেশের শিল্পের সমৃদ্ধি ও বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মেধা ও মননে, আবেগ ও যুক্তিতে, চরিত্র ও আঙ্গিক গড়নে তিনি সাংগীতিক অনুরণন তুলেছেন ছাপাই ছবির জগতে। প্রথম দিকে মনিরের ছবিতে উৎকীর্ণ হয়েছে নির্যাতিতের প্রতি মমত্ববোধ ও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। সেসব ছবি স্বল্পপরিসরে হলেও মুক্ত স্বদেশকামীদের ত্যাগ ও পাকিস্তানি হয়েনাদের নির্যাতনের ভয়াবহতাকে প্রকাশ্যে আনে ইউরোপীদের কাছে। কিন্তু খুব দ্রুতই তাঁর চিত্রতল বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী আঙ্গিকে নিজস্ব আবেগ-অনুভূতির প্রকাশক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আবার কখনো কখনো বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী আবেগের বাইরে গিয়েও তাঁর ছবিতে থাকে বাস্তব জগতের ইশারা। প্রথম দিকের ছবিতে থাকা কালোর আধিক্য কমে আসে পরবর্তী সময়ে। বর্ণিল হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রপট। আর বুনট, রং ও রেখার গীতল বিনুনিতে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ বিধৃত হতে থাকে পটে। মূলত প্রকৃতি এবং এর রূপের নানা বৈচিত্র্যই হয়ে ওঠে তাঁর ছবির মূল প্রতিপাদ্য। মনিরুল ইসলামের ছবি প্রকৃতি থেকে আহরিত রূপ ও রূপবন্ধের ভারসাম্য, ঐক্য ও সামঞ্জস্যতার মেলবন্ধনে সূচিত। রেখা ও পরিসরের বিন্যাসও শক্তিশালী এবং একইসঙ্গে নয়নলোভন ও কাব্যিক। তাঁর ছবিতে নিডলের প্রতিটি আঁচড়, রঙের প্রতিটি ফোঁটাকেই মনে হয় অপরিহার্য এবং কোনো ক্ষুদ্র অংশকেও বাদ দিলে তা অসম্পূর্ণতা বোধে আবিষ্ট করে। ছবির পরিসর-বিন্যাস ও রং-রেখা ব্যবহারের এই দক্ষতা অর্জনের শেকড় প্রোথিত তাঁর ষাটের দশকে চর্চিত জলরং চিত্রসমূহে। তখন বাংলার নৈসর্গিক রূপবৈভব অবলোকনের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে শিল্পীর মনোজগতে স্মৃতিতাড়িত যে আবেগের জন্ম দেয়, তা-ই মূলত তাঁর শিল্পের উৎসক্ষেত্র। তার সাথে যোগ হয়েছে ইউরোপের বরফাচ্ছাদিত শ্বেতশুভ্র ও ধূসর প্রান্তরে স্বল্প রং ও প্রকৃতি দেখার অভিজ্ঞতা। এই দুই দেশের অভিজ্ঞতা এবং নিজের শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য–

---

[৫৮০] বস্তুত ছাপচিত্রের ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষ বিচারে শিল্পী মনিরুল ইসলামের শিল্পকর্ম এককভাবে গবেষণার দাবি রাখে। তিনি এ যাবৎ সহস্রাধিক ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন, পরিসরের অভাবে যার অধিকাংশই অনুল্লেখ্য রাখতে হচ্ছে আলোচনায়। তবে বিভিন্ন সময়ের ধারাবাহিক বিবর্তন-আবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করবার মতো যথেষ্ট কাজ এখানে আলোচিত হয়েছে।

> আমার ছবিতে পূর্ব ও পশ্চিম একসঙ্গে আছে। কারণ আমি দু'জায়গাই থেকেছি, এখনো থাকি। মানুষের অস্তিত্ব জটিল। ভাবনাও সহজ নয়। ...আমি প্রেরণার উৎসগুলোর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই। পুরনো ইতিহাসের প্রমাণ হাজির করার জন্য দেখাই বইয়ের পাতা। আবার ব্যক্তিগত জীবনের সাক্ষী হিসেবে থেকে যায় কোন চিঠির খাম। এভাবে মহাকাল ও নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা সময়টা একাকার হয়ে থাকে। বারবারই আমি শক্তির উৎস আঁকতে চেয়েছি। মানুষ বেঁচে থাকে শক্তি ও আশার মধ্যেই।
>
> ...আবার শেষ বিচারে তো আমরা একাও। একদিন এ পৃথিবী থেকে একাই বিদায় নিতে হয় সবাইকে। এ জন্য একা শায়িত মানবদেহ এঁকেছি ছবিতে। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে তুলনীয় এ ছবির এলিমেন্ট। তাদের মধ্যে রচিত হয়ে আছে নানা ভারসাম্য। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমি যেন এই মানবজীবন পাড়ি দিচ্ছি। সব মিলিয়ে আমার ছবি তাই হয়ে উঠেছে মহাজাগতিক। আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির গ্রহের মধ্য দিয়ে চলছে আমার সত্তা, সব মানুষেরই সত্তা। সবই যেন ভাসছে সময়ের মধ্যে। তাই ভাসমান উপাদানের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ। আমি সূক্ষ্ম রেখার একটি এলিমেন্টের সঙ্গে অন্য এলিমেন্টের সম্বন্ধ দেখিয়েছি।[৫৮১]

মূলত, পাশ্চাত্যের সংবেদনশীল করণকৌশলকে আশ্রয় করে তিনি প্রাচ্য বোধ, দর্শন ও প্রকৃতিকে অভিজ্ঞতার আলোকে আশ্রয় দিয়েছেন চিত্রপটে। তাই যাপিত জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে সু-সমন্বয় ও ঐক্য স্থাপনের একধরনের তাগিদ যেন শিল্পী মনিরুল ইসলামের শিল্পকৃতিতে বিরাজমান সব সময়। তাঁর পরিসর যেন নিজস্ব বোধ আর অভিজ্ঞতায় জারিত করে বাস্তব কোনো অনুষঙ্গের সন্তোষজনক নির্মিতি। তাতে কখনো ভেসে ওঠে দিগন্তের বিস্তৃতি, নীল আকাশের অসীম বিস্তার আবার কখনো প্রকৃতির অবভাস ও নদী বা সমুদ্রের বিশালতা। তাঁর শিল্পে আঙ্গিকের মৌলিক দ্যোতনা, বিষয় ভাবনায় প্রাচ্য দর্শনকে নতুন ক্ষেত্র থেকে সামগ্রিকভাবে অনুভব করার প্রেরণা তাঁকে পাশ্চাত্য শিল্পসমালোচকদের আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রথম দিকের ছাপাই ছবিতে সাদা-কালো কিংবা রং ব্যবহারে একধরনের কাঠিন্য লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে রঙের শান্ত ও নরম বিন্যাস এসেছে জলরঙের স্বচ্ছতা ও কোমলতা থেকে। রং রেখার সাথে নানা ধরনের জ্যামিতিক আকার-আকৃতির বিন্যাসও তাঁর ছবির প্রাসঙ্গিকতাকে মূর্ত করে তুলেছে। তাঁর ছবিতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের দোলাচল স্পষ্ট। বিষয়ের সঙ্গে ছাপাই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে অসাধারণ নির্মিতি তাঁর ছাপচিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। মাধ্যম নিয়ে শিল্পী মনিরুল ইসলামের নিত্যনতুন নিরীক্ষা ছাপাই মাধ্যমের সম্ভাবনার দিগন্তকে করছে প্রতিনিয়ত আরও প্রসারিত। শুধু ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যম নয়, চিত্রকলার চর্চায়ও তিনি নিয়োজিত নব্বইয়ের দশক থেকে। তাতেও রং-রেখা আর আকৃতির বিস্তার ছাপচিত্রের মতো। এসব কাজেও নান্দনিকতার সাথে সুচিন্তিত নানা ভাবনা আর বিষয়ের শিল্পিত বিন্যাস উপস্থিত, যা তাঁর বহুমুখী মননশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

---

[৫৮১] মনিরুল ইসলাম, 'প্রেরণার উৎস', দ্র. মতিউর রহমান সম্পাদিত, *প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা*, ঢাকা, মিডিয়াস্টার লিমিটেড, নভেম্বর ২০০২, পৃ ৪৩৯

এ দশকের শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী রফিকুন নবীও ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ষাটের দশকে চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতির আলোয় এলেও ছাপচিত্রী হিসেবে তাঁর উত্থান সত্তরের দশকের শেষার্ধে। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রথম পর্বে ছাপাই মাধ্যমে হাতেখড়ি হলেও এ মাধ্যমে তাঁর মূল সৃষ্টিপর্ব শুরু হয় গ্রিসে শিল্পশিক্ষার সময় থেকে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি গ্রিসের এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টস-এ ভর্তি হন। প্রথমে চিত্রকলাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেও পরে বিষয় পরিবর্তন করে ছাপচিত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ দেশে চর্চিত ছাপচিত্রের প্রচলিত রীতি থেকে গ্রিসে চর্চিত ছাপাই ছবির কলাকৌশল, আকার-আকৃতির ভিন্নতা ও উৎকর্ষের পার্থক্যই তাঁকে ছাপচিত্রের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> গ্রিসে গেলাম ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ের জন্য স্কলারশিপ পেয়ে। গিয়ে দেখি প্রিন্টমেকিং ডিপার্টমেন্ট সাংঘাতিক রিচ। ওখানে যে প্রফেসররা আছেন তাঁদের কাজ দেখে অভিভূত হলাম। এচিং মোটামুটি সব দেশেই ভালো অবস্থাতেই আছে। কিন্তু উডকাট – আমরা চিরকাল যে উডকাট দেখেছি, ক্লাসেও ছোট ছোট কাজ করেছি, আবার চায়নিজ, জাপানিজ উডকাটও দেখেছি। কিন্তু এখানকার প্রফেসরদের কাজ দেখে বুঝলাম, উডকাটেও অসাধারণভাবে স্কোপস বের করা যেতে পারে কাঠে। ঠিক করলাম প্রিন্টমেকিংই করব।[৫৮২]

সেখানে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন অধ্যাপক গ্রামোতোপুলসকে। তাঁর কাজের অভিনবত্ব সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য–

> সেখানে আমার অধ্যাপক কাঠ-খোদাই চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে কাজ করছিলেন। করণ-কৌশলে খুব নতুনত্ব ছিল। তাঁর কাজের ধরনে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায়নি।[৫৮৩]

গ্রামোতোপুলসের করণকৌশলের অভিনবত্ব এবং কাঠ খোদাইয়ের বৃহদাকৃতি তাঁকে অভিভূত করে এবং নতুনতর নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তিনি নবীন শিক্ষানবিশের মতো কাজ শুরু করেন ছাপাই মাধ্যমে, যার প্রমাণ মেলে কালো রঙে ছাপা *বাঙ্গেলিস* (Bungelis, ১৯৭৪) শীর্ষক ছাপাই ছবিতে। ছবিটিতে পার্শ্বীয়ভাবে উপস্থাপিত (চিত্র ৯৪) একজন নগ্ন পুরুষ মডেলের কোমর পর্যন্ত অনুশীলন করেছেন শিল্পী। শক্তিশালী ড্রইং এবং আলোছায়ার বাস্তবধর্মী উপস্থাপনে বিষয় রূপ লাভ করেছে। এতে তাঁর নরুণ চালনার দক্ষতাও মনোযোগ আকর্ষণ করে শিল্পানুরাগী দর্শকের। একই ধরনের অনুশীলনধর্মিতা পরিলক্ষিত হয় *উপবিষ্ট রমণী* (১৯৭৪) তেও। হলুদ, সবুজ, লাল ও কালো রঙে ছাপা এই ছবিটিতে একজন নগ্ন নারীচরিত্রকে ত্রিমাত্রিকতায় উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। উপর্যুক্ত নানা রঙের আস্তরণে বিষয়ের সার্থক প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কারণ ছাত্রাবস্থা থেকেই জলরঙের কুশলী নির্মাতা ছিলেন

---

[৫৮২] রশিদ আমিন, 'রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার', 'শিল্প ও শিল্পী', http://www.shilpaoshilpi.com/রফিকুন-নবীর-সাক্ষাৎকার/ , প্রেক্ষিত ১১-১২-২০১৫ খ্রি.

[৫৮৩] রফিকুন নবী, 'বৈরী সময়ের আমি', দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *Rafiqun Nabi Quest for Reality*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৩, পৃ ৭

তিনি। তবে পূর্বের মতো বিষয়ের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের পরিবর্তে নারীচরিত্রের নাকে-মুখে-চোখে একধরনের সরলীকরণের আভাস যেন দৃষ্টিগোচর হয়। সমধর্মী সরলীকরণ *দুই বোন* (১৯৭৪) ছবিতেও। সামান্য আলোর উপস্থিতিতে কালোর দুটি আস্তরে সম্পন্ন করা ছবিটিতে পুরো পটজুড়ে গ্রিক দুই বোনের উপস্থিতি। অবয়ব দুটিকে স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয় কাটাকুটি বিষয়ের বিপরীতে সৃষ্টি করেছে নকশাদার পশ্চাৎপটও। *নৌকাগুলি* (১৯৭৪) শিরোনামের কাজটির উপস্থাপনেও লক্ষ করা যায় তা। চরে পড়ে থাকা তিনটি নৌকা আর কয়েকটি পাখির ওড়াউড়ি বিষয় হয়েছে এর। নীল, হলুদ, বাদামি ও কালো রঙে ছাপা ছবিটির হলুদ চরে পাইন কাঠের নিজস্ব বুনটের সাথে শিল্পীর সৃষ্ট বুনট চমৎকার মনোযোগকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এতে রং, রেখা আর বিষয়ের মনোজ্ঞ বাস্তবধর্মী উপস্থাপন থাকলেও আলোছায়ার বিন্যাস অনুপস্থিত। হলুদ আর কালো রঙে ছেপেছেন *ভাঙা জানালা* (১৯৭৪)। এতে তাঁর নরুণ চালনার দক্ষতা ও বুনট নির্মাণের দক্ষতা নজরকাড়া। ছবিটির নির্মাণভঙ্গি দর্শকের বিমূর্ততার বোধকেও যেন কিছুটা উসকে দেয়। আবার সরল ও এক রঙের নিরাভরণ পশ্চাৎপট ব্যবহার করেছেন *কাক* (১৯৭৫) ছবিতে। এলোমেলো ও ভাঙা ভাঙা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেখায় ভেজা কাকের গা ঝাড়ার মুহূর্তটি শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্যভাবে। আলোছায়াহীন ছবিটিতে খানিকটা সরল বিমূর্তায়নও পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭৩-৭৬ পর্যন্ত করা অধিকাংশ কাজই গতানুগতিক রীতি অর্থাৎ আলো থেকে অন্ধকার পদ্ধতিতে করা এবং অনুশীলনধর্মী। বিষয় হিসেবে এসেছে একটি বা দুটি মানব অবয়ব, কোনো প্রাণী বা অন্য কোনো সরল জড়বস্তু। কোনো বিশেষ রীতি বা আঙ্গিকের প্রতি দুর্বল না হয়ে বরং ড্রইং থেকে ছাপ নেওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলো আয়ত্তে আনাই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এতে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খানিকটা সরলতার দিকেই যাত্রা করেছে তাঁর চিত্রতল। ছাপচিত্র ছাড়া এ সময়ের রেখাচিত্র ও তেলরং চিত্রের দিকে তাকালেও আমরা এর সত্যতা পাই। অধিকাংশ কাজই বাস্তববাদী ও আধা বাস্তববাদী রীতিতে করা। যদিও শুরু থেকেই বাস্তবধর্মী রীতির প্রতি মনোযোগ ও দক্ষতাই তাঁকে সুবিদিত করেছিল। কিন্তু গ্রিসের বৃহত্তর শিল্প-পরিবেশ তাঁর বাস্তবধর্মী চর্চার আঙ্গিকে পরিবর্তন আনে। অর্ধ-বিমূর্ততার দিকে যাত্রা শুরু হয় তাঁর। গ্রিস থেকে ফেরার পরও কাঠ খোদাই মাধ্যমে চর্চা অব্যাহত রাখেন তিনি। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তাঁর ছাপাই ছবিতে করণকৌশলগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্বের আলো থেকে অন্ধকার পদ্ধতির পাশাপাশি অন্ধকার থেকে আলোতে আসার রীতিতেও ছাপচিত্র নির্মাণ শুরু করেন এ সময়। *উপবিষ্ট মানুষ* (১৯৭৬), *গ্রীষ্মের কপোত* (১৯৭৮), *লাফ* (১৯৭৮), *আত্মপ্রতিকৃতি* (১৯৭৯) ইত্যাদি আশির পূর্ববর্তী সময়ে করা। *উপবিষ্ট মানুষ* (চিত্র ৯৫) ছবিতে আধ-খোলা দরজার মধ্য দিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসে থাকা এক তরুণকে দেখিয়েছেন শিল্পী। যেন হতাশায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। যেন জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে মোকাবিলা করতে করতে সে ক্লান্ত, হতাশ। বাইরে থেকে দেখার ফলে অন্ধকার দরজার বিপরীতে

তরুণের হাত-পা ও চেয়ারে চকচকে আলোর উপস্থিতি চরম নাটকীয়তার সাথে একধরনের শূন্যতাবোধেও আবিষ্ট করে দর্শককে। আবার এতে আলোছায়ার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে তিনি পরিসরের গভীরতাও সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য। আর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে একটি কবুতরকে কাঠের সু-উচ্চ প্যানেলে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে *গ্রীষ্মের কপোত* ছবিতে। শান্তভাবে বসে থাকা পায়রা যেন শান্তির প্রতীকী উপস্থাপন। ছবিতে ব্যবহৃত রং শান্ত ও স্নিগ্ধ। ছোট্ট সাদাকালো একটি কবুতরের বিপরীতে হালকা হলুদাভ তলের ওপর পাশাপাশি স্থাপিত কাঠের তিনটি সুউচ্চ ফালি পরিসরের সামগ্রিক ছন্দকে ব্যাহত করে না বরং তিনটি উলম্ব হলুদাভ রেখা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পরিসরের ভারসাম্য বিধান করে চমৎকারভাবে। এতে কাঠের বুনটকে সযত্নে ব্যবহার করেছেন কাটাকুটি ও সামান্য কিছু লেখার সাথে। এই ছবিতে উপর্যুক্ত আলো থেকে অন্ধকার এবং অন্ধকার থেকে আলোয় আসা এই দুই পদ্ধতিরই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। কাঠের বুনটের এরূপ সযত্ন ব্যবহার দেখা যায় তাঁর *লাফ* ও *আত্মপ্রতিকৃতি* শীর্ষক কাজেও। প্রথম পর্বের এ সকল কাজের কোনো কোনোটিতে খানিকটা অলংকরণধর্মিতা পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে তার প্রভাব অনেকটাই অপসারিত হয়।

সত্তরের মাঝামাঝি থেকে সরলতার দিকে রফিকুন নবীর যে যাত্রা সূচিত হয়েছিল, তা পরিণতি লাভ করে মূলত আশির দশককের প্রথম থেকেই। এ সময় প্রায় বিমূর্ততায় পৌঁছে যায় তাঁর চিত্রতল এবং পুরোপরি দ্বিমাত্রিক হয়ে ওঠে। *কবি* (১৯৮০), *নীলটোপ* (১৯৮০), *প্রকৃতি ও আমার সাধ* (১৯৮১), *ভিখারির স্বপ্ন* (১৯৮২), *ছাপচিত্র-১* (১৯৮৩), *কম্পোজিশন* (১৯৮৫), *জানালা* (১৯৮৯), *শিকার* (১৯৮৯), *সূর্যের নিচে একটি কুঁড়েঘর* (১৯৮৯), *মাছ-১* (১৯৮৯) ইত্যাদি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ। *কবি* গঠনগত দিক দিয়ে খানিকটা পরাবাস্তবাদি আঙ্গিকের। আর বিষয় আবর্তিত হয়েছে এক কবির বিচিত্র ভাবনাকে ঘিরে। সরলায়িত গাছ, ফল, পাখি, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, চাঁদ, সূর্য প্রভৃতির উপস্থিতি এক কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এতে। আর এ সবের নিচে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দুই হাত প্রসারিত করে থাকা নীল কবি যেন পরাজিত দুঃখ, সামাজিক বিপত্তি এবং বিবেকের কাছে, যারা তাঁর চিন্তার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। সরলায়িত ও ইঙ্গিতময় রূপবন্ধের সাথে পরিসর বিভাজনে শিল্পীর অনবদ্য দক্ষতা বিষয়ের প্রকাশকে সার্থক করে তুলেছে। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য–

> স্থানকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, ঘোড়া, মানুষ, পায়রা, মাছ ও বিভিন্ন ফর্মকে কিভাবে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে সাজানো যায়, ফর্ম ভেঙ্গে কিভাবে ফর্ম তৈরী করা যায়, সব মিলে ইঙ্গিতময়তা একটা ছবি কিভাবে সফল হয়ে উঠতে পারে তা লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিরাটাকার “কবি” কাঠখোদাইটিতে।[৫৮৪]

অস্বচ্ছ রং আর কালো রেখার সাথে উন্মুক্ত পরিসর ছেড়েছেন এ সময়ের কাজে। অত্যাশ্চর্য কিছু সৃষ্টির নিমিত্তে কাঠে নরুণ চালিয়েছেন বলিষ্ঠতা ও ক্ষীপ্রতার সাথে। যেমন *নীলটোপ*-এ নাটকীয় পরিবেশ

---

[৫৮৪] কবীর চৌধুরী, ‘রফিকুন নবী’, *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৩০*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪

সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত পরিসরের সাথে বিভিন্ন আকারের কিছু সরল আকৃতিও যোগ করেছেন ওপরে ও নিচে। মাঝখানে আনুভূমিক জলের ইঙ্গিতবাহী রূপবন্ধের সাথে উলম্বভাবে কয়েকটি মাছের রূপবন্ধকে করেছেন উপস্থাপন। যারা ওপরে নির্দিষ্ট টোপ গেলার জন্য মরিয়া। আমাদের সমাজে ক্ষমতা বা লাভের টোপটি গলাধঃকরণের অশুভ প্রতিযোগিতার দিকেই হয়তো শিল্পী ইঙ্গিত করেছেন এর মাধ্যমে। চিত্রকলার মতো জটিল বর্ণচ্ছটায় নদী, মাছ, পাখি, ফল আর অজানা রূপবন্ধের ইঙ্গিতময়তায় নির্মাণ করেছেন *প্রকৃতি ও আমার সাধ*। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফুটপাতে শুয়ে থাকা ভিখারি স্বপ্ন দেখে এক বিলাসী ও রঙিন জীবনের, যেমনটা সে প্রতিনিয়ত তার চারপাশে দেখে কিন্তু সে তা ছুঁতে পারে না। ফুটপাতে শোয়া ভিখারি আর তার এমন স্বপ্নের নানা অনুষঙ্গকে একাধিক রং আর সরল আকৃতির জটিল সম্মিলনে নির্মাণ করেছেন *ভিখারির স্বপ্ন* (চিত্র ৯৬)। এর মাধ্যমে নিজের সামাজিক দায়বদ্ধারও যেন প্রমাণ রাখলেন শিল্পী। অন্যদিকে *ছাপচিত্র-১* এর বিন্যাস অনেকটাই বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত ইঙ্গিতবহ। যদিও মাছ এবং অন্যান্য রূপবন্ধ কিছুটা আভাসিত হয়ে ওঠে এতে, তবে মূল কাঠামোবিন্যাসটি আকৃতি-প্রধান। প্রায় একই ধরনের কাঠামোবিন্যাস *কম্পোজিশন* এও। রং, রেখা, আকৃতি আর বুনটই এর মূল অনুষঙ্গ। *খোলা জানালা*ও অনেকখানি বিমূর্ত বিন্যাসের কাজ। হলুদ, নীল, লাল, সাদা আর বাদামি রঙের কয়েক প্রস্থ প্রলেপে গড়ে উঠেছে এর চিত্রকল্প। এরপর আবার ফিরেছেন বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত প্রকাশে। দুই হাতে আড়াআড়িভাবে পাত্রে মাছ নিয়ে এক পুরুষ চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন *শিকার* শীর্ষক ছাপাই ছবিতে। বিষয়ের নাক-চোখ পরনের কাপড়-চোপড়ের গঠন-আঙ্গিকে লোকজ সরলতা দৃশ্যমান। সোজাসুজিভাবে বলা যায়, বিষয় উপস্থাপনে কাকতাড়ুয়ার সরলায়িত গঠন ব্যবহার করেছেন শিল্পী। আবার *সূর্যের নিচে একটি কুঁড়েঘর* ছবিতেও এই লোকায়ত সরলতার উপস্থাপন লক্ষণীয়। ঘর পাখি গরু সূর্য ও তার প্রতিফলন আর জলাশয় নির্মাণে লোকজ সরলতার সাথে শিশুর সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততাও যুক্ত হয়েছে এতে।

আশির দশকেই তিনি সবচেয়ে নিয়মিতভাবে চর্চা করেছেন ছাপাই মাধ্যমের। কাঠের বুকে নরুণের সুনিয়ন্ত্রিত গতায়তে সৃষ্টি করেছেন কাব্যিক ব্যঞ্জনা। এ সময় রং, আকৃতি আর বুনটের সাথে কখনো গিয়েছেন বিমূর্ত অভিসারে, আবার কখনো পরিচিত বিষয়ের সরলায়িত কোনো রূপবন্ধের সাথে অর্ধ-বিমূর্ত রহস্যময়তাকে করেছেন সঙ্গী। তাঁর এ সময়ের কাজে বিষয়ের বাস্তবধর্মী উপস্থাপনের চেয়ে আকার ও আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাঙাচোরা কাঠ আর কাঠের আঁশের গঠনগত বুনটের সাথে মোটা রঙের সু-সংযোগে নির্মাণ করেছেন চিত্রপট। প্রতীকী অর্থপূর্ণ ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রং ব্যবহার করেছেন সবসময়। মাধ্যমের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ আর স্বতঃস্ফূর্ত সরল আকৃতির মাধ্যমে বিষয়ের অন্তর্গত সারাৎসারকে উপস্থাপন করাই যেন শিল্পীর লক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে এ সময়। তাঁর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনে মৃত্তিকালগ্নতা ও দেশজ স্বাদ রয়েছে।

আশৈশব নগরে লালিত শিল্পী রফিকুন নবীর সামগ্রিক শিল্পভাণ্ডারের একটি বিরাট অংশজুড়ে অবস্থান করছে লোকজ জীবনযাত্রার এমন নানা অনুষঙ্গ। জন্ম থেকে শৈশব পর্যন্ত মামার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে কাটিয়েছেন তিনি। আবার তাঁর কৈশোরের ঢাকাও ছিল ছোট্ট মফস্বল শহর। দু-পা পেরোলেই গ্রাম্য জীবন। এসব তিনি অনুশীলনও করেছেন ছাত্রজীবনে। ফলে তাঁর মানসলোক গড়ে উঠেছে শৈশব-কৈশোরের সেসব স্মৃতি আর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। তাই তাঁর শিল্পে খুব সহজেই স্থান করে নিয়েছে শৈশবের গ্রাম, গ্রামসংশ্লিষ্ট পশুপাখি, রাখাল, জেলে, মাঝি, কৃষক, কৃষাণিরা। (নগর ঢাকা তাঁর শিল্পে গ্রাম বা গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায় কমই প্রাধান্য পেয়েছে। যতটা পেয়েছে তা-ও চিত্রকলা এবং বিশেষত ব্যাঙ্গচিত্রে বেশি) তিনি এই গ্রাম এবং গ্রামসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিরই ধারণাগত উপস্থাপন করেন খানিকটা রোমান্টিক স্বপ্নময়তায়। যেমন *শরৎ* (১৯৯০) ছবিতে কালচে বাদামি তলে লালচে হলুদ আর অবিন্যস্ত সাদার প্রলেপে নির্মাণ করেছেন শরতের স্নিগ্ধ লাবণ্য। এলোমেলো কালো রেখা আর ত্রিভুজ-সদৃশ জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহার একে উত্তীর্ণ করেছে বিমূর্ততা বোধে। *মাছরাঙা* (১৯৯৩) ও *পাখি* (১৯৯৪) নির্মাণ করেছেন অর্ধ-বিমূর্ত আঙ্গিকে। জ্যামিতিক আকার-আকৃতির সাথে এলোমেলো কাটাকুটি আর কালো মোটা রেখায় ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন পট। এ সময়ের চিত্রকলার বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের আঙ্গিকও ছাপাই ছবির মতো। (বরং বলা ভালো যে, ছাপচিত্র চিত্রকলার আঙ্গিকের অনুগামী) নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমের চর্চাতেই বেশি নিয়োজিত থেকেছেন। তবে ছাপচিত্র থেকে একেবারে নিজেকে সরিয়ে না নিয়ে বরং নিয়মিত বিরতিতে এর চর্চাও করেছেন। *গোকূল* (২০০২), *জেলে* (২০০২), *সংগ্রাম* (২০০৩), *খাঁচায় মৃত মুনিয়া* (২০০৩), *ঝড়ো দুপুর* (২০০৩) ইত্যাদি পরবর্তীকালে করা তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি। *গোকূল*-এ তৃণভূমিতে গোচারণের দৃশ্য দেখেছেন কিছুটা ওপর থেকে। গাছ পাখি ফল গরু ইত্যাদির রূপায়ণে থেকেছেন শিশু-সরলতাপন্থী। মাছ ধরতে যাওয়া স্বামীর বিপদচিন্তায় উদ্বেগাকুল জেলেনির চিন্তাক্লিষ্ট মুখ এঁকেছেন *জেলে* ছবিতে। মোটা রং বলিষ্ঠ রেখা আর আধুনিক ও সরল রূপবন্ধে ছাগলের দড়ি ছেঁড়ার প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে দেখিয়েছেন *সংগ্রাম* ছবিতে। হলুদ, কমলা আর বাদামি প্রেক্ষাপটে খাঁচায় চিত হয়ে পড়ে থাকা মৃত পাখির ছবি *খাঁচায় মৃত মুনিয়া*। আর এলোমেলো সঞ্চরণশীল রেখার ঝড়ো গতিশীলতায় দুপুরকে রূপায়িত করেছেন *ঝড়ো দুপুর* ছবিতে। এসব ছবিতে বিষয়ের সরল ও আধুনিক রূপবন্ধের ব্যবহার আর ভারী রঙের প্রলেপে অভিব্যক্তিবাদী সরলতায় উত্তীর্ণ তাঁর চিত্রপট। এ ছবি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> ...উডকাটের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করে, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষয়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবার এবং নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশজাত আবেগকে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায় যাকে আমরা সাধনার সংযম দিয়ে জটিলতা ও বাহুল্য থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াশ বলে থাকি। তাই এসব ছবিতে স্টেনসিল ব্যবহার করে কিংবা অন্যসব সহজ কৌশলের আচ্ছাদনে মাধ্যমগত স্বাতন্ত্র উপেক্ষা করে এবং ছবির

> সামগ্রিকতাকে এড়িয়ে শুধু উপরিতলকে জমকালো আর দৃষ্টিনন্দন করে তুলবার প্রচেষ্টা দেখা যায় না; বরং অর্ন্তনিহিত ভাবকে স্পষ্ট করে তুলবার লক্ষ্যে রূপের বাহ্যাবরণ ছেদ করে অন্তর্কাঠামোকে দর্শকের দৃষ্টি সীমায় মেলে ধরবার প্রচেষ্টা দেখা যায়।[৫৮৫]

সৃষ্টি ও উত্তরণপ্রয়াসী শিল্পী রফিকুন নবীর সৃজনে মননশীলতা ও জীবনলগ্নতা তাঁর পরিশীলিত বোধ আর বুদ্ধির প্রাখর্যে উজ্জ্বল। তাঁর শিক্ষক জয়নুল কামরুল সফিউদ্দিন প্রমুখ কিংবদন্তিতুল্য পূর্বসূরিদের সৃজন-বৈশিষ্ট্য ছিল ঐতিহ্যিক প্রবাহে নিমজ্জিত, রফিকুন নবী তাঁদেরই সার্থক উত্তরাধিকার। উপর্যুক্ত শিল্পীদের শিক্ষা-সাহচার্য আর পঞ্চাশ-ষাটের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ এবং মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে মৃত্তিকালগ্ন রেখেছে আজীবন। তাই লোকজ ও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সরল ও সহজবোধ্য উপস্থাপন দেখা যায় তাঁর কাজে। যা তাঁকে বাস্তবাদী ধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর হিসেবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একথা একই সাথে তাঁর ছাপাই ছবির ক্ষেত্রেও যাথার্থ। তবে বাস্তববাদী ধারার প্রতিনিধি হলেও তাঁর ছাপাই ছবি বাস্তবতার হুবহু অনুকরণ নয় বরং পূর্বে অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিতাড়িত কোনো আবেগের নিজস্ব উপস্থাপন। এর আকার-আকৃতিগুলো চেনাজানা হলেও নিজস্ব রং আর পরিসর ব্যবস্থাপনায় তা হয়ে ওঠে শিল্পীর স্মৃতিজারিত নিজস্ব বিনির্মাণ। সেখানে খানিকটা রোমান্টিক অভিগমন থাকলেও ঐতিহ্যানুরক্তি ও সামাজিক দায়বদ্ধতাও প্রতিফলিত। এর সাথে অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়াবলিও শিল্পিত উৎকর্ষে স্থান করে নিয়েছে তাঁর ছাপচিত্রে। দেশজ আবহের সাথে নাটকীয় ও সুসংবদ্ধ পরিসর নির্মাণ তাঁর কাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ছবি তৈরি হয় রেখা রং বুনট আর বিষয়ের ভাবকে সঙ্গে নিয়ে উপকরণের সমাবেশ ও পরিসর বিভাজনের ব্যাকরণগত রীতি মেনে। বিষয় রং অথবা আলোর বিশেষ বিন্যাসে পরিসরের কোনো নির্দিষ্ট একটি অংশে মনোযোগ কেন্দ্র নির্মাণ করে নাটকীয়তার জন্ম দেন তিনি। কখনো একক কিংবা কখনো একাধিক উপকরণের এমন সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ বিন্যাস তাতে থাকে, যেন তা আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়। উপাদান সংগঠনের এই শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধও তাঁর ছাপছবিকে বিশিষ্ট করেছে সমসাময়িকদের থেকে। আবার একই ছবিতে কখনো কখনো পরিপ্রেক্ষিতের নানামাত্রিক ব্যবহারের ফলে পরিসরের ধারণাকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেন তিনি। এসবের সাথে কালো রঙের ব্যঞ্জনাদীপ্ত ব্যবহার তাঁর ছাপাই ছবিকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করেছে। রেখাঙ্কন ও জলরঙে অসামান্য দক্ষতা থাকার দরুণ তাঁর ছাপচিত্রে খসড়া পরিকল্পনার ভাব এবং স্তরের পর স্তর রং চাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রথম দিকে রং ব্যবহারে ছাপচিত্রীদের মতো স্বচ্ছ ও সংবেদনশীলতা থাকলেও ক্রমশ তা কমে আসে এবং ভারী রঙের প্রলেপে তা চিত্রকলার সমর্থক হয়ে ওঠে। সে ভারী রঙের আড়াল থেকেও নিচের রঙের স্তর উঁকি দেয়। তবে সেটা যতটা রং ব্যবহারের সংবেদনশীলতার জন্য তার চেয়ে কাঠের আঁশের বুনট ব্যবহারের দক্ষতা

---

[৫৮৫] নিসার হোসেন, ‘প্রতিস্বিকতার শিখরে: রফিকুন নবীর উডকাট’, দ্র. মোঃ জহিরুদ্দিন সম্পাদিত, *ছাপাই ছবির চার পথিকৃত*, ঢাকা, গ্যালারি চিত্রক, ২০০৩

এবং ছাপার কালির স্বচ্ছতার জন্য বেশি। গ্রিস থেকে ফেরার পর অন্ধকার থেকে আলোয় আসার পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানোর ফলে রেখার দৃঢ়তা ও গতিশীলতা তাঁর ছাপচিত্রকে বলিষ্ঠ করে তোলে। একই ছাঁচে একাধিক রঙের ব্যবহার ও স্থানিকভাবে রং প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন আকারের একাধিক ছাঁচ ব্যবহার করলেও ছবিতে একটি মূল ছাঁচ ব্যবহার করেন সব সময়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছাঁচ ব্যবহারজনিত ত্রুটিগুলো তাঁর কাজের বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> সার্ফেস প্রিন্টের হাতে-ঘষা যে সনাতনী প্রক্রিয়া তা দিয়েই নরুনে কাটা অংশ থেকে ইন্টাগ্লিওর মতো সাদার পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত সূক্ষ্ম অথবা পুরুগাঢ়-ঋজু রেখা নির্মাণ করে, একাধিক ফলকের সাহায্যে জলরঙের মতো একের পর এক স্বচ্ছ বর্ণ প্রলেপের বুনট তৈরির মাধ্যমে জড় আকৃতিতে জঙ্গম ভাব দিয়ে, পশ্চাৎপটে সম্পূরক বর্ণেও অনচ্ছ প্রয়োগে রূপ-অরূপে ক্ষয়-বৃদ্ধির বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং অফ রেজিস্ট্রেশনের হেরফেরকে সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগিয়ে দ্বিমাত্রিকভাবে বিন্যস্ত রেখা ও রূপের মধ্যে ভাস্কর্যসুলভ প্লাস্টিক গুণে সমৃদ্ধ করে তুলবার মতো স্ব-উদ্ভাবিত অভিনব প্রক্রিয়াগুলো একদিকে যেমন তাঁর ছবিকে ছবিত্বের গুণে সরেস করে তুলেছে, তেমনি নবীন প্রজন্মেও সামনে এইসব ছবি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়ের রূপায়ণ প্রকরণে বাংলার লোকচিত্রের সংশ্লেষ রেখেও কীভাবে একটি চিত্রকর্মকে যুগজ্ঞান যোগে সমকালীন করে তোলা যায় সেই দিশাও আমরা রফিকুন নবীর চিত্রকর্ম থেকে পেতে পারি।[৫৮৬]

তিনি বিশ্বাস করেন মাতিসের সেই কথায় যে, ভালো ছবি একটি ভালো নকশাও। যা রফিকুন নবীর সমগ্র শিল্পীজীবনে প্রবলভাবে উপলব্ধ হয়। সকল মাধ্যমে রঙের বিচিত্র বিন্যাস আর বিষয়ের দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনে রফিকুন নবীর দক্ষতাও সুবিদিত। এ দেশের শিল্পজগতে যা তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়ও করেছে। তাঁর মূল সৃজন-ভাণ্ডার চিত্রকলা-কেন্দ্রিক হলেও ছাপচিত্রের মতো মাধ্যমকে এ দেশে নতুন মাত্রায় উত্তরিত এবং জনপ্রিয় করার পেছনে তাঁর অবদানও অবশ্য স্বীকার্য।

শিল্পী মিজানুর রহিমও (১৯৪৪) সত্তরের তরুণ প্রজন্মের একজন, যারা পরবর্তীতে ছাপচিত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন। ষাটের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ধাপ শেষ করেছিলেন চিত্রকলায়। তবে ছাপচিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন সত্তরের দশকের শেষের দিকে বেলজিয়ামের প্রবাসজীবনে। তিনি বেলজিয়ামের রয়াল একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ লিথোগ্রাফির ওপরে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (১৯৮০)। সামান্য কিছু এচিং এবং ড্রাইপয়েন্ট করলেও দীর্ঘ সময় ধরে লিথোগ্রাফের চর্চা করেছেন। বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহাভ্যান্তরভাগকে বেছে নিয়েছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য, জড়জীবন কিংবা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে তাঁর কাজে। বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনই লক্ষণীয় তাঁর কাজে।

---

[৫৮৬] নিসার হোসেন, 'প্রতিস্বিকতার শিখরে: রফিকুন নবীর উডকাট', দ্র. মোঃ জহিরুদ্দিন সম্পাদিত *ছাপাই ছবির চার পথিকৃত*, ঢাকা, গ্যালারি চিত্রক, ২০০৩

অভ্যন্তরভাগ ৩, *অভ্যন্তরভাগ* ৪ এবং *অভ্যন্তরভাগ* ৬ (১৯৮০-৮৩)-এর ক্ষেত্রে করিডোরে একটি করে ফুলের টব রাখা আছে। অন্য আরেকটি *অভ্যন্তরভাগ* (১৯৮০-৮৩) শিরোনামের ছবিতে একটি লিথোস্টুডিওর অভ্যন্তরভাগ নির্মাণ করেছেন শিল্পী। সেখানে প্রেসের ওপরে রাখা কয়েকটি বোতল এবং চিত্রপটের সম্মুখে রাখা একটি টেবিল বেশ খানিকটা অস্পষ্টতার মধ্যে প্রকাশিত। আবার *কম্পোজিশন*-২ (১৯৮০)-তে ঘরবাড়ির আভাস চিত্রতলে (চিত্র ৯৭)। *কম্পোজিশন*-৩ (১৯৮০)-ও স্থাপত্যিক কাঠামোর উপস্থাপন। *প্রেম*-১ (১৯৮০-৯০) এবং *প্রেম*-২ (১৯৮০-৯০)-তে নারী ও পুরুষের অসাধারণ সরল দুটি রূপবন্ধকে দেখিয়েছেন ঘনিষ্ঠতায়। আবার *ন্যুড*-১ (১৯৮০-৯০) এবং *ন্যুড*-২ (১৯৮০-৯০)-তে স্টুডিওর ভেতরে দুজন নগ্ন নারীকে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমটিতে দাঁড়ানো এবং দ্বিতীয়টিতে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়। মনুষ্য অবয়ব উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি যে সরলতার আশ্রয় নিয়েছেন, তা আমাদের উত্তর-প্রতিচ্ছাবাদীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। রোমান্টিক ভঙ্গিতে দেখেছেন নারীর আলুলায়িত চুল *কম্পোজিশন* (১৯৮১/৮২) শীর্ষক লিথোচিত্রে। এ পর্বের ছবিগুলো সবই সাদা-কালোর তীব্র বৈপরীত্যে নির্মিত। আলোছায়ার বিন্যাস ব্যকরণভিত্তিক নয়। তবে স্পটলাইট-সদৃশ রহস্যময় আলোর বিন্যাসের মাধ্যমে আকস্মিকভাবে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ফলে চিত্রতলে সবসময় একটি অত্যুজ্জ্বল অংশের সৃষ্টি হয়েছে। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ উজ্জ্বল অংশটির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন তলজুড়ে; যার ফলে বিষয়বস্তুর তুলনায় চিত্রপটের চকচকে অংশেই দর্শকের চোখ পরিভ্রমণ করে বেশি এবং অন্ধকার অঞ্চলে বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে খানিকটা অসুবিধাই হয়। বিষয়টি সার্বিকভাবে কিছুটা রহস্যময়তারও জন্ম দেয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংসতার রূপায়ণ করেছেন *আগুন*-১, ২, ৩ এবং ৪ (১৯৯৬) শীর্ষক লিথোচিত্রগুলোতে। এখানে তীব্র অন্ধকার ভেদ করে বিভিন্ন স্থাপনায় দুষ্কৃতি প্রদত্ত আগুনের লেলিহ লোলুপ শিখা উঠে গেছে মাঝ আকাশ পর্যন্ত। *ইমেজ*-১, ২ (চিত্র ৯৮) এবং ৩ (১৯৯০ এর দশক)-এ লিথোর ওপরে তুষ কন্টি অ্যারাবিক গামসহ বিভিন্ন মাধ্যমের সম্ভাবনা নিয়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন মনোজ্ঞ নির্বস্তুক সমাবেশ।

শিল্পী মিজানুর রহিম ঢাকা চারুকলার ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শিল্পকলায় বাস্তবরীতির যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন সারাজীবনের শিল্পকৃতিতে তাঁর প্রভাব বেশ শক্তভাবেই দৃশ্যমান। বিদেশে লিথোগ্রাফের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে কিছু লিথোগ্রাফ করলেও পরবর্তীকালে এ মাধ্যমের চর্চায় বেশ অনিয়মিতই বলা চলে। তবে ছাপচিত্র ছাড়া রেখাচিত্র ও জলরং মাধ্যমেরও বেশ কুশলী শিল্পী তিনি।

এ প্রজন্মের অন্য আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী শিল্পী মাহমুদুল হক। ষাটের দশকের শেষভাগে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রথম পর্ব সম্পন্ন করেন চিত্রকলায়। ছাত্রাবস্থায় ছাপাই ছবির প্রাথমিক কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন পাঠ্যক্রমের বাধ্যবাধকতায়। কিন্তু ছাপচিত্র মাধ্যমের সাথে

তাঁর আন্তরিক সখ্য গড়ে ওঠে ষাটের দশকের শেষ নাগাদ এক ছাপচিত্র কর্মশালায় অংশগ্রহণের সূত্রে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে *ইউসিস* বিখ্যাত মার্কিন ছাপচিত্রী মাইকেল পন্স ডিলিয়নের একটি ছাপচিত্র কর্মশালায় আয়োজন করে পশ্চিম পাকিস্তানে। এতে অংশগ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীদের একজন হলেন শিল্পী মাহমুদুল হক। এই কর্মশালা অনেক নতুন করণকৌশলের সাথে ছাপাই মাধ্যমের ব্যাপ্তি ও এর শক্তিমত্তাকে নতুনভাবে তুলে ধরে তাঁর সামনে। আর এটাই তাঁকে পরবর্তীকালে এই মাধ্যমের প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলে। দুই মাসব্যাপী এই কর্মশালায় রঙিন এচিং মাধ্যমে বেশ কিছু ছাপাই ছবি করেন তিনি। ধাতব পাতকে এসিড সহযোগে গভীরভাবে ক্ষয় করে (deep bite) রোলারের সাহায্যে বিভিন্ন রং প্রয়োগের মাধ্যমে রঙিন এচিং ছবি ছাপার কলাকৌশল শেখানো হয়েছিল এই কর্মশালায়। শিল্পী মাহমুদুল হকও হলুদ সবুজ লাল নীল কালো প্রভৃতি মুখ্য রং সহযোগে ছবি ছাপাই করেছেন এতে। বিভিন্ন ধরনের আকার-আকৃতির সাথে কখনো কখনো ফুলে ওঠা কোনো সাদা পরিসর ছেড়েছেন। আবার কখনো কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, সরলায়িত মানবাবয়ব কিংবা ফুল-লতাপাতার অনিন্দ্য সরল রূপবন্ধে নির্মাণ করেছেন চিত্রপট। এচিংয়ের সূক্ষ্ম রেখার সাথে উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতি ও শিনকোলের ব্যবহারে কখনো বুনট-প্রধান অবার কখনো মসৃণ তল নির্মাণ করেছেন। পূর্বে ছাত্রাবস্থায় অনুশীলনধর্মী কিছু ছাপাই ছবি করলেও এ সময়ের কাজ আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক থেকে মূলত মাইকেল পন্স ডিলিয়নের আঙ্গিক ও করণকৌশলানুবর্তী। ইউসিসের এই কর্মশালা তাঁর ওপরে খুব প্রভাব-বিস্তারী হয়েছিল পরবর্তীকালেও। এমনকি সত্তরের দশকের প্রায় পুরোটা জুড়েই এই প্রভাব দৃশ্যমান তাঁর ছাপাই ছবিতে। যদিও চিত্রকলায় এ সময় তাঁর আঙ্গিক অনেকখানি কিবরিয়ানুবর্তী এবং বিমূর্ততা ও অর্ধ-বিমূর্ততার দোলাচলের মধ্যবর্তী স্তরের; কিন্তু ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তা অনেকটাই মাধ্যমগত নিরীক্ষাধর্মী। সত্তরের শেষার্ধে করা *ছাপ*-১২ (১৯৭৭), *ছাপ*-১৩ (১৯৭৭), *ছাপ*-১৫ (১৯৭৭), *ছাপ*-১৬ (১৯৭৭), *ছাপ*-১৭ (১৯৭৭) ইত্যাদি ছবিও মাধ্যমগত নিরীক্ষার লক্ষণাক্রান্ত। রেখা, নানা ধরনের আকার-আকৃতি আর কালোর সাথে প্রাথমিক বর্ণের বিন্যাসে নির্মাণ সংহতি লাভ করেছে এতে। কখনো আবার পরিচিত কোনো রূপবন্ধের সাথে উত্তল সাদা পরিসরও ছেড়েছেন পূর্বের ন্যায়। তবে শিল্পী মাহমুদুল হকের ছাপচিত্র নতুন মাত্রা অর্জন করে আশির দশকের প্রথমে জাপান পর্বে।

১৯৮১-৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপান সরকারের বৃত্তির আওতায় সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাপচিত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন তিনি। এখানে অধ্যাপক শিরোকি তোশিওকির তত্ত্বাবধানে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, মেজোটিন্ট ও কলোগ্রাফ মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি কাজ করেছেন লিথোগ্রাফ, মনোপ্রিন্ট, সিল্কস্ক্রিন, কাঠ খোদাই প্রভৃতি মাধ্যমেও। আশির দশকের এই প্রথমার্ধই শিল্পী হকের জীবনে ছাপচিত্র মাধ্যমে চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায়। এ সময়ের নিরীক্ষাই তাঁকে ছাপচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ চিত্রকলায় তিনি সত্তরের দশকে

খ্যাতিমান হলেও ছাপচিত্রী হিসেবে তিনি প্রদীপের আলোয় আসেন আশির দশকের শুরুতেই। তেল ও জল রং মাধ্যমে উজ্জ্বল ও নয়নলোভন রঙের বিন্যাস ছেড়ে এ সময় তিনি বেছে নেন কালো। এ প্রসঙ্গে শিল্পীকে উদ্ধৃত করে সমালোচক বলেছেন–

> রঙের প্রাচুর্যে ছবির মূল বক্তব্য হয়তো হারিয়ে যেতে পারে; বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের গভীরতা ক্ষুণ্ন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি শাদা-কালো রঙ ব্যবহার করেছেন।[৫৮৭]

তাঁর এ সময়ের নিরীক্ষা জমাট কালো তলে সাদার বিপরীতে বিভিন্ন ঘনত্বের কালোর আস্তর এবং নকশাধর্মী, বুনটনির্ভর ও আকারকেন্দ্রিক। তবে এই আকারসমূহের উৎস বাস্তব জগৎ। অতি সাধারণ এবং চেনা বাস্তবতাকে ভেঙেচুরে নির্মিত হয়েছে তাঁর দৃশ্যতল। সে বাস্তবতা এসেছে কখনো তাঁর পরিপার্শ্বের সাধারণ কোনো ঘটনা থেকে, কখনো কখনো ওপর থেকে দেখা কোনো নগরদৃশ্য থেকে; এমনকি চিরচেনা গোলাপের কোমল গঠন থেকেও। কিন্তু চিত্রতলে আকারের কায়িক শক্তিকে ধারণ করে তা বিবর্তিত হয়ে এক ভিন্ন সত্যকে তুলে ধরে আমাদের কাছে; যেখানে আকারই স্বরাট ঈশ্বরের মতো। যেমন ঘূর্ণমান নাগরদোলার আর্বতনগতির দৃশ্যজ অভিজ্ঞতাকে ভেঙেছেন *ছাপ*-২৯ (১৯৮২)-তে (চিত্র ৯৯)। *ছাপ*-৩০ (১৯৮২)-এ বিস্ফোরিত আঁতশবাজির রূপকে বিমূর্ত করে তুলেছেন। আবার ফুলদানিতে রাখা ফুলের বাস্তবতাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নতায় *ছাপ*-৩১ (১৯৮২), *ছাপ*-৩২ (১৯৮২) এবং *ছাপ*-৪২ (১৯৮৩) প্রভৃতি চিত্রে। কখনো আবার চিত্রপট নির্মাণ করেছেন শুধু নকশাধর্মিতায়, আকার-আকৃতি আর বুনট গঠনের দক্ষতায়। তবে, শুধু জড়বস্তুই নয়, মানব অবয়বকেও ভেঙেছেন প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বাইরে গিয়ে। *উপবিষ্ট রমণী*-১ (১৯৮২) এবং *উপবিষ্ট রমণী*-২ (১৯৮২) এর উদাহরণ। বহুমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে নানাবিধ আকার-আকৃতির সমন্বয়ে নারীর সরলায়িত অবয়ব উপস্থাপন করেছেন এতে, যা উত্তরপ্রতিচ্ছায়াবাদী মাতিসকে মনে করিয়ে দেয়। এ সকল কাজের মাধ্যমে তিনি মাধ্যমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশল আত্মস্থ করার পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে বস্তুকে দেখার চেষ্টা করেছেন অনেকটা ঘনকবাদীদের মতো। সাদাকালোর তারতম্যে বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করাই তাঁর মূল লক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে এতে। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন–

> I had wanted to express my experience, may it bother the viewer with pondering for a few minutes. I don’t offer explanations but I render what occurs to me after seeing an interesting object. I render them differently and expect the

[৫৮৭] হাসান হাফিজ, 'মাহমুদুল হকের ছাপচিত্র', *রোববার*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ ৫১

> viewer to experience it in his own way and that's why I have not named any of my works.[৫৮৮]

মাহমুদুল হকের শিল্প-আঙ্গিক কখনো কখনো চরম বিমূর্ততায় উপনীত হলেও তার উৎস প্রোথিত বাস্তবতায়। জমাটবদ্ধ কালোর বিভিন্ন ঘনত্ব আর আকার-আকৃতির সম্মিলনও তাকে পার্থিব অনুষঙ্গ থেকে তাই দূরে রাখতে পারে না; বাস্তব আর কল্পনার দোলাচল স্পষ্ট তাতে। কখনো আবার তাঁর একান্ত অবয়বী ছবিতেও মূর্ত হয়ে ওঠে বিমূর্ততার বোধ। এ প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁর *পাথরের উপরে পাথর* (১৯৮৪) সিরিজ চিত্রটির কথা (চিত্র ১০০)।[৫৮৯] শক্ত কাঠামো, ভরযুক্ত, ত্রিমাত্রিক, সাদৃশ্যধর্মী ও অনুপুঙ্খ উপস্থাপন-আঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও এই পাথরগুলো চিত্রতলে মানুষের বিমূর্তবোধকে উসকে দেয়। এই চিত্রগুচ্ছে তিনি অন্ধকার পশ্চাৎপটের বিপরীতে পাথরের ওপরে পাথরকে স্থাপন করেছেন ভাস্কর্যসুলভ বৈশিষ্ট্যে। খেলার ছলে বাচ্চাদের পাথরের ওপরে পাথর সাজিয়ে নির্মিত বিভিন্ন কাঠামোর গঠন থেকে উদ্বুদ্ধ হলেও তা মনে করিয়ে দেয় মানুষের সৃষ্টি সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যিক কাঠামো স্টোনহেঞ্জের কথা। পাথরের নানাবিধ আকৃতি ও এর উপরিতলের বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চিত্রগুচ্ছে তল গঠনের জন্য মেজোটিন্টের সাথে এচিং পদ্ধতিরও সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে পাথরের বুনট এবং এর শক্ত গঠনকাঠামো নির্মাণের জন্য মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন অনবদ্য দক্ষতায়। পাথর সিরিজ ছাড়া মেজোটিন্ট মাধ্যমে মোচড়ানো কাগজ এবং ফালি করা কাঠের স্তূপকে বিষয় করেও কিছু কাজ করেছেন। মাধ্যম মেজোটিন্ট হওয়ায় কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পাথর সিরিজের মতো সফল না হলেও দিনশেষে সেগুলোও যথেষ্ট চিন্তার উদ্রেককারী। আবার মেজোটিন্ট ও এচিং অ্যাকোয়াটিন্টে এসব নিরীক্ষা ছাড়া কলোগ্রাফ মাধ্যমেও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। *ছাপ-৪৩* (১৯৮৩), *ছাপ-৪৪* (১৯৮৩), *ছাপ-৪৫* (১৯৮৩), *ছাপ-৫১* (১৯৮৪) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ।

জাপান পর্বে তিনি ছাপচিত্র মাধ্যমের নানামাত্রিক সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফলে মাহমুদুল হকের এ সময়ে সৃষ্ট পরিমণ্ডলে নিরীক্ষার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু নিরীক্ষার চোরাবালিতে আটকে তিনি লক্ষ্যচ্যুত হননি কখনো। নিজস্ব অনুভূতির সার্থক প্রকাশরূপ দিতে নির্মিতির শেষ বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে তিনি সদা সচেষ্ট থেকেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য–

---

[৫৮৮] Shadab Ahmad, 'An artist for whom technique is not important', পাকিস্তানে প্রকাশিত দৈনিক *The Frontier Post* এ প্রকাশিত, ১৯৮৮; শিল্পীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত

[৫৮৯] এই সিরিজের কোনো কোনো কাজকে 'স্মরণীয়' হিসেবেও অভিহিত করেছেন শিল্পী

> Technique, texture and colors are not important, they are secondary in my works. The main thing is projection of my feelings and thoughts through creative images of reality as seen by me.[৫৯০]

জাপান-পরবর্তী সময়েও ছাপচিত্রচর্চা তিনি করেছেন; কিন্তু তা জাপান পর্বের মতো অতটা নিরবচ্ছিন্ন নয়। কারণ শিল্পী হক শুরু থেকেই চিত্রকলার চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন ছাপচিত্রের পাশাপাশি। আর জাপানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর চিত্রকলা চর্চায় আবার নিয়মিত হয়ে পড়েন। ফলে নব্বইয়ের দশকে এসে করা কিছু মনোপ্রিন্টে চিত্রকলার মতো রং-রেখা এবং আকৃতির ব্যবহার দেখা যায়। এ সময় ছাপচিত্রও করেছেন বেশকিছু। আশির দশকে তাঁর কাজে বিষয় বা আকার-আকৃতির ঘন সন্নিবিষ্টতা ছিল, যা অনেকটাই মনোযোগ-কেন্দ্রের মতো। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে এসে তা অপসারিত হয় অনেক ক্ষেত্রে, বিষয় তরলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র তলে। কখনো কখনো পরিসরের কেন্দ্রকে ছেড়ে বিষয় ছড়িয়ে পড়েছে বহিঃসীমায়ও। কোথাও আবার রাসায়নিকের দক্ষ ব্যবহারে নির্মিত বুনটবদ্ধ তলে যোগ করেছেন চেনা-অচেনা রূপবন্ধ। যেমন *আকাঙ্ক্ষা* (১৯৯৩) সিরিজের ছবিগুলোতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে শিল্পীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন ছুটে চলে কোনো এক অন্ধকার তলের বিপরীতে। কোথাও কোথাও জমাট অনুভূতিরাশির বন্ধন শীতল হয়ে আসে অনেকটাই, পরক্ষণেই তা আবার খুঁজে পায় লক্ষ্য। বুনটযুক্ত তলে কখনো কখনো মনোযোগ-কেন্দ্র তৈরি করেছেন আয়তাকার জানালা-সদৃশ কোনো রূপবন্ধ যোগ করে অথবা চওড়া সাদা গতিশীল পরিসরের আড়ালে।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে শিল্পী মাহমুদুল হকের সারাজীবনের নানামুখী নিরীক্ষা অবশেষে তাঁর ছাপচিত্র চর্চাকে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে বর্তমান শতকের প্রথম দশকে করা তাঁর *ছাপ-৮৮* (২০১৩), *ছাপ-৮৯* (২০১৫), *ছাপ-৯০* (২০১৫) শীর্ষক ছবিতে (চিত্র ১০১)। এখানেও সমগ্রতলে বিস্তৃত বুনট রং-রেখা আর নানামুখী প্রতীক ও রূপকের ব্যবহারে চিত্রপট থেকেছে পূর্বের মতোই বিমূর্ত। সীমিত পরিসরে অসীমের যে ব্যাপ্তি তিনি ঘটিয়েছেন, তাঁর শিক্ষা তিনি জাপান পর্বে অর্জন করে থাকবেন হয়তো। তবে রেখা, রং ও প্রতীক বা চিহ্নের ব্যবহরে, এমনকি বুনট তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁর সংবেদনশীলতা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। এতে মাধ্যমগত দক্ষতার সাথে তাঁর মানসিক পরিপক্বতার স্তরকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কারিগরি দক্ষতার সাথে বিষয় উপস্থাপনের এমন নৈপুণ্য শিল্পী মাহমুদুল হককে এ দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শৈল্পিক সংযম, শৃঙ্খলা এবং সংবেদনশীলতা হলো তাঁর ছাপাই ছবির বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো তার সাথে যোগ হয়েছে নিষ্ঠা ও ধৈর্য। শিল্পী হকের সারা জীবনের শিল্পকৃতির দিকে নজর দিলে দেখা যায় তাঁর ছাপচিত্রের আঙ্গিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরাসরি

---

[৫৯০] Shadab Ahmad, `An artist for whom technique is not important', পাকিস্তানে প্রকাশিত দৈনিক The Frontier Post এ প্রকাশিত, ১৯৮৮; শিল্পীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত

তাঁর চিত্রকলার আঙ্গিকানুবর্তী নয়, যেমনটা অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বরং ছাপাই মাধ্যমে মাধ্যমের চরিত্রকে আত্মস্থ করে সে অনুযায়ী শিল্প রচনা করেছেন, যা শুরু থেকেই অনেক বেশি করণকৌশল-নির্ভর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয় প্রকাশে তাঁর চিত্রতল থেকেছে আকৃতি-নির্ভর ও বুনট-প্রধান। তাঁর বুনটের ব্যবহার পুনরাবৃত্তিমূলক। উপাদান সংগঠন এবং এই বুনট নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর তীক্ষ্ণ মনোযোগ লক্ষণীয়। পরিসর বিভাজন ও বুনট নির্মাণে কখনো কখনো রশিদ চৌধুরী এবং মো. কিবরিয়ার প্রভাব অনুভূত হয় তাঁর কাজে। চিত্রকলায় উজ্জ্বল ও মনোরম রঙের বিন্যাস থাকলেও তাঁর ছাপচিত্র বরাবরই সাদাকালো কিংবা একক রং-বিশিষ্ট। তবে ছাপচিত্রের করণকৌশলগত এসব নিরীক্ষা তাঁর চিত্রকলার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে অনেক সহায়ক হয়েছে। বিশেষত বুনট নির্মাণ এবং উপকরণ স্বল্পায়নের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। শিল্পী মাহমুদুল হক ছাপচিত্রের মতো পরিশ্রমসাধ্য মাধ্যমে শিল্পরচনা করে যেমন ছাপাই মাধ্যমের উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তেমনি একজন শিল্প-সংগঠক, ছাপচিত্রের পথপ্রদর্শক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আর এসব কারণেই তিনি এ দেশের শিল্পকলার জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিষ্ঠান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পী কালিদাস কর্মকারও এ প্রজন্মের অন্যতম প্রভাবশালী ছাপচিত্রী। ষাটের দশকে প্রথমে ঢাকায় এবং পরবর্তী সময়ে কলকাতায় শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ষাটের দশকে স্নাতক হলেও, ছাপচিত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ সত্তরের একবারে শেষ লগ্নে। তিনি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে ছাপচিত্রের বিভিন্ন করণকৌশলের ওপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর ছাপছবির ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং একইসাথে তা এক একটি পর্ব নির্দেশকও। ছাপচিত্রের প্রতি আগ্রহের শুরু কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থায়। কলেজের তীব্র রক্ষণশীল পরিবেশের বাধা অতিক্রম করে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই ধাতব পাতের ওপরে অন্য ধাতব তল যোগ করে ছাঁচ নির্মাণ করেছিলেন নিজস্ব আগ্রহে। এরপর কলেজের মাঠ সমান করার জন্য ব্যবহৃত রোলার দিয়ে রাতের আঁধারে তা ছেপেছিলেন বন্ধুদের সহযোগিতায় এবং বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অর্জন করেছিলেন ছাপচিত্র মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের পুরস্কার। এ ঘটনা ছাপচিত্রের জন্য এক গোপন ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল তাঁর মনে। পরবর্তীকালে (১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে ওয়ারস অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ) পোল্যান্ডে ছাপচিত্র বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে যার প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবন থেকে ছাপচিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকলেও মূলত, প্রফেসর আন্দ্রে রদজিনিস্কির তত্ত্বাবধানে সত্তরের দশকের শেষে তিনি এ মাধ্যমে শিল্প নির্মাণে নিয়মিত হন। *শ্রদ্ধার্ঘ্য*-১ (১৯৭৮), *শ্রদ্ধার্ঘ্য*-২ (১৯৭৮), *ছাপচিত্র*-২ (১৯৭৮), *ছাপচিত্র*-৩ (১৯৭৮), *ইমেজ*-৭ (১৯৭৯) ইত্যাদি তাঁর পোল্যান্ড পর্বের কাজ।

শ্রদ্ধার্ঘ্য-১ (চিত্র ১০২) শিল্পকর্মটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেছেন শিল্পী। ছবিতে কাপড়ে চোখ বাঁধা শশ্রুমণ্ডিত এক প্রবীণ স্বাধীনতাকামীকে গলায় ফাঁসির রশি এবং পেছন থেকে তক্তার সাথে পেরেকবিদ্ধ অবস্থায় দেখানো হয়েছে। প্রতিকৃতির নিচে নির্বাপিত মোমবাতি সদৃশ্য কিছু রূপবন্ধ পেরিয়ে একটি আড়াআড়ি বাক্সে সংরক্ষিত রয়েছে তার পিস্তল। যা থেকে জন্ম নাড়ি-সদৃশ রেখার একটি কুণ্ডুলী নেমে গেছে শেষ পর্যন্ত। তার ওপরে জন্মের অপেক্ষায় মাতৃগর্ভে কুণ্ডুলিত হয়ে থাকা একটি মানব শিশুর অবস্থান। যেন বহু ত্যাগ আর রক্ত-অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত স্বদেশ রক্ষার পরবর্তী দায়িত্ব তিনি (মুক্তিকামী প্রবীণ) তুলে দিয়ে গেলেন অনাগত প্রজন্মের হাতে। আর ওপরের তক্তার ডান দিকের শেষ প্রান্তে একটি পাখি ফুল মুখে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে তাঁর এই মহান আত্মত্যাগের। *শ্রদ্ধার্ঘ্য-২*-তে দেশের সমসাময়িক ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার প্রতীকী রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ছবিটির রচনাশৈলী এবং এর গঠন-কাঠামো পূর্বের শিল্পকর্মটি হতে বেশ ভিন্ন। ছবির পুরো পরিসর চেনা-অচেনা ঘননিবদ্ধ নানা কারুকাজ ও রূপবন্ধে পরিপূর্ণ। ওপরের অংশটি একটি নিখুঁত বৃত্ত এবং নিচের আবৃত অংশ আয়তাকার। ছবিটির একেবারে নিচ থেকে একটি সরু আয়তাকার পরিসর ওপরের দিকে উঠে ত্রিভুজ আকৃতি ধারণ করেছে। এই ত্রিভুজ এবং আয়তক্ষেত্রকে অধিক্রমণ করে গড়ে উঠেছে আরও একটি বৃত্ত। এর মাঝখানে একজন রাজপুরুষের প্রতিকৃতি, যার মাথার মুকুট ভাসমান এবং বাম হাত প্রতীকী ক্রুশবিদ্ধ। নিচের বাম দিকের কোনায় নগ্ন নারীর অর্ধ-বিমূর্ত রূপকল্প এবং ডানদিকের কোনায় পার্শ্বীয়ভাবে উপস্থাপিত পুরুষ চরিত্র ওপরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর রাখছে। বিদেশে অবস্থান করলেও কালিদাসের সমগ্র অস্তিত্বে সর্বক্ষণ অবস্থান করেছে দেশ ও দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি। যেমনটা দেখি তাঁর *ছাপচিত্র-২* এও। ওপরের তলে অসংখ্য পেরেক দিয়ে শক্তভাবে আটকানো একটি বড় বাক্সের ডান দিকের কোনায় বাংলাদেশ লেখা একটি ডাকটিকেট এবং বাম দিকের কোনায় হাতে লেখা কিছু বার্তা, যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশেরই প্রতীকী রূপায়ণ বলে অনুমিত হয়। নিচের দুই পাশের কোনায় একজন নারী ও পুরুষের মুখ, যা শিল্পীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধারণা করা যায়। বাক্সের ওপরের অংশে একটি নিখুঁত বৃত্তাকার বুনটযুক্ত পরিসরে বালা পরিহিত একটি কালো হাতের উপস্থিতি। অশুভ শক্তির দোর্দণ্ড দাপট অথবা ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ছবির মনোযোগ-কেন্দ্রে বসানো হয়েছে সেটি। বাম দিক থেকে মুখ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটি কুকুর। বাক্সের ওপরে স্থাপিত একটি নল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলী বের হচ্ছে। এর মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন ঘটনাবলি ফুটে উঠেছে। এই রেখাচিত্রের সাথে আদিম চিত্রকলা কিংবা শিশু-চিত্রকলার সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। ধোঁয়ার নলের দুই পাশ দিয়ে দুটি ছিদ্র হতে পেরেকবিদ্ধ অবস্থায় প্রচণ্ড চাপে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডুলীর মতো বিকৃত সব মানুষ। এর মাধ্যমে স্বাধীনতাত্তোর দেশের স্বল্প যাত্রায় নানা ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিবেশে ক্ষুব্ধ মানবাত্মাকে পেশিশক্তি প্রয়োগে অবদমিত রেখে সবকিছু স্বভাবিক দেখানোর অপচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

করা হয়েছে। উপকরণের একই ধরনের সংগঠন এবং বিন্যাস লক্ষণীয় তাঁর *ইমেজ-৭* শীর্ষক চিত্রটিতেও। হিন্দুদের নানা দেবদেবী, বিভিন্ন প্রতীক ও চিহ্নের ব্যবহারে নির্মাণ করেছেন পূর্বের ন্যায় নির্গম নল যুক্ত পেরেকবিদ্ধ বাক্স। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তার কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার এক নিকষ অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সাম্প্রদায়িক চরিত্রে প্রত্যাবর্তন করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্তনে স্বধর্মীয়দের (ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের) নিরাপত্তাজনিত অজানা নানান শঙ্কা তাঁকে এমন বিষয় নিয়ে শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে শিল্পী কালিদাস কর্মকার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁর শিল্পে প্রধানত ধ্বনিত হয়েছে সর্ব-ধর্মের এক মিলনধ্বনি। তিনি সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়েছেন মানুষকে। সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখের নানা অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন বুনট, রেখা আর রঙে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় *ছাপচিত্র-৩* শীর্ষক চিত্রটির কথা। এখানে এক শীর্ণকায় খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির মানুষকে পটজুড়ে দেখিয়েছেন শিল্পী। তার ডান হাত উত্তোলিত রেঞ্জ নিয়ে, আর বাম হাত বুকের কাছে নিবদ্ধ। রেঞ্জের ঠিক ওপরে রাহুগ্রস্ত চাঁদ আর পটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বিস্তৃত অন্ধকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি যেন তাদের রাহুগ্রস্ত জীবনের দুর্দশাকে নির্দেশ করে। নিচের বাম দিকে মনুষ্য করোটিরূপী অদ্ভুত এক প্রাণীর পিঠে বসে, ক্ষমতাসীনরা জীবনকে উপভোগ করতে চলেছেন ডান দিকের বিবসনা বিকৃত নারী চরিত্রের দিকে। নিচে বাম দিকের কোনায় যেন দর্শক হিসেবে রয়েছে এক পুরুষ চরিত্র।

পোল্যান্ড পর্বের অধিকাংশ কাজই সাদা-কালোতে ছাপা। প্রতিটা কাজের রেখাচিত্র এবং বুনট নির্মাণের জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ও যত্নশীল থেকেছেন তিনি। তবু তাতে রেখার সাবলীলতা একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি। বরং রেখার পৌনঃপুনিক এবং উপকরণের সচেতন ব্যবহারে নির্মাণ সংহতি লাভ করেছে। কিছুটা পরাবাস্তববাদী আবহ বিদ্যমান এ সময়কার কাজে। বুনটের ব্যবহারও কম। দুয়েকটি কাজ ভিন্ন অধিকাংশ কাজেই সামান্য হলেও শূন্য পরিসর ছেড়েছেন। যা পরবর্তীকালে একেবারেই দেখা যায় না, বরং তাঁর ছাপাই ছবি হয়ে ওঠে ঘননিবদ্ধ উপকরণ ও বুনটযুক্ত এবং বর্ণিল।

আশির দশকের শুরুতে তাঁর সামনে সুযোগ আসে বিশ্বখ্যাত শিল্পী এস. ডব্লিউ. হেইটারের সাথে কাজ করার। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হেইটার 'আতেলিয়ার-১৭' নামের একটি স্টুডিও গড়ে তোলেন। সমকালীন ছাপচিত্র চর্চায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠে। কালিদাস কর্মকার ১৯৮১-১৯৮৪ পর্যন্ত আতেলিয়ার-১৭-তে হেইটার আবিষ্কৃত রঙিন এচিং পদ্ধতি (যা *হেইটার টেকনিক প্রিন্ট* বা *ভিস্কোসিটি* পদ্ধতি বলে পরিচিত) রপ্ত করেন। কলকাতা ও পোল্যান্ড পর্বের অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানের সাথে নতুন শেখা করণকৌশলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগে তাঁর শিল্প এ সময় নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। এ সময় থেকেই

তিনি রঙিন এচিং শুরু করেন। *ইমেজ*-১ (১৯৮৪), *ইমেজ*-২ (১৯৮৪), *ইমেজ*-৬ (১৯৮২), *ইমেজ*-৭ (১৯৮১), *ইমেজ*-১১ (১৯৮৩), *ইমেজ*-১৬ (১৯৮৩), *ইমেজ*-৯ (১৯৮৫), *ইমেজ*-১৭ (১৯৮৮) ইত্যাদি তাঁর ছাপাই ছবির দ্বিতীয় পর্ব নির্দেশক কাজ।

লাল আর কালো রঙে ছেপেছেন *ইমেজ*-৭। বিষয়বস্তুতে থেকেছেন পৌরাণিক দেবদেবী এবং পবিত্র প্রতীককেন্দ্রিক। দেবদেবী, গরুড় পাখি, মাঝ বরাবর উপস্থাপিত নল এবং তার দুই প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা অর্ধবিকৃত মানব চরিত্রের রূপায়ণে রেখাচিত্রের নিজস্ব ঢঙে থেকেছেন পূর্বানুবর্তী। তবে বুনট নির্মাণ এবং মাছের রূপবন্ধের ক্ষেত্রে অনেকখানি বদলে নিয়েছেন নিজেকে। প্রথম পর্বের সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি এবং বিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন এ পর্বে। যেমন ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপড়েন এবং তার অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন *ইমেজ*-৬ (চিত্র ১০৩) শীর্ষক ছাপাই ছবিতে। এক রঙে ছাপা ছবিতে ভালোবাসাকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ বিবেচনা করে নিজের প্রিয়তমাকে দেখেছেন বোরাক-এর আদলে। তার সামনে সুখের দিনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে খুঁজে পাওয়া পাখির কঙ্কালকে করেছেন স্থাপন। নিচের দিকে আনুভূমিক নল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাত তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা খুঁচিয়ে আহত করছে কিছুটা কৌণিকভাবে স্থাপিত নল থেকে বেরিয়ে আসা শিল্পীকে। একটু সামনে উড়ন্ত প্রজাপতির একটি রূপবন্ধ এসেছে প্রেমের প্রতীক হিসেবে। এ ছাড়া রয়েছে নিচের দুই প্রান্তে বিপরীতমুখী ভঙ্গিতে দুটি দীর্ঘগ্রীব পাখির রূপবন্ধ। পুরো পটজুড়ে বিন্যস্ত অগণিত রেখার বঙ্কিম গতি। যেন এই রেখাগুলোই অনুভূতির গোপন জালকের মতো পুরো সম্পর্ককে বেঁধে রেখেছে। আবার ভালোবাসাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে নির্মাণ করেছেন *ইমেজ*-১১। বিক্ষত বুনট, রেখার আঁকিবুঁকি আর নানা অজানা রূপবন্ধ পেরিয়ে মুখোমুখি প্রণয়ীযুগল। বিপরীতে মুখ ফেরানো পাখির ঠোঁটে ধরা ফুল তারই ইঙ্গিতবাহী। পরক্ষণেই বিরহে কাতর হয়ে নির্মাণ করেছেন *ইমেজ*-১। মূল তলে কালোর সাথে হলুদ আর জলপাই রঙের ঘনত্বের তারতম্য ঘটিয়ে নির্মাণ করেছেন দৃষ্টিনন্দন চিত্রপট, কালিদাসের শিল্পসম্ভারে যা অত্যন্ত দুর্লভ। কেননা তিনি কখনোই গতানুগতিক সৌন্দর্যের চর্চায় মনোনিবেশ করেননি। তিনি বুঝেছিলেন, প্রথাগত চর্চার চেয়ে উদ্ভাবনের দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া ভালো।[৫৯১] তাই কালিদাস প্রথাবদ্ধ সমাবেশ রচনার পথটি এড়িয়ে গেছেন সচেতনভাবেই। তবে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিসুখকর এই চিত্রতলে ভালোবাসার প্রজাপতিকে আঁকড়াতে হাত প্রসারিত করেছেন ঊর্ধ্বমুখে। স্মৃতিরূপী অসংখ্য ললিত রেখার মায়াজাল ছিন্ন করে পলায়নপর সে। একটি কালো অর্ধবৃত্তের দুই পাশে স্থাপিত নর ও নারীমূর্তি প্রত্যক্ষ করছে তার (প্রজাপতির) চলে যাওয়া। উত্থিত হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে বিষণ্ন বসে আছে সুখপাখির রূপবন্ধ। নিচের দিকে হাতের শেষ প্রান্তে বুনটযুক্ত পরিসরে ব্যবহার করেছেন এক মায়াবী চোখ। এই চোখ, পাতা, পাখি এবং পাখির পালক এ পর্বের অনান্য ছবিতেও এসেছে। এগুলো বারবার তাঁর ছবিতে এসেছে প্রিয়তমার চোখ, প্রেমের স্মৃতি

---

[৫৯১] মইনুদ্দীন খালেদ, 'রূপদক্ষ কালিদাস কর্মকার', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৫১

হিসেবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় *ইমেজ-১৬* ছাপাই ছবিটির কথা। এ ছাড়া *ইমেজ-২*, *ইমেজ-১৭*, *ইমেজ-৯* প্রভৃতিও নরনারীর মানবিক সম্পর্কের নানা জটিল পর্যায়কে ধারণ করে আছে, যা দেশে ফেরার পরও দীর্ঘদিন তাঁর মনোলোককে আবিষ্ট করে রেখেছিল। বিমূর্ত এই বোধকে প্রকাশ করতে তাঁর ছবি কখনো কখনো হয়ে উঠেছে সর্বব্যাপী, জটিল কিংবা কুণ্ডলিত।

এ পর্বের ছবিতে শিল্পী নিজস্ব আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে। কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসাকে দেখেছেন বিভিন্ন রকমের কল্পিত প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রকাশ ঘটাতে কখনো কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন প্রচুর রেখার, যা কিছুটা হলেও হেইটারের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ঘটেছে বলে অনুমিত হয়। তবে এনগ্রেভিংয়ের পরিবর্তে কালিদাস রেখা নির্মিতির জন্য ব্যবহার করেছেন এচিং নিডল এবং সফটগ্রাউন্ড পদ্ধতি, যা তাঁর রেখাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। বস্তুত এ সমস্ত কাজে করণকৌশলের সুনিয়ন্ত্রিত এবং দক্ষ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। নমিত রং ব্যবহার, সুচিক্কন রেখা আর বুনট তৈরির মুনশিয়ানা তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিসরেও একজন দক্ষ ছাপচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বুনট নির্মাণের জন্য ওপেন বাইট, সুগার বাইট, সফটগ্রাউন্ড, স্পিট বাইট, ড্রিপটিং প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

আশির দশকের শেষ থেকে নব্বইয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত তিনি জাপানে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে জাপানি কাঠ খোদাইয়ের ওপর টোকিও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড মিউজিক-এ (১৯৮৭-১৯৮৮) এবং পরে আলফা হিল স্টুডিওতে (১৯৮৯-১৯৯০) আবাসিক শিল্পী হিসেবে জাপানি ওয়াসি পেপার আর্টের ওপরে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই জাপান পর্বে শিল্পী অনেকখানি বিমূর্ত আবহে নির্মাণ করেছেন পরিসর। যদিও তাতে কখনো-সখনো পরিচিত রূপবন্ধ উঁকিঝুঁকি মারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *ইমেজ-৩* (১৯৮৮), *ইমেজ-৫* (১৯৮৮) ইত্যাদির কথা। কখনো আবার ছাপাই ছবির বিশুদ্ধতার প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে প্রিন্টের ওপরে হাতে কাজ করেছেন। শিক্ষানবিশকালীন সময়ের পর মাধ্যমের বিশুদ্ধতা কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি তাঁর কাছে। চিত্রকলা ভাস্কর্য কিংবা ছাপাই ছবি– সবকিছুকে তিনি একত্রে শিল্প বলে বিবেচনা করেছেন। *ইমেজ-১০* (১৯৯০) (চিত্র ১০৪), *ইমেজ-১২* (১৯৯৭) প্রভৃতিতেও দেখা যায় একই প্রবণতা। এসব শিল্পকর্মের কোনো ছোট ছোট অংশে যোগ করেছেন কোনো নরনারীর রেখাচিত্র, কখনো বা কোনো চিহ্ন বা প্রতীক। তবে এতে জাপানি শিল্পের সূক্ষ্মতা, বলিষ্ঠতা ও নমিত রঙের বিন্যাস এবং সেইসঙ্গে তাঁর নকশা নির্মাণ, বুনট তৈরি ও রং ব্যবহারের অসামান্য দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নব্বইয়ের দশকে এসে এসব কাঠ খোদাই ও অন্যান্য মাধ্যমের সাথে সেরিগ্রাফ মাধ্যমেও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তিনি। এর মাধ্যমে সেরিগ্রাফিতে রেখা ও বর্ণ লেপনের চরম উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন শিল্পী কালিদাস কর্মকার। এটি অন্য শিল্পীদের কাছে তখনো ছিল অভাবনীয়। *ইমেজ-৯* (১৯৯৭), *ইমেজ-১৪*

(১৯৯৭)। এসব শিল্পকর্মেও জ্যামিতিক নানা আকৃতির সাথে ক্রমশ ঘনতর বিভিন্ন রঙের আস্তর আর পূর্বের ব্যবহৃত নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপচিত্র নির্মাণ করছেন। একে তিনি ‘ডিজিটাল লিথোগ্রাফ’ বলে অভিহিত করে থাকেন। এতে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ বা ইমেজের ক্ষুদ্রাংশকে কম্পিউটারের বিভিন্ন এফেক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে শিল্প নির্মাণ করে থাকেন। কখনো কোনো বিমূর্ত আকৃতি, এলোমেলো রেখা, অজানা রূপবন্ধ যেমন এসেছে, তেমনি বিভিন্ন অর্থবহ প্রতীক, বৃত্ত, ত্রিভুজ কিংবা আয়তাকার গড়নের মতো পরিচিত আকৃতিও এতে পরিলক্ষিত হয়। ডিজিটাল ইমেজের ওপরে কখনো আবার সরাসরি রং-তুলির প্রলেপ চালিয়েছেন। সব মিলিয়ে এই ডিজিটাল লিথোগ্রাফ শিল্পী কালিদাসের সৃষ্টিসম্ভারকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করলেও তা ছাপাই মাধ্যমে তাঁর পূর্বের সৃজন-উৎকর্ষকে ঠিক কতটা অতিক্রম করতে পেরেছে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

কালিদাসের সৃষ্টিসম্ভারে শিল্প নির্মাণের মাধ্যম এবং উপকরণের অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। শিল্পসৃষ্টির এক অতৃপ্ত বাসনা তাঁকে তাড়িয়ে ফেরে সবসময়। আর সে অদম্য কর্মস্পৃহায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি নিমগ্ন হয়ে পড়েন সৃষ্টিতে। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজিয়ে দিয়ে কাব্যিক গীতলতায় নির্মাণ করেন পট। তাই তাঁর কাজ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> His work is elegant. If you look for melody, you can find it there. His style is very close to music, music of despair. He offers a certain proposition of the passionate present, which is sad.[৫৯২]

শুরু থেকেই প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতার কারণে নিজের জাত চিনিয়েছেন শিল্পী কালিদাস কর্মকার। ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে প্রথমে কিছুটা বর্ণনাত্মক থাকলেও পরবর্তীকালে চিত্রকলার মতো তা-ও হয়ে ওঠে প্রতীকী ও সংকেতময়। পরিচিত-অপরিচিত রূপবন্ধ নানা প্রতীক আর চিহ্নের সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন যেন এক কল্পণার জগৎ। প্রাকৃতিক রূপবন্ধের সঙ্গে মানবিক উপলব্ধির এক সমন্বিত বিবর্তন যেন তাঁর কাজ। সহজ সাংগীতিক এই কাজ সম্পর্কে তাই যথার্থই বলা হয়েছে ‘প্রথম অলো’য় প্রকাশিত সংবাদে। তাঁর কাজে–

> গহিন প্রশ্ন যত আছে, উত্তর খোঁজার প্রয়াস তত নেই। ছবিতে অতল আবেগ আছে, যুক্তির বেড়াজাল নেই। রূঢ় বাস্তবের নিঃসংকোচ প্রকাশ আছে, নান্দনিকতার অনুরণন নেই। কালিদাসের ছবিতে শুধু বেদনা এবং বেদনা প্রকাশের ব্যাপারটিই মুখ্য নয়, বরং এটি সময়, স্থান এবং অবিশ্রান্ত মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যকার সম্পর্ককেও মূর্ত করে তোলে। হতাশ আকাঙ্ক্ষা, তান্ত্রিক শিল্প-নৈপুণ্য, সযত্নে লালিত স্মৃতি এবং প্রতীকী অনুসন্ধানের

---

[৫৯২] B. K. Jahangir, ‘Portrait of a Painter : Kalidas Karmakar’, *Alluvial Diary* শিরোনামের একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত, পৃ ৫

> সম্মিলিত পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় তাঁর চিত্রকলায়। তাঁর কাজে বিভিন্ন সামান্য উপাদান, বুনট, আকার এবং রঙের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়।[৫৯৩]

শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কোনো শৈলী, দর্শন কিংবা নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিবর্তে মনের তাৎক্ষণিক অনুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> বিশদ অর্থে তার ছবি সত্তার রূপান্তরের উপাখ্যান। পরস্পরবিরোধী দুই অনুষঙ্গে এক চৌকস সমীকরণ।[৫৯৪]

তাঁর ছবিতে বস্তুর সাদৃশ্যধর্মিতা রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু আলোছায়ার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার নেই। তাঁর শিল্পজীবন সমাজ আর রাজনীতির বিক্ষত বোধ এবং রূঢ় বাস্তবের প্রতিচ্ছবি যেন। নতুন নতুন বিষয়, রেখা ও বুনটের স্বতঃস্ফূর্ত এবং জঙ্গম ব্যবহার ছাপচিত্রের চিরস্নিগ্ধ ও শান্ত স্বভাবটিকে ভেঙে ফেলে কখনো কখনো। তাই তা নয়ন-সুখকর হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বরং দৃষ্টিকে আহত করে। যা তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ। কালিদাস কর্মকার দীর্ঘদিন একই করণকৌশল এবং বিষয়ের আবর্তে থাকেননি কখনোই। বরং কিছুদিন পরপর মাধ্যম ও করণকৌশলের সাথে বিষয়ও বদলে নিয়েছেন আমূল।

এ দেশে ছাপচিত্র শিল্পের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে একজন সংগঠক হিসেবেও কালিদাস কর্মকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলেন 'আতেলিয়ার' ৭১'।[৫৯৫] চরম বৈরিতার মাঝেও এই স্টুডিও প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত (বর্তমানে 'কসমস আতেলিয়ার' ৭১ নামে) দেশে ছাপাই ছবির পরিমণ্ডলকে আরও ব্যাপ্ত ও গুরুত্ববহ করে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এই অনন্য সাংগঠনিক দক্ষতা, সহজাত সৃজনশীলতা, সুদক্ষ কর্মস্পৃহা আর ব্যাপক উৎপাদনশীলতা তাকে এ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীতে পরিণত করেছে।

একদল উচ্ছল তরুণের হাতে এ দেশের শিল্পকলা সত্তরের দশকে নতুন দিশা লাভ করেছিল। শিল্পী শহিদ কবির সে তরুণ প্রজন্মের অন্যতম একজন। ষাটের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন। নিজের সৃজন উৎকর্ষ আর শক্তিমত্তায় সত্তরের দশকের প্রথমেই শিল্পানুরাগীদের কাছে নিজের অবস্থান করে নিলেও ছাপচিত্রী হিসেবে শিল্পী শহিদ কবিরের আবির্ভাব আশির দশকের শেষে স্পেন প্রবাসী হওয়ার পর। শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে পুঁজি করে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আর্ট কলেজে শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে স্পেন চলে যান শিল্পকে

---

[৫৯৩] http://www.prothom-alo.com/life-style/article/375082/কাল-থেকে-কালিদাস-কর্মকারের-'পাললিক-আত্মা' প্রেক্ষিত ১৬-১২-২০১৬ খ্রি.

[৫৯৪] মইনুদ্দীন খালেদ, 'রূপদক্ষ কালিদাস কর্মকার', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৫১

[৫৯৫] ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের কিবরিয়া ছাপচিত্র মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় প্রকাশিত, পৃ ১৮; ড. বজলুর রশীদ খান (রশীদ আমিন), 'বাংলাদেশের ছাপচিত্র: উৎস-কথা ও পরম্পরা' (ড. বজলুর রশীদ খান (রশীদ আমিন), 'বাংলাদেশের ছাপচিত্র: উৎস-কথা ও পরম্পরা', *ফাইন আর্ট দ্য জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ফাইন আর্ট স্টাডিজ*, ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৫, পৃ ৭০) শীর্ষক রচনায় আতেলিয়ার' ৭১ স্থাপনের সময়কাল ১৯৮৫ বলে উল্লেখ করেছেন

আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে। কিন্তু কোনো ধরনের সরকারি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ছাড়া শুধু ছবি এঁকে স্পেনে তৃতীয় বিশ্বের একজন তরুণ শিল্পীর জীবনধারণ ছিল অসম্ভব। তখন বাধ্য হয়ে অন্যের ছবি ছেপে দেওয়ার কাজ শুরু করেন তিনি। তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কারণ ছাপচিত্রের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন দেশে থাকতেই। তখন দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে জ্যামিতিক বিন্যাসে অবয়বধর্মী কিছু ছাপচিত্র রচনার মাধ্যমে অল্পবিস্তর চর্চাও করেছিলেন কাঠ খোদাই, এচিং এবং ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে। সেই শিক্ষাই তাঁকে এই বিরুদ্ধ স্রোতে টিকে থাকতে সাহায্য করে। পরে ধীরে ধীরে হাত পাকিয়েছেন বিশ্বখ্যাত সব গুরু শিল্পীদের শিল্পকর্মের ছাপ নিতে নিতে। প্রকৃতপক্ষে আশির দশকের প্রায় পুরোটা সময় তিনি ব্যস্ত থেকেছেন অন্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের ছাপ তৈরির কাজে। এ সময় স্পেনের বৃহত্তর শিল্প পরিমণ্ডল তাঁর শিল্পবোধকে আমূল পাল্টে দেয়। বিশ্বশিল্পের অন্যতম এ কেন্দ্রস্থল থেকে স্বীয় বোধবুদ্ধি আর চেতনায় গ্রহণ-বর্জন আর জারন-বিজারনের খেলায় নির্মাণ করেন এক স্বতন্ত্র শিল্পভুবন। সত্তরের দশকে তাঁর শিল্পে মরমি আধ্যাত্মবাদের যে ছায়া আমরা লক্ষ করি, এ সময় তা পুরোপুরি অপসৃত হয়। আমূল বদলে যায় তাঁর পট। বাউল সাধক লালনের মর্মবাণী তাঁর দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মৌনী আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে রূঢ় বাস্তবতা বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর। ছোট ছোট অনেক আপাত গুরুত্বহীন বিষয় ও বস্তু স্থানলাভ করে তাঁর শিল্পে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> স্পেনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি লালন ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ছবি আঁকতাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধীরে ধীরে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা অনুভব করলাম। দেখলাম, স্পানিশদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিকতা - এসবের জায়গা বড় কম। অতীন্দ্র কোন কিছুকে তাঁরা পাত্তা দেয় না। তখন আমার উপলব্ধি হলো যে, লালনের ভাবনায় রূঢ় বাস্তবতা থেকে এক ধরনের পলায়নপরতা আছে। লালনের ভাবনা যদিও মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু মানুষের বিদ্রোহী ও সংগ্রামী সত্তাকে সে কখনো কখনো নিষ্ক্রিয় করে রাখে।[৫৯৬]

ইউরোপীয় শিল্পপরিমণ্ডলে তাঁর শিল্পবোধ আরও পরিণত হয়। এ সময় বিশ্বশিল্পের মহীরুহরা এবং স্পেনের তৎকালীন সামাজিক জীবনচিত্র তাঁর সৃষ্টিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইউরোপের আন্তর্জাতিক ও উন্মুক্ত পরিবেশে তেলরং ও ছাপচিত্র নিয়ে নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হন তিনি। বিশেষত ছাপাই ছবিতে তাঁর এই নিরীক্ষা রং-রেখার এক নিবিড় ছন্দ সৃষ্টি করে। *পিকাসোর প্রতি শ্রদ্ধা* (১৯৮৮) শীর্ষক ছাপচিত্রটিতে তাঁর নিরীক্ষার প্রমাণ পাই। উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে এলোমেলো বিক্ষত বুনটযুক্ত তলে ইস্ত্রি চালনারত এক সরল নগ্ন নারীমূর্তি বিষয় হয়েছে এর। একটি মাত্র ধাতব পাত ব্যবহার করে তাতে বিভিন্ন গভীরতার রেখা তক্ষণ শেষে স্থানিকভাবে হলুদ এবং কালো রং প্রয়োগ করে ছাপ নির্মাণ করেছেন। এলোমেলো রেখা আর বিক্ষিপ্ত বুনটে নির্মাণ করেছেন *পুরনো স্নানঘর*

---

[৫৯৬] মইনুদ্দীন খালেদ, 'শহিদ কবির : বিদ্রোহী, মরমি, ইন্দ্রিয়প্রবণ', ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *তোমার পরে ঠেকাই মাথা* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে প্রকাশিত

(১৯৮৯)। গভীর এবং উন্মুক্তভাবে তক্ষণ করার ফলে এসব ছবিতে রেখার ঋজুতা কিছুটা কম, যা পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে *মেলিটিলা* (১৯৯০) শীর্ষক ছবিতে (চিত্র ১০৫)। স্পেনের জনপ্রিয় খেলা ষাঁড়ের লড়াইয়ে নামার আগে সাইকেলের হাতলে মহিষের শিং-সদৃশ কিছু বেঁধে পরিচালককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মুহূর্ত এতে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। খুব সাধারণ এবং সরলভাবে বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন। ছাপাই ছবির সংস্করণ বিশুদ্ধতার উর্ধে উঠে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মাঠ বোঝাতে ছবির নিচের দিকে খানিকটা অংশে বালির স্তর জুড়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে স্পেনীয় শিল্পী তাপিজের ক্যানভাসে মাটি লেপে দেওয়ার কৌশল দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত বলে অনুমিত হয়। সমসাময়িক স্পেনের সমাজচিত্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা *দ্য স্ট্রিট সার্কাস* (১৯৯০)। এতে একটি বেঞ্চের এক প্রান্তে এক জিপসি তরুণকে ট্রাম্পেট বাজাতে দেখা যাচ্ছে। অন্য প্রান্তে একটি মইয়ের ওপর শারীরিক কসরত প্রদর্শন করছে একটি ছাগল। এখানেও ছাঁচ নির্মাণের জন্য গভীর তক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। চিত্রতল নির্মাণ করেছেন সাদা ও কালোর বৈপরীত্যে। সাদা সমতল পটের বিপরীতে ছায়ামূর্তির মতো উপস্থাপন বিষয়ের। ছবিটির রেখা মোটা ও কালো এবং বিষয়ের কাঠামোবিন্যাস নিতান্ত সরল। বিষয় উপস্থাপনে একই রকম সরলতাপন্থী হলেও চিত্রতল বর্ণিল হয়ে উঠেছে *সলিটারিও-১* (১৯৯০) ও *সলিটারিও-২* (১৯৯০) ছাপচিত্র দুটিতে। গভীর ও উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে নির্মিত এই ছবি দুটিতে দৃশ্যত একটি গাছের নিঃসঙ্গতার আড়ালে শিল্পী রঙিন পৃথিবীতে প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার কথাই যেন প্রকাশ করেছেন। শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা আর একাকিত্বে নিজেকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। এ সময় থেকেই বিষয়ের উপস্থাপনে সরলতা এবং করণকৌশল ও রং প্রয়োগের দক্ষতা তাঁর শিল্পকে বিমূর্ত আবহ দান করে, যদিও তা সব সময় দৃশ্যমান অভিজ্ঞতারই উপস্থাপন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *হাইওয়ে* (১৯৯২) এবং *মার্গারিটা*, *স্পানিশ ফুল* (১৯৯৪) শিল্পকর্ম দুটির কথা। এখানে এচিং ও সুগার লিফটিং পদ্ধতিতে ছাঁচ নির্মাণ করে একাধিক উজ্জ্বল রঙে ও ধাপে ফুটিয়ে তুলেছেন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আঁকাবাঁকা রাস্তা এবং ছোপ ছোপ রং ও বঙ্কিম রেখায় ফুলের নান্দনিক প্রকাশ। কিন্তু রোমান্টিক আবেগের সে তুলি চালনায় বিষয় তার নিজস্ব প্রকাশরূপ হারিয়ে রং-রেখা আর বুনটের ছন্দোবদ্ধ উপস্থিতিতে পরিসরকে বিমূর্ত করে তুলেছে যেন। আসলে দুর্নিবার হৃদয়াবেগের প্রকাশে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বঙ্কিম রেখা আর ছোপ ছোপ বর্ণোপচারের। বহু পূর্বে ছোপ ছোপ রঙের আশ্রয়ে দৃশ্যজ বাস্তবতার যেমনটা উপস্থাপন করেছিলেন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী ক্লদ মনেও। তাই শিল্পী ক্লদ মনেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন *মনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-১, ২, ৩, ও ৪* (২০০০) শিরোনামের মনের আঁকা শিল্পের বিনির্মাণ করে। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের এই ধারা তাঁর চিত্রকলা এবং ছাপচিত্র উভয় রীতিতেই বহাল থেকেছে সবসময়। লালন, পিকাসো, মনে থেকে সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথও এসেছেন এই একই ধারায়। সংকটে-সম্ভাবনায় এদের প্রেরণার পাশাপাশি স্পেনের উন্মুক্ত পরিবেশও স্বপ্নীল ভাবালুতায় আবিষ্ট করেছে তাঁকে। স্পেনীয় প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে

স্পেনীয় ভূ-দৃশ্য-১ (২০০২) (চিত্র ১০৬), *স্পেনীয় ভূ-দৃশ্য-২* (২০০২) ইত্যাদি শিল্পকর্মে। নীলচে সবুজের বুকে বসন্তের আগুনরাঙা পাহাড় আর বৃক্ষরাজির অনাবিল সৌন্দর্য প্রকাশে তাঁর আবেগী আঁচড় ও জমাট বর্ণচ্ছটা এগুলোকেও পৌঁছে দিয়েছে বিমূর্ততার উপকণ্ঠে।

আঁকার মতো বিষয়ের অভাব হয়নি কখনো শিল্পী শহিদ কবিরের; বিশেষ করে স্পেন প্রবাসী হওয়ার পর থেকে। প্রবাসের রুদ্র-রুক্ষ বাস্তবতা আর দিগ্বিজয়ী সব শিল্পীদের সৃষ্টি-সান্নিধ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমূল বদলে দিয়েছে। তখন সহজলভ্য, সস্তা, ফেলনা এবং পরিত্যক্ত সব বস্তুকে যেন নতুন চোখে দেখলেন এবং সেসব তাঁর ছবির বিষয় হিসেবে নিলেন। ফলশ্রুতিতে জড়জীবনের মতো অতি সাধারণ বিষয়ও বুনট, রেখা আর বর্ণচ্ছটার প্রায়োগিক দক্ষতায় অসামান্য প্রকাশবাদী আঙ্গিক লাভ করেছে। *এবরিল* (২০০২), *নভেমব্রে* (২০০০), *উভস* (২০০২), *আমার স্টুডিও, মাদ্রিদ-১* ও ২ (২০০৪) ইত্যাদি জড়জীবন চিত্রও প্রকৃত অর্থে শৈল্পিক মর্যদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার সাথে বিষয় নির্দেশক এলোমেলো অস্পষ্ট রেখা আর অভিজ্ঞ হাতের তুলির আঁচড় একে করে তুলেছে কাব্য গুণসমৃদ্ধ ও ইঙ্গিতময়। এমনকি *মেক্সিকান লিলির* (২০০৩) মতো একটি ফুলকেও অসামান্য দরদে সৃষ্টি করেছেন তিনি। ফুল তাঁর প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। কামজ বাসনার প্রত্যক্ষ প্রকাশরূপেও ফুলকে বিবেচনা করেছেন কখনো কখনো।

ক্ষুধা ও কামনা প্রকাশে শিল্পী শহিদ কবির সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ। প্রকৃতির মতো তাঁর উপস্থাপিত চরিত্রসমূহ কোনো না কোনোভাবে তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে শিল্পী আর শিল্প আলাদা কিছু নয়। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, বিষয়ের সাথে শিল্পীর সম্পর্ক আত্মিক না হলে প্রকাশ সার্থকরূপ লাভ করে না। এ কারণে অন্যান্য চরিত্রের মতো তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ নারী চরিত্রগুলোরও আড়ালে রয়েছে দুঃখ, কষ্ট, সুখস্মৃতি বা জীবনের নানা অনুষঙ্গের বিবিধ ব্যঞ্জনা। চিত্রকলায় *বস্তির রাণী* কিংবা *নার্গিস*-এর মতো নারীচরিত্র যেমন দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিরূপ, তেমনি ছাপচিত্রে *ক্লো* (২০০৩) ও *মার্তা* (২০০৩) উসকে দেয় সুখের স্মৃতিগুচ্ছ। লাল আর হলুদের উচ্ছ্বাসে স্টুডিওভিত্তিক উপস্থাপনভঙ্গিতে এঁকেছেন অতীতের বান্ধবীদের। তবে এখানে আলোছায়ার স্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত। আবার উপস্থাপনে বাস্তবানুগত্য থাকলেও তা ঠিক একাডেমিক রিয়েলিজমের শর্ত পূরণ করে না। বরং রঙের এলোমেলো ছোপ বিষয়ের উপস্থাপনকে আরও উষ্ণ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

শহিদ কবিরের শিল্পে অতীত স্মৃতি, স্পেনের জনজীবন, নিসর্গ যেমন উঠে এসছে তেমনি সীমাহীন আবেগে এ দেশের সমাজবাস্তবতাও তাঁকে আন্দোলিত করেছে। প্রবাসজীবনের ফাঁকে যখন সময় কাটিয়েছেন জন্মভূমিতে তখন এ দেশের মানুষের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নিসর্গ ইত্যাদিও তাঁর শিল্পে প্রকাশরূপ লাভ করেছে সমান গুরুত্বে। স্পেনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে আরও বেশি এ দেশের মাটি ও মানুষলগ্ন করেছে। তবে তা অ্যাক্রেলিক-টেম্পেরায় যতটা, ছাপাই মাধ্যমে ততটা

নয়। শহিদ কবিরের ছবি মানে অনর্গল রঙের সংযোজনে গড়া রঙের ছবি। চিত্রকলায় তাঁর রং মলিন, অনেকটাই দৃষ্টিনন্দন কোমল ব্যাপারটাকে যেন এড়িয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ছাপাই ছবিতে তাঁর বর্ণ প্রলেপ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও দৃষ্টিনন্দন, যা একই সঙ্গে অর্থবোধকও। সেটা সম্ভবত মাধ্যমগত ভিন্নতার কারণেই ঘটে থাকবে। কারণ ক্যনভাস ও ধাতব পাতে তাঁর কাজের ধরণ একই; নিজের আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই তখন মূল বিষয়। বস্তুত বিষয়-নির্বাচন ও বর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শহিদ কবিরের আঙ্গিক একেবারে ভিন্ন। রং ব্যবহারের এই মৌলিকত্ব তাঁর সৃষ্টিকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়। এ ক্ষেত্রে মিগেল বারসেলো ও অ্যান্তোনিও তাপিজ তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ছবিতে রেখা এবং রেখাচিত্রের নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্য দৃশ্যত কম কিন্তু এর গঠন কাঠামোর বলিষ্ঠতা বিষয়কে সত্যনিষ্ঠ রাখে। প্রথাবিরুদ্ধতা, তুচ্ছ উপেক্ষিত বিষয়কেও সমান গুরুত্বে প্রকাশের সাহসিকতা এবং মাধ্যমের প্রতি নির্লিপ্ত সাধনাই শিল্পী শহিদ কবিরের শিল্পের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

সত্তরের দশকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অন্যতম শিল্পী আবদুস সাত্তার। একজন প্রাচ্য রীতির চিত্রশিল্পী গবেষক এবং লেখক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তিনি এ দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রীও। সত্তরের দশকে যে কয়েকজন শিল্পীর হাত ধরে এ দেশের ছাপচিত্র নতুন পথের দিশা লাভ করে, আবদুস সাত্তার তাঁদের একজন। মাধ্যমের প্রতি তাঁর নির্মোহ অনুরক্তি আর নিরন্তর চর্চা এ মাধ্যমে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছাপচিত্র মাধ্যমের স্যাথে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ঘটে ষাটের দশকের শেষ নাগাদ ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন। কিন্তু এ মাধ্যমের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে মধ্য সত্তরে (১৯৭৩-৭৫) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে। সেখানে প্রথম বছর চিত্রকলায় এবং শেষ বছর ছাপচিত্র বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কাজ করেছেন কাঠ খোদাই, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফ, মনোপ্রিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট প্রভৃতি মাধ্যমে। *প্রসাধন* (১৯৭৪), *উপবিষ্ট মহিলা* (১৯৭৪), *মহিলা* (১৯৭৪), *একটি বালিকা* (১৯৭৪), *বাউল* (?), *ফুল বিক্রেতা* (?), **১৯৭১-৭২** (?), *হরিণ* (১৯৭৪), *সাঁওতাল রমণী* (১৯৭৫), *মুখ (১৯৭৬)*, *কালো হাত (১৯৭৬)*, *দুই মুখ* (১৯৭৬), *নারী ও ভালবাসা* (১৯৭৮), *প্রিন্ট*-২ (১৯৭৯) ইত্যাদি তাঁর প্রথম দিকের কাজ। এ সময়ের অধিকাংশ কাজে প্রাচ্য ধারার স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পরিচ্ছন্ন ও অলংকৃত রেখার সাথে বিষয় নির্বাচনের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থেকেছেন নারী ও নারীকেন্দ্রিক। তাদের চোখ বড় বড়, কখনো অর্ধনিমীলিত। এ ছাড়া পাখি ও প্রাণী বিষয়ক অবয়ব-নির্ভরতাও দেখা যায়। তবে বিষয়ের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হয়েছেন অর্ধ-বিমূর্তরীতির অনুসারী। পরাবাস্তববাদিতা এবং রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান তাঁর এ সময়ের কাজে। তাঁর চরিত্র, পোশাক এবং প্রেক্ষাপটসমূহ অনেকখানি উজ্জ্বল ও অলংকৃত হলেও একধরনের বিষণ্নতাও যেন পরিলক্ষিত হয় এ চরিত্রসমূহের অভিব্যক্তিতে।

মোটা ব্রাশের বলিষ্ঠ টানে এঁকেছেন *প্রসাধন*। অর্ধ-বিমূর্ত শৈলীতে পটের পুরোটাজুড়ে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে উপস্থিত সৌন্দর্যচর্চারত রমণী। এতে রেখার তেজস্বিতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, দৃঢ়তা এবং যথার্থতা জানান দিচ্ছে এ মাধ্যমে তিনি কতখানি দক্ষ। গভীর জঙ্গলের বিপরীতে বঙ্কিম ভঙ্গিতে *হরিণ* এঁকেছেন ইন্টাগ্লিও পদ্ধতিতে। চিত্রের মূল জমিন বুনট-প্রধান, যার বৈশিষ্ট্য জানান দিচ্ছে জঙ্গলের অস্তিত্বের। আবার নগ্ন নারীর সলজ্জ চাহনি নির্মাণ করেছেন *উপবিষ্ট মহিলা*তে। পশ্চাৎপটের ফুল ও লতাপাতার সাথে নগ্ন নারীদেহ একইসঙ্গে রহস্য ও সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে। লম্বা লতার জড়াজড়ি করে থাকা অগ্রভাগ এবং হাত, পা, গলা ও কোমরে অলংকারের উপস্থিতি আনন্দদায়ক অনুভূতি প্রকাশক যেন। সূক্ষ্ম সরু রেখা, অর্ধনিমীলিত চোখ এবং চরিত্রের কোমলতা ও আলংকারিকতা একে প্রাচ্যদেশীয় শিল্প প্রতিপন্ন করে। *বাউল* ছবিতে হলুদ পশ্চাৎপটে গাঢ় খয়েরি পাঞ্জাবি গায়ে আর হাতে একতারা নিয়ে উপস্থিত বাউল। এখানে তার অভিব্যক্তি জানান দেয় সে বাউল।[৫৯৭] অর্ধ-বিমূর্ত ভঙ্গিতে এঁকেছেন *মহিলা* বলিষ্ঠ রেখার আঁচড়ে। এটি বেশ ব্যতিক্রম এজন্য যে, তাঁর ছবির ক্ষেত্রে সচেতনভাবে বুনটের ব্যবহার খুব বেশি লক্ষণীয় নয়। এতে চুলের অংশের ঘনত্ব তৈরিতে পাতলা কাপড়ের ছাপ দিয়ে নির্মাণ করেছেন বুনট। আবার নত আঁখিপল্লব আর গভীর আত্মমগ্ন ভঙ্গিতে নারীমুখ এঁকেছেন *মুখ* ছবিতে। চোখ-মুখের রৈখিক গড়নে প্রাচ্য ঘরানার সরলতার সাথে একধরনের বলিষ্ঠতাও দৃশ্যমান এতে। যেন কোনো প্রতিজ্ঞার পূর্বক্ষণ, একটু পরেই এই কোমল রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সংকল্পের দৃঢ়তা। একই সময়ে ইন্টাগ্লিওতে এঁকেছেন *দুই মুখ*। তবে তা পূর্বের তুলনায় অনেকটাই সরল ও আঙ্গিক-প্রধান। একটি আয়তাকার পরিসরে বড় চোখ আর দীর্ঘ নাকের নারী ও পুরুষের চতুষ্কোণাকার সরলায়িত দুটি মুখ এঁকেছেন পাশাপাশি। পুরুষের মুখের গোঁফ আর নারীর নাকের নোলক আকৃতি দুটিতে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে। দীঘল তন্বী তরুণীকে এঁকেছেন *একটি বালিকা*তে। শরীরের তুলনায় তার মুখ অনেক ছোট ও সরলতা-উত্তীর্ণ। ছবির পশ্চাৎপট এবং অবয়বটি জাঁকালোভাবে অলংকৃত, যা মোঘল অনুচিত্র কিংবা পারসিক চিত্রকলার কথা মনে করিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছেন **১৯৭১-৭২** লিথোগ্রাফটি দিয়ে। ছবিতে এলোচুলে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে এক নগ্ন তরুণী। পাশে একটি শূন্য বিষপাত্র। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বীরাঙ্গনাদের সামাজিক বঞ্চনা আর নিগ্রহের প্রেক্ষাপটে এঁকেছেন এ ছবিটি। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের দ্বারা সংগঠিত বীভৎসতাকে পরাবাস্তববাদী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন *কালো হাত* ছবিতে। স্নিগ্ধ চাঁদনি রাতে গাছপালা ফুঁড়ে এ দেশের বুকে নেমে আসা এক জান্তব কালো হাতের ইঙ্গিত তাতে। ভাস্কর্যসুলভ বলিষ্ঠতায় নির্মাণ রূপলাভ করেছে *সাঁওতাল রমণী*তে (চিত্র ১০৭)। ঘাড় বাঁকিয়ে দুই হাতে খোঁপায় বুনোফুল গুঁজে নিচ্ছে এ সাঁওতাল রমণী। মাথা, শরীর আর বাহুর রূপায়ণে কমনীয়তা এবং সামান্য আলোছায়ায় উপস্থাপন লক্ষণীয়। শরীর ও বাহুর তুলনায় মাথার গড়ন একটু

---

[৫৯৭] ফজলুল করিম, 'আবদুস সাত্তার ও তার সাম্প্রতিক চারুকলা', *দৈনিক বার্তা*, রাজশাহী, ৪ঠা পৌষ, ১৩৮৩, প্রাপ্ত নমুনায় পৃষ্ঠা নম্বর উল্লিখিত নেই

ছোট এবং পার্শ্বীয়ভাবে উপস্থাপিত। আর কাপড়ের ভাঁজ, পাড়, চুড়ির অলংকরণ ইত্যাদির রূপায়ণে তাঁর সূক্ষ্ম মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *নারী ও ভালবাসা* ছবিতেও কিছুটা পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে নারীচরিত্রের রোমান্টিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সালংকারা এক তরুণী। তার ঘন চুলের সর্পিল বেণি নেমে গেছে নিচ পর্যন্ত। ছবিতে প্রেমের প্রতীক হয়ে এসেছে পাখি, ফুল, লতা, পাতার অনুষঙ্গ, যা একই সঙ্গে সৌন্দর্য ও রহস্যেরও জন্ম দেয়। শুরু থেকে একধরনের রোমান্টিক আবহে অবয়বী চিত্র নির্মাণ করলেও দশকের শেষ নাগাদ তাঁর আঙ্গিকে পরিবর্তন আসে। আভাসিত হয়ে ওঠে নকশা ও প্রতীকধর্মিতা। *ছাপ*-২ শিরোনামের কাজটির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। মিশ্র মাধ্যমের ছবিটিতে মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে পানপাতার মতো একটি আকৃতি, যা সাধারণত হৃদয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া চিত্রপটের অধিকাংশটাই গড়ে উঠেছে নানা ধরনের নকশার সমন্বয়ে। সত্তরের দশকের শুরুতে অবয়ব-প্রধান অর্ধবিমূর্ত আঙ্গিকে শিল্পনির্মাণ করলেও সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ তাঁর চিত্রতলে অবয়বের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয় এবং প্রতীক ও নানা ধরনের নকশার ব্যবহারে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। এ সময়কার অধিকাংশ কাজই করেছেন কাঠ খোদাই মাধ্যমে, যা তাঁকে খ্যাতিমান ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে আবদুস সাত্তারের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ছাপাই ছবির স্বচ্ছতা এবং নিপুণ আলংকারিক বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। উডকাটের কাজে সাত্তার উপলব্ধি করেছেন কাঠের ভেতরের মর্মকে। অর্থাৎ কাঠকে বিভিন্নভাবে ব্যবচ্ছেদ করে আঁকা বাঁকা বহুভঙ্গিম রেখাকে বিন্যাস করেছেন। তারপর উজ্জ্বল রংয়ের প্রয়োগে রেখা ও গড়নে এনেছেন বর্ণিল সাযুজ্য। এ ধারার ছবিগুলো জ্যামিতিক নিয়মে। বর্গাকার আয়তাকার বৃত্তাকার বিভিন্ন মোটিভের নয়ন সুখকর সমীকরণ টেনেছেন শিল্পী আর কাঠের শরীরের যে টেক্সচার তা থেকে অনুভবে আসে গতিময় এক ব্যঞ্জনার কখনো যেন আবেগঘন মনের সঙ্গীত।[৫৬৮]

আবদুস সাত্তার কাঠ খোদাই মাধ্যমে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে বিষয়ের যে প্রতিরূপ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা এ দেশে ছিল একেবারে নতুন। তবে এ পর্বেও পরিচিত অনুষঙ্গ যেমন জ্যামিতিক নানা রূপবন্ধ, নকশা এবং বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার লক্ষণীয়। বস্তুত শিল্পী বাস্তব অনুষঙ্গের দক্ষ ব্যবহারে পরিসরকে উত্তীর্ণ করেছেন বিমূর্ততায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, *লাল বৃত্ত*-১ (১৯৭৮), *লাল বৃত্ত*-২ (১৯৭৮), *কালো রেখা* (১৯৮০), *পোড়া কাঠ*-১ (১৯৮০), *পোড়া কাঠ*-২ (১৯৮০), *পোড়া কাঠ*-৩ (১৯৮১), *পোড়া কাঠ*-৪, (১৯৮২), *পোড়া কাঠ*-৫, (১৯৮২), *পোড়া কাঠ*-৬, (১৯৮২), *হাতের ছাপ ও অর্ধবৃত্ত* (১৯৮২), *বন্ধনী ও চারটি আকৃতি* (১৯৮২), *নকশাসহ প্রিন্ট* (১৯৮৩) ইত্যাদি।

---

[৫৬৮] মইনুদ্দীন খালেদ, 'শিল্পী সাত্তারের ছবি : নিসর্গ ও মানুষের বিরোধাভাস', দ্র. *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ ১৬৬

ভারতবর্ষে থাকার সময় চিত্রকলা ও ছাপচিত্রের পাশাপাশি আবদুস সাত্তার ভাস্কর্য নির্মাণের শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নির্মাণ করেছিলেন বেশ কিছু ভাস্কর্যও। ধারণা করা যায়, উপকরণ সংগঠনের এই শিক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকবে *লাল বৃত্ত-১* ও *লাল বৃত্ত-২* কাঠ খোদাই দুটিকে। এই দুটি ছবিতেই কাঠের বৈশিষ্ট্যযুক্ত তল সংযুক্ত করে ভাস্কর্যসুলভ গড়ন নির্মাণ করেছেন সরল উপস্থাপনরীতিতে। কাঠের ধরন, গড়ন, বুনট ও রং নির্মাণে তাঁর বিশেষ মনোযোগ লক্ষণীয়। কখনো বা কাঠের আঁশের বুনটের সাথে খোদাই করেছেন নকশাও। আর ছবিতে বিশেষ মনোযোগকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যোগ করেছেন লাল বৃত্ত। আবার একটি কাঠ-সদৃশ তলের সাথে অন্য একটি তল যোগ করেছেন ভীষণ যৌক্তিকতায়। *লাল বৃত্ত-২* ছবিটিতে দর্শকের দিকে বেরিয়ে থাকা কাঠের ফালিটির মাথায় একটি হুকে সাদা সুতা যোগ করে তাকে বেঁধে দিয়েছেন ওপরের একটি ফালির সঙ্গে। সুতাটি একদিকে যেমন কাঠের ফালির সংযুক্তিকে যৌক্তিক করেছে, তেমনি তার টানটান ভাবও দর্শকের ওপর স্নায়বিক চাপ তৈরি করে। *লাল বৃত্ত-১* ছবিতে কয়েক ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাঠের ফালিকে যুক্ত করলেও মাঝখানের ফালিতে যুক্ত নকশা এতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। আর তিনটি তলের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া লাল বৃত্ত তলসমূহকে করেছে সন্নিবিষ্ট ও একক। পরবর্তীকালেও তাঁর কাজে এই বৃত্ত আংশিক পরিবর্তিত হয়ে অর্ধবৃত্তরূপে দীর্ঘদিন ক্রিয়াশীল থেকেছে।

আশির দশকের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন *পোড়াকাঠ* শিরোনামের ধারাবাহিক গুচ্ছচিত্রাবলিতে। এই চিত্রসমষ্টি নির্মাণ করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর্ট কলেজের মেধাবী ছাত্র এবং উদ্যমী তরুণ শহীদ শাহনেওয়াজের স্মরণে। যাঁকে পাকিস্তানি হানাদাররা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ কালরাতে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল তাঁর হোস্টেলের কক্ষে। যুদ্ধোত্তর সময়ে হোস্টেলের দেওয়ালে গুলির গর্ত, মেঝেতে রক্তের দাগ ইত্যাদি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে এ বিষয়টিকে নিয়ে শিল্প রচনা করতে। যেমন *পোড়াকাঠ-১* এ (চিত্র ১০৮) হলুদ জমিনের ওপর আনুভূমিক কয়েক প্রস্থ কাঠের ফালির মাঝ বরাবর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত উলম্বভাবে স্থাপিত আরো কয়েকটি ফালি, যা ধারন করে আছে বিক্ষত নানা আঁচড়, রক্তের দাগ আর নিচের দিকে গুলির আঘাতে চারটি দগদগে পোড়া চিহ্ন। পরিচিত এবং বাস্তব অনুষঙ্গ যোগ করে নির্মাণ শিল্পরূপ লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে তা একধরনের বিমূর্ত আবহও সৃষ্টি করে। এ পর্বের কাজেও পূর্ববর্তী সময়ে ব্যবহৃত বৃত্ত প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধবৃত্তে পরিবর্তিত হয়ে। *পোড়াকাঠ-২ ও পোড়াকাঠ-৩* এ অন্যান্য অনুষঙ্গের সাথে অর্ধবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে কখনো এককভাবে আবার কখনো পৌনঃপুনিকতায়। একটি রাবার জাতীয় নমনীয় বস্তুকে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকা করলে তা মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে যেমন প্রচণ্ড শক্তিতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়, তেমনি এই অর্ধবৃত্তগুলোকে পাকিস্তানিদের গুলি ও ধ্বংসের বিপরীতে এ দেশীয়দের অন্তর্গত প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন ছবিতে। যেন পাকিস্তানিদের দুঃশাসন-নির্যাতনে নত হলেও একইসঙ্গে ভেতরে ভেতরে সঞ্চিত হচ্ছে পরাধীনতার

শৃঙ্খল ভাঙার দুর্মর শক্তিও। অন্যভাবে তা সৃষ্টিশীল শক্তির আধারও। এই অর্ধবৃত্ত ও গুলির চিহ্নের সাথে *পোড়াকাঠ-৫*-এ যুদ্ধ-ধ্বংস-মৃত্যুর বিরুদ্ধে নেতি অর্থে এঁকেছেন ক্রস, সমকালীন বিশ্বরাজনীতি যার উৎসস্থল। এ ছাড়া *পোড়াকাঠ-৪*, *পোড়াকাঠ*-৬ ইত্যাদিতে অনেকগুলো গুলির চিহ্ন পটজুড়ে স্থাপন করেছেন, যা সামগ্রিকভাবে পরিসরকে করে তুলেছে বিমূর্ত। *হাতের ছাপ ও অর্ধবৃত্ত*, *বন্ধনী ও চারটি আকৃতি* একই ধরনের বিষয় এবং উপাদানের সংশ্লেষে নির্মিত শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্মগুলো একদিকে যেমন প্রিয়বন্ধুর অনাকাঙ্ক্ষিত নির্মম মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা, অন্যদিকে তা এ দেশীয়দের ওপর পাকিস্তানি হায়েনাদের চালানো বর্বর ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম প্রতীক। একইসঙ্গে তা সারা বিশ্বের যুদ্ধ-নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেককারী ও এসবের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদও। আবার *নকশাসহ প্রিন্ট* কাঠ খোদাই চিত্রটিতে নির্মাণ করেছেন সমতলীয় হলুদ জমিনে উলম্ব ও আনুভূমিক কয়েকটি রঙের পুরু তল। কোনো কোনোটি ধারণ করে আছে গুলির আঘাতের চিহ্ন কিংবা কোনো বিক্ষত বুনট। একেবারে নিচে বাম দিকের কোনায় একটি কমলা রঙের ফুলেল নকশা যেন সুন্দরের বিপরীতে ধ্বংস আর মৃত্যুর বীভৎসতা তুলে ধরে। এ পর্বের ছবিগুলোতে মেধা, মনন ও দক্ষতার সুসমন্বয় ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। পরিসরের স্পষ্ট ও মনোজ্ঞ বিভাজন করেছেন তিনি। যা দেখেছেন কিংবা যা অনুভব করেছেন, তার পুরোটাই সততা ও স্বচ্ছতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। যেকোনো ধরনের বাহুল্যকে বর্জন করেছেন দৃঢ়চিত্তে। তবে জ্যামিতির সাথে এগুলোর নিবিড় সম্পর্ক কোথাও যেন শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে জ্যামিতিক কাঠামোর এই শক্ত ব্যবহারও শ্লথ হয়ে আসে তাঁর চিত্রপটে। তবে তখনো তাঁর ছবিতে গুলির আঘাতে সৃষ্ট পোড়া দাগ, রক্ত, হাতের ছাপ ইত্যাদি এসেছে ঘুরেফিরে। বিশেষ করে আমেরিকায় ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে প্রাট ইনস্টিটিউটে পড়তে গিয়ে করা কাজেও এগুলোর উপস্থিতি চোখে পড়ে। *শিরোনামহীন-১* (১৯৮৫), *শিরোনামহীন-২* (১৯৮৫), *সম্পর্ক* (১৯৮৫), *সম্পর্ক-২* (১৯৮৫), *শিরোনামহীন* (১৯৮৬), *শিরোনামহীন* (১৯৮৬), *সুরা এখলাস* (১৯৮৬), *প্রাটের পাতা* (১৯৮৬) ইত্যাদি এ সময়কার কাজ। প্রথম দিকের ছবিতে উপাদানের সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরো পরিসরকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এ সময়কার কাজে তার পরিবর্তে শূন্য পরিসর ছাড়ার প্রবণতা দেখা যায়। গুলির চিহ্নগুলো আগের মতো সমগ্র চিত্রতলে ব্যাপৃত না থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ছোট কোনো অঞ্চলে দৃশ্যমান। কোনো কোনো ছবিতে বাক্য বা বাক্যাংশ যোগ করেছেন। কোথাও আবার আরবি ভাষার বাক্য কিংবা সুরা যোগ করেছেন। এ দেশে আরবি লিপিচিত্রণ তিনিই করেছেন প্রথম। আবার পূর্বের অর্ধবৃত্তের সাথে সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে ত্রিভুজ আকৃতিও ব্যবহার করেছেন ছবিতে। বিভিন্ন ধরনের পাতার ইমেজও ব্যবহার করেছেন কিছু কাজে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আবদুস সাত্তার খুব দ্রুতই পরিবর্তন করেছেন নিজেকে। এর ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের দশকে আবার বদলে যায় তাঁর চিত্রপট। বিমূর্ততার পরিবর্তে তাঁর চিত্রতল আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে

পূর্বের অবয়বী অর্ধবিমূর্ততায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– *ফুলসহ ছাপচিত্র* (১৯৯২), *শিরোনামহীন-ক* (১৯৯৬), *গোলাপসহ প্রিন্ট-১* (১৯৯৮), *গোলাপসহ প্রিন্ট-২* (১৯৯৮), *গোলাপসহ প্রিন্ট-৩* (১৯৯৮), *গোলাপসহ প্রিন্ট-৪* (১৯৯৮), *গোলাপসহ প্রিন্ট-৫* (১৯৯৮), *ছয় রমণী* (১৯৯৮) ইত্যাদি শিল্পকর্মের কথা। বিষয়বস্তুর সাথে এ সময়ে করণকৌশলেও কিছু পরিবর্তন ঘটান তিনি। আমেরিকায় শিল্পশিক্ষা গ্রহণের সুবাদে তাঁর জানা হয়েছিল ছাপার অত্যাধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে। তাই দেশে ফিরে তিনি অফসেট মাধ্যমের সাথে কাঠ খোদাইয়ের সুসমন্বয়ে নির্মাণ করতে শুরু করেন ছাপচিত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *ফুলসহ ছাপচিত্র* শীর্ষক ছাপচিত্রটির কথা। এতে ফুল ও লেখার অংশগুলো অফসেটে ছেপে পরে তাতে কাঠ খোদাই মাধ্যমে যোগ করেছেন অন্যান্য রং ও অনুষঙ্গ। একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন *শিরোনামহীন-ক* এর ক্ষেত্রেও। এখানে ভাস্কর্যসুলভ আকৃতির সাথে ফিতা-সদৃশ আকৃতিগুলোতে ব্যবহৃত ইমেজের উৎস অফসেটের ছাপ। এ সময়ের শিল্পকর্মসমূহে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে অন্যান্য অনুষঙ্গের সাথে বারবার ব্যবহার করেছেন ফুল। সাত্তারের ছবিতে শুরু থেকে ঘুরেফিরেই এসেছে এই ফুলের অনুষঙ্গ। কখনো গোলাপ কখনো পদ্ম, কখনো কুঁড়ি অবার কখনোবা ফুলের আকারে। কখনো প্রেমের, কখনো পবিত্রতার কিংবা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে তা এসেছে। যেমন *গোলাপসহ প্রিন্ট-১* (চিত্র ১০৯) এবং *গোলাপসহ প্রিন্ট-২* এ বাংলাদেশের মাহন মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তিনি। ছবির একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন জাতীয় স্মৃতিসৌধ। পাশে বহুলব্যবহৃত অর্ধবৃত্তাকার রূপবন্ধ এবং গোলাপ ও ফুলের পাপড়ি-সদৃশ নানা অনুষঙ্গ আলংকারিক ভঙ্গিতে। কোথাও বা কিছু বাংলা শব্দ, আমাদের অতিপরিচিত কোনো প্রাণীর রূপবন্ধও ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে, যা সবশেষে শিল্পকর্মটিকে বাংলাদেশের বলেই প্রতিপন্ন হয়। আবার অফসেট ও কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা *গোলাপসহ প্রিন্ট-৩* ও *গোলাপসহ প্রিন্ট-৪*-এ রমণীর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ফুল ব্যবহার করেছেন। এতে অর্ধবৃত্তাকৃতি, বিভিন্ন বাংলা অক্ষর ও জ্যামিতিক নানা নকশার সাথে প্রেমের প্রতীক হৃদয়ের আকৃতিও ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত, পূর্ব ও পশ্চিমকেও একসাথে বেঁধেছেন (*গোলাপসহ প্রিন্ট-৩*) দুই নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এক জোড়া কালো রোদচশমায় এক পশ্চিমা আধুনিকা এবং অন্যজন লজ্জাবনত আঁখিতে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যধারী। বস্তুত, আবদুস সাত্তার তাঁর কাজের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের সূক্ষ্ম ও সুসমন্বয় ঘটিয়েছেন সবসময়। এ সময় নানা ধরনের আকৃতি, প্রতীক আর বর্ণ ব্যবহারের পাশাপাশি অবয়বভিত্তিক চিত্র নির্মাণের দিকেও ফিরে আসেন তিনি। আবার পুরো তলজুড়ে বিষয়ের জমাট সমাবেশ নির্মাণের প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের ছাপচিত্রে আবদুস সাত্তার এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। তিনি ছাপচিত্রের শৈল্পিক উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে কাজ সংক্ষিপ্তকরণ ও সরলীকরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দেশে মেশিন ব্যবহার করে কাঠ খোদাই মাধ্যমে একইসাথে উপরিতল ও অন্তর্লীন পদ্ধতির ছাপ

নেওয়ার প্রচলন ঘটান আবদুস সাত্তার। এ ছাড়া কাঠের পরিতলে বিষয়, রং ও রেখার সংবেদনশীল ব্যবহারের মাধ্যমের সীমাবদ্ধতাকে উৎরে যেতে সমর্থ হন ঈর্ষণীয়ভাবে। সরলতা, স্পষ্টতা, উপাদানের ভারসাম্য বিধান এবং ঐকতান তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য। তবে ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে বুনটকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প নির্মাণের সহজ এবং বহুল চর্চিত প্রচলিত রীতির অনুসারী না হয়ে বরং হেঁটেছেন অপ্রচলিত পথে। ছবিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি মনোযোগ-কেন্দ্র নির্মাণের দিকে তাঁর আগ্রহ লক্ষণীয়। তাঁর ছবিতে ছোটখাটো বিষয়কেও সমান গুরুত্বে দেখার ব্যাপার উপস্থিত। খুঁটিনাটি অনেক বিষয় তিনি অনুপুঙ্খ নির্মাণ করেন সুপরিকল্পিত রেখায়। সুচিন্তিত এবং ছন্দায়িত গতিশীল রেখা, উষ্ণ ও দৃষ্টিসুখকর রং বিন্যাস এবং বিষয় উপস্থাপনের পরিমিতি বোধ তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেকেছেন কখনো সমতলীয় আবার কখনো ক্রমশ ঘনতর পশ্চাৎপট-বিশিষ্ট। প্রাচ্যরীতি-ঘনিষ্ঠ আবদুস সাত্তার পাশ্চাত্যের বিমূর্ততা দ্বারা আকর্ষিত হলেও চিত্রের উপাদান সংগঠন, বিষয় নির্বাচন এবং রং-রেখার প্রায়োগিক দিক থেকে থেকেছেন প্রাচ্যরীতি-অনুবর্তী। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য হলো–

> আমি প্রাচ্য ধারায় শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করেছি, এবং আমার সকল কাজেই এই ধারার প্রভাব যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে বিষয়ে সচেতন থেকেছি। বিষয়ভিত্তিক, বিশেষ করে ফিগারেটিভ কাজে এই ধারার সুস্পষ্ট প্রভাব যে কেউ লক্ষ্যকরে থাকবেন। তবে বিষয়হীন কিংবা প্রতীক ধর্মীকাজের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ধারার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন একথা বলা যাবেনা। কারণ এ সকল কাজে পশ্চিমী ধারার আমেজ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়, রঙ, ফর্ম, কম্পোজিশন কিংবা অন্য যে কোনভাবে প্রাচ্যের ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছি।[৫৯৯]

ছাপাই মাধ্যমে এ ধরনের প্রাচ্যরীতি-অনুবর্তী শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে এ দেশে তিনি অগ্রগণ্য। প্রাচ্য শিল্পের রহস্যময়তার সাথে ভারতীয় ধ্রুপদি শিল্পের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি এ মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন শিল্প, যা তাঁকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> আবদুস সাত্তার ওরিয়েন্টাল মিস্টিসিজম এবং ভারতীয় ধ্রুপদী কারুকলায় বেশী আগ্রহী। প্রিন্টিংকে তিনি প্রকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছে–কারণ এতে বৈচিত্র এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ প্রচুর।[৬০০]

শিল্পী আবদুস সাত্তার মোগল বা পারসিক রীতির সাথে পাশ্চাত্য রীতির সম্মিলনে শিল্প নির্মাণ করলেও বিষয়বস্তুতে সবসময় থেকেছেন দেশজ। তিনি এক বিরুদ্ধ সময়কে বেছে নিয়ে মাধ্যমের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে করেছেন প্রাচ্য ধারায় শিল্পচর্চা। কারণ সত্তরের দশকেও আমাদের শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের পাশ্চাত্য প্রীতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এমন প্রতিকূলতায়ও তিনি নিজ বিশ্বাসে অটল থেকেছেন এবং সফল হয়েছেন।

---

[৫৯৯] আবদুস সাত্তার, 'শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর "শিল্পে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং মূর্ত-বিমূর্ত বিতর্ক" বিষয়ক অভিমত', দ্র. *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*, ঢাকা, সাজু আর্ট গ্যালারি, ২০০২, পৃ ৩৭

[৬০০] ফজলুল করিম, 'আবদুস সাত্তার ও তার সাম্প্রতিক চারুকলা', *দৈনিক বার্তা*, রাজশাহী, ৪ঠা পৌষ, ১৩৮৩, প্রাপ্ত নমুনায় পৃষ্ঠা নম্বর উল্লিখিত নেই

ষাটের শেষ নাগাদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে শিল্পের বৃহৎ পরিসরে বিচরণ শুরু করা শিল্পী-প্রজন্মের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিল্পী আবুল বারক্ আল্‌ভীও ছাপাই মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ষাটের দশকের শেষার্ধে আর্ট কলেজ থেকে শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন চিত্রকলায়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতায় চিত্রকলার সম্পূরক বিষয় হিসেবে ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর পরিচয় ঘটে ছাপাই মাধ্যমের সাথে। সে সময় কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ, ড্রাইপয়েন্ট ইত্যাদি মাধ্যমে কিছু ছাপচিত্র রচনা করেন। ছাত্রাবস্থায় করা ছাপাই ছবির মধ্যে *প্রতিকৃতি* (?), *ফিগার কম্পোজিশন* (?), *ফিগার কম্পোজিশন* (?), *ভূ-দৃশ্য (১৯৬৭)* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ছবির নির্মাণ-কৌশল ও আলোছায়ার বাস্তবধর্মী ব্যবহার তাঁর পরিপক্বতা এবং রেখাঙ্কনের শক্তিমত্তাকে জানান দেয়। এ ছাড়া স্বল্প সময়ে এসব অনুশীলনমূলক চর্চায় বিভিন্ন ছাপাই মাধ্যমের সাবলীল ও যথাযথ ব্যবহার তাঁর দক্ষতার প্রমাণ। ছাত্রজীবনের শেষের দিকে তাঁর সুযোগ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আয়োজিত ছাপচিত্রী মাইকেল পন্স ডিলিয়নের পূর্বোল্লিখিত ছাপচিত্র কর্মশালায় অংশগ্রহণের। (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কর্মশালার অন্য অংশগ্রহণকারী শিল্পী মাহমুদুল হক) দুই মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা নতুন নতুন করণকৌশলের সাথে ছাপচিত্র মাধমের ব্যাপ্তি ও এর শক্তিমত্তাকে নতুনভাবে তুলে ধরে তাঁর সামনে। এই কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের করণকৌশলের প্রয়োগে বেশ কিছু ছাপচিত্র রচনা করেন তিনি। এর মধ্যে একটি হলো *অভ্যন্তর* (১৯৬৭)। এতে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শূন্য শয্যাসহ একটি ঘরের অভ্যন্তরভাগকে তুলে ধরেছেন শিল্পী। অজস্র রেখার কাটাকুটিতে নির্মিত ছবিটির দরজায় বাইরে গমনোদ্যত দুটি ছায়াবৎ নারীমূর্তি। বিছানা দুটির রৈখিক গড়নে ত্রিমাত্রিকতার অবভাস থাকলেও ছবির পশ্চাৎপট দ্বিমাত্রিক এবং এর বিরচন কৌশল সরল। এ ছাড়া *পুরানো ঢাকা* (১৯৬৭), *বাড়ির পথে* (১৯৬৭) ইত্যাদি এ কর্মশালার উল্লেখযোগ্য কাজ।

ষাটের দশকের শেষে (১৯৬৮) তিনি যখন স্নাতক সম্পন্ন করেন, দেশ তখন উত্তাল জাতীয়তাবাদী চেতনায়। জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যবাদী ও আগ্রাসী নীতি স্পষ্টভাবে এ দেশের মানুষকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে, শুধু ধর্মের খাতিরে দুটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জনগোষ্ঠী একত্রে থাকতে পারবে না। ফলে অনিবার্যভাবে শুরু হয় স্বাধিকারের দাবিতে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তখনকার তরুণ প্রজন্ম। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সেই জাগরণে সমাজের অগ্রসর, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংবেদনশীল অংশ হিসেবে আমাদের তরুণ শিল্পীরাও ব্যাপকভাবে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে সমূহ সচেতন তরুণ শিল্পী আল্‌ভীও ছাত্রজীবন থেকেই শিল্পীসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সামিল হন দেশ মুক্তির সেই সংগ্রামে। এই সংগ্রাম সত্তরের দশকের প্রথম দিকে (১৯৭১) রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে এবং নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্পী আবুল বার্ক আলভী বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের

ছাপচিত্র বিভাগে যোগদান করেন শিক্ষক হিসেবে। এর মাধ্যমে পুনরায় তাঁর সামনে ছাপচিত্র মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় লিথোগ্রাফে ছাপেন *কম্পোজিশন* (১৯৭৪)। তাতে তলের সমগ্র জুড়ে কালোর উলম্ব ফিতাসদৃশ গড়ন দর্শককে বিমূর্ত বোধের ধারণা দেয়। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে তিনি এচিং মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। *কম্পোজিশন* (১৯৭৯) এই সময়ের একটি শিল্পকর্ম (চিত্র ১১০)। বলিষ্ঠ এবং গতিশীল রেখায় বিষয়ের স্পষ্ট উদ্ভাসন এতে পরিলক্ষিত হয়। চিত্রপটের নিচের দিকে কয়েকটি জ্যামিতিক গড়ন যুক্ত করেছেন আনুভূমিকভাবে। ওপরে ও নিচে শূন্য পরিসর ছেড়ে ছবির নির্মাণকে দৃষ্টিনন্দন ও মনোজ্ঞ করে পরিসর বিভাজনে নিজের মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। *কম্পোজিশন* (১৯৮১)-তেও চিত্রতল গড়েছেন বিমূর্ত আঙ্গিকে; রেখা, রং, আকৃতি ও বুনটকে প্রাধান্য দিয়ে। বুনট নির্মাণের জন্য উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে গড়েছেন ভিন্ন ভিন্ন গভীরতার আকৃতি। ফলে বিভিন্ন উচ্চতায় ফুলে থাকা পৃষ্ঠতল যেন মনের অব্যক্ত অনুভূতিরাশির প্রকাশকে আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ করেছে। খানিকটা একই ধরনের নির্মাণ তাঁর *হারমনি* (১৯৮১)। গোলাকার পরিসরকে ঘিরে একটি আয়তক্ষেত্র, তাকে ঘিরে বর্গ কিংবা আরেকটি আয়তক্ষেত্র আবার তাকে ঘিরে আরও কয়েকটি, কোনোটি উত্তল, কোনোটি অবতল। বস্তুত জ্যামিতিক কাঠামোর এসব আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উপকরণের ঠাস বুনটে সৃষ্টি করেছেন তল। যেন এর মাধ্যমে এক মায়াবী, এবড়ো-খেবড়ো ও জটিল পথপরিক্রমার শেষে তিনি পৌঁছে গেছেন এক স্নিগ্ধ সরলতায়। চারটি আলাদা আলাদা ছাঁচ পাশাপাশি যোগ করার ফলে তিনটি উত্তল সাদা রৈখিক পরিসরও ভিন্ন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। আবার একাধিক ছাঁচ যোগ করে ছেপেছেন *কম্পোজিশন* (১৯৮১) চিত্রটি। চারটি প্যানেলের প্রত্যেকটিতে রং, রেখা আর বুনট সহযোগে আলাদা আলাদা মনোযোগ-কেন্দ্র তৈরি করেছেন। তাতে তিন নম্বর প্যানেলের লক্ষ্য-নির্দেশক বৃত্তকার পরিসরটি হয়ে উঠেছে সমগ্র ছবির কেন্দ্র। এ পর্বের অধিকাংশ কাজের মতো এ ছবিতে ব্যবহৃত বুনটও বেশ উত্তল এবং উন্মুক্ত। বুনট নির্মাণ এবং সরল আকৃতি ব্যবহার করে ছাপ নির্মাণের ধারা বজায় থেকেছে তাঁর *কম্পোজিশন* (১৯৮২/৮৩) চিত্রটির ক্ষেত্রেও। কালো ও বাদামি রঙের আটটি ভিন্ন ভিন্ন চতুর্ভুজাকৃতির ছন্দোবদ্ধ বিনুনির সাথে বর্ণহীন তিনটি বাঁকানো তাঁরকাটা-সদৃশ ধাতব বস্তু যোগ করে অবতল বুনট নির্মাণ করেছেন। শিল্পী আবুল বারক আলভীর জাপান-যাত্রার পূর্বের অধিকাংশ ছাপাই ছবি প্রধানত মাধ্যমগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্ট। সত্তরের শেষে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমটি ছাপচিত্র বিভাগের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়ার ফলে এ ধরনের নিরীক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সহজসরল আকারের সাথে বুনট ও রেখার কার্যকারিতাই মূলত বিষয় হয়ে এসেছে এতে। আর রং যোগ করেছেন রেখা ও আকৃতির বৈচিত্র্যহীনতা দূর করতে। তবে কখনো কখনো হয়তো সরল এসব আকারের উৎস হয়েছে একান্ত পরিপার্শ্বিক কোনো বিষয়। হয়তো এসব ছবির নির্মিতিতে মাইকেল পন্স ডিলিয়নের করণকৌশল কিছুটা হলেও তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

আশির দশকের প্রথমে (১৯৮৩) আবুল বার্‌ক আল্‌ভী জাপান সরকারের বৃত্তির আওতায় সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাওমি আসাকুরার তত্ত্বাবধানে এক বছর (১৯৮৩-৮৪) ‘কম্পোজিশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইন আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন’ (Composition and Construction in Art and Design) বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ সম্পন্ন করেন। এই জাপান পর্বের শিক্ষা তাঁর রেখাচিত্রণ এবং উপকরণের সমাবেশ ঘটানোর ধারণাকে আরও সুসংহত ও প্রশস্ত করে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে করা ছাপচিত্রসমূহে। যেমন কালো রঙের পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে কোমল ও উজ্জ্বল রঙের সাথে সরল জ্যামিতিক কাঠামোয় ভেঙেছেন বাস্তবের জড়জীবন চিত্রকে *অভিব্যক্তি* (১৯৮৭) শীর্ষক ছাপাই ছবিতে। আবার সাদা তলের বিপরীতে বুনটযুক্ত চওড়া সবুজের আস্তরের ওপর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধূসর রৈখিক বুনটের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশে রচনা করেছেন *সবুজ ও ধূসর* (১৯৮৭) (চিত্র ১১১)। অন্যদিকে আকার, বুনট, রেখা আর রং সমান গুরুত্বে উদ্ভাসিত *কম্পোজিশন* (২০০৮) (চিত্র ১১২) এবং *কম্পোজিশন* (২০১৬) চিত্র দুটিতে। এসব শিল্পকর্মে ব্যবহৃত রং, রেখা, বুনট এবং আকৃতির ব্যবহার এবং করণকৌশল পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম, সুষম ও সংবেদনশীল।

ছাপচিত্র মাধ্যমের অন্যান্য রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভীর চর্চা মূলত এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে। অন্য সবার মতো শিল্পী জীবনের শুরুতে অবয়বী থাকলেও পরবর্তীতে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই বিমূর্ততার উৎস চিত্রকলা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর অন্তর্জগতে ব্যপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। যুদ্ধোত্তর সময় থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার বাহ্যিক সৌন্দর্য বা চরিত্রের উপস্থাপনধর্মিতার পরিবর্তে বস্তুর সারসত্তাকে উপস্থাপনই তাঁর মূল লক্ষ হয়ে ওঠে। তেলরঙে করা *কবর* (১৯৭৪) ছবিতে তাঁর এ পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে কিছু সরল আয়তাকার কাঠামোর উপস্থাপনে মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেছেন তিনি, যা একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকাকেও উপস্থাপন করে প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। শিল্পী আল্‌ভীর শিল্পকর্মের বিমূর্ততার সূত্রপাত এখান থেকেই, এমনকি তাঁর ছাপচিত্রেরও। পরে জাপান পর্বের শিক্ষা তাঁর কাঠামোভিত্তিক বিমূর্তায়নের এই ধারণাকে সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> His interest in abstraction and the technique of printmaking now found a more nuanced manifestation. Alvi picked up etching in earnest, creating abstract images in a superb combination of line, form and colour. His forms are light

> and reposeful or flighty and their interaction with space gives them a relief-like immediacy.[৬৩]

তিনি সরল আকার-অকৃতির সাথে রেখা, বুনট আর সুমিষ্ট বর্ণ সহযোগে চিত্রতল গড়েন বিমূর্ত বিন্যাসে, যা তাঁর ছাপাই ছবিরও বৈশিষ্ট্য। তবে ছাপাই ছবিতে রেখা, রং, বুনট কিংবা আকৃতির কোনোটির প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব না করে, বরং সব কিছুর ছন্দোবদ্ধ উপস্থাপনে শান্ত ও স্নিগ্ধ তল নির্মাণ করেছেন। বাদামি, সবুজ, নীল, মরচে ধরা লাল, হালকা হলুদ, কালো, ধূসর ইত্যাদি শান্ত ও কোমল রঙের প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ্য। তবে তাঁর চিত্রকলায় রঙের যে সুষমা, যে নয়ন লোভন লাবণ্য, ছাপাই ছবিতে তা অতখানি প্রকাশ্য না হলেও তাঁর রং ব্যবহারের পরিমিতি দর্শনানুভূতিতে প্রশান্তির আবেশ সৃষ্টি করে।

শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভীর শিল্পী জীবনের সামগ্রিক পথপরিক্রমা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ছাপাই মাধ্যমে তাঁর চর্চা নিরবচ্ছিন্ন নয়। বিমূর্ত ধারার চিত্রশিল্প ছাড়া গ্রন্থ-অলংকরণ থেকে শুরু করে টেলিভিশন সেট ও প্যাভিলিয়নের নকশা ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা এবং ছাপচিত্রের মাধ্যমগুলো সময়সাপেক্ষ হওয়ায় ঠিক যতটা সৃজনক্ষম তিনি ছিলেন, তার পুরোটা তিনি ছাপচিত্র মাধমে ব্যয় করতে পারেননি। তবে নিয়মিত বিরতিতে যে স্বল্পসংখ্যক ছাপচিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন তা এবং তার প্রতিলিপি সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে তাঁর সমগ্র কাজ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে অল্পসংখ্যক শিল্পী বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চিত্রকলায় স্বল্প সময় প্রভাবসঞ্চারী হলেও ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ কখোনোই আসেনি। তবে তাঁর মূল পরিচয় একজন বিমূর্ত ধারার চিত্রশিল্পী হলেও ছাপচিত্র মাধ্যমে নিজের আগ্রহ, নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী হিসেবে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন।

এ ছাড়া এ প্রজন্মের অন্য শিল্পীদের মধ্যে হামিদুজ্জামান খান, হাসি চক্রবর্তী, স্বপন চৌধুরী, বীরেন সোম, মনসুরউল করিম, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, চন্দ্রশেখর দে প্রমুখও ছাপাই মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পকর্ম রচনা করেছেন।

চল্লিশের শেষ লগ্নে শুরু হওয়ার পর এ দেশের ছাপচিত্রের ইতিহাসে আশির দশকই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মমুখর এবং প্রাণচাঞ্চাল্য লাভ করে। সত্তরের দশকের শিল্পী প্রজন্মের সাথে যোগ হয় আশির দশকের তরুণ প্রজন্মের ছাপচিত্রীদের কর্মতৎপরতা। এ দশক থেকে দেশে ছাপচিত্রের বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত নিয়মিত ছাপচিত্রীর দেখা পাওয়া যায় প্রথম। শুরু থেকে এ সময় পর্যন্ত যাদের ছাপচিত্রী হিসেবে

---

[৬৩] Sayed Manzoorul Islam, ‘Abul Barq Alvi’, in *Bangladesh Art Collection of Contemporary Paintings*, Dhaka, Society for Promotion of Bangladesh Art, 2003, p. 205

চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের সবাই ছাপচিত্রে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন বিদেশে। কারণ শুরু থেকেই মাধ্যমটি এ দেশীয় ছাত্র-শিল্পীদের হাতে চর্চিত হয়েছে নামমাত্র গুরুত্বে। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী যে স্বল্পসংখ্যক ছাপচিত্রের ক্লাস হতো, তা দিয়ে এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি তো দূরের কথা, নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে ঠিকঠাক ছাপ নিতে পারাটাই ছিল আসল। (এর ব্যতিক্রম দু-একজনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে তাঁরাও ছাত্রাবস্থার পর আর ছাপচিত্র করেননি নানা সীমাবদ্ধতায়) আশির দশকে এসে এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপচিত্রে বিশেষায়িত বিএফএ ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালুর সুবাদে। আবার এ সময়ে বাংলাদেশে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ছাপচিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে গুরুত্বের সাথে। দশকের প্রথমেই (১৯৮১) শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শুরু হয় এশিয়ান আর্ট বিয়েন্নাল, যা এ দেশীয় শিল্পীদের আন্তর্জাতিক পরিসরে ছাপাই ছবির তৎকালীন ধারা সম্পর্কে মোটমুটি একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশি শিল্পীদের ছাপচিত্র বিদেশে (পোল্যান্ডে) প্রদর্শন, আবার বিদেশিদের (জার্মান শিল্পীদের এবং পিকাসোর লিথোচিত্র) ছাপচিত্র এ দেশে প্রদর্শনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময় থেকেই মূলত ছাপচিত্রের বৈচিত্র্যময় বিকাশের সূত্রপাত হয়। আবার কয়েকজন শিল্পীর (রফিকুন নবী, আবদুস সাত্তার) ছাপচিত্র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের ঘটনাও এ দেশের ছাপচিত্র জগতে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। দশকের শেষার্ধে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে দেশীয় উদ্যোগে নির্মিত ছাপাই মেশিন যোগ হয়। এ ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘ সময় ধরে আয়োজন করে দুটি ছাপচিত্র কর্মশালারও, যা সার্বিকভাবে ছাপচিত্র চর্চার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা প্রদান করে।

চিত্রকলা চর্চায় প্রথম থেকে দেখা গেলেও আশির দশক থেকে ছাপচিত্রীদের মধ্যেও দলগত চর্চার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী কালিদাস কর্মকার সীমিত পরিসরে গড়ে তোলেন 'আতেলিয়ার ৭১'। যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে বেরিয়ে এসে দলগতভাবে অনেকের পক্ষে ছাপচিত্রচর্চার সুযোগ তৈরি হয়। এ ছাড়া ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর আর্ট কলেজ 'চারুকলা ইনস্টিটিউট' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা শুধু ছাপচিত্রচর্চাই নয়, সামগ্রিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। দশকের প্রথমার্ধেই (১৯৮৩) খুলনার শশীভূষণ পাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়টিকে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে ছাপচিত্রচর্চার ব্যাপ্তি আরও খানিকটা প্রসারিত হয়। এ দশকেও ছাপচিত্রে স্নাতক অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে এ মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যান্য দেশের ছাপচিত্রের চর্চা এবং এর করণকৌশলগত নানা দিক সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, যা পরবর্তীকালে তাঁদের নিজেদের শিল্প আঙ্গিককে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি এ দেশের সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও নিরীক্ষাপ্রবণ করে তুলেছে।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে এ কে এম আলমগীর হক একটি সুপরিচিত নাম। পুরনো ঢাকার আন্তরিক পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত। ফলে খুব কাছ থেকে দেখা শহুরে জীবনের নানা অনুষঙ্গ পরবর্তীতে তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। এরপর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি স্থায়ীভাবে কানাডার সাসকাটুনে বসবাস করে আসছেন। এই দুই দেশের প্রকৃতি এবং জীবন তাঁর সৃষ্টি পর্যায়কে প্রভাবিত করেছে।

শিল্পীজীবনের শুরু থেকেই ব্যতিক্রমী নিরীক্ষাধর্মী ও সাহসী শিল্প সৃষ্টির জন্য সকলের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন আলমগীর হক। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার শুরু ঢাকা আর্ট কলেজে চিত্রকলা বিষয়ে (১৯৭৫)। পরে ভারতের মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৯) থেকে ছাপচিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন। ছাপচিত্র এবং চিত্রশিল্প– দুই মাধ্যমেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলেও তাঁর মূল পরিচয় একজন প্রকরণদক্ষ ছাপচিত্রী হিসেবে। মাধ্যমের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরক্তি আর বিরামহীন চর্চা তাঁকে ছাপাই মাধ্যমের একজন কুশলী নির্মাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কানাডাপ্রবাসী হওয়ার আগে ও পরের সময় এবং শিল্পকর্ম পর্যালোচনা করে তাঁর সৃষ্টি পর্যায়কে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বে, বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ ধাপে তিনি মানব অবয়বভিত্তিক নিরীক্ষাধর্মী কিছু কাজ করেছিলেন। তবে অন্য দশজনের মতো শুরুটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার উপস্থাপনধর্মী হলেও প্রায় একই সঙ্গে বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত ও বিমূর্ত উপস্থাপনঋদ্ধও করে তুলেছিলেন তাঁর চিত্রপট। সেখানে বৈচিত্র্যময় রং আর পরিচিত অপরিচিত নানা রূপবন্ধের সাথে রেখার সংযোগে বিষয়ের সবিশেষ প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। কখনো কখনো মাধ্যম নিয়ে করেছেন সাহসী নিরীক্ষা। কখনো আবার অবয়ব বা আকৃতিকে প্লেট বা ছাঁচ থেকে কেটে বাদ দিয়ে বর্ণহীন ফুলে থাকা পরিসর সৃষ্টি করে সম্পূর্ণতার মধ্যে হঠাৎ নৈর্ব্যক্তিকতার অবতারণা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *শিরোনামহীন-৩* (১৯৭৯) শিল্পকর্মটির কথা। চিত্রতলে বিস্তৃত মধ্যম ঘনত্বের একটি রঙের গড়নের মধ্য দিয়ে ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে একটি অপরিচিত ঘন গড়ন। এর মধ্যে ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির কিছু সাদা উত্তল গড়ন তিনি তৈরি করেছেন প্লেট কেটে বাদ দিয়ে। কখনো আবার অভীষ্ট আকার বা আকৃতি অনুযায়ী ধাতবপাত কেটে নিয়ে তা থেকে ছাপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আরাধ্য প্রতিরূপ। স্বল্পতাই সেখানে হাজির বিশালত্বের ব্যঞ্জনা নিয়ে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে করা অনামা (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ছবিটির নাম মুদ্রিত হয়েছে *আর্টিস্ট প্রুফ-১*) ছবিটি চারটি ছোট ত্রিভুজাকৃতির প্লেট এবং একটি চাবির ছাপ দিয়ে নির্মাণ করেছেন। নিচের দুই কোনায় স্থাপিত প্লেট দুটিতে কিছু রেখা এবং অজানা আকৃতি থাকলেও ওপরে স্থাপিত চাবি এবং তার দুই পাশের প্লেট দুটি রং-শূন্য অবস্থায় ছাপ নিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন রঙের শূন্যতা আর উপস্থিতি তাদের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে,

তেমনি সাদা সমতল পরিসর হঠাৎ অবতল হয়ে বস্তুর আকারকে ধারন করে সৃষ্টি করেছে নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনারও। তবে এ পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো *কম্পোজিশন* (১৯৮১) ও *রন্ধনশালা* (১৯৮২) সিরিজ। এ সিরিজ দুটির ছবির গঠন, পরিসর বিভাজন, উপাদানের সংশ্লেষ খানিকটা একই রকম। *কম্পোজিশন*-৩ (১৯৮১) এ মূল পরিসরকে মাঝবরাবর সাদা ও রঙিন অংশে বিভক্ত করে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বোতল-সদৃশ রূপবন্ধ হাজির করেছেন শিল্পী। সাদা পরিসরের সাথে রঙিন পরিসরের সমন্বয়ের জন্য ওপরের সাদা অংশের পাত্রগুলোকে রঙিন, আর রঙিন অংশের মধ্যে একটি সাদা আকৃতি ছেড়ে দিয়েছেন। রেখা এবং পরিমিত মাত্রার এসিড প্রয়োগে আকৃতিগুলোর বুনট নির্মাণ করে দেখিয়েছেন কারুকৃতির মুনশিয়ানাও। আর পরিসরকে একই রকম দুটি ভাগে ভাগ করে গড়েছেন *রন্ধনশালা*-৩ (১৯৮২) এর চিত্রপট। ওপরের সাদা পরিসরে (চিত্র ১১৩) রন্ধনশালায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ছয়টি পাত্রকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন। নিচের রঙিন অংশেও রয়েছে তিনটি পাত্র। বিভিন্ন আয়তনের রেজিন কণা ফেলে প্রতিটি আলাদা আলাদা রূপবন্ধে ব্যবহার করেছেন আলাদা বুনট। উপকরণের বিন্যাসঘটিত বুনট ছাপচিত্রকে আদর্শগতভাবে সমৃদ্ধিশালী করে। শিল্পী আলমগীর হক তাঁর কাজে সবসময় মাধ্যমের এই সুযোগ বা বৈশিষ্ট্যকে পুরোপরি ব্যবহার করেছেন। কখনো উন্মুক্ত তক্ষণ, আবার কখনো বা সুঁইয়ের এলোমেলো আঁচড়ে মোমের আস্তরণকে ভেঙে। সুন্দর এবং চমৎকার বুনট তৈরির জন্য প্লেটে বিভিন্ন ধাপে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থায় কাজ করেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, *আকৃতি ও পরিধি*-৩ (১৯৮২) শিল্পকর্মটির কথা। এখানে হালকা নীল রঙের জমিনে ওপর থেকে বাম দিক ঘেঁষে নিচের দিকে নেমে গেছে একটি কালচে সবুজাভ অনিয়মিত আকৃতি। বাম দিকের প্রান্ত ছুঁয়ে ছুরির মতো বাঁকানো একটি আকৃতি ঢুকে পড়েছে বড় গাঢ় রঙের আকৃতির অখণ্ডতার মধ্যে। হালকা রঙের এবড়ো-খেবড়ো বুনটযুক্ত এই আকৃতিই ছবির পুরো মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বস্তুত শিল্পী আলমগীর হকের অধিকাংশ কাজেই রং ও আকৃতির সাথে কারুকৃতির দক্ষতায় সৃষ্ট নানা ধরনের বুনটই মনোযোগ এবং অর্থবোধকতার কেন্দ্রে অবস্থান করে। *ফরম অ্যান্ড স্পেস* (১৯৮২) এবং *রঙের আকৃতিতে আনন্দ* (১৯৮৫) শীর্ষক সিরিজগুলোতেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। *ফরম অ্যান্ড স্পেস-৪* (১৯৮২)-এ (চিত্র ১১৪) এলোমেলো রেখার আঁচড়যুক্ত নীলরঙের একটি অনিয়মিত আকৃতি জুড়ে আছে পুরো পট। এর ওপরে তিনটি ছোট-বড় আপাত আয়তাকার আকৃতিকে বিভিন্ন দূরত্বে স্থাপন করেছেন শিল্পী। প্রতিটি আকৃতিই বিক্ষত বুনটযুক্ত। আবার *রঙের আকৃতিতে আনন্দ*-৩ (১৯৮৫) শীর্ষক শিল্পকর্মটিতে একটি প্লেটেই স্থানিকভাবে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে ছাপ তৈরি করেছেন। প্লেটের মাঝখান থেকে তিনটি উত্তল সাদা পরিসর ছেড়ে জানালার মতো আপাত অবয়ব তৈরি করেছেন। এ ছাড়া সমগ্র চিত্রতলে আরও কিছু ছোট ছোট সাদা বিন্দু বা রেখার মতো পরিসর ছেড়েছেন। আর একেবারে কেন্দ্রে স্পিট বাইট (spite bite) করে

গ্রিল-সদৃশ অংশ দুটিতে মরিচা ধরা লোহার মতো বুনট সৃষ্টি করেছেন, যা দর্শকের সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

সামগ্রিকভাবে আলমগীর হক রোমান্টিক প্রকৃতিবাদী। কানাডাপ্রবাসী হওয়ার পর দৃশ্যমানতার আপাত-চিহ্নগুলো মুছে ফেলে বিমূর্ত করে তুলেছেন পরিসরকে। বিশুদ্ধ বিমূর্ততায় নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির একেকটি বিশেষরূপ। জ্যামিতিক নানা আকৃতির সাথে জৈব-অজৈব নানা রূপবন্ধের সম্মিলনে গড়েছেন চিত্রজমিন। আর প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রধানত রঙের জৌলুস, বৈচিত্র্য ও বর্ণবিভার চমৎকারিত্বের দিকগুলো। দ্বিতীয়ত, রেখা ও আকারের গতিশীল ও ছান্দিক রূপ-বৈশিষ্ট্যসমূহ। আসলে আশির দশকের শেষ থেকে ধীরে ধীরে তাঁর উত্তরণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কানাডাপ্রবাসী হওয়ার পর তা পরিণতি লাভ করে। তবে কানাডা পর্বে তাঁর ছবি করণকৌশলগত দিক থেকে আরও সংবেদনশীল ও নিখুঁত হয়েছে। বেড়েছে রঙের চাকচিক্য ও জমকালো ভাব। এ সময়ে করা *আকারের বিষয় ও বর্ণ-৮* (১৯৯৫) একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম। নানা ধরনের জ্যামিতিক আকৃতির সাথে বিভিন্ন বর্ণবিভার আয়োজনে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে সমগ্র তল। এ ছাড়া *ছাপ-৯* (১৯৯৩), *ছাপ-১০* (১৯৯৩), *ছাপ-১৬* (১৯৯৪), *ছাপ-১৮* (১৯৯৫), *ছাপ-১৯* (১৯৯৫) প্রভৃতি ছাপাই ছবিতে এসব গুণাবলি স্পষ্ট। *ছাপ-৯* শীর্ষক ছবিটিতে ঘন জলপাই রঙের তলে দুটি বড় কালো ছোপ দিয়ে পরিসরকে ভাগ করে ওপরের অংশে একসারিতে তিনটি বেগুনি আয়তাকার আকৃতির মধ্যে একটি ক্রস দিয়ে মনোযোগ-কেন্দ্র তৈরি করেছেন, যা একইসঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছে পরিসরকে। আবার *ছাপ-১০* (চিত্র ১১৫) শিরোনামের ছবিটিতে বৃষ্টির আগে গম্ভীর নীলচে কালো মেঘের উপস্থিতি যেন। ছবির কেন্দ্র রয়েছে নিচের দিকে। একইভাবে *ছাপ-১৬*, *ছাপ-১৮*, *ছাপ-১৯*-তেও ছবির নিচের দিকে তৈরি করেছেন কেন্দ্র। মনোযোগ-কেন্দ্রে আয়তাকার, রৈখিক, অর্ধবৃত্তকার যেসব আকৃতি নির্মাণ করেছেন, তাতে বিভিন্নভাবে এসিড তক্ষণ করে যোগ করেছেন নানা ধরনের বুনট। আর তল নির্মাণের জন্য কখনো আশ্রয় নিয়েছেন উন্মুক্ত তক্ষণ পদ্ধতির, কখনো অ্যাকোয়াটিন্টের আবার কখনো বা দুই পদ্ধতিরই ব্যবহার করেছেন সার্থকতার সঙ্গে। ফলে সার্বিকভাবে তা রং, রেখা আর বুনটের ছবি হয়ে উঠেছে। বুনট, রেখা আর তলে রঙের ব্যবহার পরিমিত এবং চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে উষ্ণ ও শীতল– দুই ধরনের রঙের ব্যবহারই দেখা যায় তাঁর কাজে।

আবার মনোযোগ-কেন্দ্র ভেঙে গেছে *ধূলি আচ্ছাদিত শস্য ক্ষেত্র* (১৯৯৬), *প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবি* (১৯৯৬), *একটি আর্দ্র ছত্রাক আচ্ছাদিত দেয়াল* (১৯৯৮), *গভীর জলের নিচে শস্য ক্ষেত্র* (১৯৯৮) (চিত্র ১১৬) ইত্যাদি শিল্পকর্মে। পূর্বের ন্যায় এ পর্বের ছবিও বিমূর্ত অভিব্যক্তি ধারার রং-রেখা আর বুনটের ছবি। তবে নামকরণের সাথে চিত্রের দৃশ্যজ অভিজ্ঞতার মিল দেখে মনে হয় প্রকৃতির সাথে কোনো কোনো অংশের হুবহু সাযুজ্য থাকাটাও অসম্ভব নয়। বিশেষ করে উপর্যুক্ত শেষ ছবিটি সত্যিকার

অর্থেই জলমগ্ন শস্যখেতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মূলত, এটি পরবর্তীকালে করা জলহীন লিথোর ছবিগুলোতে তাঁর উত্তরণের পর্যায়।

তাঁর জলহীন লিথোগুলো এচিংয়ের মতো সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত নয়। অনেক বেশি মুক্ত ও বন্ধনহীন উদ্যমতা নিয়ে নির্মিত। যেন বহুকালের পুরনো আগল ভেঙে উন্মুক্ত প্রান্তরে মুক্তির স্বাদ নেওয়া। এমনকি ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রপটের প্রচলিত সীমা মুক্তিই যেন তাঁর লক্ষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রঙের বিন্যাস চড়া ও উষ্ণ। তাতে আমেরিকান পপ আর্টের সাযুজ্যও পরিলক্ষিত হয়। *শিরোনামহীন (ভূ-দৃশ্য)*-১৭ (২০১১), *শিরোনামহীন (ভূ-দৃশ্য)*-১৯ (২০১১) ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ।

কানাডাপ্রবাসী হওয়ার আগে থেকেই ছাপচিত্রে ঈর্ষণীয় প্রকরণ-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন শিল্পী আলমগীর হক। শুরু থেকেই তাঁর নিরীক্ষা প্রধানত দ্বিমাত্রিক, আলোছায়া বর্জিত এবং ছবির আঁকার সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। তাঁর অধিকাংশ কাজই মসৃণ চতুষ্কৌণিক না হয়ে বরং এবড়ো-খেবড়ো আর বহুকৌণিক। প্রথম পর্বের অধিকাংশ কাজেই উপাদান বা আকারের ব্যাকরণগত পুনরাবৃত্তির সাথে একটি মনোযোগ-কেন্দ্রের অবস্থানও লক্ষণীয়। প্রবাসী হওয়ার পর থেকে ক্রমেই তাঁর কাজ থেকে ব্যাকরণভিত্তিক মনোযোগ-কেন্দ্র অপসারিত হতে থাকে। বিশেষত ওয়াটারলেস প্লেনোগ্রাফির (planography) ক্ষেত্রে আকার, রং ও বুনট বিক্ষিপ্তভাবে পুরো পরিসরকে ব্যাপক দখল করে নেয়। তবে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্টগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্র-বিশিষ্ট থেকেছে। ইন্টাগ্লিও এবং প্লেনোগ্রাফগুলোর মধ্যে যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি একই সময়ে করা চিত্রকলা এবং ছাপাই ছবিতেও পার্থক্য বিদ্যমান। এ পর্বের ছাপাই ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বস্তুক এবং রং, রেখা এবং বুনটের সংযোগে বিশুদ্ধ বিমূর্ততায় নির্মিত। তবে রং, রেখা আর বুনটের সমধর্মী ব্যবহার থাকলেও চিত্রকলায় পরিচিত নানা বিষয়ের সাদৃশ্যধর্মী উপস্থাপন দেখা যায়। প্রকৃতির সাথে সাজুয্যপূর্ণ যেসব আকৃতি তাঁর কাজের প্রথম পর্বে এসেছে, সেগুলো সুচিন্তিত এবং দক্ষ হাতের নির্মাণ। প্রকারান্তরে প্রবাসী হওয়ার পরও তাঁর কোনো কোনো কাজে আকারে, গড়নে কিংবা রেখাচিত্রে যে চেনা-পরিচিত নানা বিষয়বস্তুর আদল ইতস্তত ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে, তাতে শিশুচিত্রের সাযুজ্য ও সারল্য লক্ষ করা যায়।

এ দেশে ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক পরিবেশকে আরও বিস্তৃত এবং সহজ করার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে আশির দশকেই শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করেছিলেন কয়েকটি কর্মশালার। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন প্রবাসজীবন যাপনের পর ২০১২ এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ফিরে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে চর্চিত নতুন নতুন মাধ্যম এবং তাঁর চর্চার সুফলকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ দেশে।

শিল্পী রতন মজুমদার (১৯৫৪) এ দশকের একজন উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্রী। সত্তরের একেবারে শেষ লগ্নে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করলেও আশির দশকে এসে শিল্পবোদ্ধাদের মনোযোগ লাভে সমর্থ হন। মৃৎশিল্প বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ শিল্পীর মতো প্রথাগত জল ও তেল রং মাধ্যমে শিল্প নির্মাণ শুরু করলেও শীঘ্রই তিনি মাধ্যম হিসেবে কাঠ খোদাইকে বেছে নেন এবং খ্যাতিলাভ করেন। তাই ছাপচিত্র ছাড়া চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্প রচনা করলেও তাঁর মূল খ্যাতি ছাপচিত্রী হিসেবে। ছাপাই মাধ্যমের দুর্দমনীয়তা এবং একই ছবির একাধিক প্রতিলিপি তৈরি সম্ভব ও সহজলভ্য হওয়ার মতো বিষয়গুলো তাঁকে এ মাধ্যমের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আসলে প্রতিভা কোনো সময়ই সবিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত মাধ্যমটি বেছে নিতে ভুল করে না। শিল্পী রতন মজুমদারের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নিভৃতচারী এ শিল্পীর অধিকাংশ ছাপছবিই কাঠ খোদাই ও লিনো খোদাই মাধ্যমে করা এবং সাদা-কালোয় ছাপা। তাঁর কাজ সবসময়ই পরিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতাজাত বিষয়সমৃদ্ধ। ছবির বিষয় নির্বাচন, বিন্যাস, গঠন, আলোছায়া উপস্থাপনের নিজস্বতা তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ড্রইংয়ের সুনিপুণ দক্ষতা, পরিমিতিবোধ এবং দৃষ্টি প্রশান্তিদায়ক অথচ বিষয়ের ঠাস বুনুনি। শিল্পীর কাজ প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক রবিউল হুসাইন লিখেছেন–

> শিল্পী রতন মজুমদার একজন সংবেদনশীল শিল্পী তো বটেই সেইসঙ্গে তিনি ভীষণভাবে বিশুদ্ধ শিল্পের এক সন্ধানী পথিক। গঠন, বিন্যাস, সাজানো, আলো-ছায়ার খেলা, পরিমিতিবোধ, ড্রইংয়ের মুনশিয়ানা – এগুলো তো আছেই সেইসঙ্গে মিলেছে শক্ত কাঠামোর মধ্যে মনকাড়া বুনুনি, জ্যামিতিক বিমূর্ততা, আবার বাস্তবরীতির প্রকাশ, সঙ্গে বিমূর্ত বা নৈর্ব্যক্তিক পরাবাস্তব বিষয় – সব নিপুণ সৃষ্ট কৌশলে নিখুঁতভাবে বিম্বিত করেছেন।[৬০২]

প্রথম দিকের কাজে মানব অবয়ব এবং পূর্ণগর্ভ কালো পরিসরের আধিক্য লক্ষণীয়। সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় ও গতিশীল রেখায় বর্ণনা করেছেন বিষয়ের। *নগ্নতার সাধ (১৯৭৭)*, *শিল্পী ও বর্ষার প্রতিকৃতি (১৯৭৭)*, *একতারা (১৯৭৮)*, *প্রেম (১৯৭৮)*, *তোরা যে যা বলিস (১৯৭৮)*, *কালো সময় (১৯৮০)* ইত্যাদি এ পর্বের উদাহরণ। জমাট কালো রঙের জমিনে সাদা রেখায় নির্মিত *নগ্নতার সাধ*-এ (চিত্র ১১৭) চেয়ারে উপবিষ্ট এক নগ্ন পুরুষ চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। ছবিতে আলনা, ড্রেসিং টেবিল, ফুলদানি ইত্যাদির অবস্থান সজ্জাকক্ষের চরিত্র নির্দেশ করছে। শিল্পকর্মটির ওপরের অংশের আয়নায় হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া সাদার সাথে চেয়ারের নিচে দর্শকমুখী হয়ে বসে থাকা বিড়ালের জ্বলজ্বলে সাদা চোখের মাধ্যমে সাদা-কালোর নাটকীয় ভারসাম্য বিধান করেছেন তিনি। পুরো ছবিটি বাস্তবরীতি-ঘনিষ্ঠ হলেও আলোছায়ার স্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত। তবে মেঝের ঘননিবদ্ধ জ্যামিতিকতায় পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করে সমগ্র ছবিতে ত্রিমাত্রিক অধ্যাস সৃষ্টি করেছেন দক্ষতার সাথে। আর পলেস্তারা খসে পড়া দেয়ালের

---

[৬০২] রবিউল হুসাইন, 'সাদা-কালোর চিত্রকাব্য', *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ ৯৭-৯৮

বিপরীতে দাঁড় করিয়ে নিজেকে এঁকেছেন *শিল্পী ও বর্ষার প্রতিকৃতি*তে। কালো পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে বলিষ্ঠ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সাদা রেখায় বাস্তবধর্মী রীতিতে নিখুঁত এঁকেছেন আত্মপ্রতিকৃতি। আলোর ব্যাকরণভিত্তিক প্রয়োগ না ঘটিয়ে এবং চোখের জ্বলজলে দৃষ্টিতে নির্মাণ করেছেন নৈর্ব্যক্তিকতা। আবার পলেস্তারা খসা দেয়ালও সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন প্রতীক ও রূপকের। সব মিলিয়ে ছন্দের নিপুণ বুনুনিতে বেঁধেছেন সাদাকালোর মতো চরম বৈপরীত্যকেও। *কালো সময়*ও আত্মপ্রতিকৃতি বিষয়ক আরেকটি ছবি, যেখানে নিজের দুঃসময়কে চিহ্নিত করেছেন। জীর্ণ পোশাকে শীর্ণ চেহারার নিজেকে ঘরের একপাশে স্থাপন করে একধরনের শূন্যতার আবহ যেন সৃষ্টি করেছেন শিল্পী। মাথার পেছনে একদিকে ফুলদানি আর অপরদিকে কালো বিড়ালের অশুভ উপস্থিতি এবং পুরো পরিসর জুড়ে কালোর আধিক্য যথার্থ অর্থেই একে কালো সময়ে পরিণত করেছে। অন্যদিকে যার যা ইচ্ছে বলার সুযোগ দিয়েছেন *তোরা যে যা বলিস* ছবিতে একটি আধ-শোয়া নগ্ন পুরুষ চরিত্রকে উপস্থাপন করে। সম্মুখে অবস্থিত অলংকৃত খাটের পেছনের জানালায় উঁকি দিচ্ছে শৈলীবদ্ধ মেঘ-পাহাড় আর সূর্যমুখীরা। পায়ের দিকে একটি তেপায়ার ওপরের পাত্রে আলুলায়িত লতার উপস্থিতি জড়জীবন-সদৃশ। আলাদাভাবে জড়জীবন-চিত্রও করেছেন কিছু। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *ভগ্ন সৌন্দর্য* (১৯৭৬), *একতারা* (১৯৭৮)। এগুলোতেও সাদাকালোর চরম বৈপরীত্যে নির্মাণ করেছেন চিত্রপট। একই রকম বৈপরীত্য দেখা যায় চারুকলা অনুষদের বহির্দৃশ্য *ঝরা পাতা*তেও।

প্রথম পর্বের এসব কাজের রেখায় ও পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে বাস্তবানুগতা এবং ত্রিমাত্রিকতার অবভাস থাকলেও পরবর্তীকালে দ্বিমাত্রিকতা তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে *ওঠে*। প্লাইবোর্ডের সাধারণ বুনটের পরিবর্তে যোগ হতে থাকে বিভিন্নভাবে নরুণ চালনায় সৃষ্ট নানা ধরনের বুনট। পূর্বের মানব অবয়ব প্রাধান্যতার পরিবর্তে বহির্দৃশ্যের ধারণাগত চিত্রায়ণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে *ওঠে*। যেমনটা তিনি দেখেছেন তাঁর চারপাশের পরিচিত পরিবেশে। রতন মজুমদারের আঁকা ভূ-দৃশ্য সম্পর্কে শিল্পসমালোচক সাইদ আহমেদের মন্তব্য−

> His landscape does not cover a huage area depicting numerous objects. He attempts to find a concentrated from which assumes different shapes, now broken and uneven then flowing and lyrical. It is indeed a personalized view of his known people, paddy field, flowers and birds. His works reflect a deep sense of sincerity and a tremendous urge to peel off the layers, to go deeper beyond the surface.[৬৩৩]

---

[৬৩৩] Sayeed Ahmad, 'An Inner Gaze', ১৯৮৩ সালে আলিয়ঁস ফ্রঁসেস, ঢাকায় অনুষ্ঠিত রতন মজুমদারের একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে প্রকাশিত

বিভক্ত সমাজ-১ (১৯৮০), *ফাঁদের রূপ* (১৯৮০), *মৃত্যুর পর কালো প্রজাপতির দল* (১৯৮১), *বিভক্ত সমাজ-২* (১৯৮১), *সমাজের রূপ-১* (১৯৮১), *সমাজের রূপ-২* (১৯৮১), *সমাজের রূপ-৩* (১৯৮১), *সমাজের রূপ-৪* (১৯৮১), *সমাজের রূপ-৫* (১৯৮১) প্রভৃতি শিল্পকর্ম এ পর্বের উদাহরণ।

বিভক্ত সামজ-১-এ (চিত্র ১১৮) ওপর থেকে একটি ভূ-দৃশ্য দেখেছেন। মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিভেদ যে সমাজের অখণ্ডতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তারই প্রতীকী রূপায়ণ এই চিত্রজমিন। পুরো ভূখণ্ডটিকে বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে শিল্পী একেকটিকে নির্দেশ করেছেন ফসলের খেত, জলাভূমি, গোচারণভূমি, বনভূমি ইত্যাদি হিসেবে। কিছু খণ্ডে জ্যামিতিক আকার-আকৃতি নির্দেশ করে আধুনিক স্থাপত্য-কাঠামোও আভাসিত করেছেন। আবার কেন্দ্রের একটি জলাভূমিতে ফুটে থাকা শাপলা ও অন্য খণ্ডে খুঁটিতে বাঁধা দুটি গবাদি পশু যেন আমাদের পরিচিত কোনো ভূখণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দেয়। একই রকম বিষয় নির্দেশ করেছেন *বিভক্ত সমাজ-২* এও। (তবে *বিভক্ত সমাজ-৩, ৪, ৫* এবং ৬ (১৯৮৮) এ কালো জমিনে সাদা রেখা অথবা বিভিন্ন আয়তনের বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের ব্যবহারে তল নির্মাণ করে বর্তমানের সমাজ-কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন প্রাজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীর মতো) এ দেশের অতিপরিচিত আরও একটি দৃশ্য তাঁর *ফাঁদের রূপ* ছবিটি। বাংলাদেশে শীতের শেষে নদীনালায় জলপ্রবাহ কমে আসার ফলে তাতে বেড়া দিয়ে মাছ ধরার প্রচলিত রীতির ধারণাগত উপস্থাপন এ চিত্রটি। চিত্রতলকে দুটি বর্গ ও একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে ভাগ করে তিন আয়তনের সাদা বিন্দু ও তার পৃথক আবর্তনগতি সহযোগে তিনটি আলাদা আলাদা ফাঁদ উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। *মৃত্যুর পর কালো প্রজাপতির দল* (১৯৮১) ছবিটিতে বিন্দু বিন্দু সাদা আলো আর জমাট ঘন কালোয় জীবন আর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের মধ্যে পার্থক্য গড়েছেন। মৃতের শরীর থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষরাজি এবং কালো প্রজাপতির পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবজীবনের এক অমোঘ সত্যের অবতারণা করেছেন।

বলা যায়, *বিভক্ত সমাজের*ই বর্ধিতরূপ হলো *সমাজের রূপ* শীর্ষক সিরিজটি। এসব ছবির গঠন, পরিসর বিভাজন, উপাদানের সংশ্লেষ একই রকম এবং ভীষণভাবে জ্যামিতিক কাঠামোয় আবদ্ধ। অর্থাৎ আয়ত, বর্গ, ত্রিভুজ, বৃত্ত, বিন্দু, বিভিন্ন দৈর্ঘের সরল কিংবা কোনাকুনি বিভাজিত রেখার ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। পূর্ণগর্ভ কালো পরিসরের আধিক্য কমে ধীরে ধীরে সাদা পরিসরের পরিমাণ ও ব্যবহার বেড়েছে ক্রমে ক্রমে। প্রথম দুটি ছবিতে (*সমাজের রূপ-১ ও ২*) বিষয়ের যে ব্যাপকতা এবং সন্নিবিষ্টতা, পরবর্তী তিনটিতে (*৩,৪ ও ৫*) তা ক্রমে আরও সন্নিহিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব ছবিতে ব্যবহৃত রূপবন্ধ নিয়েছেন তাঁর পরিচিত পরিপার্শ্ব যেমন ধানক্ষেত, জলাভূমি, মাঠ-ঘাট, কৃষকের গোবর লেপা উঠানে পোঁচের দাগ কিংবা উঠানে মেলে দেওয়া ধান ও অন্যান্য ফসলের

দৃশ্যমান বুনট থেকে। গ্রামের সাধারণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিল্পী প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> রতন মজুমদার পল্লীর পরিবেশে বেড়ে উঠে ছিলেন। পল্লীর সব কিছুই তাঁর কাছে আদরণীয়। গাছপালা, পশু-পাখী, মানুষ তাঁর শিল্পকর্মের প্রিয় বিষয়বস্তু। তিনি সব কিছুর গভীরে যেতে চান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখতে চান। সাধারণ প্রাকৃতিক ডিজাইন ফরম থেকে সূক্ষ্ম অলংকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন নকশার উদ্ভাবন করেন সাবলীল ভাবে। এক একটি ধানকে অলংকরণ করতে করতে তাঁর ছাপচিত্রে সৃষ্টি হয় নতুন নকশার প্রকৃতি। সুপারী পাতা আর সুপারী পাতা থাকে না, পাতার রেখা অলংকরণে সমৃদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে নতুন নকশা। নব পদ্ধতিতে সনাতন ডিজাইনের ফরম সাবলীলভাবে খাপ খায় নতুন ডিজাইন ফরমে। রতনের পরীক্ষা–নিরীক্ষা নতুন ডিজাইনে এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য।[৬০৪]

সাদা-কালোর বৈপরীত্যে পরিচিত বিষয়কে জ্যামিতিক এবং জৈবিক নানা আকৃতি ও নতুন নকশায় বিমূর্ত বা নৈর্ব্যক্তিক রূপে উপস্থাপন করেছেন *মুখের বিকৃতি*-১ (১৯৮৩), *মুখের বিকৃতি*-২ (১৯৮৩), *বাগান*-১ (১৯৮৩), *বাগান*-২ (১৯৮৩), *কম্পোজিশন*-১ (১৯৮৩), *কম্পোজিশন*-২ (১৯৮৩), *প্রকৃতি*-১ (১৯৮৩) প্রভৃতি শিল্পকর্মে। এসব কাজে সাদা পরিসরের ব্যাপক ব্যবহারও লক্ষণীয়। পরিসর পুরোপরি সাদা এবং উপদানসমূহ কালো হয়ে এসেছে তাঁর *অবচেতন*-১, ২, ৩ এবং ৪ (১৯৯০)-এর ক্ষেত্রে। একটিমাত্র ছাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করে, বিমূর্ত উপাদানের বুননি বা কালো পরিসরের ঘনত্ব কমিয়ে এ সিরিজটি নির্মাণ করেছেন।

এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো *নিসর্গের কোপ খেলা* (১৯৮১), *প্রতিযোগিতা* (১৯৮২), *শিল্পীর কক্ষ* (১৯৮৩), *প্রাচীর*-১ ও ২ (১৯৮৩), *সূর্যাস্ত*-১ (১৯৮৭), *সূর্যাস্ত*-২ (১৯৮৭), *ঘুড়ি*-২ (১৯৮২), *ঘুড়ি*-১ (১৯৮৯) ইত্যাদি।

রতন মজুমদারের ছবি কখনো কখনো উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদী এবং ন্যূনতম উপাদান ব্যবহারকারীদের বা ন্যূনতাবাদীদের (মিনিমালিস্ট) কথা মনে করায়। উপস্থাপনের সরলতা এবং বিষয়ের সাধারণত্বই শিল্পী রতন মজুমদারের ছবির প্রাণ। ছাপাই ছবির মতো এত অনিশ্চিত একটি শিল্পমাধ্যমে তাঁর মতো বলিষ্ঠ, সুচিন্তিত এবং নিখুঁত রেখার প্রয়োগ এ দেশের খুব কম শিল্পীর কাজেই দৃশ্যমান। কাঠের শক্ত জমিনে তাঁর সূক্ষ্ম-স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলিষ্ঠ ড্রইং নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। শিল্পীর অধিকাংশ কাজে আলোছায়ার স্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত। তবে কোথাও থাকলেও তা ব্যাকরণগত নিয়মের অনুগামী নয়, বরং বিশেষ শৈলীবদ্ধ। এ ছাড়া সৃষ্টি কৌশলের প্রতি তাঁর মনোসংযোগ, নরুণ চালনার দক্ষতা, ধৈর্য এবং পরিমিতিবোধও তাঁর সৃষ্টিতে অনন্য মাত্রা যোগ করেছে।

---

[৬০৪] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, 'রতন মজুমদার', *কন্টেম্পরারী আর্ট সিরিজ অব বাংলাদেশ*-৩২, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪

এ দেশের সৃজনশীল ছাপচিত্রের যাত্রা চল্লিশের দশকের শেষে শুরু হলেও আশির দশকের আগ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো নারী ছাপচিত্রীর দেখা পাওয়া যায় না। দশকের শুরুতেই ছাপচিত্রী হিসেবে রোকেয়া সুলতানার আবির্ভাব সেই অতৃপ্তিকে কিছুটা প্রশমিত করে। আবার শুরু থেকে স্বদেশে ছাপচিত্রে বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীর যে অভাব ছিল (সত্তরের শেষ লগ্নে প্রবর্তিত ছাপচিত্রে বিশেষায়িত স্নাতক ডিগ্রির) প্রথম ব্যাচের ছাত্রী হিসেবে রোকেয়া সুলতানার মাধ্যমে সে অভাবও পূরণ হয় (পরে অবশ্য বিশ্বভারতীর শিক্ষাও তাঁর মানসলোক ও শিল্পী সত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে)। তাই বলা যায়, ছাপচিত্রী হিসেবে রোকেয়া সুলতানার আবির্ভাব এ দেশের ছাপচিত্র শিল্পের ইতিহাসে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়। এরপর সময়ের সাথে তিনি এ দেশের ছাপাই ছবির ধারায় নিজের অবস্থানকে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন এবং নারী শিল্পী হিসেবে সম্মানের জায়গা ছাড়িয়ে নিজস্ব আঙ্গিকের বলিষ্ঠতায় নিজেকে অন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

শুরু থেকেই শিল্পী রোকেয়া সুলতানার চিত্রতল গড়ে উঠেছে সরলতাকে আশ্রয় করে। প্রথম দিকের বেশ কিছু কাজে প্রকৃতির অফুরন্ত উৎস তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ সময় অন্যান্যের সাথে ছাগল বিষয় হয়েছে সরলতম আকৃতিতে। এ ছাড়া সূক্ষ্ম রেখার সাথে বিভিন্ন ঘনত্বের চওড়া কালোর বিস্তারে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কোনো ঘটনা, উপকরণ কিংবা ভূ-দৃশ্যকেও সরলতায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। তবে প্রত্যক্ষ জগতের হুবহু অনুবাদ নয় বরং, বিষয়ের নির্যাসের সাথে প্রাণস্পন্দনটুকুই সেখানে প্রতিভাত হয়েছে গুরুত্বের সাথে। কখনো আবার সাদা-কালোর বিনুনিতে বিষয়ের বিমূর্ত সমাবেশও লক্ষ করা যায়। তবে শুরুর এই দোদুল্যমানতা কাটিয়ে খুব দ্রুতই নিজস্ব আঙ্গিকে থিতু হয় তাঁর চিত্রপট। এ সময় বহির্জগৎ থেকে তিনি চোখ ফেরান অন্তর্জগতে। ব্যক্তি মানুষ এবং একজন নারী হিসেবে তাঁর অস্তিত্বের নানা সংকটকে দেখতে থাকেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। প্রথমে *ম্যাডোনা* (আশির দশকের পথমার্ধে শুরু) এবং পরে *সম্পর্ক* (২০০০ থেকে শুরু) শিরোনামের ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টিতে তাঁর এই পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনের স্বাভাবিক আবর্তন গতির নিয়মে নারীত্ব আর মাতৃত্বের বন্ধনে ম্যাডোনা সিরিজটিতে (চিত্র ১১৯) তিনি তাঁর সামাজিক, পারিবারিক এবং পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করেছেন। একমাত্র আত্মজা লরার জন্ম, তার প্রতি মাতৃত্বের দায় ও সামাজ প্রেক্ষিত এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী নিজেও বলেছেন–

> ... 'মাতৃত্ব' এক অপার আনন্দ, এক অনিন্দ্য সৃজন, অমিত সৃষ্টি সুখের উদ্ভাস! লারার জন্মের পর আমার নিজের মধ্যেও এক অলৌকিক জন্ম হলো, মাতৃত্বের আশ্চর্য সুখ আমার শিল্পী জীবনকে পরমভাবে সমৃদ্ধ করল।

> আমার ছবি আঁকার বিষয়, স্টাইল সবকিছুতেই এর ‘পজিটিভ’ প্রভাব পড়ল বা গভীরভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হলো। সে সময় থেকে ‘ম্যাডোনা’ সিরিজের কাজ শুরু হয়েছিল।[৬০৫]

মাতৃত্বের এই অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পযাত্রাকে করেছে ঋদ্ধ, সংহত। ফলস্বরূপ ম্যাডোনা সিরিজেই মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের আদি ও অকৃত্রিমতা আবির্ভূত নবতর মাত্রায়। মা ও সন্তানের দৈনন্দিন জীবনের পথ চলার সাথে শিল্পীসত্তার এক গভীরতম উপলব্ধি এই সিরিজ, যা মাতৃত্ব ও নারীত্বের শক্তিকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। *ম্যাডোনা*-২ (১৯৮৪), *ম্যাডোনা*-১ (১৯৯১), *ম্যাডোনা*-২ (১৯৯১), *ম্যাডোনা*-৩ (১৯৯৩), *ম্যাডোনা* (১৯৯৭), *ম্যাডোনা* (১৯৯৮), *রাস্তায় ম্যাডোনা* (১৯৯৫), *রিক্সায় ম্যাডোনা* (১৯৯৫), *রাস্তায় ম্যাডোনা* (১৯৯৬), *ম্যাডোনা* (১৯৯৬), *সহযাত্রীদের সাথে ম্যাডোনা* (১৯৯৪), *সহযাত্রীদের সাথে ম্যাডোনা* (১৯৯৫), *নৌকায় ম্যাডোনা* (২০০০), *ম্যাডোনা* (২০০৩) ইত্যাদি এই সিরিজের অংশবিশেষ। এসব ছবিতে একটি ঘনবসতিপূর্ণ ও কোলাহলমুখর শহরে মা ও শিশুকন্যার নিত্যসংগ্রামকে বিভিন্নভাবে শিল্পী উপস্থাপন করেছেন। কখনো শিশুকে কোলে নিয়ে মা খাওয়ার টেবিল গোছানোয় ব্যস্ত, কখনো গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে মেয়ের হাত ধরে আকাশে উৎসবের বাঁকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে। আবার কখনো খেলায় মত্ত তো কখনো ছাতা হাতে দুর্যোগ থেকে মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টায় রত। কখনো নৌকায় তো কখনো রিকশায়, আবার কখনো ভীড়ভারাক্রান্ত বাসে ঝুলন্ত মা মেয়েকে আগলে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত। বস্তুত এসবের আড়ালে মা হিসেবে সন্তানের প্রতি তাঁর স্নেহবাৎসল্যের সাথে জাগতিক কর্মযজ্ঞের প্রতিটি ধাপে নিজের সংগ্রামকেই উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেও বলেছেন-

> My Madona series is a tale of my personal sufferings and a protest against the inanities of patriarchal ideology.[৬০৬]

আশির দশকের প্রথমার্ধে শুরু হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই সিরিজ চলমান থেকেছে। ফলে ধীরে ধীরে তাতে নানা বিবর্তনও যোগ হয়েছে। তবে আঙ্গিকগত পরিববর্তন খুব বেশি না হলেও পরিসর বিন্যাস ও বিষয়ের সমাবেশ রচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শুরুতে রুক্ষ পশ্চাৎপটে অন্যান্য অনুষঙ্গের সামান্য উদ্ভাসের সাথে মা ও শিশুর দুটি অবয়বের সংযুক্তিতে তল নির্মিত হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য সদস্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার শুরুর হাস্যোজ্জ্বলতার সাথে ধীরে ধীরে যোগ হয়েছে রঙের উজ্জ্বলতাও। যেমন *ম্যাডোনা*-২তে মলিন নীলচে ও সবুজাভ রঙের আধিক্যে বিষয়ের উদ্ভাস রচিত হলেও পরবর্তীকালের অধিকাংশ ছবিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম দিকে ম্যাডোনার উপস্থাপন সামনাসামনি হলেও পরবর্তীকালে তা হয়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে পার্শ্বীয়। এ সময় তিনি *ঢাকা*

---

[৬০৫] রোকেয়া সুলতানা, ‘নারীর পজিটিভ পাওয়ার আমাকে মুগ্ধ করে’, http://www.bengalfoundation.org/?review=নারীর-পজিটিভ-পাওয়ার-আমাক প্রেক্ষিত ২১-০৩-২০১৭ খ্রি.

[৬০৬] Interviews by Ziaul Karim, ‘Rokeya Sultana: A Truly Female Voiace’, *Contemporary Art in Bangladesh Special Volume: Arts & The Islamic World*, No 34, Autumn 1999, p. 34

শহর (১৯৯৪), *লরার পৃথিবী* (১৯৯১), *বাদামী বন* (১৯৯৫), *রাজা ও রাণী* (১৯৯৬) ইত্যাদি শিরোনামেও কিছু ছাপচিত্র রচনা করেন, যেগুলোও তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে। তবে বিষয়বস্তুতে নারীকেন্দ্রিক থাকার কারণে তিনি নারীবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠেন। বস্তুত ছাপাই ছবি, তেলরং, জলরং কিংবা টেম্পেরা যে মাধ্যমেই তিনি কাজ করেছেন, সমসাময়িক সমাজপ্রেক্ষিতে নারীচেতনা তাঁকে সবসময় আকৃষ্ট করেছে। ম্যাডোনাতে তিনি যেমন নারীর বাহ্যিক জগতের সংগ্রামের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন তেমনি *সম্পর্ক*তে নারীর অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাই বলা যায়, বহুতল বিশিষ্ট্য সামাজিক সম্পর্কের আড়ালে নারীর স্বপ্ন, প্রেম অথবা নারীজীবনের অব্যক্ত নানা বাসনার চিত্রজ রূপায়ণ তাঁর *সম্পর্ক* (চিত্র ১২০) সিরিজ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ-

> একজন নারীর অন্তর্মুখী অভিযাত্রার যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ এবং এর যে রূপান্তর তারই আলেখ্য সৃজিত হয়েছে রোকেয়া সুলতানার 'রিলেশান্স' সিরিজের চিত্রকর্মে। নারীর ভালোবাসার অন্তঃপুরে অনুপুঙ্খ আবেগের যে রহস্যময় অবস্থান রোকেয়া তাঁর ক্যানভাসে সেই অবস্থানেরই ব্যবচ্ছেদ করেছেন, নারীর মানসিক এবং জৈবিক আকাঙ্ক্ষার যে দ্বান্দ্বিক গল্প তার প্রকাশে ক্যানভাসে এক ঐন্দ্রজালিক জগৎ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। মেয়ের বড় হয়ে ওঠাকে দেখেছেন গভীরতম দৃষ্টি নিয়ে এবং তাতেই সন্ধান পেয়েছেন নিজের উজ্জ্বল তারুণ্য, অমিয় ইচ্ছাশক্তি, অব্যক্ত স্বপ্ন আর অমিত আবেগের।[৩৩৭]

মূলত টেম্পেরা মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ছবি নির্মাণ করলেও ছাপাই মাধ্যমেও এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিত্র নির্মাণ করেছেন, যা করণকৌশলগত দিক থেকে পৃথক হলেও আঙ্গিকগত দিক দিয়ে অভিন্ন। এই সিরিজে তিনি নাারীত্বের আদি রূপ বা স্বভাবকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন এবং স্থান-কালের ঊর্ধ্বে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অবদমিত স্বপ্ন, কল্পনা, কামজ বাসনা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন অথবা দুজন নারী অবয়বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে চিত্রপটে। এই নারী চরিত্রগুলো পূর্বের (ম্যাডোনার) তুলনায় আরও সরল, দীর্ঘায়িত, কখনো কখনো কাল্পনিক দো-আঁশলা গড়নযুক্ত এবং নগ্ন। এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> Here, figures are rendered in less detail than those of the Madona series. They are sketchily executed in energetic black outlines, their faces devoid of features. They are nude, and while the majority are recognizably female, others are ambiguously sexed, and some appear simultaneously as both sexes. The Relations figures float weightlessly, recline, or languidly embrace against cumulus clouds of colour with no perceivable self-consciousness. The lack of clothing conveys an abandonment of cares and restrictions – perhaps of the figures' daily lives – snd lack of constraint by convention, time, and even

[৩৩৭] সরোয়ার জাহান চৌধুরী লিখিত বেঙ্গল গ্যালারি অব্ ফাইন আর্টসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *রোকেয়া* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

> gravity. Although nude, and time embracing, Relations is entirely devoid of sexual titillation.[৬০৮]

এই চিত্রগুচ্ছে শিল্পী প্রাণময় আবেগ আর শিল্পিত বিন্যাসে নারীর যে জীবন তৃষ্ণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে কল্পনাবিলাসী যৌনতার সাথে রহস্যময়তা ও মানবিক বোধও উজ্জ্বলতায় বিকশিত। আবার কিছুটা বিদ্রোহের সুরও যেন এতে অনুভূত হয় প্রচলিত সামাজিক রীতি ভাঙার চেষ্টায় কিংবা সামাজিক লোকাচারে অনুচ্চার্য বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে। এ ছাড়া *নূহের নৌকা* (২০০৪), *ক্রুসবিদ্ধ* (২০০৪), *চাঁদ হাতে মানুষ* (২০০৪) ইত্যাদিও তাঁর এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

শিল্পী রোকেয়া সুলতানার ছাপচিত্র নির্মাণের দক্ষতা প্রভাবিত করেছে তাঁর চিত্রকলার পরিসর নির্মিতিকেও। চিত্রকলায় উপকরণের যে সমাবেশ, যে রেখাপ্রধান সরলতম অবয়ব বারবার ব্যবহৃত হয়েছে তার উৎস ছাপচিত্র। বস্তুত গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে তিনি ছাপচিত্রের পাশাপাশি চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমেও মনোনিবেশ করেন এবং বিমূর্ত প্রকাশবাদিতার একটি নিজস্ব আঙ্গিকও নির্মাণ করতে সক্ষম হন। এ সময় থেকে ক্রমশ চিত্রকলা মাধ্যমের চর্চায় নিয়মিত হওয়ার ফলে ছাপচিত্র মাধ্যমের চর্চার গতি কিছুটা হ্রাস পায় (বিশেষ করে বর্তমান শতকের প্রথম দশকের কিছু সময়)। এরপর বর্তমান শতকের প্রথম দশকে (২০১২) ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে আমেরিকার নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সময়ে তাঁর ছাপাই ছবির পালে নতুন করে হাওয়া লাগে। পূর্বে এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফ, কাঠ খোদাই, ড্রাইপয়েন্ট ইত্যাদিসহ ছাপচিত্রের প্রচলিত সব মাধ্যমে কাজ করলেও আমেরিকাপর্বে তিনি নিরীক্ষা করেন 'ইউনিক প্রেসার প্রিন্ট' পদ্ধতি নিয়ে। ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকির ফলে ছাপাই মাধ্যমের প্রচলিত পদ্ধতির বিকল্প পরিবেশবান্ধব ও বিষক্রিয়ামুক্ত নানা পদ্ধতি নিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঘটে চলা নানা নিরীক্ষা প্রবণতার ধারাবাহিকতায় তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছেন। এ পদ্ধতিটি প্রথাগত রিলিফ ও স্টেনসিল পদ্ধতি দুটির সমন্বিত একটি রূপ, যা তাঁর ছাপচিত্রে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এই প্রেসার প্রিন্ট পদ্ধতিতে করা তাঁর ছাপচিত্রসমূহে ব্যবহৃত অবয়বগুলো পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও সরল, কুণ্ডলিত, রেখা বর্জিত এবং সিলিউট আকৃতিযুক্ত। *লিভিং ওশান* (২০১২), *ভেনাস ক্রসিং দ্যা মুন* (২০১২) (চিত্র ১২১), *ফ্লোরা, ফনা অ্যান্ড আই* (২০১২), *ফাতা মরগানা* (২০১২) ইত্যাদি সিরিজগুলো এ পর্বের উদাহরণ। দীর্ঘ সময় ধরে ছাপচিত্র এবং চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে রোকেয়া সুলতানার সাবলীল পদচারণার দরুন এ দুই মাধ্যমের গুণাগুণ একত্র হয়ে নতুন দৃশ্যজ অভিজ্ঞতার অবতারণা করেছে এই চিত্রগুচ্ছ। এখানে বিভিন্ন ধরনের আকার আকৃতির সমাবেশে তিনি চিত্রতলকে কারুকার্যময় করে তুলেছেন, যা মরীচিকাসদৃশ্য একধরনের প্রহেলিকার জন্ম দেয়। কারো কারো কাছে

---

[৬০৮] Melia Belli Bose, 'A mother's Love, A Woman's Journey: the Art of Rokeya Sultana', ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *রোকেয়া* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

তা মহাজাগতিক কোনো সত্য, সমুদ্রের অতল জলরাশির নিচের অজানা জগৎ কিংবা আধ্যাত্মিক নৈর্বক্তিকতা নিয়েও হাজির হয়। বস্তুত এসব ছাপাই ছবিতে মহাজাগতিক, জৈবিক ও শিশুসুলভ নানা আকৃতির সাথে উজ্জ্বল রঙের সমন্বয়ে যে দৃশ্যজ কল্পনার জগৎ তিনি নির্মাণ করেছেন, পূর্বের সকল সময়ের ন্যায় তার উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে শিল্পীর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে। এ ছাড়া *সোলারিস* (২০১২), *প্রিলুড টু স্পেস* (২০১২), *অফ টাইম অ্যান্ড স্টারস* (২০১২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র সিরিজ।

শিল্পী রোকেয়া সুলতানার সৃজনসম্ভারে সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে সরলতা, কাব্যিক বয়ানধর্মিতা এবং নিজস্বতা। সে যাত্রায় তাঁর চিত্রপট সবসময় একনিষ্ঠ থেকেছে প্রকৃতি, ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও তাঁর পরিচিত পরিপার্শ্বের। কল্পনাবিলাসী রোমান্টিকতা ও পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকের সাথে বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনে প্রকৃতি, নারী ও প্রেমের অপূর্ব সন্নিবেশে নারীত্ব, মাতৃত্ব ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন তিনি। রোকেয়ার নারীরা যেমন কোমল ও পেলব তেমনি লড়াকু, নির্ভীক ও নিঃশঙ্কও। তাঁর ছবিতে বিষয়নির্ভর ও বক্তব্যধর্মী শিল্পরীতির সাথে বিমূর্ত ধারার শিল্প আঙ্গিকের এক সুসমন্বয় লক্ষ করা যায়। তাঁর শিল্পকর্ম তাঁর ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির জটিল প্রকাশক্ষেত্র। প্রতিটি ছবি যেন তাঁর দিনপঞ্জির এক একটি পাতা। চলমান সমাজপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি শিল্পীর কর্মকাণ্ড ও আবেগঅনুভূতির একান্ত নিরীক্ষাক্ষেত্র তাঁর শিল্প। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> I prefer to do my art in series. My previous body of work focused on relations between the human figure, materials, objects, forms, colors, and tools; and Iam always influenced by nature. This new body of work is an extended study of these relations. These series are like my journals, as I feel they capture the various phase of my lifelong artistic journey. They are like chapter in a story.[৩৩৯]

তবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনানির্ভর হলেও নির্মিতিতে তা কখনো কখনো স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা তাঁর নিজস্ব চিত্রভাষা ও আঙ্গিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর ছাপাই ছবির তল সবসময় তরল, বুনটযুক্ত, আবেগী, ছন্দোময় এবং বহুতলবিশিষ্ট। তবে বিষয়ের কাব্যিক সমাবেশ রচনার সাথে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারই হলো শিল্পী রোকেয়া সুলতানার ছাপাই ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। আবার পরিসরের স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস ও রূপ-রূপবন্ধের সাহসী সংযোজনও তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁর অঙ্কন শৈলী সহজ এবং শিশুসুলভ সরলতা উত্তীর্ণ। ছন্দোময় রেখায় চিত্রপটে উপস্থাপিত মানব অবয়ব সরল ও ললিত। আবার আকার-আকৃতির গড়ন এবং অভিব্যক্তিতেও এই সরলতা বিদ্যমান। বস্তুত তাঁর শিল্প আঙ্গিক শিশুচিত্র ও গুহাচিত্র উদ্ভূত বলে

---

[৩৩৯] Rokeya Sultan, 'Words on Fata Morgana', ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত *ফাতা মরগানা* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

বোধ হয়, যা তাঁর ছাপাই ছবিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছে এবং বক্তব্যের সবিশেষ প্রকাশ ঘটানোর সহজ পথ বাতলে দিয়েছে। বিষয়ের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের বদলে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এর মননশীল রূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে। সেজন্য তাঁর চিত্রপটে বিষয়ের নাটকীয় উদ্ভাস সামান্য হলেও তা জীবন্ত, সতেজ এবং অনেক বেশি প্রকাশমুখী হয়ে ওঠে। প্রথাগত পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার পরিহার করে অবয়ব ও উপাদানসমুহকে চিত্রতলে ভাসমান অবস্থায় উপস্থাপন করেছেন। ফলে তাঁর চিত্রতলে সম্মুখপট ও পশ্চাৎপট পৃথক করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ছাপচিত্র এবং চিত্রকলা দৃশ্যশিল্পের দুটি মাধ্যমেই তাঁর সাবলীল পদচারণার দরুন এক মাধ্যম অন্য মাধ্যমকে সমৃদ্ধ করেছে। চিত্রকলার সরল রেখাচিত্রের সূত্র যেমন ছাপচিত্রে প্রোথিত, তেমনি ছাপাই ছবির রঙের উজ্জ্বলতা এবং এর স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস চিত্রকলা উদ্ভূত। তবে রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিল্পী সনৎ করও তাঁকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছেন। ছাপাই মাধ্যমের এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁর আঙ্গিক ও রূপবন্ধের ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটলেও কিছু নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। যেমন তাঁর অবয়বসমুহ ক্রমশ ধাবিত হয়েছে আরও সরলতার দিকে। আবার পূর্ববর্তী সময়ের মতো উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার থাকলেও শেষের দিকে তাঁর কাজে আকারআকৃতির গুরুত্ব বেড়েছে, যেগুলোর উপর্যুপরি উপস্থিতি একধরনের বিমূর্ত বোধের ধারণা দেয় দর্শকদের। রেখার ব্যবহারও কম দেখা যায় সমসাময়িক ছাপাই ছবিতে। এর অনেক কিছুই মাধ্যম ব্যবহারের ভিন্নতায় উদ্ভিন্ন হলেও একথাও সত্য যে, নিরন্ত প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার দ্বারা তিনি নিজস্ব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে অন্য উচ্চতায় উপনীত করতে সমর্থ হয়েছেন। ছাপাই মাধ্যমের ছন্দোময়তাকে তিনি শিল্পে প্রস্ফুটিত করেছেন অপরিসীম দরদ ও দক্ষতায়, যা এ দেশের ছাপচিত্রের ইতিহাসে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

চিত্রকলায় আশির দশকে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেও একজন ছাপচিত্রী হিসেবে শিল্পী দিলারা বেগম জলির পরিচিতি নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে। আশির দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছেন চিত্রকলায়। তবে দশকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক চট্টগ্রামে দেড় মাসব্যাপী আয়োজিত ছাপচিত্র কর্মশালার মাধ্যমে ছাপাই মাধ্যমের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরপর ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাপাই মাধ্যমে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিপর্যায়। অর্থাৎ বলা যায়, ছাপাই মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্মসমূহ তিনি নব্বইয়ের দশকেই সম্পন্ন করেছেন। কাজ করেছেন রিলিফ, ইন্টাগ্লিও এবং প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে। শুরুতে মাধ্যমকে আত্মস্থ করতে এবং বিভিন্ন সময়ে কিছু বিচ্ছিন্ন শিল্পকর্ম নির্মাণ করলেও মূলত এ মাধ্যমে করা তাঁর অধিকাংশ কাজ সিরিজভিত্তিক। করেছেন *বস* (১৯৮৩), *কোরবানি* (১৯৮৯), *অ্যাকুরিয়াম* (১৯৯০-৯১), *চাঁদে অমাবস্যা* (১৯৯০), *লালসালু* (১৯৯১), *ক্যাকটাস* (১৯৯২), *বেহুলা ও মনসা* (১৯৯৪) প্রভৃতি সিরিজ।

আমাদের শিল্পযাত্রা শুরু থেকেই একধরনের রোমান্টিকতার বাতাবরণে আবদ্ধ ছিল। সমাজ-রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া বড় বড় ঘটনাও খুব বেশি আলোড়িত করেনি আমাদের শিল্পীদের। ফলে একধরনের জনবিচ্ছিন্নতা নিয়ে বেড়ে উঠছিল তা। আশির দশকের কোনো কোনো শিল্পী এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সমাজপ্রেক্ষিত তাঁদের শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিল্পী দিলারা বেগম জলি সে প্রজন্মের একজন উজ্জ্বল প্রতিনিধি। সমাজ ও সময় জলির সৃষ্টি প্রেরণার মূল উৎস। চারপাশের সমাজবাস্তবতা আর তার নানা অসংগতি শিল্পীর ভেতরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা-ই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু। ছাত্রাবস্থা থেকেই জলি প্রথাবিরোধী। প্রচলিত রীতি বা আঙ্গিককে অনায়াসে গ্রহণ না করে বরং তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, ভেঙেছেন। শুরু থেকেই কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষের আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিপরীতে নারীর বিপন্নতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। নারীর সামাজিক অবস্থান, বৈষম্য, নির্যাতন, অবিচার, আনন্দ, দ্রোহ ইত্যাদি তাঁর শিল্প সৃষ্টির মূল উপজীব্য বলে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর শিল্পে নারী এসেছে কখনো অন্দরসজ্জার অনুষঙ্গ হিসেবে। কখনো দেয়ালে দেয়ালচিত্র কিংবা দিনপঞ্জির পাতায় নগ্ন লাস্যময়ী হিসেবে; প্রবল কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষের বিকৃত কামোন্মাদনার প্রতীক হিসেবে। আবার *কোরবানি* সিরিজে নারী এসেছে উৎসর্গীকৃত পশুর বিকল্প রূপে। সেখানে ধারালো বটির বিপরীতে মাছ এবং চতুষ্পদী প্রাণীর সমান্তরালে কোরবানির পশুর মতো গলায় মালা পরিহিত অবস্থায় উপস্থাপন করেছেন নারীচরিত্রকে। যেন সংসারের ঘানিতে পড়ে নারীর স্বপ্ন-সাধ-আত্মসুখ সবকিছুকেই সে উৎসর্গ করছে কোরবানির পশুর মতো। আর ঘরের চার দেয়ালকে অ্যাকুরিয়ামের চার দেয়ালের সাথে তুলনা করেছেন *অ্যাকুরিয়াম* সিরিজে (চিত্র ১২২)। রং-বেরঙের মাছ ও অন্যান্য জলজ অনুষঙ্গের সাথে ভাসমান নারীচরিত্রও, পাশে দর্শক পুরুষ। যেন সমাজে নারী দর্শনীয় কোনো অনুষঙ্গ। এই সমাজবাস্তবতাকে উপস্থাপনের জন্য কখনো কখনো আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র *লালসালু*র মজিদ ও তাঁর স্ত্রী জমিলা চরিত্রের আড়ালে অশুভ আর শুভের দ্বন্দ্বকে যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তেমনি সমাজে মৌলবাদী ধারণার প্রবল বিকাশের সাথে সাথে নারীর অসহায়ত্বের দিকটিও প্রকাশ করেছেন সুনিপুণভাবে তাঁর *লালসালু* সিরিজে। মোমবাতির শিখা, কবর, দাড়িওয়ালা পুরুষ চরিত্র এবং নারী ও অন্যান্য চরিত্রের প্রতীকী উপস্থাপনে নাটকীয়তা নির্মাণ করেছেন চিত্রপটজুড়ে। সামাজিক এসব অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে চিত্রপটজুড়ে নারীর প্রতিকৃতিতে গড়েছেন *মুখ* (১৯৯১)। হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র *কালী*-র আদলে অসাম্য আর অনাচারের বিরুদ্ধে সংহারীরূপে সৃষ্টি করেছেন নারীকে। উজ্জ্বল কমলা রঙের জমিনের বিপরীতে সবুজ সাদা আর নীলচে কালোয় তা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আরও। কয়েকজন নির্যাতিতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট ভঙ্গি তুলে ধরেছেন *অনামা* (১৯৯০?) (শিরোনাম অজানা) চিত্রটিতে। অন্ধকারাচ্ছন্ন তলে পাঁচটি ভয়ার্ত লিঙ্গনির্বিশেষ মনুষ্যসদৃশ্য ভাসমান আকৃতির উপস্থাপন এতে। আকৃতিগুলোতে সাদার বিপরীতে রক্তলালের উপস্থিতি পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে জানান দিচ্ছে। *কীসের জন্য উৎসর্গ করা?* (১৯৯০-৯১?) এর পটের অগ্রভূমিতে পড়ে আছে

বিক্ষত নারীমূর্তি। আর তাকে ঘিরে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু সন্ত্রস্ত নারীমুখ। ওপরে এক নারীমূর্তি চিন্তামগ্ন এই ভেবে যে, প্রতিদান যদি এরূপ, তবে তাদের এ আত্মত্যাগ কীসের জন্য! বিষাদনীল আর রক্তলালের ব্যবহার পরিস্থিতিকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। সমকালীন সন্ত্রাস ও সহিংসতাও উপজীব্য হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় *খেলার মত-১* (১৯৯৩)-এর কথা। নব্বইয়ের নব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে নির্মাণ করেছেন ছবিটি। যেখানে হত্যা-সন্ত্রাস নিছক খেলার মতো।

নারীর অন্তর্গত মনোবেদনার অখ্যান তাঁর *ক্যাকটাস* সিরিজ (চিত্র ১২৩)। সামাজিক জীবনে নারীর নানামুখী দুঃখ, বঞ্চনা আর অবহেলাকে ক্যাকটাসের কণ্টক-জর্জর অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন তিনি। এই অসাম্য আর নিষ্পেষণের মনোবেদনা নিয়েও নারীজন্মকে মহিমান্বিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়; থাকে আনন্দের আয়োজন। যেমন কণ্টকাকীর্ণ অবস্থাতেও ক্যাকটাস ফুল ফোটায়। কিন্তু পশুরূপী কোনো দানব চরিত্রও তাঁর সে আনন্দযজ্ঞ নস্যাৎ করে দেয়, এমন নাটকীয়তা নির্মাণ করেছেন এই সিরিজে। আবার ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দুই নারীর বিরোধের পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন *বেহুলা ও মনসা* সিরিজ। এতে নারীসত্তার দৈনন্দিন অস্তিত্ব, সংকট, প্রতিবাদ, আকাঙ্ক্ষা আর মানবিক প্রকাশের বাতাবরণ নির্মাণ করেছেন দক্ষতার সাথে।

দিলারা বেগম জলির এই শিল্পজগৎ দৃশ্যমান বাস্তবতার হুবহু উপস্থাপন নয়। বরং চেনা ও শোনা জগতের নানা ঘটনাবলির এক প্রতীকী ও প্রতিবাদী উপস্থাপন তা। সন্ত্রাস, রাজনীতি, সহিংসতা বিশেষ করে নারীর সামাজিক অবস্থান, বৈষম্য, নির্যাতন, অবিচার, আনন্দ, দ্রোহ ইত্যাদি তাঁর শিল্প সৃষ্টির মূল উপজীব্য। তাঁর শিল্প নির্মাণের আঙ্গিক সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত। বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও অন্তর্গত বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সবসময়। একধরনের শিশুসরলতা-উত্তীর্ণ তাঁর চিত্রতল, যা বাংলার লোকায়ত সূচিশিল্পের নানা সরল রূপবন্ধ কিংবা শিশুচিত্রকলা থেকেও আত্মীকৃত হতে পারে। তাঁর এসব শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের উপকরণের সাহায্যে চিত্রপটে একধরনের ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণ করেন কিছুটা পরাবাস্তবাদী আঙ্গিকে। বর্ণনার প্রয়োজনে বা বক্তব্যের সবিশেষ প্রকাশের নিমিত্তে কখনো চিত্রতল গড়েছেন চলচ্চিত্রের স্টোরি বোর্ডের মতো ছোট ছোট খোঁপে চরিত্রগুলো স্থাপনের মাধ্যমে। আবার কখনো সব উপাদানসমূহ মধ্যাকর্ষণহীন কোনো তলে ভাসমান অবস্থায় করেছেন স্থাপন। কখনো বা চিত্রতলের চারদিক থেকে করেছেন উপকরণ বা প্রতীকের সংযোজন। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়, যা তাঁর চিত্রকলা থেকে উদ্ভূত। তবে রঙের এই উজ্জ্বলতা মোহনীয়তার পরিবর্তে একধরনের বীভৎস, চীৎকৃত পরিবেশ বর্ণনা করে। যেমনটা দেখি তাঁর উপস্থাপিত চরিত্রসমূহেও। তাঁর অঙ্কিত আকৃতি বা চরিত্রসমূহে সেসব নান্দনিক করে তোলার কোনো প্রচেষ্টাই লক্ষ করা যায় না বরং অনেকটাই অস্বস্তি উৎপাদক, মেরুদণ্ডহীন কোনো মাংসপিণ্ডের মতো।

পরিস্থিতির বিরূপতা তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সহজেই। চিত্রতলে উপস্থাপিত আকৃতিসমূহে স্পষ্ট এবং অস্পষ্টতার রহস্যময়তা পূঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ফলে খুব সহজেই একধরনের নৈর্ব্যক্তিকতার জন্ম হয়। তাঁর শিল্পে মাধ্যমের করণকৌশলের আধিপত্য দেখা যায় না। ছাপচিত্রে সাধারণত আমরা যে বুনট-প্রধান তল দেখে থাকি, জলির চিত্রতল তেমন নয়। বরং তা অনুভূতি ও বক্তব্য-প্রধান। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক নানা সংঘাত, বিশেষত নারীজীবনের সংকট জলির ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুরুষতান্ত্রিক সামাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থানের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বরাবরই সচেতন। তাই সামাজিক বৈষম্য আর অনাচারের নানা ঘটনা তিনি বোধ আর অনুভূতি দ্বারা জারিত করে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, তা মাধ্যমের সীমাবদ্ধতাকে উৎরে শিল্প হয়ে ওঠে সহজেই।
ছাপাই মাধ্যমের যন্ত্রানুষঙ্গ, অন্যান্য উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপর্যাপ্ততার কারণে দিলারা বেগম জলি নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের পরে আর নিয়মিত ছাপচিত্র নির্মাণ করেননি। তবে চিত্রকলার ছাত্রী হওয়ার সুবাদে তাঁর ছাপচিত্র যেমন হয়েছে বহুবর্ণিল, তেমনি ছাপচিত্র নির্মাণের জ্ঞান পরবর্তীকালে নির্মিত তাঁর চিত্রাবলির তলের নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে কোথাও কোথাও।

চিত্রশিল্পী হিসেবে আশির দশকে 'সময়' শিল্পীদলের সাথে শিল্পী ওয়াকিলুর রহমানের আবির্ভাব হলেও ছাপচিত্রী হিসেবে তাঁর পথচলার শুরু নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ থেকে। আশির দশকের প্রথমেই (১৯৮১) চিত্রকলা বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন ঢাকার শিল্পমহাবিদ্যালয় থেকে। চিত্রকলার পরিপূরক সহপাঠ হিসেবে এ সময়েই তাঁর ছাপচিত্রচর্চার হাতেখড়ি হয়। এরপর পাঠ্যক্রমের বাইরে এবং (আলমগীর হকের) কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুবাদে কাঠ খোদাই, ড্রাইপয়েন্ট এবং এচিং মাধ্যমেও বেশ কয়েকটি ছাপচিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চীন সরকারের বৃত্তির আওতায় তিনি চীনের সেন্ট্রাল একাডেমি অব ফাইন আর্টস পিকিং এ যান চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য। এই চীন পর্বে গঠিত মানসই মূলত তাঁর পরবর্তীকালের শিল্প সৃষ্টির প্রধান উর্বরা ক্ষেত্র। এ সময় শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে চীনের শিল্পের ঐতিহ্যগত ধারা (বিশেষত সাদার বিপরীতে কালো ও ধূসর রঙের প্রয়োগ) তাঁর মনোলোকের উপর প্রভাববিস্তারী হয়। চীন থেকে ফিরে তিনি চলে যান জার্মানিতে (১৯৮৮)। জার্মানি হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী দীর্ঘদিনের যাপনক্ষেত্র, এখানেই চিত্রশিল্পী থেকে ছাপচিত্রী হয়ে ওঠা। চীনেও ছাপাই ছবির সমৃদ্ধ চর্চা ও ইতিহাস থাকার পরও এই জার্মান পর্বেই তাঁর সামনে ছাপচিত্রের ব্যাপক সম্ভাবনার দিকটি উন্মোচিত হয় মূলত ইউরোপজুড়ে ছাপাই ছবি চর্চা-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখে। সাথে বিরূপ বাস্তবতায় জীবন ধারনের জন্য ছাপচিত্রকেই অবলম্বন করেন তিনি। কারণ বাংলাদেশের মতো প্রান্তিক কোনো দেশের এক তরুণের পক্ষে ইউরোপে চিত্রকলার চর্চা করে টিকে থাকার মতো বাস্তবতা ছিল না। ফলে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেয়া কিছু কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে তা থেকে রিলিফ পদ্ধতিতে ছবি ছাপার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর ছাপচিত্রের পথচলা। এরপর বার্লিন ইউনিভার্সিটি অব আর্টস-এ শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন ছাপাই

মাধ্যমে। কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ, অ্যালুগ্রাফ ও অন্যান্য মাধ্যমের সাথে এচিং অ্যাকোয়াটিন্টেও এ সময় থেকে কাজ করা শুরু করেন। প্রথম দিকে তাঁর কাজে বস্তুর প্রতিনিধিত্বমূলক গুণের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও নব্বইয়ের প্রথমার্ধ থেকে নানামুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে তা অপসারিত হতে থাকে। ছবি হয়ে উঠতে থাকে বিমূর্ত গুণসমৃদ্ধ। আবার নতুন করে জাগরিত হতে থাকে চীনের স্মৃতি, তুলির বলিষ্ঠ আঁচড়ে আঁকা ক্যালিগ্রাফি, সাদার বিপরীতে কালো ও ধূসরে আঁকা পরম্পরাগত শিল্পের সরল ভাষা আর জেন দর্শন। জাপানি জেন দর্শনের পরিমিতির সাথে ইউরোপের জ্যামিতিক শুদ্ধতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিক। *বাস্তবতা পেরিয়ে* (১৯৯৩), *মরা নদী*-১ (১৯৯৩), *মরা নদী*-২ (১৯৯৩) (চিত্র ১২৪), *চীনের স্মৃতি*-৩ (১৯৯৩), *চীনের স্মৃতি-৪* (১৯৯৩), *যাওয়া আসার পথে* (১৯৯৩), *পরিসর নিয়ে খেলা* (১৯৯৩) ইত্যাদি শিল্পকর্মে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকের দেখা মেলে। এসব ছবিতে জমাট কালোর আস্তরের ওপর সাদা আকার-আকৃতি, কিংবা সাদা বা ধূসর তলে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত চৈনিক ক্যালিগ্রাফির মতো মোটা কালো রেখা, চওড়া রঙের আস্তর ও অচেনা রূপবন্ধে অব্যক্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একধরনের সংকেতময়তা প্রকাশ্য তাতে। হয়তো বর্তমানের সহায়হীনতাই উসকে দিয়েছে অতীতের স্মৃতিগুচ্ছ। তাই রং, রেখা আর পরিসরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে নিজস্ব বোধের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। সমালোচক এ প্রসঙ্গে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন নিম্নোক্ত উক্তিটিতে–

> Wakil’s recent works are not concerned with his outer reality, but rather treating his personal feelings. He therefore uses froms which do not resemble what we call reality. But nevertheless these froms gain their independent existence and become objects themselves. Wakil dose not like to impose any certain meaning or idea on them, he rather enjoys them to come out spontaneously from his subconsciousness. The same goes for space: He does not use it just to fill up the blank but tries to respect its specific quality. Colours also become economical and simple.[৬১০]

তাঁর এই বিমূর্ত বোধের উৎস ক্ষেত্রবিশেষে চীনের ঐতিহ্যিক শিল্প কিংবা স্মৃতি-ধূসর বাংলাদেশের প্রকৃতি। চওড়া কালো রেখাকে চীনের ক্যালিগ্রাফি থেকে যেমন নিয়েছেন, তেমনি পাখির চোখে দেখা এ দেশের নদীনালাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বেশ। এই গ্রহণ-বর্জনের নানামুখী বৈচিত্র্যের সাথে ওয়াকিলের ছবিতে যোগ হয়েছে আকার-আকৃতির বৈচিত্র্যও। গতানুগতিক ধারার চৌখুপী থেকে বেরিয়ে ত্রিভুজ, বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রাকৃতিকে ছবির জমিন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কেননা আপাত বিসদৃশ

---

[৬১০] Dhali Al-Mamun, ‘Towards Simplicity’, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যেটে ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত *ওয়াকিল* শীর্ষক ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

এই আকৃতি দ্বারাই জগতের সকল আকৃতির সরল উপস্থাপন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে চীনের জেনবাদী শিল্পী সেংগাই (১৭৫০-১৮৩৭) তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। নৈরাজ্য, দর্শন, ন, র, ঃ ইত্যাদি বাংলা ভাষার কোনো শব্দ বা অক্ষরের সাথে রেখা, রং, আর বুনট সহযোগে তৈরি করেছেন *বর্গ* (১৯৯৪) চিত্রগুচ্ছ। এতে বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের তাৎপর্যকে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। আবার আনুলম্বিক ভাস্কর্য-সুলভ কাঠামো এবং গোলাকৃতি তলে রং-রেখা আর বুনটের নির্মাণ তাঁর *ত্রিভুজ* (১৯৯৪) ও *বৃত্ত* (১৯৯৪) চিত্রগুচ্ছ। শুধু রং আর বুনটের তলে রেখার আঁকিবুঁকিতে কখনো কখনো পরিচিত কোনো চিহ্ন বা বিষয়ের উদ্ভাস, যেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষয়ে যাওয়া পাথুরে দেয়ালের জঙ্গমতা তাতে। তাঁর এ পর্বের কাজেও অনুপ্রেরণা হয়েছে মাতৃভূমির প্রকৃতি এবং এর ভাষা। এই দেশ ও এর প্রকৃতি শিল্পী ওয়াকিলের চৈতন্যজুড়ে বিস্তৃত থেকেছে সবসময়। দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থানের ফলে স্বদেশের স্মৃতিময় ধূসর অতীত ছায়া ফেলে মনের পর্দায়। ওয়াকিলও চোখ বন্ধ করে অনুভব করেছেন সাভার থেকে শাহবাগ আসার স্মৃতি, দুই পাশের জলাভূমি, দৃশ্যাবলি। আর এই অনুভূতির দৃশ্যজ প্রকাশ তাঁর *পথে* (১৯৯৬) শীর্ষক সিরিজটি (চিত্র ১২৫)। এতেও ছবির গতানুগতিক আকৃতি বাদ দিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন দীর্ঘ আনুভূমিক চিত্রতল। গাঢ় বা হালকা রঙের কোনো দৃশ্যপটের বিপরীতে কখনো সরু সূক্ষ্ম আবার কখনো চওড়া কালো রেখায় সৃষ্ট রূপবন্ধের সংযোগে গড়ে উঠেছে চিত্রতল। তাতে নিসর্গ অবলোকনের স্বাদ অনুভূত হলেও ঘরবাড়ি, গাছপালা কিংবা নিসর্গের পরিচিত অনুষঙ্গের সাথে তাদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর নিঃসীম কোনো প্রান্ত, রেখায় আঁকা এক ধ্বংসস্তূপ। এ প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন সমালোচক–

> ওয়াকিলের ছবি দেখে মনে হয় এ যেন ক্যালিগ্রাফি নির্ভর পুরাকীর্তির ধ্বংসস্তূপ। যেন বিচিত্র অভিব্যক্তির অক্ষর সময়ের দাবি উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এইসব দীর্ণ ক্যালিগ্রাফি সুনির্দিষ্ট অর্থের গুণ হারিয়ে বহুমাত্রিকভাবে সংবেদী হয়ে এক গভীর এরিয়েলের মর্মার্থ পেয়েছে।
>
> কোন এক জমাট, নিপাট পটভূমিতে তীব্র আঘাত লেগেছিল। তারপর অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে গিয়েছে। স্পেসের মধ্যে ভেসে থেকে সেই টুকরোগুলো এখন অভিন্নতার গান গায়। শুকনো মওসুমে আমাদের জলাভূমিরও এই রূপ– শুকিয়ে যাওয়া ভূস্তরে মৃত জলরেখা আর মাঝে মধ্যে গভীরতর খাদে এখনো জল। কিংবা বলা যায় শুকনো প্রান্তর পেরিয়ে থেমে থেমে গ্রাম, বনভূমি যেমন দৃষ্টির মধ্যে ভাসে। অথবা বিরান মাঠের খড়-বিচালি, জল চলে যাওয়ার পর জমির ওপরের দাগ, সাঁকোর ত্রিকোন বাঁশের গড়ন, জল থেকে মুখ উচিয়ে স্থির হয়ে থাকা নৌকার গলুই- এইসব অনুষঙ্গ শূন্য স্পেসে সিম্ফনি রচনা করেছে।[৬১১]

পরিসরে টুকরো টুকরো রং, কালোর আঁচড়, এবড়ো-খেবড়ো বুনট কখনো কখনো ইশারা দিয়ে যায় পরিচিত কোনো চিত্রকল্পের। শুধু স্বদেশের স্মৃতিই নয়, এতে মিশেছে চৈনিক ক্যালিগ্রাফিও। মোটা তুলির আঁচড়ে ত্রিকোনাকার রূপবন্ধ কিংবা ঈষৎ বৃত্তাকার চিহ্ন তো দর্শকদের তারই ইঙ্গিত দেয়।

---

[৬১১] মঈনুদ্দীন খালেদ, 'চেতনার এক রাঙা ভাষণ', ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত *ওয়াকিল* শীর্ষক ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

আবার ভূমির সমান্তরালে উপস্থাপিত রেখা যেন স্থিতি ও শান্তির বার্তা শোনায়। তাঁর ছবিতে দৃশ্যজগৎ যেমন অতিন্দ্রীয় ইশারা নিয়ে হাজির হয়, তেমনি পরিচিত-অপরিচিত অক্ষরকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ভাসমান রূপবন্ধের সারি তৈরি করে বিমূর্ত ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর *শব্দ* (১৯৯৮) সিরিজ (চিত্র ১২৬)। স্বল্প রং, সূক্ষ্ম ও ভরাট রেখায় নির্মিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ভাষার বর্ণগুলো ছবির ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়েছে এতে। ধূসর তলে জমাট কালো রূপবন্ধ কখনো বিক্ষিপ্ত, কখনো সন্নিবিষ্ট। এই সন্নিবিষ্টতা আরও গাঢ় হয়ে সমগ্র তল অধিগ্রহণ করেছে *ওটি* (১৯৯৯, ২০০০) চিত্রগুচ্ছে (চিত্র ১২৭)। কালোর বুকে কালোর আঁচড়ে, আবার কখনো সূক্ষ্ম রেখায় কালো সরিয়ে নির্মিতি রূপ লাভ করেছে এতে। কখনো ক্রস, কখনো শূন্যর মতো সামান্য প্রতীক বিষয় হয়ে এসেছে। বিষয় সামান্য ও স্বল্প, কিন্তু অসামান্য আবেগের বুদ্‌বুদ তাতে। যেন কিছু না বলার মধ্যেই আছে কত কথা, পরিসর জুড়ে নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে রয়েছে বহু কিছুর অবস্থিতি! এ সিরিজ সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য–

> Images titled O.T. are alphabet revolution in it's phonetically and cultural phenomena blending with belonging and closeness. Wakil explored in this prints, the concept of words and structure with their symbolic signifincance to our communion of worth and expression as our primary expressive tools converges into states of freedom, darkness, its sacrifice, vigorousness and various gestures of emotion and intellect in its visibility.[৬১২]

একজন ছাপচিত্রী হিসেবে খ্যাতিমান হলেও শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান দৃশ্যশিল্পের অপরাপর মাধ্যম যেমন: চিত্রকলা, স্থাপনা, ভিডিও আর্ট ইত্যাদি মাধ্যমেও সফল। মনোজাগতিক আবেগ প্রকাশের প্রয়োজনে মাধ্যম ব্যবহার করেন তিনি। বক্তব্যের সবিশেষ প্রকাশই সেখানে শেষ কথা। তাই কখনো কখনো একাধিক মাধ্যমকে যুক্তও করেছেন প্রয়োজনে। ছাপচিত্র এবং চিত্রকলা মাধ্যমের সু-সন্নিবেশেও কাজ করেছেন। ফলে এক মাধ্যম সহজেই অন্য মাধ্যমকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর *পুনর্বিন্যাস* (২০০৭) সিরিজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নব্বইয়ের দশকে করা ছাপচিত্রগুলোর কোনো কোনোটির ওপরে রং ছড়িয়ে কিংবা পূর্বের কোনো কোনো বিন্যাসকে পুনরায় আয়োজন করেছেন বর্তমানের আলোকে। ঢেকে যাওয়া চওড়া রঙের আস্তরের কোনো ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আছে অতীতের একচিলতে রেখা ও রঙের আভাস। কখনো রঙের প্রলেপের নিচ থেকেই পুরনো ক্ষতের মতো নিজর অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে বুনট। ধীরে ধীরে ওয়াকিলের যাত্রা ন্যূনতাবাদের দিকে। স্বল্প ও দু-একটি রং ব্যবহারের প্রবণতার সাথে রেখা ও রূপবন্ধ ব্যবহারের ব্যাপারে স্বল্পতা, সরলতা ও শান্ত নমনীয়তার সাথে শূন্যতার আবহই যেন ফুটে ওঠে। *নদী ত্বক* (২০০৮/১০)-এ পর্বের উদাহরণ। এক রং-বিশিষ্ট তলে সরল

---

[৬১২] Javed Jalil, 'Lifted Shadows and Broken lines', ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি ২১-এ অনুষ্ঠিত *Deep Print* শিরোনামের ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

রেখার পৌনঃপুনিক ব্যবহারে নদীর উপরিত্বকে ঝিকিমিকি আলোর উপস্থাপন করা হয়েছে। সরল ও পৌনঃপুনিকভাবে উপস্থাপিত ছায়াবৎ রেখা দর্শককে একধরনের বিমূর্তবোধে আবিষ্ট করে।

শিল্পী ওয়াকিলুর রহমানের ছবি রেখার কাটাকুটি, বর্ণচ্ছটা ও বুনটের সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও রূপবন্ধের সম্মিলনে রচিত। এসবের সাথে তিনি সংশ্লেষ করেছেন বর্ণ, শব্দ ও গাণিতিক সংখ্যাও। পশ্চিমে দীর্ঘদিন বাস করলেও পশ্চিমী শিল্পের নাটকীয়তা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হওয়ার তুলনায় সহজ-সরল, নমিত ও শান্ত আঙ্গিকপন্থী থেকেছেন নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশে। বলা যায়, এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সরলতাপন্থী আঙ্গিকের অনুবর্তী থেকেছেন তিনি। তাঁর ছবি শান্ত ও নমনীয় এবং শূন্যতাবোধে আবিষ্ট। ঠিক যথার্থ অর্থে না হলেও বিশেষ রচনাকৌশলের কারণে একটু পরপর ব্যতিক্রমী রূপবন্ধের জটলা পেরিয়ে যাওয়ায় দর্শকদের একধরনের ছদ্ম বর্ণনাত্মক স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দেয় তাঁর ছবি। সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বিষয়াবলি তাঁর চিত্রপটে সরাসরি কোনো প্রভাব বিস্তার করে না, তবে মনোজগতে এর যে অভিঘাত, তা উপলব্ধ হয় সহজেই। বিশেষত অভিবাসী হওয়ার কারণে একধরনের মনোজাগতিক টানাপড়েনও সহজেই দৃশ্যমান। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেকেছেন অনুজ্জ্বল ও মলিন রং-ঘনিষ্ঠ এবং ধূসর-কালোর প্রাধান্যযুক্ত। ওয়াকিলের ছবি প্রকাশভঙ্গিতে প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। অর্থাৎ সুন্দর ও নয়নলোভন চিত্রপট নির্মাণের যে প্রবণতা আমাদের বিমূর্তবাদী শিল্পীদের দেখা যায়, ওয়াকিল তা থেকে আলাদা। তাঁর ছবি যতটা সুন্দর, তার চেয়ে অনেক বেশি অবচেতন মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আর এটাই তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। তা ছাড়া এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট মাধ্যমে জলরঙের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ওয়াশ এবং পরিসরের নকশা নির্মাণে স্বচ্ছন্দ ও অপ্রথাগত থাকাও তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আশির দশকে দেশে শিক্ষিত প্রজন্মের ছাপচিত্রীদের অন্যতম একজন হলেন শিল্পী মুসলিম মিয়া (১৯৬১)। ছাপচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে। দশকের প্রথমার্ধে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবস্থায়ই ছাপচিত্রামোদীদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন তিনি। শিক্ষানবিশকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অসীম ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে ছাপাই মাধ্যমে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ও নিভৃতচারী এই শিল্পীর মগ্ন সাধনা, মাধ্যমের প্রতি তাঁর নিরুদ্বেগ ভালোবাসা এবং নিরলস পরিশ্রম তাঁকে এ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীর মর্যাদায় আসীন করেছে। ধাতু খোদাই শিল্পে (ব্যাংক নোট তৈরির জন্য) তিনি শুধু বাংলাদেশের তো নয়ই, সারা পৃথিবীতে টিকে থাকা স্বল্পসংখ্যকদের একজন। ছাপাই ছবি নির্মাণের জন্য তিনি উডকাট, উড এনগ্রেভিং, মেটাল এনগ্রেভিং, এচিং, লিনোকাট, অ্যাকোয়াটিন্ট প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন।

ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যক্রমানুযায়ী শিল্প নির্মাণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও শিল্পী মুসলিম মিয়া ছিলেন সুদূরের যাত্রী। শুধু একাডেমিক প্রয়োজনে শিল্প নির্মাণে তৃপ্ত না থেকে এর বাইরেও নির্মাণ অব্যাহত

রেখেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে নির্মিত হয় *কলঙ্কিত কাঠ* (১৯৮৩) শিরোনামের মতো ছাপচিত্র (চিত্র ১২৮)। আশির দশকে ঢাকা শহরের কোনো এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে সিগারেট জ্বালানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা জ্বলন্ত দড়িই এ ছবির প্রধান বিষয়। ছবিটির নির্মিতিতে অনুশীলনধর্মিতা থাকলেও মাধ্যমের ওপরে শিল্পীর নিয়ন্ত্রণ নজর কাড়তে সক্ষম। দোকানে কাঠ নির্মিত দেয়ালের রং, বুনট, আলোছায়া এবং সর্বোপরি এর উপরে লেপে দেওয়া চুনের দাগ নির্মাণে শিল্পীর দক্ষতা এবং অসামান্য মনোসংযোগ প্রশংসার দাবিদার। *সময়ের বিবর্তন* (১৯৮৫) শীর্ষক চিত্রটিতেও তাঁর কারুকৃতির মুনশিয়ানা নজর কাড়ে। একটি কাঠের বেড়ার গায়ে গুঁজে রাখা তিনটি ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড এই ছবির বিষয়বস্তু। নাটকীয়ভাবে সুরেলা আবেশ সৃষ্টির জন্য শিল্পী ছবির ওপরের দিকে বহুবর্ণিল আভা তৈরি করেছেন ত্রিমাত্রিক ঢঙে। এ ছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ড এবং তক্তার বেড়ার খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ নির্মাণেও তাঁর গভীর মনোযোগ লক্ষণীয়। অর্ধ-বিমূর্ত আঙ্গিকে সৃষ্টি করেছেন *ইমেজ ইন প্রিন্ট* (১৯৮৪) এবং *ইমেজ ইন প্রিন্ট* (১৯৮৫)। দুটি ছবিতেই প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ, যেমন ফুল-লতা-পাতা ইত্যাদির সমন্বয়ে নির্মাণ করেছেন তল। তবে এ দুটি ছবির বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো এর বুনট তৈরির বিষয়টি। কাঠের পরিতলে বুনট তৈরির জন্য নির্মিত বিশেষ আঠা যোগ করে তার ওপর অঙ্কন করেছেন বিষয়। এরপর একইসঙ্গে পৃষ্ঠতল এবং অন্তর্লীন পদ্ধতিতে ছাপ নেয়ার ফলে পরিকল্পিত বুনটের সাথে অঙ্কনের স্বতঃস্ফূর্ততাও যোগ হয়েছে। প্রথম দিকের এসব ছবিতে দৃশ্যজ বাস্তবতার সরাসরি ও অনুপুঙ্খ উপস্থাপন লক্ষণীয়। পটে উপাদানের সমাবেশ রচনার ক্ষেত্রে থেকেছেন একাডেমিক রীতিপন্থী। সত্তরের দশকের শিল্পী আবদুস সাত্তারের করণকৌশল ও বর্ণপ্রয়োগ তাঁকে বেশ প্রভাবিত করেছে শুরু থেকেই।

আশির দশকের শেষার্ধে মুসলিম মিয়া বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে যোগদান করেন। চাকরির সুবাদে এ সময় তিনি এক বছর (১৯৮৭-৮৮) ইতালি ও সুইজারল্যান্ডে ব্যাংক নোট তৈরি-সংক্রান্ত মেটাল এনগ্রেভিংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অধ্যাপক টি. চুনিনির তত্ত্বাবধানে। ফলে ধাতুতে প্রতিকৃতি এবং নকশা খোদাই-সংক্রান্ত অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন তিনি। ছাপচিত্রে তাঁর করণকৌশলগত দক্ষতাও আরও শানিত হয় এ সময় থেকে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নব্বইয়ের প্রথমার্ধে করা কিছু প্রতিকৃতিতে। *শেক্সপিয়ারের প্রতিকৃতি* (১৯৯১), *রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি* (১৯৯০), *ভ্যানগঘের প্রতিকৃতি* (১৯৯৩), *সাত বীরশ্রেষ্ঠর প্রতিকৃতি* (১৯৯২) প্রভৃতি। এসব প্রতিকৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো সংবেদি রেখার স্পষ্ট ব্যবহার। প্রতিটি রেখা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী মোটা-চিকন কিংবা গভীর ও স্বল্প গভীরতা-বিশিষ্ট হয়ে বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করেছে। এই দশকে এচিং মাধ্যমে করা কিছু ছাপচিত্রেও রেখার স্পষ্ট ও সংবেদি ব্যবহার স্পষ্ট। যেমন– *প্রসাধন* (১৯৯৪), *শিরোনামহীন* (১৯৯৮)। প্রথমোক্ত

ছবিতে প্রসাধনরত তরুণী এবং দ্বিতীয়টিতে নগ্নবক্ষা এক তরুণীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর উপস্থাপনভঙ্গি সরলতা-উত্তীর্ণ হলেও একধরনের কাঠিন্য ও জমাটবদ্ধতাও যেন লক্ষণীয়।

আশির দশক থেকে শিল্প চর্চায় নিয়োজিত থাকলেও বর্তমান শতকের শূন্য দশক শিল্পী মুসলিম মিয়ার শিল্পীজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি-পর্যায় বলে ধারণা করা যায়। এ সময়ে তিনি পূর্বের ন্যায় দৃশ্যজ বাস্তবতার হুবহু উপস্থাপন-প্রবণতা থেকে সরে এসে পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে শিল্প নির্মাণে ঝুঁকে পড়েন এবং *ইমেজ ইন প্রিন্ট*, *অচিন পাখি* ও *লোকসংগীতের উপকরণ* শীর্ষক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টি নির্মাণ করেন। এই ধারাবাহিক চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে বাউল দর্শন, তাদের জীবনাচার ও ব্যবহার্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং অনান্য অনুষঙ্গ নিয়ে। এসব শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো–

> ... চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির বিলুপ্ত প্রায় লোকগাঁথা, একতারা- দোতারার বোল, সংসার বিহীন বাউল-সন্ন্যাসীদের প্রকৃতির প্রেমে উৎসর্গকৃত জীবন ধারা এবং তাদের কল্পনা-জগতের অচিন পাখিদের নিয়ে রচিত মনমুগ্ধকর সুরের মূর্ছনা, যা বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। প্রচলিত কাঠখোদাই, এচিং ও এনগ্রেভিং এর সাথে নতুন কিছু টেকনিক যোগ করে বন্ধনহীন এই সমাজের প্রতিচ্ছবিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, ...।[৬১৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, *অচিন পাখি*-১ (২০০৩)-তে বাংলার লোকসংগীতের উপকরণ দোতারার শীর্ষ পরিবর্তিত হয়ে একটি পাখির রূপবন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে উলম্বভাবে (চিত্র ১২৯)। তার নিচে আরও একটি পাখির সরল রূপবন্ধ উঁকি দিচ্ছে উপরের দিকে। পাখি এখানে প্রাণের প্রতীক। পটের উপরের অংশে একটি ত্রিভুজাকৃতি এসেছে পবিত্রতার প্রতীক হয়ে। ছবির কোমল রং-বিন্যাস এবং পরিকল্পিত বুনট দর্শকের দৃষ্টিকে প্রশান্ত করে। কিছুটা একই রকম বিন্যাস লক্ষণীয় তাঁর *ইমেজ ইন প্রিন্ট*-৭ (২০০৩) ছবিতেও। নাগরিকজীবনের ব্যস্ততা আর আনন্দ ও প্রাণ-প্রাচুর্যহীন শহরের কঙ্কাল সদৃশ কাঠামোর ওপরে মুখ ভার করে বসে আছে বিপর্যস্ত পাখির রূপবন্ধ *অচিন পাখি*-২ (২০০৩)-তে। পেছনে পতন্মোমুখ লাল ফিতা জড়ানো ত্রিশূল। যেন তা শহুরে জটিলতার কাছে সরলতাশ্রয়ী জীবনের পরাজয়ের প্রতীক। বিপরীতে প্রাণের পাখির গীতলতা ও উচ্ছলতার প্রকাশক হয়ে উঠেছে *আচিন পাখি*-৩ (২০০৩)। বাম পাশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি রেখে ছবির কেন্দ্র বরাবর লতাপাতার মধ্যে মুখ উঁচিয়ে আছে এক চঞ্চল পাখি। যার অভিব্যক্তিতে উচ্ছলতা স্পষ্ট। বুনট ও রং-বিন্যাসেও এই উচ্ছলতা প্রকাশমান। আবার বহুশ্রুত লালনগীতি 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায় ...'র রূপকল্প উপস্থাপনের জন্য বেশ কিছু রেখার আঁকিবুঁকিতে সৃষ্ট প্রতীকী খাঁচার ভেতরে স্থাপন করেছেন পাখিকে *অচিন পাখি*-৯ (২০০৩)-তে। *লোকসংগীতের উপকরণ (পাখি)* (২০০৩) শীর্ষক ছবিতে চিত্রপটের

---

[৬১৩] শিল্পীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার

মাঝ বরাবর বেড়ার মধ্যে উপস্থাপিত কাফন-আচ্ছাদিত একটি শব। পাশেই দোতারার শীর্ষ পরিণত হয়েছে মৃত বাউলের প্রতিকৃতিতে। যেন বাউলের মৃত্যুর সাথে সাথে প্রতীকী মৃত্যু হয়েছে যন্ত্রটিরও। ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখির মতো একটি মিশ্র প্রাণী। আবার দোতারার মাথা একটি বিষণ্ন-নয়না দীর্ঘগ্রীব পাখিতে পরিণত হয়েছে *লোকসংগীতের উপকরণ (দোতরা)* (২০০৩) শীর্ষক ছবিতে। এ ছাড়া ফুল-লতা-পাতার অনুষঙ্গ এসেছে দুটি ছবিতেই। এই সিরিজের অন্যান্য ছবিতেও (২০০৫-এ নির্মিত মিনি প্রিন্ট) পাখি, দোতারা, ত্রিশূল, গাঁজার কলকে, ফুল-লতা-পাতা এবং বিভিন্ন অজানা রূপবন্ধও এসেছে পরিবর্তিত হয়ে। এসব রূপবন্ধের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে 'মরার আগে যেবা মরেরে' শীর্ষক লাইন যোগ করেছেন *লোকসংগীতের উপকরণ (২a)* (২০১২) তে। জবা ফুলের কেশর, করতাল, খঞ্জনি ইত্যাদি নতুন রূপবন্ধের সাথে লেখাযুক্ত আকৃতিটির গঠন বেশ আলংকারিক। একই রকম আলঙ্কারিক নলাকার রূপবন্ধের ব্যবহার দেখা যায় *লোকসংগীতের উপকরণ (২b)* (২০১২)-তে। যার অনুপ্রেরণা আবদুস সাত্তারের ছবি বলে অনুমিত হয়।

প্রশান্ত রং, সুপরিকল্পিত রেখা আর সুদক্ষ বুনটের বিনুনিতে শিল্পী মুসলিম মিয়া বেঁধেছেন সমাজের অপ্রচলিত জীবনধারার চালচিত্র। ছাপাই মাধ্যমে করা তাঁর চিত্র সমষ্টিতে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির বিলুপ্তপ্রায় নানা ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনচিত্র সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিষয় ও শৈলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম মিয়ার শিল্পকৃতিতে একধরনের অস্থির পথপরিক্রমাও লক্ষণীয়। তবে কখনোই চরম বিমূর্ততাকে আশ্রয় করে তিনি গড়ে তোলেননি তাঁর চিত্রপট। বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন পরিচিত পরিপার্শ্ব থেকে, আঙ্গিকগত দিকে থেকেছেন বাস্তবানুগ এবং অর্ধ-বিমূর্ত শৈলীর প্রতি অনুরাগী। তাঁর রং-বিন্যাস মনোমুগ্ধকর, রেখায় স্পষ্টতা ও প্রাচ্যরীতির গীতলতা বিদ্যমান। পরিসর বিভাজন, বিষয় এবং রং-বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিল্পী মৌলিক নকশার রীতির প্রতি মনোযোগী থেকেছেন সবসময়। সত্তরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী আবদুস সাত্তারের প্রভাব এ ক্ষেত্রে খুব কার্যকর থেকেছে। সাত্তারের তল নির্মাণ, পরিসর বিভাজন, বুনট সৃষ্টি, রং নির্বাচন এমনকি, বিশেষ কিছু রূপবন্ধ সামান্য পরিবর্তিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর চিত্রপটেও। এত কিছুর পরও বিষয় নির্বাচনের স্বকীয়তা, মাধ্যমের প্রতি সৎ অনুরক্তি ও পরিশ্রম তাঁর পথকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে এবং একইসঙ্গে এ দেশের ছাপচিত্র শিল্পের ইতিহাসে তাঁকে করেছে গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া এ প্রজন্মের নাইমা হক, শাহাদাত হোসেন (১৯৫৫), কাজী রকিব, গোলাম ফারুক বেবুল (১৯৫৮), ঢালী আল মামুন, হাবিবুর রহমান (?), শিশির ভট্টাচার্য, নিসার হোসেন, ফারেহা জেবা প্রমুখও ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্প নির্মাণ করেছেন।

এ দেশের সৃজনশীল ছাপচিত্রচর্চার ধারা নব্বইয়ের দশকের পূর্বেই দীর্ঘ পাঁচ দশক অতিক্রম করে সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক মানের শিল্পধারায় পরিণত হয়। পূর্ববর্তী দশকসমূহের সৃজন-উদ্যমের সাথে এই

দশকের নবীন ছাপচিত্রীদের কর্মোদ্যম মিলিত হয়ে ছাপচিত্রের সামগ্রিক মর্যাদাকে আরও উচ্চতায় উন্নীত করে। আবার বেশ কয়েকজন তরুণ ছাপচিত্রীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন বিদেশে বাংলাদেশের ছাপচিত্রকে আরও মর্যাদায় এবং একইসঙ্গে স্বদেশেও এই মাধ্যমকে আরও গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে (১৯৯৩) খুলনা আর্ট কলেজে দেশীয় উদ্যোগে নির্মিত এচিং মেশিন এবং মাঝামাঝি সময়ে (১৯৯৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিভাগের স্টুডিওতে ব্যবহারের জন্য জাপানি অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষভাবে নির্মিত একটি আধুনিক লিথোগ্রাফি এবং একটি এচিং মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।[৬১৪] আবার দশকের শেষার্ধে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে (একটি এচিং ও একটি লিথো ছাপার যন্ত্র) অত্যাধুনিক ছাপাই মেশিন যোগ হয়। শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য উপকরণের এই নতুন সংযোজন সৃজনশীল নিরীক্ষা ও উন্নতমানের ছাপচিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

পূর্বের ধারাবাহিকতায় এ দশকে অনেকেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।[৬১৫] আবার দলগত চর্চার নিমিত্তে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন উদ্যমী তরুণ মিলে গঠন করেন *ঢাকা প্রিন্ট মেকার্স*। এর সদস্যরা এ দেশের সামগ্রিক ছাপচিত্রচর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ দশকে নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ (১৯৯৪), বগুড়া আর্ট কলেজ (১৯৯৫) এবং রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৮) যাত্রা শুরু করে, যা ছাপচিত্রচর্চার গণ্ডিকে আরও প্রসারিত করে তোলে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ হিসেবে অধিভুক্ত হয়। এর পাশাপাশি শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মশালা ও কর্মসূচির মাধ্যমে ছাপচিত্রচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ সময় সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগও যোগ হয়। বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ জোরালোভাবেই ছাপচিত্র-বিষয়ক নানা কর্মশালা আয়োজিত হতে থাকে। ফলে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষকদের হাত ধরে নানামুখী উত্তরণ ঘটে ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে।

এই দশকের প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের অন্যতম শিল্পী আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী (১৯৬৪)। কাঠ খোদাই মাধ্যমের পরিশ্রম আর ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পী এ মাধ্যমে নিজেকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখতে সমর্থ হয়েছেন এবং খ্যাতি লাভ করেছেন, আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। আশির দশকের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে এবং

---

[৬১৪] চানক্য বাড়ৈ, 'ছাপচিত্রের যাত্রাপথ', *মাসিক উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৯ (নব পর্যায়), চৈত্র সংখ্যা ১৪১৬, পৃ ৫১

[৬১৫] শিল্পী মো. জসিম উদ্দিনের উদ্যোগে এ সময় (১৯৯২) কয়েকটি এচিং প্রেস নির্মিত হয় দেশীয় বাজারে সহজলভ্য যন্ত্রাদি সহকারে, যার ভিত্তিতেই ব্যক্তিগত স্টুডিও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সংগঠিত হয়ে ওঠে। জসিম উদ্দিনের পর যশোরের শেখ ছাদেকুল ইসলাম (১৯৬৫) তৈরি করেন খুলনা আর্ট কলেজের ব্যবহৃত মেশিনটি। এ ছাড়া সমসাময়িক সময়ে আরও কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ মেশিন তৈরির ক্ষেত্রে দেখা গেলেও তা খুব কার্যকারী হয়নি। তবে বর্তমান শতকের প্রথম থেকে দেশে ছাপাই মেশিন তৈরির এই উদ্যোগ নতুন উচ্চতায় পৌঁছে ছাদেকুল ইসলামের হাত ধরে। এ পর্যন্ত তিনি ৫০টিরও বেশি ছাপাই মেশিন নির্মাণ করেছেন, যেগুলো এ দেশের ছাপচিত্র শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

নব্বইয়ের শুরুতে ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি শিল্পের বৃহৎ জগতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। পরে পিএইচ.ডি ডিগ্রিও অর্জন করেছেন শিল্পকলায়। তবে আশির দশকের শেষ থেকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। শুরুর দিকে অনুশীলনধর্মী রীতিতে এঁকেছেন *ছয় রমণী* (১৯৮৭)। সমতল পশ্চাৎপটের বিপরীতে ছয় গ্রাম্য রমণীর অবসর যাপন বিষয়বস্তু হয়েছে এর। অঙ্কনশৈলীতে ত্রিমাত্রিক আবহ বিদ্যমান থাকলেও বিষয়ের উপস্থাপন মূলত দ্বিমাত্রিক এবং রেখাপ্রধান। পরবর্তীকালে তাঁর আঙ্গিক পুরোপরি দ্বিমাত্রিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কলকাতা পর্বের কাজ দ্বিমাত্রিক এবং সাদাকালো। এ সময় তিনি নির্মাণ করেন *দেখে যেন মনে হয়* শিরোনামের কাঠ খোদাই চিত্রগুচ্ছ। এতে বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ অবধি বিভিন্ন বিষয়াবলিকে উপজীব্য করে কাঠ খোদাই মাধ্যমে তা ছেপেছেন। শুধু মুক্তিযুদ্ধ বা ভাষা-আন্দোলন নয়, এ দেশের তৎকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের নানা বিষয়াবলিও উঠে এসেছে। আবার সমসাময়িক ভারতবর্ষের এবং বিশ্ব রাজনীতির নানা অনুষঙ্গও তাতে যোগ করেছে বিবিধ মাত্রা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *দেখে যেন মনে হয়* (১৯৯২) এবং *দেখে যেন মনে হয়-১* (১৯৯২)-এর কথা। প্রথমোক্ত *দেখে যেন মনে হয়* (চিত্র ১৩০) ছাপচিত্রটিতে সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতির সাথে এবং বিশ্ব রাজনীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। মাঝখানে শিবের মতো ত্রিশূল হাতে চরিত্র এবং পাশে জড়াজড়ি করে থাকা তরুণ-তরুণী আর তার ডান দিকের শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় উপস্থাপিত নর-নারী চরিত্রগুলো এসেছে সমসাময়িক বিভিন্ন ধরনের সিনেমার দেয়ালচিত্র থেকে। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার দীর্ঘদিনের কারাবাসের পর মুক্তিলাভ, বার্লিন দেয়ালের পতন এবং দুই জার্মানির একত্র হওয়ার মতো ঘটনা, ভারতের রাজনীতিতে রামমন্দির ইস্যু, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসন ইত্যাদি বিষয়ও ছবিতে উঠে এসেছে 'নেলসন ম্যান্ডেলা লাল সালাম', 'ক্রেমলিনের ঘড়ি এখনো চলছে', 'রামমন্দির', 'আরব দুনিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হাত উঠাও' লেখার আড়ালে। আবার উড্ডীয়মান ভারতীয় পতাকারূপী ঘুড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে আমেরিকারূপী একটি ছেলেশিশু। এর মাধ্যমে আমেরিকার আগ্রাসী নীতির যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি 'AMERICA IS A STATE WHERE LIBERTY IS STATUE' লেখার মাধ্যমে মার্কিনদের অতি মানবিক হিসেবে নিজেদের জাহির করার প্রয়াসকেও খেলো করে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। এ ছাড়া শূকর, কাক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ইত্যাদি রূপবন্ধও ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে। আবার পৌরাণিক মহাকাব্য *মহাভারত* এবং *রামায়ণ*-এর সাথে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ ইতিহাস ও সমকালীন রাজনীতির সু-সংযোগ ঘটিয়েছেন *দেখে যেন মনে হয়-১*-এ। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ব্যবহার করে সাপলুডুর আদলে তাদের উত্থান-পতন আর পরিপার্শ্বের সবকিছু নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মাঝখানে এই রাজনীতির চাল আর তার চারপাশ ঘিরে ঘটে চলেছে রাজনীতি ও

পৌরাণিক নানা ঘটনাবলি। যেমন অশোক চক্র নিয়ে খেলছে একটি শিশু। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে জটায়ুকে আহত করে রাবণের সীতা হরণ। তার সামনে শরশয্যায় ভীষ্ম। বাম পাশে গাছের ডালে বংশীবাদনরত কৃষ্ণকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করছে নগ্ন গোপীনীরা। নিচে রাম শরবিদ্ধ করেছে মায়ামৃগকে। মাঝে শান্ত সমাহিত বুদ্ধের মূর্তি। আবার তার পাশে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে ছুটেছেন এক মুসলিম শাসক। ওপরে ধ্বংসের প্রতিমূর্তি দেবী কালী ধ্বংসের পরিবর্তে আর্তের শুশ্রূষায় রত। বস্তুত রাজনীতিই এ সকল ঘটনাপ্রবাহ আর উত্থান-পতনের নিয়ন্তা। এসবের মাধ্যমে তিনি এক কল্পনারাজ্য নির্মাণ করেছেন চিত্রপটে। এখানে পৌরাণিক রূপকের আড়ালে চারপাশের অসঙ্গতির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন শিল্পী। উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে থেকেছেন সরলতাপন্থী এবং একক রং-বিশিষ্ট। তবে খুব শিগগিরই বর্ণিল হয়ে ওঠে তাঁর চিত্রতল; বিশেষত কলকাতা থেকে দেশে ফেরার পর। *জীবন এবং অন্য গল্প*-২ (১৯৯৪) এবং *শিরোনামহীন* (১৯৯৫)-এ পর্বের উদাহরণ। *জীবন এবং অন্য গল্প*-২-এর পরিসরকে কালো রেখায় কয়েকটি রঙে ভাগ করেছেন। বাম পাশে একটি টোপকে ঘিরে তিনটি মাছ আর ডান দিকে লোলুপ চোখের জেলে চরিত্র, ওপরে মাছের কাঁটা আর নিচে কিছু অচেনা রূপবন্ধের উপস্থাপনে মাছের সাথে জেলেজীবনের নিবিড় সম্পর্কের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন শিল্পী। আবার *শিরোনামহীন* কাঠ খোদাইয়ে একটি অর্ধবৃত্তাকৃতির নিচে দুটি হাতের তালুতে লাল ও সাদা রঙে 'আল্লাহু' এবং 'ওঁ' লিখে দিয়েছেন। মূলত, এর মাধ্যমে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে শিল্পী আমিরুল মোমেনিন পুত্রসন্তানের জনক হওয়ার পর *নুহাশ ও দেবশিশু* শিরোনামের একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক চিত্রগুচ্ছ নির্মাণ করেছেন। তাঁর পুত্রসন্তান নুহাশ শৈশবে পরপর কয়েকবার দুর্ঘটনা থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার পর তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, নুহাশ নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো দেবদূত দ্বারা সুরক্ষিত। আর এ বিশ্বাসকে উপজীব্য করে তিনি নির্মাণ করেছেন উপর্যুক্ত চিত্রগুচ্ছ। এতে শুভ-অশুভ বিভিন্ন রূপবন্ধের সাথে বারবার পুত্র নুহাশ ও দেবশিশুদের একই তলে চিত্রায়িত করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় (উদাহরণ *নুহাশ ও দেবশিশু*-৩৩)। তবে সবসময় তিনি বুঁদ হয়ে থাকেননি এই ব্যাৎসল্যে। স্বদেশ, সমাজ আর স্ব-কালও একইসঙ্গে তাঁর ছাপাই ছবির বিষয় হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *বাংলাদেশ*-১ (২০১৪) (চিত্র ১৩১) এবং *বাংলাদেশ*-৩ (২০১৪)-এর কথা।[৬১৬] নুহাশ এবং দেবশিশুর সাথে এসব ছবিতে সাধারণ মানুষের সরল জীবনযাত্রার সাদামাটা উপস্থাপন যেমন বিষয় হয়ে এসেছে, তেমনি সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের নানা অসংগতিও ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সাদাকালো কাঠ খোদাই ছবির জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করলেও রঙিন ছাপচিত্র নির্মাণেও নিজের মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। রং ব্যবহার ও কাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য–

[৬১৬] *বাংলাদেশ*, *সময়* প্রভৃতি চিত্রগুচ্ছও তাঁর *নুহাশ ও দেবশিশু* সিরিজের অংশ। নুহাশের জন্মের পর থেকে তাঁর সব ছবিই *নুহাশ ও দেবশিশু* সিরিজভুক্ত, এমনকি পরবর্তীকালে করা *দেখে যেন মনে হয়*ও

> I emphasize green, burnt-sienna and orange colours and these shades of colours are mainly and prominently used in almost all my works. I also emphasize black and white impressions. Sometimes these shades are used as symbols of the subject matter and sometimes in favour of the composition of the work. Generally, human animal figures, figurines of birds, snakes and fishes and forms of the moon, stars, sky, wall etc. forms and motifs are used in my work in stylized and very simple ways of drawing. My- thological subject matter is also prominently present in my work. All the said figures and forms and motifs are used in my work in symbolic forms.[৬১৭]

শিল্পী আমিরুল মোমেনিন চৌধুরীর শিল্প-আঙ্গিক কিছুটা বর্ণনাত্মক। চারপাশের বিভিন্ন ঘটনাবলি নিজস্ব গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেন চিত্রপটে। বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও অন্তর্গত বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সবসময়। বাস্তব অনুষঙ্গের সাথে কল্পনার মিশেলে শিশুতোষকল্পনা রাজ্যের মতো করে নির্মাণ করেন ছবির তল, কিছুটা পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শুধু ছাপচিত্র নয়, বরং এ দেশের সামগ্রিক শিল্পজগতে তিনি এমন এক আঙ্গিক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যাতে দেশজতা রয়েছে। যে গল্প ও রূপবন্ধে তিনি গড়েন তাঁর চিত্রতল, তা এ দেশের এবং একইসঙ্গে তাঁর নিজের। সামাজিক অন্যায় আর অনাচারের দিকগুলোকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরাই তাঁর কাজের প্রধান দিক। বড় আকারের ছাপচিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায় তাঁর মধ্যে। অধিকাংশ ছবিই রেখা-প্রধান। ছবির তল নির্মাণের ক্ষেত্রে আকৃতি, রূপক ও রূপবন্ধসমূহ চিত্রপটের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায়, আবার কখনো সব উপাদান মাধ্যাকর্ষণহীন কোনো তলে ভাসমান অবস্থায় উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন ধরনের পরিচিত-অপরিচিত রূপবন্ধের সাথে টেক্সটের ব্যবহার করেছেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই। সাদা-কালো ছাড়া অন্য রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও থেকেছেন অনুজ্জ্বল ও দৃষ্টিবান্ধব রং-ঘনিষ্ঠ। বর্তমানেও তিনি শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে ছাপাই মাধ্যমের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে শিল্পের বিশাল ভুবনে বিচরণ শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ তরুণ ছাপচিত্রীদের মধ্যে শিল্পী লায়লা শার্মিন একজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাপচিত্রে গ্রহণ করার সুবাদে কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ, এচিং, মনোপ্রিন্ট প্রভৃতি মাধ্যম তাঁর আয়ত্তেই ছিল। আর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন মানুষের ওপর, তথা মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্কের ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন মানুষের নিঃসঙ্গ অসহায়ত্ত ও বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার অসারতাকে। প্রকৃতি ও যন্ত্রকে জয় করার সুবাদে সভ্যতার চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়া মানুষ কেন যেন হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। সম্পর্কগুলোকে করে তুলেছে জটিল, একঘেয়ে ও আনন্দহীন। প্রথম দিকের

[৬১৭] শিল্পীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার

কাজে এসবেরেই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। সম্পর্কের *জটিলতা-১* (১৯৮৯), *সম্পর্কের জটিলতা-২* (১৯৯১), *তিনজন-১* (১৯৯১), *চারজন-১* (১৯৯১), *চারজন-২* (১৯৯১), *ঈর্ষা* (১৯৯১), *প্রতীক্ষা* (১৯৯১), *ভালোবাসা* (১৯৯১), *দ্বন্দ্ব-১* (১৯৯১), *দ্বন্দ্ব-২* (১৯৯১) ইত্যাদি তাঁর প্রথম পর্বের কাজ।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতাকে উপস্থাপন করেছেন *তিনজন-১* ছবিতে। পারস্পরিক উদাসীনতার সুযোগে সম্পর্কে তৃতীয় কারো আগমন এবং তার ফলে সৃষ্ট পারস্পরিক দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করেছেন বিষণ্ন রং ও সরল রূপবন্ধে। একইভাবে তারুণ্যের প্রেমোন্মাদনার বিপরীতে ক্লান্তিকর দাম্পত্য সম্পর্কের একঘেয়েমি প্রকাশ করেছেন *চারজন-১*-এ। *চারজন-২*-এ জটিল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অভিব্যক্তিহীন মানবের জীবন-যাপনের যান্ত্রিকতা বিষয় হয়ে এসেছে। দুটি মৌলিক আবেগের সংঘাত বিষয় হয়ে এসেছে *ঈর্ষা* ছবিতে। রংই এখানে পার্থক্য তৈরি করেছে প্রেমের আবেগ আর প্রেম-পরবর্তী ঘৃণার মধ্যে। নীলকে তিনি ব্যবহার করেছেন প্রেমের প্রতীক হিসেবে আর ঘৃণাকে প্রতীকায়িত করেছেন লাল জ্বলজ্বলে দুটি চোখের মাধ্যমে। *প্রতীক্ষা*, *ভালোবাসা*, *দ্বন্দ্ব-১*, *দ্বন্দ্ব-২* প্রভৃতি ছবিতেও তারুণ্যের আবেগে বিষয় করেছেন নর-নারীর প্রেম, বিরহ, সম্পর্কের কৃত্রিমতা কিংবা দাম্পত্য টানাপড়েনের নানা অনুষঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> আমার এ পর্যায়ের ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে পৃথিবীর মানুষের যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা। মানুষ একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। খুব কাছাকাছি থেকেও একে অপরের ব্যাপারে উদাসীন। সবাই যেন অভিনয় করে চলেছে। মানুষের সম্পর্কের এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো আমার বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন ভাবে এসেছে।[৬৮]

এ সময়ের কাজে তাঁর ব্যবহৃত মনুষ্য অবয়ব সমতল, বহিঃরেখা প্রধান, ছায়াবৎ, আবক্ষ, সরল, অভিব্যক্তিহীন এবং যন্ত্রসুলভ। তাতে প্রকাশবাদী বৈশিষ্ট্যও প্রকাশমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্চাৎপট সমতল ও একক কিংবা একাধিক রং-বিশিষ্ট। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেকেছেন অনুজ্জ্বল ও কোমল রং-ঘনিষ্ঠ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবয়বসমূহে একধরনের বিকৃতি লক্ষ করা যায়, যা পরাবাস্তববাদী আবহের কথাও মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃতির উপস্থাপন বা বিষয়ের প্রকৃতি-সান্নিধ্যতা কম দেখা যায়। বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার পরিপার্শ্বিক অবস্থান নির্দেশ করেননি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ফলে দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে বিষয়ের অবস্থান ঠিক কোথায়, দিন অথবা রাত কিংবা ঘর অথবা বাইরে। প্রথম পর্বের এ সমস্ত শিল্পকর্মে বিষয় নির্বাচন এবং এর উপস্থাপনভঙ্গিতে কিছুটা অপটুত্ব থাকলেও খুব দ্রুতই পরিণতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ছবিতে। তবে আঙ্গিকগত স্বকীয়তা নির্মাণের পথে অবচেতনে পল ক্লি ও কান্দিনিস্কি হয়তো সামান্য প্রভাবিত করেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বিষয়ের সরল ও ন্যূনতম উপস্থাপনে গড়েছেন তল। স্বল্প রং ও রেখার ব্যবহারে প্রকাশমান থেকেছেন অন্তর্গত আবেগে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্য বা বাক্যাংশ জুড়ে দিয়েছেন

[৬৮] লায়লা শার্মিন, *আমার ছাপচিত্রঃ লিথোগ্রাফ ও উডকাট*, অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১৩

চিত্রপটে। এ সময় থেকে তিনি ধীরে ধীরে ছাপচিত্রে সঠিক সংস্করণের বাধ্যবাধকতা থেকে সরে যেতে থাকেন। অর্থাৎ শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাপের পাশাপাশি হাতেও যোগ করা শুরু করেন লেখা, রেখা, বিভিন্ন রূপবন্ধ কিংবা প্রয়োজনীয় নানা অনুষঙ্গ। *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল-১* (১৯৯৩), *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল-২* (১৯৯৩), *চুমু* (১৯৯৪), *স্বপ্নরাজ্য-১* (১৯৯৫), *স্বপ্নরাজ্য-২* (১৯৯৫), *স্বপ্নরাজ্য-৩* (১৯৯৫), *টানবাজারের ড্যাফোডিলগুলো* (১৯৯৫), *কচুরিপানা কন্যা-১* (১৯৯৫), *ভালোবাসার বাগান* (১৯৯৫), *সন্ন্যাসীর জীবন* (১৯৯৫), *আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি* (১৯৯৫) প্রভৃতি তাঁর উত্তরণ পর্বের কাজ।

যৌনতা এবং অবক্ষয়কে উপজীব্য করে লেখা বোদলেয়ারের *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল* অবলম্বনে নারীকে আবেদনময়ী বিভিন্ন ভঙ্গি ও তার স্পর্শকাতর অঙ্গসমূহকে কয়েকটি প্যানেলে উপস্থাপন করেছেন *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল-১* ও *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল-২* ছবিতে (চিত্র ১৩২)। তবে নর-নারীর প্রেম ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও *চুমু* ছবিতে তাঁর পরিণতি ও উত্তরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে গভীর চুম্বনরত নগ্ন দুই নর-নারীকে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। এলোমেলো কাটাকুটি রেখায় বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনে গড়েছেন তল। সমগ্র চিত্রতলে রেখা, রং আর বুনটের সম্মিলনে বিষয়ের জমাট সমাবেশ লক্ষ করা গেলেও *স্বপ্নরাজ্য-১*, *স্বপ্নরাজ্য-২* ও *স্বপ্নরাজ্য-৩*-এ চিত্রপটের সংগঠন স্বল্প রং, রেখা আর বুনট-নির্মিত। ছোট ছোট এলোমেলো রেখা আর রঙের ফোঁটায় গড়েছেন স্বপ্নের মায়াবী জগৎ। একান্ত নিজস্ব সে জগতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন ঈশ্বর নামক মাদাম সোসোট্রিসের (*স্বপ্নরাজ্য-৩*)। কারণ সে দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও অশুভকে রোধ করতে পারে না, যার দ্বারা সে নিজে ভুগেছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ সংঘাতময়, কিন্তু শার্মিনের স্বপ্নরাজ্য স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। তাতে শিল্পীর উপস্থিতি রৈখিক গড়নের এক নারীরূপে। এ ছাড়া আধ-ফালি চাঁদ, স্নিগ্ধ শাপলা, সূর্য, শব্দ ও শব্দ সমষ্টি, নানা গাণিতিক সংখ্যা আর হিসাব-নিকাশের সাথে রয়েছে অপরিচিত বিভিন্ন অনুষঙ্গ, যা পরিসরকে বিমূর্ততায় উত্তীর্ণ করেছে। কিছুটা রোমান্টিক ও পরাবাস্তববাদী আবহে দুজন নর-নারীর উদ্দাম প্রেম উদ্‌যাপনকে বিষয় করেছেন *ভালোবাসার বাগান* ছবিতে। পট নির্মাণ করেছেন স্বল্প রং ও বুনটের উত্তল পরিসরকে ব্যবহার করে। এর ওপরে কালি-কলমে এঁকেছেন ছায়ামূর্তির মতো চরিত্র। আর তলজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জৈবিক নানা রূপবন্ধে টানবাজারের রূপোপজীবীনীদের উপস্থাপন করেছেন *টানবাজারের ড্যাফোডিলগুলো* ছবিতে (চিত্র ১৩৩)। স্থানিকভাবে প্রয়োগ করা রং আর নিতান্ত সরল রূপবন্ধে যেন দৃষ্টিনন্দন ফুল ফুটিয়েছেন সমগ্র চিত্রপটে। এলিয়ট যেমন *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড*-এ কচুরিপানাকে যৌনতা আর উর্বরতার প্রতীক করে দেখিয়েছেন, তেমনি শার্মিনও নারীকে যৌনতা আর উর্বরতার প্রতীক করে দেখিয়েছেন *কচুরিপানা কন্যা-১*-এ। স্বল্প রেখা, রং আর বুনটের সাথে *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* থেকে যোগ করেছেন কিছু উদ্ধৃতি। একইভাবে *সন্ন্যাসীর জীবন* এবং *আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি* ছবিতেও একটি বা দুটি রেখার সাথে স্তন-সদৃশ দুটি প্রতীক আর কখনো কখনো লম্বা চুল বোঝাতে এলোমেলো রেখার আশ্রয়

নিয়েছেন, যা সার্থকভাবে নারীর বিমূর্ত অধ্যাস গড়ে তুলেছে। এ ছাড়া পরিচিত-অপরিচিত রূপবন্ধ, এলামেলো রেখা আর স্থানিক রং-বিন্যাসে আবেগের সবিশেষ প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এ পর্বের কাজে তিনি ধূসর, স্বর্ণাভ হলুদ, সোনালি, লাল, কালো প্রভৃতি রঙের ব্যবহার করেছেন। পটের অধিকাংশ সাদা ছেড়ে এসব রং ব্যবহার করেছেন খুব স্বল্প পরিসরে। উপকরণের ব্যবহারেও থেকেছেন ন্যূনতাবাদীদের মতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর চিত্রতল হয়ে ওঠে জমকালো রঙিন ও নানামুখী উপকরণসমৃদ্ধ। শিল্প নির্মাণে ছাপের সাহায্য নিলেও পূর্বের মতো হাতের মাধ্যমে সরাসরি অনেক বেশি উপাদান যোগ করতে থাকেন। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু পশ্চাৎপট নির্মাণ করেছেন ছাপের মাধ্যমে। আবার কোথাওবা দু-একটি উপাদান বা রূপবন্ধ যুক্ত করেছেন এ পদ্ধতিতে। বাকিটা করেছেন সরাসরি হাতে। ফলে তাঁর ছবি আর বিশুদ্ধ ছাপচিত্রের শর্তগুলো পূরণ না করলেও এ উত্তরণ ছাপাই ছবি থেকেই ঘটেছে।

তাঁর এই উত্তরণ আরও পরিণত হয়েছে বর্তমান শতকের প্রথম থেকে। *ইউটোপিয়া* (২০০৮), *আর্কেডিয়া* (২০০৮), *সত্য সুন্দর ও আমি* (২০০৮) (চিত্র ১৩৪), *রূপসী বাংলা* (২০০৮), *সোনার বাংলা* (২০১৩), *দত্তা দয়াদভাম দমায়াটা : শান্তি শান্তি শান্তি* (২০১৪), *মাদাম সসেট্রিসের প্রবেশ নিষেধ* (২০১৪) ইত্যাদি ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টিতে তাঁর পরিণতির লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। এই ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টিতেও তিনি এক স্বপ্নরাজ্য নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নদীমেখলা বাংলাদেশ আর এর প্রকৃতিই তাঁর এ পর্বের শিল্পকর্মের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে থেকেছে। শিশু-সরলতায় এ দেশের নদী, নৌকা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাছ, প্রজাপতি, জোনাকি, রংধনু, পাখি, শাপলা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন চিত্রতলে। শিল্পী লায়লা শার্মিনের সারা জীবনের শিল্পকৃতিতে শিশুচিত্রের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। শিশুদের গড়া সহজ-সরল রূপবন্ধ তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিষয় উপস্থাপনে ব্যাকরণভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তে বস্তুর ধারণাগত উপস্থাপনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দৃষ্টিবান্ধব ও জমকালো উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তল নির্মাণের জন্য একটি ছাঁচের ছাপ নিয়ে কখনো তাতে হাতে কাজ করেছেন, কখনো বা কোলাজের মতো করে কোনো কিছু জুড়ে দিয়েছেন। একই ছাঁচের একাধিক ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। যেমন *দত্তা দয়াদভাম দমায়াটা : শান্তি শান্তি শান্তি-১৩* (২০১৪) ছবিতে ব্যবহৃত নিচের ছাঁচটি *মাদাম সসেট্রিসের প্রবেশ নিষেধ* (২০১৪) ছবির নিচের অংশে উল্টো করে ব্যবহার করা হয়েছে। দুটিতেই অন্যান্য রূপবন্ধের সাথে কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তিও যোগ করেছেন। প্রকৃতির রূপায়ণে থেকেছেন দূরবর্তী। আর ছবির উপকরণগত সমাবেশ রচনার ক্ষেত্রে থেকেছেন গতানুগতিক সৌন্দর্য-কেন্দ্রিক।

সুন্দর নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে শিল্পী লায়লা শার্মিন নষ্ট সময় ও রাজনীতির বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ করেছেন। কারণ পৃথিবীর সকল বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তিনি সৃষ্টিশীলতা দিয়ে

পৃথিবীকে আমূল বদলে দেওয়ার মতো রোমান্টিক ধারণায় বিশ্বাসী। বাস্তবিকপক্ষে সময় যতই উদ্বেগজনক আর অশুভ হোক না কেন, মানুষের শক্তির ওপর তাঁর আস্থা অগাধ। কাব্য-সাহিত্য তাঁকে এ ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে। ইলিয়ট আর বোদলেয়ারের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে তাঁর ওপর। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দিন প্রমুখরাও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তাই স্মৃতিজাগানিয়া রং-রেখা আর পরিসরের যথাযথ সমাবেশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন কাজে। তাঁর পেলব চঞ্চল এবং স্বাধীন সাবলীল সমাবেশসমূহের মধ্যে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা থেকে।

শিল্পী আহমেদ নাজির (১৯৬৪) নব্বইয়ের তরুণ প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্রী। শিল্পী পিতার (শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ) সন্তান হওয়ার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে শিল্পচর্চার সাথে পরিচয়। তা থেকেই ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে ওঠেন শিল্পকলার প্রতি। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে পা রাখেন শিল্পের বৃহৎ জগতে। শুরুর দিকে অন্য দশজনের মতো অনুশীলনধর্মী শিল্প রচনা করেছেন ছাপাই মাধ্যমে। মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন এচিং, লিথোগ্রাফ, কাঠ খোদাই, ডিজিটাল প্রিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট, মনোপ্রিন্ট, কলোগ্রাফ, বোর্ডে ইন্টাগ্লিও (তাঁর মতে *বোর্ডোগ্রাফ*)-সহ ছাপচিত্রের নানা নিরীক্ষাধর্মী মাধ্যমে। নিরীক্ষার প্রাথমিক পর্বে মানুষই বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে তাঁর শিল্পে। এসেছে সমকালীন প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার নানা বিষয়। *যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মুখ* (১৯৮৭), *বন্দী-১* (১৯৮৯), *বিজয়ের স্বপ্ন* (১৯৯০), *শোকার্ত* (১৯৯১), *ক্ষুব্ধ মুখ* (১৯৯১), *রিক্তা* (১৯৯১), *অবস্থান* (১৯৯১) প্রভৃতি এ পর্বের উদাহরণ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াল সময়ে পাকিস্তানি হায়েনাদের দ্বারা নির্যাতিত এক বাঙালির যন্ত্রণাক্লিষ্ট করুণ উপস্থিতি চোখে পড়ে *যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের মুখ* শীর্ষক ছবিতে। পটের সম্মুখে অবস্থিত নির্যাতিতের পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে অপেক্ষমাণ ব্যক্তি, যার অভিব্যক্তিতে ঠিকরে উঠেছে নির্মম পরিণতির মুখোমুখি হতে যাওয়ার তীব্র আতঙ্ক। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি উঠে এসেছে *বন্দী-১* শীর্ষক ছাপচিত্রে। জল নিমগ্ন ঘরবাড়ির সম্মুখপটে সাহায্যের আশায় দাঁড়িয়ে তিনজন নারী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিঃস্ব, অসহায় হয়ে পড়া এক নারীচরিত্রের উপস্থিতি *রিক্তাতে*। সব হারানোর শোক আর আর্তি নিয়ে দুঃসহ জীবন বয়ে চলার ক্লান্তি স্পষ্ট তার শারীরিক অভিব্যক্তিতে। বন্যা প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য হলো–

> চারদিকে অথই পানি, অথচ খাবার পানির তীব্র সংকট, খাদ্য সামগ্রীর অভাব, বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন, বস্তিবাসী হাজারো মানুষের ক্ষুধাতুর মুখ, মানবেতর জীবন-যাপন আমার শিল্প [শিল্পী] হৃদয়কে প্রচণ্ড আলোড়িত ও ব্যতীত [ব্যথিত] করে তুলে। ...আমার এই উপলব্ধি ও অনুভূতি আমাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, যখনই কোন

> মুখাবয়ব বা ফিগার আঁকতে গিয়েছি তখনি অবচেতনভাবেই সেই দুঃখী-মানুষের আর্তনাদক্লিষ্ট চেহারা বা ফিগারগুলো আমার চিত্রকর্মে জায়গা করে নিতে থাকলো।[৬১৯]

চিত্রপটজুড়ে নারীমুখের উপস্থিতি *ক্ষুব্ধ মুখ* শীর্ষক ছবিতে। নারীর সমাজিক বৈষম্য আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীচরিত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষোভ আর আক্রোশ উন্মোচিত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিব্যক্তিতে। সমাজকাঠামোর তলানিতে অবস্থিত এক শীর্ণকায় বিপন্ন পুরুষের সকরুণ উপস্থাপন *অবস্থান*। আর রাজনৈতিক হানাহানিতে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান স্বজনের শোকার্ত মুখ এঁকেছেন *শোকার্ত*তে। এ পর্বের ছবিতে বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বাজারের সস্তা ও সহজলভ্য বোর্ডকে নিজস্ব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালিত করে একইসাথে তা থেকে ইন্টাগ্লিও ও রিলিফ পদ্ধতিতে ছাপ নির্মাণ। এ ছাড়া অভিব্যক্তিপূর্ণ জ্যামিতিক অবয়বের সাথে ভঙ্গুর রেখা ও সীমিত রঙের ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে। তবে এই ছোট ছোট রেখার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার এবং নারী বা পুরুষ অবয়বের গঠন সামগ্রিকভাবে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের রেখা ও অবয়বের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষত সফিউদ্দিন আহমেদের *কান্না*, *একুশে স্মরণে*, *স্মৃতি একাত্তর* ও *বন্যা* সিরিজের ছবিগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পিতা সফিউদ্দিনের প্রভাব শিল্পশিক্ষার্থী হিসেবে যাত্রা শুরুর প্রথম থেকেই ছিল নাজিরের। রং, রেখা, শৈলীতে তো বটেই, সফিউদ্দিনের প্রভাব ছিল নাজিরের ছাপচিত্রের বিষয় নির্বাচনেও। *পায়রার খোপ* (১৯৮৫), *নিসর্গ*-২ (১৯৮৫) ইত্যাদিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আবার প্রথম দিকের কিছু কাঠ খোদাই ছবিতে (*গোধূলী*, ১৯৮০) নন্দলালের সহজ পাঠের অলংকরণও প্রভাবিত করেছে তাঁকে। আঙ্গিকে নন্দলাল কিংবা সফিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে প্রভাবিত করে থাকলেও করণকৌশলগত দিক থেকে থেকেছেন সবসময় স্বতন্ত্র। মাধ্যমের ক্ষেত্রে সফিউদ্দিন আহমেদ যেখানে অত্যন্ত বিশুদ্ধতাবাদী নাজির সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে সতত নিরীক্ষাপ্রবণ। ফলে হার্ডবোর্ডের মতো সস্তা ও ভঙ্গুর উপকরণ ব্যবহার করে ছাপ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তিনি এক মাধ্যমের সাথে অন্য মাধ্যমের সংযোগ ঘটিয়েছেন অনায়াসে। কারণ তাঁর শিল্পদর্শনে মাধ্যমই শেষ কথা নয় বরং বক্তব্যের সবিশেষ প্রকাশই মূল কথা। তাই অনায়াসেই তিনি উত্তরণ ঘটিয়েছেন শৈলীর, জটিল জ্যামিতিকতা থেকে লোকশিল্পের সরলতায় প্রকাশ করেছেন বিষয়ের। তবে যামিনী রায় কিছুটা প্রভাবিত করেছেন এ পর্বের চিত্রতলও। লোকজ নানা রূপবন্ধের সাথে উৎসবের কোমল ও উষ্ণ নানা রং মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন *পহেলা বৈশাখ* (১৯৯৩, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮) সিরিজের কয়েকটি ছবি। বাংলা নববর্ষে চারুকলা ইনস্টিউটে উদ্‌যাপিত পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার নানা উপকরণ হাতি, ঘোড়া, পাখা, পুতুল, পাখি ইত্যাদির সাথে উৎসব চিহ্নিত করতে বেলুন, জোকারের মুখোশ, টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন পরাবাস্তববাদী আঙ্গিকে। আবার জীবনের অজানা অধ্যায়ের রূপান্তর ঘটিয়েছেন বিমূর্ত রীতিতে *জীবনের অন্ধকার দিক* (১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯৭) ছবি তিনটিতে। তলজুড়ে

[৬১৯] নাজির আহমেদ, 'আমার ছাপচিত্রের জগৎ', অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১২

কালো রঙের আধিক্যের সাথে বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তকার কিংবা আয়তাকার নানা গড়নের সাথে বিভিন্ন রঙের সূক্ষ্ম রেখার সুমিত বন্ধনে উন্মোচিত করেছেন জীবনের অন্ধকার সত্যকে। একইসাথে *ভগ্ন জীবন* (১৯৯৭) নামক ছবিটিতে তারুণ্যের প্রেম-ভালোবাসাজনিত ব্যর্থতা বা হতাশাচ্ছন্নতাকে চিত্রিত করেছেন নাজির। তলজুড়ে নারী-পুরুষের অবয়বের সাথে ত্রিভুজ বৃত্তের মতো নানা জ্যামিতিক আকৃতি এবং পরাবাস্তববাদী ঢঙে নারীর কোমল বাহু, পাখি ইত্যাদি জৈব রূপবন্ধেরও ব্যবহার করেছেন। হালকা বুনটযুক্ত তলে ছেঁড়া ফিতার ক্যাসেটে আর এলোমেলো রেখায় নির্মাণ করেছেন 'তার ছেঁড়া' অথবা 'ফিতা ছেঁড়া'র অবস্থা। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে থেকেছেন যেন পেছনের উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটের বিপরীতে বর্তমানের অন্ধকারাচ্ছন্নতা-পন্থী। আবার পরক্ষণেই *প্রেমের অনুভূতিতে* (১৯৯৯) সব হতাশা অন্ধকারাচ্ছন্নতা কাটিয়ে শুভ্রতায় ঝলমলে হয়ে উঠেছে সবকিছু।

জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়কে শিল্পোপজীব্য করলেও তাঁর শিল্পে সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী হয়েছে শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার স্মৃতি। আশির দশকে নিরীক্ষার শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয় হয়ে দখল করেছে তাঁর চিত্রজমিন। নব্বইয়ের দশকের বিভিন্ন সময়েও উঁকি দিয়েছে সে স্মৃতি। অবশ্য সেসবে সফিউদ্দিন আহমেদের ছায়া বর্তমান থাকায় তাঁর প্রকৃত মুক্তি হয়নি। তবে নব্বইয়ের একেবারে শেষ লগ্নে এসে এই যুদ্ধের স্মৃতিকে ভর করে মুক্তিলাভ করেছে তাঁর নিজস্ব শিল্প-আঙ্গিকও। শুধু অন্য কারো প্রভাববলয় থেকেই নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করা শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর শৈলী অতুলনীয়, অনন্য। মুক্তিযুদ্ধের ছবি বলতে মাথায় গামছা বাঁধা মুক্তিযোদ্ধার উল্লম্ফ দৌড়, রাইফেল হাতে ছুটে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বলিষ্ঠ হাতে উত্তোলিত রাইফেলের যে গৎবাঁধা ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, শিল্পী আহমেদ নাজিরের উপস্থাপন তা থেকে একেবারে ভিন্ন। তাঁর স্মৃতি রক্ত-ধোয়া, তাঁর স্মৃতি অভিজ্ঞতালব্ধ; শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অস্থিমজ্জায়, প্রতিটি কোষে উপলব্ধ! শৈশবে ভেতরে বাসা বাঁধা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি তাঁর বেড়ে ওঠার সাথে সাথেই বেড়ে উঠেছে। তাই রঞ্জনরশ্মির নিচে নিজের শরীর দিয়ে হাত-পায়ের হাড়গোড়ে, বুকের পাঁজরে, মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে, এমনকি হৃদয়ের রক্তবাহী প্রতিটি ধমনিতেও খুঁজে চলেছেন যুদ্ধস্মৃতি। সেজন্য তাঁর *যুদ্ধনথি* তাঁর আত্মজীবনীরই অংশ হয়ে উঠেছে যেন। ছাপচিত্রের প্রথাগত মাধ্যমকে সরিয়ে যুদ্ধনথির অধিকাংশ কাজই করেছেন মুদ্রণপ্রযুক্তির অত্যাধুনিক মাধ্যম ডিজিটাল প্রিন্টে। কারণ মাধ্যমের মুনশিয়ানা নয়, বরং বক্তব্যের সবিশেষ প্রকাশই তাঁর লক্ষ। তবে নব্বইয়ের দশকের শেষ নাগাদ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে মার্চের কালরাতে পিতার শাসন উপেক্ষা করে জানালার শার্শি গলিয়ে বাইরে গভীর কালোর বিপরীতে অগ্নাভ হলুদের যে উল্লম্ফন দেখেছিলেন, তা-ই মূর্ত করে তুলেছেন *বাংলাদেশের কালো রাত্রি* ১৯৭১ (১৯৯৮) শীর্ষক শিল্পকর্মে। *যুদ্ধনথি* (২০০১) নির্মাণ করেছেন বিমূর্ত

আঙ্গিকে। এতে বেদনার্ত নীল রঙের সাথে (চিত্র ১৩৫) সরল আনুভূমিক ও উলম্ব এলোমেলো রেখা এবং বিন্দু-বৃত্তের সহযোগে গড়ে তুলেছেন তল। আর ওপর থেকে নেমে আসা অন্ধকার গড়নের মাঝে একদিকে নীল বিক্ষত উচ্চাবচ বুনট আর অন্যদিকে জ্বলজ্বলে রক্তস্মৃতি সময়ের ভয়াবহতাকে ইঙ্গিত করে। নাজির রঞ্জনরশ্মির মাধ্যমে যুদ্ধের স্মৃতি খুঁজেছেন মেরুদণ্ডের হাড়গোড়ে, মাথার খুলিতে *যুদ্ধনথি-৫* (২০০৩) এবং *যুদ্ধনথি-১১* (২০০৫)-তে। এতে শিরদাঁড়া আর হাড়গোড়ের আলোছায়ার সাথে সামান্য লালচে আভার উপস্থিতি যেন যুদ্ধের বিভীষিকাময় সময়কে মনে করিয়ে দেয়। *যুদ্ধনথি-১৫* (২০০৫)-তে অন্ধকার আর ধোঁয়াটে সাদা তলের বিপরীতে মস্তিষ্কের জৈবিক গঠনের ছন্দোবিচ্ছেদ্য সারি সারি ছবি যেন শহিদের জ্বলজ্বলে আত্মা। *যুদ্ধনথি-৪৮* (২০০৯) সংখ্যক চিত্রটিতে (চিত্র ১৩৬) রক্তলাল তলের ওপরে জমাট কালোর বিপরীতে পায়ের হাড়ের এক্স-রের ছবি যুক্ত করেছেন। সাদা-কালো হাড়ের রূপবন্ধের সাথে লাল রঙের বুননে মুক্তিযুদ্ধের মানবিক ক্ষয়ক্ষতির দালিলিক চিহ্নই যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন শিল্পী। দুটি হাড়ের ছবি কালো তল থেকে লাল তলের ওপরে বাড়িয়ে উপস্থাপন করায় ছবির গঠনে কিছুটা ভিন্নতাও এসেছে। আবার রক্তাভ তলের ওপরে ছোপ ছোপ কালোর সহযোগে দৈত্যাকার মানবাকৃতির বহিঃরেখ ধ্বংস আর বিভীষিকার মাঝে ঠায় দাঁড়িয়ে ধংস-মৃত্যু উপভোগরত ঠাণ্ডা মাথার পাক হয়েনার উপস্থাপন হলো *যুদ্ধনথি-৭৬* (২০০৯)। এ ছাড়া বুকের পাঁজর, রক্তবাহী ধমনির বিভিন্ন ছবি যুক্ত করেও নির্মাণ করেছেন যুদ্ধস্মৃতি। আহমেদ নাজিরের যুদ্ধনথি যুদ্ধপীড়িত মানবাত্মার হৃদয়বেদনার জ্বলজ্বলে আখ্যান। তা কখনো আমাদের নিয়ে যায় একাত্তরের হানাদারদের পৈশাচিকতায়, আবার কখনো শোকাপ্লুত করে স্বজন হারানোর বেদনায়। এই যুদ্ধনথি শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে রচিত হলেও পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, ধ্বংস আর মৃত্যুর বিপরীতে এ যেন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদও, যা বিবেককে পীড়িত করে নৃশংসতা থেকে উত্তরণের দাবিতে। কারণ নির্যাতিতের রক্ত আর অশ্রুর রং দেশ-কালের ঊর্ধ্বে উঠে একই রকমের।

অনেক ত্যাগ, অশ্রু আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আজকের এই বাংলাদেশ। আমাদের শিল্পীরা অনেকেই তা দেখেছেন খুব কাছ থেকে, অনেকে রক্তমূল্যও দিয়েছেন স্বাধীন স্বদেশ অর্জনে। তবু আমাদের চিত্রশিল্পে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব ও ভয়াবহতা প্রকৃত আবেদনে উদ্ভাসিত হতে পারেনি। তবে শিল্পী আহমেদ নাজিরের ব্যতিক্রমী উপস্থপনায় মুক্তিযুদ্ধ ভিন্নমাত্রা যেমন লাভ করেছে, তেমনি দীর্ঘ অপ্রাপ্তির বেদনাকেও কিছুটা হলেও প্রশমিত করেছে।

এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে *বিজয়ের স্বপ্ন* (১৯৯০, ১৯৯৫, ১৯৯৬), *অতীতের ছায়া* (১৯৯৪, ১৯৯৫), *শরণার্থী* (২০০১) ইত্যাদি। *যুদ্ধনথি* ছাড়া ডিজিটাল প্রিন্টে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ ব্যবহৃত নানা উপকরণ যোগ করে নির্মাণ করেছেন *এক কিংবদন্তির পথচলা* (২০১৩-১৪),

কম্পিউটার এবং তাঁর নানা অনুষঙ্গ যোগ করে করেছেন *ভাবুক* (২০১৪), সিনেমার পোস্টার নিয়ে করেছেন *নাটক* (২০১৫) শীর্ষক সিরিজ।

এই প্রজন্মের অপর উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শিল্পী রফি হক (১৯৬৫)। ছাপচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে। শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার ঘেরাটোপে চর্চা শুরু করলেও ধীরে ধীরে ব্যক্তিভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। ছবির গঠন ও বিষয়-ভিন্নতায় গড়ে উঠতে থাকে স্বতন্ত্র আঙ্গিক। শিল্পী রফিও শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার রীতি-অনুবর্তী বিষয়াবলি চর্চা করলেও খুব দ্রুতই তিনি স্বকীয় শৈলীতে প্রকাশমান হন। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র থাকা অবস্থায় নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই তাঁর সৃজনের নন্দন-আবহ কলারসিকদের মুগ্ধ করে। অন্য অনেকের মতো সেই সৃজন সম্ভারের অনেকটা জুড়েই ছিল তাঁর ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতির স্বতন্ত্র প্রকাশ। জীবনের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয় মানুষের, রফির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে পরিপার্শ্বিক পরিবেশজাত নৈরাশ্য, হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা, ব্যক্তিচেতনা, নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অতীত স্মৃতি, এমনকি অবদমিত যৌন-আবেগের মতো বিষয়কে আশ্রয় করে মুক্তি খুঁজেছে তাঁর চিত্রপট। তাই রেখা, রং আর কবিতার কয়েকপ্রস্থ পঙ্‌ক্তিতে গেয়েছেন একাকিত্বের গান। তাঁর চরিত্রের অন্তর্মুখীনতাও হয়তো এ ক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারী হয়ে থাকবে। আবার কখনো কখনো এতে প্রভাবক হয়েছে কবিতা। যেমন– *নতুন ভাগ্যের সন্ধানে* (১৯৯৫?) এঁকেছেন জীবনানন্দের *বোধ* কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তবে কবিতায় কবির কল্পনা ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে চলে যাওয়ার ফলে যে গতিশীল চিত্রকল্পের জন্ম হয়, সেটা চিত্রপটে অসম্ভব। তাই শিল্পী শুধু অনুপ্রাণিতই হন, আর তা থেকে জন্ম হয় স্বতন্ত্র শিল্পের। *নতুন ভাগ্যের সন্ধানে*তেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অবিশ্রান্ত কাটাকুটি আর অন্ধকার পশ্চাৎপটের বিপরীতে একপাশ থেকে হেঁটে নগ্ন নারীমূর্তি পটের সীমানা অতিক্রম করে যেতে চায় অন্য কোনোখানে, অন্য কোনো বাস্তবতায়। গাঢ়, গভীর নীল ও ক্রোম ইয়োলোর তারতম্যের সাথে অর্ধ-বিমূর্ত সত্যে উপস্থাপিত অবয়ব, আর সাথে 'তোমাকে ভুলবো না...'র মতো পঙ্‌ক্তি যেন একধরনের শূন্যতায় আবিষ্ট করে দর্শক হৃদয়কে। এর মাধ্যমে ফেলে আসা অতীত ও তার সুখস্মৃতিকেও রোমন্থন করেছেন এই দুঃখবাদী শিল্পী। তাঁর মতে অতীতচারিতা শিল্প সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত জরুরি, কারণ কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে সে বিষয়ে শিল্প সৃষ্টি করা অসম্ভব ।[৬২০] তাই অতীত স্মৃতির নানা চিত্ররূপ নির্মাণ করেছেন *যেভাবে আমি তাকে স্মরণ করি* (১৯৯৫) চিত্রগুচ্ছে (চিত্র ১৩৭)। এই ছবিগুলোর অধিকাংশতে খসড়া রেখাধর্মিতায় উদ্ভিন্ন এক নগ্ন নারীর স্মৃতি-রোমন্থন করেছেন অতীতচারী শিল্পী। ছবির কোনো কোনো অংশে গভীর কালো ছোপ যেমন বিষাদের ছায়া নিয়ে আসে তেমনি আবার পরক্ষণেই বিন্দুবৎ হলুদ, লাল, নীল, সবুজের উপস্থিতি কিংবা গড়িয়ে যাওয়া বর্ণ-প্রপাত

---

[৬২০] মন্দিরা ভাদুড়ী, 'ক্রিমসন রেড: শিল্পীর রোজনামচা', দ্র. *ক্রিমসন রেড*, ঢাকা, সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব বাংলাদেশ আর্ট (এসপিবিএ), ২০১৪, পৃ ১৮

জাগিয়ে রাখে সুখ-স্বপ্নকে। তাই পোড়া কাগজ আর পেন্সিলের নিচে আশ্রয় নেওয়া নারীমূর্তিকে দিয়েছেন আশ্বাস *আমরা আবার মিলিত হব* (১৯৯৪) শীর্ষক ছবিতে। অথবা স্তরের পর স্তর বৃত্ত, কাটাকুটি কিংবা কফিন-সদৃশ চৌখুপীর সাথে পোড়া কাগজ আর জমাট কলোর উপস্থাপনে *শুধু তোমার ভালোবসার জন্য* (১৯৯৪)-তে ইঙ্গিত দিয়েছেন ভালোবেসে নিঃশেষ হওয়ার। আবার পরিপার্শ্বিক সমাজের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অন্তর্দহ আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন *অন্তর্দহন* (১৯৯৫-২০০০) সিরিজে (চিত্র ১৩৮)। কয়েক প্রস্থ রং, এলোমেলো রেখা, ত্রিভুজ-চর্তুভুজ-বৃত্ত অথবা পরিচিত কোনো বিশেষ রূপবন্ধের সাথে পোড়া কাগজের সংযুক্তিতে নির্মাণ করেছেন সবগুলো কাজ। এ সিরিজের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য–

> The series "Inner Burn" is to some extent, symbolic. The deep wheel marks on the road, the mark of the axe on the tree, the wounds on the human body symbolizes the confrontation between the nuclear superpowers reflecting the relationship of distrust growing all human values. All this was like an "Inner Burn" for me. Basically, the relationship between etching and burnt paper gave birth to this idea.[৬১]

কবিতার সাথে শিল্পী রফি হকের নিবিড় যোগাযোগও এ ক্ষেত্রে অন্য একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষ করে কবি হেলাল হাফিজের *মানবানল* কবিতাটি। বস্তুত ব্যক্তি রফি হক কবিও, লেখেন প্রবন্ধ এবং সাময়িকীও। তাই সাহিত্যের সাথে তাঁর যোগাযোগ নিবিড়। সেই সূত্রে সাহিত্যের সাথে নিবিড় যোগাযোগ তাঁর ছবিরও। বিভিন্ন রূপবন্ধ, রঙের ছোট ছোট বিন্দু, এলোমেলো রেখার সাথে গদ্য কিংবা কবিতার কয়েক ছত্র আর যতিচিহ্নের ব্যবহার তাঁর ছবিতে চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করে। লিপি সেখানে ছবির মাত্রা নিয়ে হাজির। আবার চিত্রপটে সরাসরি কবিতার ব্যবহার ছাড়া রং-রেখা আর বিমূর্ত রূপবন্ধের সমন্বয়ে রূপায়িত করেছেন *একাকিত্ববোধ* (১৯৯৫)। কালো আর চাপা সবুজ পটের বিপরীতে নগ্ন নারীদেহের অর্ধ-বিমূর্ত উদ্ভাসে ব্যক্তিগত গোপন অনুভূতির দুঃসহ ভার বহন করে চলার মানসিক অস্থিরতার বিষণ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে হঠাৎ নীল বা লালচে কোনো আভা জানান দেয় অতীত সুখস্মৃতির। সুখ আর দুঃখের এই স্পষ্ট দোলাচল ব্যক্তি-শিল্পীর একাকিত্বকে প্রশমিত করতে পারে না। কারণ জীবন ও বাস্তবতাকে ধারণ করেই শিল্পী নিসঃঙ্গভাবে সৃষ্টি করেন শিল্প। তবে অতি দ্রুতই ব্যক্তিক অনুভূতির জগৎ ছেড়ে তিনি চোখ মেলেছেন বাইরে। দেখেছেন প্রবীণ রিকশাচালকের ক্লান্ত অথচ প্রত্যয়দীপ্ত মুখ, যা মর্মবেদনার এক *দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি* (১৯৯৫) হিসেবে গেঁথে গেছে তাঁর মনে। গ্রীষ্মের খরতপ্ত দুপুরে, বৃষ্টিতে কিংবা মাঘের কনকনে শীতে পরিশ্রান্ত রিকশাওয়ালার অসহায় জীবনযুদ্ধ তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই গ্লানি থেকে মুক্তির নিমিত্তে রঙের জ্যামিতিক বিন্যাস

---

[৬১] Rafi Haque, 'Some Words About Work and Technique', ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

আর মাঝখানে বৃদ্ধ রিকশাওয়ালার প্রতিকৃতির সাথে শামসুর রাহমানের কবিতায় *(কেউ কি এখন?)* অনুপ্রাণিত হয়ে অদৃশ্য হাতে খুঁজেছেন আশ্রয়। জীবনের রুদ্র-রুক্ষ বাস্তবতাই হয়তো কল্পনা ও দুঃখবিলাসী শিল্পী রফি হককে এতটা জীবনমুখী, সংবেদনশীল ও সমাজসচেতন করে তুলেছে। যদিও তিনি বিশ্বাস করেন, ছবি এঁকে সমাজ-সভ্যতাকে বদলে দেওয়া যায় না রাতারাতি; তবুও তার বদলে যাওয়ার নানা ইঙ্গিত, ইতিহাস কিংবা উপাদান কখনো কখনো বিষয় হয় শিল্পের, হয় ইতিহাস। রফি হকের ছবিতেও তা আছে। শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা স্থান করে নিয়েছে তাঁর চিত্রতলে। নিজস্ব আঙ্গিকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন তাঁর *দিনলিপি ঃ ১৯৭১* (১৯৯৫) শীর্ষক চিত্রগুচ্ছে। বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ, নৃশংসতা এবং মুক্তির উদ্বেল আনন্দ উদ্‌যাপন ফুটে উঠেছে এতে। খবরের কাগজে প্রকাশিত টুকরো টুকরো খণ্ডচিত্র, খবর আর লাল, হলুদ, নীল প্রভৃতি রঙের বিনুনিতে নির্মিত এ ছবিগুলো মানবতার হত্যাকারীদের প্রতি ছুড়ে দেয় ক্ষমাহীন অভিশাপ। গভীর অভিমান আর ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে ঘাতকের পানে অহর্নিশ, যেন তা চোখে চোখে রাখতে চায় আগামীর নরপশুদেরও। যদিও দেশে দেশে, কালে কালে যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। তবু শিল্পী রফি হক যুদ্ধের ঘোরবিরোধী, কারণ তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে ধ্বংস আর মৃত্যুর মিছিল। শৈশবে যেমন দেখেছেন এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, তেমনি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানের পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে ভ্রমণের সময় উপলব্ধি করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মমতাও, যা তাঁর শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে উসকে দেয় আরেক দফা। তিনি উপলব্ধি করেন দেশ-কালের উর্ধ্বে নির্যাতিতের রক্ত ও চোখের জল একই। তাই জাপানে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের (Kyushu Sangyo University-তে রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের আওতায়) সময় তিনি নির্মাণ করেন *হিরোশিমার প্রতি শ্রদ্ধা-১* (২০০০), *হিরোশিমার প্রতি শ্রদ্ধা-২* (২০০০), *হিরোশিমার প্রতিচ্ছবি* (২০০০), *আর যুদ্ধ নয়* (২০০০) (চিত্র ১৩৯) ইত্যাদি শিল্পকর্ম। এসব ছবিতে আলোকচিত্রের সামান্য কিছু অংশবিশেষের সাথে ছোট ছোট বৈশিষ্ট্যযুক্ত অগণিত রেখা আর সমতলীয় রঙের বিন্যাসে নির্মাণ করেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমনকি শান্তির জন্য তাঁর প্রার্থনাও। ছবিতে ব্যবহৃত রং পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে উজ্জ্বল। বস্তুত বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ছবিতে ঔজ্জ্বল্যের সাথে রং ব্যবহারের পরিধিও ধীরে ধীরে বেড়েছে। তাঁর চিত্রতল থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে চেনা রূপবন্ধ, সূক্ষ্ম, সরু সংবেদনশীল রেখা। পক্ষান্তরে জায়গা নিয়েছে পুরু রঙের আস্তরণ, উচ্চাবচ মোটা বুনট, বৃত্ত, ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের মতো জ্যামিতিক আকার। *যখন আমি বৃত্ত আঁকি* (২০১২) শীর্ষক ছাপচিত্রগুলো এই পর্বের উদাহরণ। এই ছাপাই ছবি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য–

> এই সিরিজের ছবিগুলোতে টেক্সচার্জড সারফেস, তার ওপরে পাতলা রং, মনে হয় কত না-বলা গল্প তাদের আভাস দিয়ে একটু ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, স্মৃতির ওপর যেন পড়েছে সময়ের পলেস্তারা। তার ওপর ক্যানভাসের অল্প-অল্প জায়গা জুড়ে উজ্জ্বল রং, চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সেগুলো যেন আজকের কথা বলছে।[৬২২]

প্রকৃত শিল্প কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের বয়ান দেওয়ার বদলে মানুষের বোধ আর মননকে উসকে দেয়। রফির ছবি অনেকটাই সে রকম। প্রকৃতি আর প্রেমের সাথে মানুষের সম্পর্ককে সরাসরি উপস্থাপিত না করে বরং তাকে দেখেছেন মানুষের জটিল মনোলোকের আলোকে, কিছুটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। তাই বলা যায়, শিল্পী রফি হকের ছবি মানুষের মনোলোকের বিবিধ হিসাব-নিকাশের জটিল আখ্যান; ছবি ও কবিতার এক আশ্চর্য মেলবন্ধন। বিষাদময়তা রফির ছবির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। অনেক কিছু থাকার পরও সর্বগ্রাসী শূন্যতার এক অদ্ভুত আবহ বিদ্যমান তাঁর কাজে। মনের গভীর শূন্য অনুভূতিরাশি অন্তর্চক্ষু দিয়ে অবলোকন করে চিত্রপটে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী ধারায়। এ ক্ষেত্রে পল ক্লি, মো. কিবরিয়া এবং মনিরুল ইসলাম তাঁকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য রূপবন্ধের সাথে অর্ধ-বিমূর্ততায় নারী-অবয়ব তাঁর ছবিতে বিষয় হয়েছে বারবার, নানা ভঙ্গিতে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> ...আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার জন্য নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা খুঁজেছি নারীদেহে। নস্টালজিক চোখে দেখেছি নারীর মুখ, নারীর দেহ, দেহের বাঁক, বুকের উজ্জ্বলতা এসবই আমার আনন্দের দিকে যাত্রা। সেজন্য এসব কাজ বন্ধুত্বের, আনন্দের সুখের যা আমি ব্যক্তিগত জীবনে পাইনি সেটিকেই আমি খুঁজেছি ছবিতে।[৬২৩]

শিল্পী রফি হকের ছবি দু-এক ফোঁটা রং, দু-একটি শব্দ বা কবিতার লাইন আর ভাঙা ভাঙা রেখার সাথে সুখ বা দুঃখের স্মৃতিগন্ধী কোনো অবয়বের রহস্যাবৃত নাটকীয় উদ্ভাসন; যা দর্শককে আচ্ছন্ন করে রাখে মুগ্ধতায়। সাথে ডায়েরির পাতা বা পোড়া খবরের কাগজের কিয়দংশের সংযুক্তি রহস্যময়তাকে আরও অভেদী করে তোলে। ছাপাই ছবির জমিনে কাগজ সংযুক্তির এই প্রবণতা তাঁর শৈশব স্মৃতি থেকে পাওয়া। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের কুষ্টিয়ার বাড়ির দেয়ালের ক্ষত ঢাকতে ভাইবোনেরা মিলে খবরের কাগজের বিভিন্ন অংশ সেঁটে দিতেন। সেই স্মৃতির সাথে শিল্পী মো. কিবরিয়া, সুজান বেনটন এবং প্রবাসী শিল্পী মনিরুল ইসলামের কোলাজও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে এ ক্ষেত্রে। তাঁর চিত্রপটে বিমূর্ততা আর অর্ধ-বিমূর্ততার দোলাচলে কল্পনা আর স্বপ্নময়তার যে বিষাদঘন আবহ তৈরি হয়, তার

---

[৬২২] মন্দিরা ভাদুড়ী, 'ক্রিমসন রেড: শিল্পীর রোজনামচা', দ্র. *ক্রিমসন রেড*, ঢাকা, সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব বাংলাদেশ আর্ট (এসপিবিএ), ২০১৪, পৃ ১৮

[৬২৩] রফিকুল হক রফিক, *একই আলিঙ্গনে ছবি আর কবিতা ঃ আমার ছাপচিত্র*, অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ নং উল্লিখিত নেই

সূত্র প্রোথিত আছে বাস্তবতায়। বাস্তবের নানা অনুষঙ্গকে স্বীয় চিত্রপটে অত্যন্ত সংবেদনশীলতায় স্থাপন করেন তিনি। তাঁর ছাপছবি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> He has got a quality of poetic creation and tranquility in his works which is very important to see. His work are not only the subject of observation with eye but also a subject of deep and innermost feelings and those are always abstract and mysterious in nature. He is an artist of lyrical connotation and pleasant visual quality. Rafi HAQUE's etchings are throughtfully composed. Memory, despair, love, death all these subjects came to his creations at an ease.[৬২৪]

তাঁর বিশিষ্টতা পেপার লিথোগ্রাফ এবং এচিং ও শিনকোলের সংমিশ্রণে শিল্প নির্মাণের। কিন্তু তিনি এই দুটি মাধ্যম ছাড়া কাজ করেছেন কাঠ খোদাই, লিথোগ্রাফ, কলোগ্রাফ ইত্যাদি মাধ্যমেও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ছবির আয়তন ছোট ও কিছুটা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট, তবে তাতে উপাদানের সমাবেশ পরিকল্পিত এবং দৃষ্টিনন্দন। প্রথম দিকে রং ব্যবহারে থেকেছেন পরিমিত। অনুজ্জ্বল ধূসর, কালো এবং বাদামি রঙের আধিক্য লক্ষণীয় তাঁর এসব ছবিতে। তবে দুঃখবিলাসী শিল্পী বিষাদের শেষে বিন্দু বিন্দু অথবা উজ্জ্বল রঙের কোনো রেখার মধ্যে দেখেছেন আশার আলোও। ধীরে ধীরে তাঁর ছবিতে রঙের উজ্জ্বলতা ও উজ্জ্বল রঙের ব্যাপ্তি দুইই বেড়েছে, বড় হয়েছে আয়তনেও। শুরুর দিকে রেখা আর পরিচিত-অপরিচিত রূপবন্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে শুধু বুনট আর রঙেরই ছবি। মূল পরিচয় ছাপচিত্রী হলেও পাশাপাশি চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমেও তাঁর বিচরণ সাবলীল। সেখানেও ছাপাই ছবির আঙ্গিক প্রভাবিত করেছে তাঁর রচনাকে।

নব্বইয়ের দশকের শিল্পীদের মধ্যে ছাপচিত্রে অদম্য তৎপরতা, নিয়ত পরিশ্রম আর ব্যতিক্রমী আঙ্গিকে সদা-উৎপাদনক্ষম হওয়ার মাধ্যমে এ দেশের শিল্পজগতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন শিল্পী রশীদ আমিন (১৯৬৬)। পরিবারে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা থাকলেও তাঁর শিল্পী হওয়ার ব্যাপারে মা-বাবার আপত্তি ছিল। শিল্পীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তাঁদের মন সায় দেয়নি প্রথমে। তবে তাঁরা মনে না নিলেও পরে মেনে নিয়েছিলেন সন্তানের সিদ্ধান্তকে। রশীদ আমিন প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছেন চীন ও বাংলাদেশে। পরে ছাপচিত্রে পিএইচ.ডি ডিগ্রিও নিয়েছেন চীন থেকে। চীনের বেইজিংই ছিল প্রথম দিকে তাঁর শিল্প সৃজনের কেন্দ্র। এ সময় চৈনিক শিল্পের করণকৌশলগত নানা দিক তাঁকে প্রভাবিত করেছে। এমনকি বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁকে প্রভাবিত করেছে চীনের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। তা ছাড়া আশির দশকজুড়ে বিশ্বব্যাপী সামরিক শাসন এবং মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনের চেতনাও তাঁকে প্রভাবিত করাটা খুব অসম্ভব নয়।

---

[৬২৪] Rabiul Husain, 'A pleasant visual world of Rafi Haque', ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

স্বপ্ন (১৯৯০), *কম্পোজিশন উইথ ক্রশ* (১৯৯০), *আর যুদ্ধ নয়* (১৯৯০), *কারাগারে মানুষ* (১৯৯০), *খাঁচা এবং মানুষ* (১৯৯২) ইত্যাদি লিথোচিত্রগুলো এ পর্বের উদাহরণ। *খাঁচা এবং মানুষ* সিরিজের ছবিগুলো চীনের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত। সিরিজের প্রায় প্রতিটি ছবিতেই খাঁচা অথবা পাখির বিপরীতে কয়েকজন মানুষকে খুব কাছাকাছি কিছু বলার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন তিনি। এখানে বৃদ্ধ চায়নিজদের খাঁচায় পাখি পোষার শখ এবং অবসরে, আড্ডায় তা বহন করার সামাজিক রীতির আড়ালে পরাক্রমশালী কম্যুনিস্ট সরকারের ভয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাহীন রুদ্ধশ্বাস অবস্থার প্রতীকী রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তিনি। কারাগারে মানুষগুলো গড়েছেন কালো জমিনে সাদা বহিঃরেখায় সহজ এবং সরলীকৃত রূপবন্ধে। গুহাচিত্রের আদলে উপস্থাপিত নির্যাতিতের ভঙ্গিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উপস্থাপন মনে করিয়ে দেয় কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটে তার প্রহর! প্রথম পর্বের এসব ছবিতে তিনি মানুষের স্বপ্ন, বিশ্বাস আর যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন সরাসরি, যা অনেকটাই একাডেমিক ও ব্যক্তিক সরলতার পর্যায়ভুক্ত।

তবে নব্বইয়ের দশকে স্বদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁর এই সরলতাকে আমূল বদলে দিল। প্রথম পর্বে প্রকাশবাদী ধারার প্রভাবের বদলে তাঁর চিত্রতল হয়ে গেল বিমূর্ত প্রকাশবাদী। সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গির বিপরীতে তা হয়ে উঠল অসরল ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রথম পর্বের সমাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংকটের পরিবর্তে প্রকৃতিই হয়ে উঠল তাঁর নিয়তি। কারণ সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমূল বদলে যাওয়া মানুষের নৈতিক ও মানবিক বোধ আর বৈষয়িক বিকারগ্রস্ততার বিপরীতে নিজের অস্তিত্বের সংকটকালে মানুষের চেয়ে প্রকৃতিকেই বড় বিশ্বস্ত মনে হলো তাঁর। তাই ধাতব পাতের ওপর সূক্ষ্ম ধাতব উপদানের তীব্র বিক্ষত আঁচড়ে নিজের নৈরাশ্য আর হতাশাকে রূপায়িত করেছেন তিনি প্রকৃতিকে বিষয় করে। শিল্পের সে অন্বেষায় সমাজ পরিপার্শ্বিকতার বিপরীতে এ যেন তাঁর আত্মানুসন্ধান।

প্রথম দিকে লিথোগ্রাফ করলেও পরবর্তীকালে এচিং, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট এবং ড্রাইপয়েন্টকে মাধ্যম হিসেবে বেশি ব্যবহার করেছেন। এ পর্বে রশীদ আমিন প্রকৃতি ও নিসর্গ দ্বারা স্পষ্টতই অনুপ্রাণিত। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি আমাদের পরিচিত ঘর, গাছ, নদী, পাহাড়, জঙ্গলের হুবহু উপস্থাপন নয়। বরং তা পরিচিত নিসর্গের অন্তর্গত বাস্তবতার কাব্যিক রূপায়ণ। প্রকৃতি মানুষের অবচেতন মনে রং-রেখার যে প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে, এ তারই গীতিময় প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> পৃথিবীর পথে চলতে চলতে আমরা যেন দু'চোখ ভরে সবকিছু দেখি – গাছ, মাটি, আকাশ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র। আমাদের নয়নের সম্মুখে যা কিছু ভেসে উঠে সবকিছুই। আর দেখতে দেখতেই যেন ভাবনার জগতে ডুবে যাই। পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যমালা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে একেবারে বায়োস্কোপের মতোই।

> মানুষ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র। আর পৃথিবীর সমস্ত রঙ ও রূপ দেখে আমরা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যাই। ভাবনায় আচ্ছন্ন হই। স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠি।[৬২৫]

তাঁর স্বপ্নের প্রকৃতি নির্মম বাস্তবে জারিত হয়ে তল পায় দ্রুত বিশৃঙ্খল রেখায়, এলোমেলো কৌণিক কাটাকুটিতে আর অমসৃণ মোটা জমাট কালো তলে। দৃশ্যমানতার সাথে হৃদয়ের আর্তি মিশিয়ে ধাতব পাতে কাটা আঁচড় বাস্তব হয়ে ওঠে অবচেতনের গীতল কাব্যরূপে। *ইন্সপায়ার্ড উইথ নেচার-১* (১৯৯৭), *ইমেজ-১২* (১৯৯৭), *কম্পোজিশন উইথ নেচার-১* (১৯৯৮), *কম্পোজিশন উইথ নেচার-২* (১৯৯৮), *কম্পোজিশন উইথ স্কাই* (১৯৯৮), *প্রিন্ট উইথ অরেঞ্জ অ্যান্ড গ্রিন* (১৯৯৯), *সাইলেন্স অ্যান্ড ক্যাওস-৩* (২০০১), *সাম ইমেজ ইন নেচার-৩* (২০০১) প্রভৃতি এ পর্বের উদাহরণ। এসব ছবির বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে আমাদের পরিচিত পরিপার্শ্ব, দূরদিগন্ত, আকাশ কিংবা প্রকৃতির বিপুল অয়োজন, কিন্তু কোথাও তার স্পষ্ট উপস্থিতি নেই (চিত্র ১৪০)। বরং প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের বিশ্লেষণী ব্যবচ্ছেদ না করে তা যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রং, রেখা আর মোটা তুলি সৃষ্ট বুনটের অভিঘাতে তুলে আনে বিষয়ের সারসত্তাকে। দৃশ্যজ বাস্তবতা হৃদয়ে উপলব্ধিজাত যে অনুভূতি বা বোধের জন্ম দেয়, যেন তার সঘন ছায়াই ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রতলে। অন্য কিছু নয়, শুধু রং-রেখা আর বুনটই সত্য এখানে। এ রং প্রকৃতির। প্রকৃতির সাথে তাঁর ক্যানভাসের রংও বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। রং প্রয়োগের জন্য কখনো শুধু এচিংয়ের রেখার শরণাপন্ন হয়েছেন, কোথাও অ্যাকোয়াটিন্টের আশ্রয় নিয়েছেন আবার কখনো বা মুক্তভাবে এসিডে তক্ষণ করিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপরিকল্পিতভাবে চিত্রতল নির্মাণের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক ফলাফলের ওপর বেশ খানিকটা নির্ভর করেছেন শিল্পী। ফলে হৃদয়ের তাৎক্ষণিক আবেগই প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে রং আর রেখার বুনুনিতে। ধাতব পাতে রঙের পর রং চড়িয়ে কাগজে ছাপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পভুবন, যাতে বাস্তবের পরিবর্তে বাস্তবতার ইশারাই বর্তমান। যেখানে দেখি আমাদের পরিচিত পৃথিবীর এক কাব্যিক নির্যাস, যা তাঁর শিল্পের আপাত বিশৃঙ্খলতা সরিয়ে বিশুদ্ধ এক সাংগীতিক মূর্ছনারও জন্ম দেয়।

পরবর্তীকালেও আমিনের চিত্রতল প্রতীচ্যের বিমূর্ততাকে আশ্রয় করে প্রাচ্যের প্রকৃতির পরিচিত রূপ, রূপবন্ধ আর রং নিয়ে মুক্তিলাভ করেছে। তবে এচিংয়ের রেখা অথবা ড্রাইপয়েন্টের বিক্ষত আঁচড় কখনো কখনো রূপ নিয়েছে পরিচিত পদ্ম অথবা বৃক্ষরাজির। কিংবা একেবারে তলানিতে এসে কোনো-না কোনো মনুষ্য-অবয়বে। সংবেদনশীল আনুভূমিক এবং উলম্ব রেখার কাটাকুটির সাথে স্বল্প রঙে নির্মিত *ট্রি ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ড্রিম স্টেয়ার-১* (২০০৭), *ট্রি অ্যান্ড ফ্লাওয়ার* (২০০৭), *ড্রাই পয়েন্ট-১* (২০০৭), *ড্রাই পয়েন্ট-২* (২০০৭), *ড্রাই পয়েন্ট-৩* (২০০৭), *স্প্রিং-১* (২০০৭), *স্প্রিং-২* (২০০৭), *ব্লু মুন* (২০০৯), *নেচার অ্যান্ড হিউম্যান* (২০০৯), *ইয়োলো কার্টায়ার্ড* (২০০৯), *ফ্লাইং ম্যান*

---

[৬২৫] রশীদ আমিন, 'কে পারে মনে অতল গহীন ছুঁতে কে পারে আপনারে চিনিতে .....', ২০১০ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত, পৃ ৩৩

(২০০৯), *উওম্যান অ্যান্ড দ্য গার্ডেন* (২০০৯), *ম্যান অ্যান্ড নেচার* (২০০৯), *গ্রিন ভ্যালি* (২০০৯), *ক্লাউডস-২* (২০০৯), *ক্লাউডস-৩* (২০০৯), *কান্ট্রি অব গ্রিন ক্লাউডস-১* (২০০৯), *কান্ট্রি অব গ্রিন ক্লাউডস-২* (২০০৯) ইত্যাদি তাঁর এ পর্বের উদাহরণ।

ট্রি ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ড্রিম স্টেয়ার-১, *ট্রি অ্যান্ড ফ্লাওয়ার*, *ড্রাইপয়েন্ট-১*, *ড্রাইপয়েন্ট-২*, *ড্রাইপয়েন্ট-৩*, *স্প্রিং-১* (চিত্র ১৪১), *স্প্রিং-২* প্রভৃতি শিল্পকর্মসমূহে রেখার বলিষ্ঠতা আর স্বতঃস্ফূর্ততায় নির্মাণ কাব্যিক রূপ লাভ করেছে। এলোমেলো রেখার আঁচড়ে ফুটে উঠেছে আধফোটা পদ্মকুঁড়ি, পাতা, লতা, ঘাস কিংবা জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশের নিষ্কলুষ আভা। আর লালচে এবং সোনালি হলুদ তাতে ঢেলে দিয়েছে বসন্তের অম্লান রূপ। এখানেও ক্ষিপ্র রেখায় গড়েছেন তল। রং ব্যবহারেও বর্তমান স্বতঃস্ফূর্ততা। যেন নিরন্তর রেখা আর রঙের যুদ্ধে অবতীর্ণ তিনি অভীষ্টের সন্ধানে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অথবা অংশে নয়, অভীষ্টের সন্ধান করেছেন সমগ্র তলে। ফলে দর্শককেও তাঁর সাথে সাথে ঘুরে আসতে হয় সমগ্র চিত্রতল। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন শিল্পী নিসার হোসেন–

> আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য মনে যে বোধ ও আচরণগুলো অবদমিত থাকে তা যে আগ্নেয়গিরির লাভার মতোই সুনির্দিষ্ট রূপ না নিয়েও নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম সে বিষয়টি আমিনের ছবি দেখে খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি।
>
> আমিনের আঁকা বড় পরিসরের কাজগুলোতে কবজির মোচড়ের তুলনায় বাহুর সঞ্চালন বেশী ঘটায় মানুষের চেতন ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে autonomic nervous system, তার আওতাভুক্ত শারীরিক স্পন্দন ও তরঙ্গ গুলোও যেন স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে কৃত্রিম বাগানের মতো পরিপাটি ছবির ভিড়ে আমিনের এই ছবিগুলো প্রাণস্পন্দনপূর্ণ এক নিষ্কলুষ প্রাকৃতিক আবহ সৃষ্টি করে।[৬২৬]

আবার চিত্রপটের ঊর্ধ্বাংশে নীল এক বর্ণচ্ছোপ সার্থকতা জানান দিচ্ছে *ব্লু মুনের*। নিচে শিশু-সরলতায় হাত বাড়িয়ে লিঙ্গনির্বিশেষ এক মনুষ্য-অবয়বের উপস্থিতি, যা একইসঙ্গে একধরনের অনিশ্চিত নাটকীয়তারও জন্ম দেয়। একই ধরনের পরিসর-বিন্যাস ও অনিশ্চিতি লক্ষণীয় *উওম্যান অ্যান্ড দ্য গার্ডেন* এবং *ম্যান অ্যান্ড নেচার* শিল্পকর্ম দুটিতেও। তবে দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে তাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্ম যাতে মনুষ্য-অবয়বের দৃশ্যমানতা তৈরি করেছেন, তা তলের সামগ্রিক আবহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। যেমন *নেচার অ্যান্ড হিউম্যান*, *ইয়োলো কার্টায়ার্ড*। এখানেও বুনট আর রঙের পর্দায় অবয়ব ও অন্য উপাদানগুলো অস্পষ্টতা নিয়ে মিশে আছে। আবার *ক্লাউডস-২*, *ক্লাউডস-৩*, *কান্ট্রি অব গ্রিন ক্লাউডস-১*, *কান্ট্রি অব গ্রিন ক্লাউডস-২* প্রভৃতি শিল্পকর্মে দিগন্তরেখা নির্দেশ করেননি শিল্পী। কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা রেখায় ব্যবহার করেছেন জৈবিক কোনো রূপবন্ধ। আকাশ, মেঘ বা প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের নির্যাস নিয়ে শুধু সম্মুখের স্তর নির্দিষ্ট হওয়া আর অনির্দেশ্য দিগন্তের কারণে

---

[৬২৬] নিসার হোসেন, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত, পৃ ১৫

এর বিস্তার অসামান্য রূপলাভ করেছে। এ দেশের মাটি, প্রকৃতি তার রং প্রভৃতির সাথে চীনের নিসর্গ, ভূ-প্রকৃতিও তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। কারণ তাঁর চিত্রতলে সমতল দিগন্তরেখার নির্দেশ প্রায়ই দেখা যায় না। যেমন চিত্রতল গড়নে খানিকটা প্রভাব দৃশ্যমান কান্দিনেস্কিরও। করণকৌশলের ক্ষেত্রে থেকেছেন পূর্বের ধারানুবর্তী। তবে পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে দ্বিতীয়বার চীন প্রবাসকালে তাঁর করণকৌশলের প্রয়োগ আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁকে পূর্বের মতো প্রভাবিত করেছে প্রকৃতি। ভাঙা ভাঙা অমসৃণ কিন্তু অর্থবোধক রেখায় নির্দেশ করেছেন বিষয়ের। পূর্বের পদ্মকুঁড়ির মতো সুডৌল আকৃতি তলে উঁকি দিচ্ছে। কখনো বা মোটা অমসৃণ কালো রেখাকে অবলম্বন করে দেয়াল ঘেঁষে উঠে যাচ্ছে কচুপাতা, একেবারে ওপর পর্যন্ত। কোথাও আবার নীল মেঘের বিস্তৃতি, দিগন্তে অস্তগামী সূর্য, লতাগুল্ম-সদৃশ রূপবন্ধ অপরিপাটি প্রকৃতির সবটুকু উচ্ছ্বাস নিয়ে যেন উপস্থিত চিত্রতলে। এ পর্বের কাজেও বাংলাদেশের রং-রূপ, তার অর্ন্তগত সৌন্দর্য তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> শিল্পের স্বদেশ বিদেশ বলে কিছু আছে কিনা জানিনা, তবে বিদেশে বসে দেশকেই যেন বেশী অনুভব করি, মগজে সব সময় খেলা করে স্বদেশ। দেশের রং ও রূপ, নীল আকাশ, হলুদ উঠোন, সবুজ প্রান্তর, মেঘদল আর আলো আঁধারের নানারূপ খেলা। এ সবই যেন অবচেতনে বার বার এসে ভীড় করে। তাই সুদুর বেইজিং এ বসে যখন ছবি আঁকি তখন ক্যানভাসে কাগজে এচিংয়ের ছাপে যা উঠে আসে তা যেন হৃদয় নিংড়ানো আমার দেশেরই রঙ, আমারই দেশেরই ছায়া।[৬৭৭]

প্রবাসে থাকলেও তাঁর সত্তাজুড়ে দেশের সরব উপস্থিতি। চৈনিক শিল্পের নানা কৌশল তাঁকে প্রভাবিত করলেও বাংলাদেশের রং, এর প্রকৃতির অবিন্যস্ততা কখনো তাঁর মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে যায়নি।

রশীদ আমিন বিমূর্ত পথের যাত্রী হলেও এ দেশের অধিকাংশ বিমূর্তবাদীদের থেকে তাঁর পথ ভিন্ন। আমাদের বিমূর্ত শিল্পে যে সুন্দর সাজানো-গোছানো উপকরণের সমাবেশ, যে পরিপাট্য লক্ষ করা যায়, রশীদ আমিনের বিমূর্ততায় সে ব্যাপারটা অনুপস্থিত। বিমূর্ততা মানে বেসিক ডিজাইনের সূত্র মতে নানা রং কিংবা জ্যামিতিক আকৃতির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একধরনের দৃষ্টিনন্দন তল নির্মাণের প্রচেষ্টাও এর মধ্যে অনুপস্থিত। স্পষ্ট জ্যামিতিকতা-মুক্ত তাঁর চিত্রতল। অর্থাৎ তাঁর ছবির উপকরণ কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার বা ছকে আবদ্ধ নয়। একধরনের বিশৃঙ্খলতা, অবিন্যস্ততা কিংবা তথাকথিত সৌন্দর্যহীনতাই তাঁর ছবির প্রাণ, শক্তি। সাধারণের সহজবোধ্য সাদৃশ্যধর্মী নির্মাণ যেন তাঁর কাম্য নয়; বরং প্রকৃত রসিক জনের আস্বাদনের জন্যই হয়তো তাঁর নির্মাণ। এক দশক পূর্বের ছবির সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বের অনুষঙ্গগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ্য হয়েছে তাঁর ছবিতে। রং

---

[৬৭৭] রশীদ আমিন, 'কে পারে মনে অতল গহীন ছুঁতে কে পারে আপনারে চিনিতে...', ২০১০ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত, পৃ ৩৩

ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও জলরঙের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বচ্ছতাও পরিলক্ষিত হয়। এই বর্ণ প্রয়োগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁর ছবির ক্ষেত্রে। স্তরের পর স্তর রং ব্যবহার করে তিনি গড়ে তোলেন চিত্রতল। সেখানে রেখা আর নিচের তলের সাথে উপরিতলের রং মিশে তৈরি হয় ঠাস বুনট। আবার উজ্জ্বল ও উষ্ণ রঙের তলে মোটা-কালো রেখা বা জমাট কালো পরিসর একধরনের রহস্যময়তা নিয়েও হাজির হয়, যা আবেগ আর বিষয়কে একত্র করে গড়ে তোলে কাব্যিক দৃশ্যময়তা। পরিশীলিত ও ন্যূনতম বর্ণের প্রয়োগও তাঁর ছবিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

শিল্পী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (১৯৬৬) ছাপচিত্র মাধ্যমকে প্রধান হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে চবির চারুকলা বিভাগ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে শিল্পের বৃহৎ জগতে পদচারণা শুরু করলেও শিল্পরসিকজনের নজরে আসেন নব্বইয়ের শেষ লগ্নে। কাজ করেছেন এচিং, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট, কলোগ্রাফ, ডিজিটাল প্রিন্ট, লিথোগ্রাফসহ ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে।

প্রথম দিকে বিষয়ের অর্ধ-বিমূর্ত উপস্থাপনে চিত্রতল গড়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *বাংলাদেশ-'৭১(?)* এর কথা। বাঙালির গৌরবের অর্জন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন এ শিল্পকর্মে। *ক্রিয়েটর* (১৯৯২)-এ একজন শিল্পীর স্টুডিওর অভ্যন্তরভাগ নির্মাণ করেছেন। এলোমেলো ও স্বতঃস্ফূর্ত রেখায় নির্মিত ছবিতে শিল্পী কখনো চিত্রপটের সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট ক্লান্ত ও চিন্তামগ্ন। আবার কখনো পেছনের ইজেলে দাঁড় করানো ক্যানভাসে কর্মরত। সমগ্র ছবিটিতে আলোছায়ার নিয়মবদ্ধ উপস্থিতির স্পষ্ট অভাব থাকলেও কিছুটা ওপর থেকে দেখা ছবিটির পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের ক্ষেত্রে খানিকটা ত্রিমাত্রিকতার অবভাস রয়েছে। শিক্ষক শিল্পী মনসুরউল করিমের প্রভাব স্পষ্টত দৃশ্যমান কাজটিতে। আর মিথ্যাবাদী রাখালের প্রচলিত গল্পের আড়ালে পুরুষের প্রেম, যৌনতা, হিংস্রতা আর প্রতারণার প্রতীকী চিত্রায়ণ হলো *দ্য লায়ার কাউবয় অ্যান্ড দ্য টাইগার* (১৯৯৩) ছবিটি। এখানে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলের পুরোটা জুড়ে শিশ্ন ও থাবা উঁচিয়ে এক বাঘ এবং তার পেটজুড়ে জান্তব পুরুষরূপী রাখালের উপস্থিতির মাধ্যমে পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন শিল্পী। হিংস্র পশুর উঁচিয়ে থাকা শিশ্ন আর থাবার সামনে নগ্ন এক আবক্ষ নারীর ভয়ার্ত উপস্থিতির সাথে প্রেক্ষাপটজুড়ে বিস্তৃত উচ্চাবচ বুনট এবং অন্ধকারের সাথে লাল ও হলুদ রঙের আভা ছবির সামগ্রিক আবহকে ভীতিকর ও যথার্থ করে তুলেছে।

পরবর্তীতেও নানারকম প্রতীক বা চিহ্নের ব্যবহারে বিমূর্ত রেখেছেন পরিসরকে। বিমূর্ত আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির এক একটি বিশেষ রূপ। জ্যামিতিক নানা আকৃতির সাথে জৈব-অজৈব নানা রূপবন্ধের সম্মিলনে গড়েছেন চিত্রজমিন (চিত্র ১৪২)। সেখানে আকার কখনো স্বাধীন, আবার কখনো অন্য একটি আকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় বিষয়ের সবিশেষ প্রকাশ ঘটিয়েছে। *ট্রপিক্যাল গার্ডেন* (১৯৯৩, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯) সিরিজের ছয়টি এবং *ট্রপিক্যাল মুন* (১৯৯৮)-এ

পর্বের উদাহরণ। ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত, সরল ও বক্র রেখার সাথে মাছ ও জলের মতো জৈব রূপবন্ধ এবং গুণ ও ভাগের মতো গাণিতিক চিহ্নের ব্যবহার করে শিল্পী নির্মাণ করেছেন বিষয়ের দৃষ্টিসুখকর বিন্যাস। কোথাও কোথাও আবার যোগ করেছেন কাটাকুটি। স্বল্প পরিসরে লালের মতো উষ্ণ রঙের ব্যবহার থাকলেও শান্ত, স্নিগ্ধ, অনুচ্চকিত অথচ দৃষ্টিবান্ধব নীল কিংবা নীলচে সবুজের মতো শীতল রঙের আধিক্য লক্ষণীয় এ পর্বের অধিকাংশ কজেই। ফলে উষ্ণমণ্ডলীয় প্রাচুর্যের পরিবর্তে একধরনের শূন্যতা বা অতীত প্রাচুর্যতার ব্যঞ্জনাই যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে এতে। তবে এ ছবিগুলোর গঠন, পরিসর-বিভাজন, উপাদানের সংশ্লেষ খানিকটা একই রকম এবং জ্যামিতিক কাঠামোয় আবদ্ধ হলেও এটি শিল্পী জসীম উদ্দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি পর্যায়ও।

এরপর *অ্যানানসিয়েশন* (২০০০), *মেটারনিটি* (২000), *ম্যাডোনা* (২০০০) প্রভৃতি শিল্পকর্মের মাধ্যমে তিনি আবার ফিরেছেন অবয়বধর্মিতায়। নারীর সম্পর্ক, সন্তান ধারণ এবং বাৎসল্যই এ পর্বের বিষয়বস্তু হয়েছে।[৬২৮] অ্যানানসিয়েশনে (চিত্র ১৪৩) দুজন দেবদূতের উপস্থিতিতে মস্তকবিহীন দুটি নর-নারীকে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। একজন দেবদূত পতনোন্মুখ, যেন বিশেষ কারো আগমনবার্তা ঘোষণা করছে তারা। *মেটারনিটি*তে নারীর গর্ভকালীন অবস্থা এবং *ম্যাডোনা*য় মৃত সন্তানকে আবেগপূর্ণ আলিঙ্গনরত মায়ের উপস্থিতি দেখা যায়। ড্রইংয়েও যোগ হয়েছে সারল্য। এ কাজগুলোতে শিল্পী একটু ভিন্নধর্মী করণকৌশল ব্যবহার করেছেন। বড় তুলির সাহায্যে প্লাস্টিক তলের ওপর চেতনানাশক (ক্লোরোফর্ম) ব্যবহার করে অর্থাৎ স্পিট বাইটিংয়ের মতো করে এচিং সম্পন্ন করেছেন, যা তাঁর মাধ্যমগত নিরীক্ষার দক্ষতাকে স্পষ্ট করে। বর্তমানে ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমসহ রেখাচিত্র ও চিত্রকলার নানা মাধ্যমেও তিনি শিল্প নির্মাণ অব্যাহত রেখেছেন।

নব্বইয়ের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে আরেকজন হলেন শিল্পী আবদুস সোবহান হীরা (১৯৭০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিউটে ছাপচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুবাদে কাজ করেছেন কাঠ খোদাই, ড্রাইপয়েন্ট, লিথোগ্রাফ, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, মনোপ্রিন্ট ইত্যাদি মাধ্যমে। বাস্তব জীবনের নানা অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সৃজনশীল মানুষদের সৃষ্টি পরিমণ্ডল। শিল্পী হীরার সৃষ্টি-জগৎও এর বাইরে নয়। তাঁর সৃষ্টিপর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করে আছে সময় এবং তা পরিমাপক নানা অনুষঙ্গ। বস্তুত নব্বইয়ের দশকে অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষাঙ্গনও অস্থির হয়ে পড়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর্ব শেষ করতে লেগে যায় দীর্ঘ সময়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী আবদুস সোবাহান সময় ও জীবনকে এভাবে হত্যা না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন *সময়* শীর্ষক ধারাবাহিক চিত্রগুচ্ছতে। সময়ের প্রতিরূপ বোঝাতে ঘড়ি এবং তার সাথে পাল্লা দিতে ছুটন্ত মানুষের রূপবন্ধ এসেছে এতে। সাথে এসেছে সিঁড়ি, ত্রিভুজ, দিকনির্দেশক রেখা প্রভৃতি। উপকরণ ও বিষয়ের

[৬২৮] প্রখ্যাত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য এ পর্বের কাজে তাঁর অনুপ্রেরণা। যদিও এতে আংশিকভাবে শিল্পী রোকেয়া সুলতানার *ম্যাডোনা*র প্রভাবও দৃশ্যমান

এ ধরনের বিন্যাস লক্ষ করা যায় *সময়-১* (১৯৯৪), *সময়-২* (১৯৯৪), *সময়-৩* (১৯৯৪), *সময়-৪* (১৯৯৪) ইত্যাদিতেও। তবে এ সময়ের ছবিতে রেখাচিত্র, পরিসর বিভাজন এবং উপস্থাপনভঙ্গিতে কিছুটা অপটুত্ব থাকলেও কিছুকাল পরে করা *জীবন ও সময়ের রূপকল্প* শীর্ষক ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টিতে (চিত্র ১৪৪) তাঁর উত্তরণ আরও স্পষ্ট হয়। এটাই তাঁর সর্বোচ্চ সৃষ্টি-পর্যায়। *সময়ের রূপকল্প-১* (১৯৯৫), *সময়ের রূপকল্প-৭* (১৯৯৫), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-৯* (১৯৯৭), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-১* (১৯৯৯), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-১৪* (১৯৯৮), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-১৫* (১৯৯৮), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-১৬* (১৯৯৮), *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-৩* (১৯৯৯) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

এসব ছবিতে হাত, মনুষ্য-অবয়ব, ত্রিভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, রেখা, পাতা ইত্যাদি রূপবন্ধ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। অবিশ্রান্ত বুনট, রেখা, চিহ্ন, বিভিন্ন প্রতীক আর রূপবন্ধের উপর্যুপরি ব্যবহারে তাঁর চিত্রতল ক্লান্তিকর ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে কখনো কখনো। আবার এ পর্বের কোনো কোনো কাজে শিল্পী মনিরুল ইসলাম এবং শিল্পী রোকেয়া সুলতানার প্রভাবও স্পষ্ট। তাঁর এ কাজ সম্পর্কে শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

> আবদুস সোবাহান হীরার কাজের দিকে তাকালে একজন শিল্পরসিকের প্রথমে মনে হবে একটি সৃজনশীল মন যেন কোন গ্রহের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং স্বভাবতই তাই তার নিজস্ব একটা কক্ষ পথও আছে। আমাদের চোখ চেনা মানুষী রূপ ও জ্যামিতিক গড়ন আক্রান্ত করেছে হীরার মন। ওই দুই রূপের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। মানুষ জ্যামিতির অরণ্যে হারিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেও তাকে আর আলাদা ভাবে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। অথবা মানুষও তো জ্যামিতি কিংবা ভাসমান কোন গ্রহ মহাকালের আকাশে। নানামুখি জ্যামিতিকীকরণ, নগ্ন রেখার মানুষী দেহ, টেক্সচার এসব মিলিয়ে একটা অপরিচিত ভুবন তৈরি হয়েছে। কখনো মনে হয় ওইসব উপাদান যেন আমাদের কল্পনার কোন গ্রহের কথা বলছে। হীরার ছবির মানুষের মুখেও চেনা পৃথিবীর চিহ্ন নেই। আর মানুষগুলো ওই জ্যামিতির মাধ্যে পড়ে আরও অচেনা হয়ে পড়েছে।[৬২৯]

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাবলি ও তার প্রতিক্রিয়াই মূলত হীরার ছবির মূল উপজীব্য। সেখানে দৃশ্যজ বাস্তবতার হুবহু উপস্থাপন তাঁর লক্ষ নয়। তিনি রূপায়ণ করতে চান বিভিন্ন বাধা বা জ্যামিতিক বলয়ে আবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিক অনুভূতি, সময় যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। তিনি সবসময় মনে করিয়ে দিতে চান, কর্মমুখরতাই জীবন; অন্যথায় তা মৃত্যুর সমতুল্য। কারণ জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর এ সত্যের মুখোমুখি হয়ে, রং-রেখা আর বুনটের ঠাস বুনুনিতে তাঁর ছবি হতাশার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকগত দিকে থেকেছেন অর্ধ-বিমূর্তরীতির অনুসারী। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শান্ত ও কোমল রং-ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে *সময়ের রূপকল্প* শিরোনামের

---

[৬২৯] মইনুদ্দীন খালেদ, 'নিঃসঙ্গতার জ্যামিতি', ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত *ইমেজ অব লাইফ অ্যান্ড টাইম* শীর্ষক একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

আরও একটি ধারাবাহিক চিত্রসমষ্টি রচনা করেছেন। এতে মূল উপজীব্য হয়ে এসেছে শ্যাওলাধরা পুরনো দেয়াল এবং তার বুকে কচি হাতে আঁকিবুঁকি করা বিভন্ন দৃশ্যচিত্র, যা মুর্তজা বশীরের তেলরঙে করা *দেয়াল* সিরিজের কথা মনে করিয়ে দেয় অবশ্যম্ভাবীভাবে। মুর্তজা বশীরের মতো হীরার দেয়ালও কোনো-না কোনো বাস্তব দেয়ালের হুবহু উপস্থাপন-প্রবণতা এগুলোর প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থিত থাকলেও একধরনের বিশুদ্ধ বিমূর্ত আবহও যেন বিদ্যমান এতে। তবে সে বিমূর্তায়ন খুব সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে, এমন দাবি করা যৌক্তিক হবে না। *সময়ের রূপকল্প-১২* (২০০৮), *সময়ের রূপকল্প-১৩* (২০০৮), *সময়ের রূপকল্প-১৪* (২০০৭), *সময়ের রূপকল্প-১৫* (২০০৭), *সময়ের রূপকল্প-১৬* (২০০৭), *সময়ের রূপকল্প-১৭* (২০০৭), *সময়ের রূপকল্প-১৮* (২০০৮), *সময়ের রূপকল্প-১৯* (২০১৫) ইত্যাদি এ পর্বের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

এই চিত্রসমষ্টিতে কখনো শ্যাওলাধরা দেয়ালের পলেস্তরা খসে বেরিয়ে এসেছে লাল ইট। কোথাও বা ময়লা দেয়ালে শিশুচিত্রের আদলে রৈখিক গড়নের মানুষের উপস্থিতি। এ ছাড়া তাতে শিশু-সরলতায় এঁকেছেন শিশু, নৌকা, ঘুড়ি, লাটাই, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। আবার কোথাও যোগ করেছেন লেখা যেমন 'মই মার্কায় ভোট দিন' অথবা 'বাংলাদেশ' ইত্যাদি (চিত্র ১৪৫) যেমনটা অলিগলির দেয়ালে সচরাচর দেখা যায়। এখানেও শীতল ও মলিন রং-ঘনিষ্ঠ থেকেছেন তিনি। পুরনো দেয়ালের ক্ষয়ে যাওয়া বুনট আর জমাট ধরা শ্যাওলার নির্মিতিতে রেজিন দানার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। বর্তমানেও তিনি অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ছাপাই ছবির বিভন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করছেন।

শিল্পী আবদুস সালামও (১৯৭১) নব্বইয়ের দশকের তরুণ ছাপচিত্রীদের অন্যতম। চিত্রকলা, স্থাপনা শিল্প, ভাস্কর্য– সকল মাধ্যমেই তাঁর সাবলীল পদচারণা থাকলেও তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি একজন নিরীক্ষাপ্রবণ ছাপচিত্রী হিসেবে। এ মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে। শুরু থেকেই একাডেমিক বাধ্যবাধকতার সীমাকে অস্বীকার করেছেন সাহসী এবং ব্যতিক্রমী সব নিরীক্ষায়। ছাপাই ছবির অনান্য মাধ্যম যেমন– কাঠ খোদাই, এচিং, লিথোগ্রাফ ইত্যাদিতে কিছু কাজ করলেও তিনি মূলত ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন প্রথম পর্বে। এ সময় তিনি নির্মাণ করেছেন *রিজেকশন* বা *পরিত্যক্ত* (১৯৯৬-২০০৩) শিরোনামের ধারাবাহিক এক চিত্রসমষ্টি, যা ব্যতিক্রমী প্রকাশ ধারার শিল্পী হিসেবে তাঁকে শিল্পরসিকদের আস্থাভাজন করে তোলে। বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন চারপাশে পরিত্যক্ত অত্যন্ত সাধারণ সব উপকরণ।

চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ কোনো-না-কোনোভাবে প্রায় প্রতিটি শিল্পীর মানসলোককে প্রভাবিত করে থাকে। শিল্পীরা সেই অনুভূতির প্রকাশ করেন তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। তবে পরিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যক্তিভেদে যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি ব্যক্তিভেদে শিল্পীদের আবেগ বা

মত প্রকাশের ধরনটাও হয় ভিন্ন। ভিন্ন তাঁদের অবলোকন, গ্রহণ, এমনকি বর্জনও। এভাবেই একই পরিপার্শ্ব থেকে আহরিত বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর অনুভূতিতে জারিত হয়ে ভিন্ন প্রকাশরূপ লাভ করে বা স্বকীয়তা অর্জন করে। শিল্পী আবদুস সালামও ব্যতিক্রম নয় এর। গণতন্ত্রের নামে নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, পরমত অসহিষ্ণুতা, লাগামহীন দুর্নীতি ইত্যাদি তাঁর শিল্প সৃষ্টির প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অবলোকন ও গ্রহণ-বর্জনের খেলায় সাধারণের কাছে পরিত্যক্ত বুট জুতো, কোমল পানীয়ের মোড়ক, ছেঁড়া ব্যাগ, পড়ে থাকা মোচড়ানো ধাতব টুকরো ইত্যাদি লাভ করেছে শিল্পিত ব্যঞ্জনা। এই ছেঁড়া বুট জুতো এসেছে সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতন কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণের প্রতীক হিসেবে। সাদা পরিসরে এককভাবে এর উপস্থিতি জান্তব। আবার কোমল পানীয়ের পরিত্যক্ত মোড়ক এসেছে জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। ধাতব পাতের প্রান্তে সংযুক্ত কবজা সম্পর্কের প্রতীক। যেমন কবজা দ্বারা দুটি ভিন্ন ধাতব খণ্ডকে সংযুক্ত করেছেন *পরিত্যক্ত-১ (১৯৯৮)*-এ (চিত্র ১৪৬)। এখানে দুটি পাতের সাথে সম্পর্কিত দুটি কবজা থাকলেও তা কোনো স্ক্রু দিয়ে আটকানো নয়। যা আপাত সুন্দর সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতাকে নির্দেশ করে। একটি কবজা ও একটি খিল দিয়ে তিনটি ক্ষয়িষ্ণু ধাতব আকৃতিকে সংযুক্ত করেছেন *পরিত্যক্ত-২* (১৯৯৯)-তে। মরিচাধরা এই তিনটি আকৃতি দূষিত আকাশ-বাতাস এবং মাটির প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন তিনি। *পরিত্যক্ত-৪* (২০০০) রাষ্ট্রের উন্নয়নের সমসাময়িক চালচিত্র যেন (চিত্র ১৪৭)। অসমাপ্ত কোনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন-পরিকল্পনার ক্ষয়িষ্ণু ভৌতিক কাঠামো যেন দাঁড়িয়ে আছে মাটি ফুঁড়ে। শিল্পী বাম দিকে উল্টো করে লিখে দিয়েছেন *বাংলাদেশ*। অজস্র রেখা আর মলিন রঙের আভায় তা সমগ্র বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রতীকী রূপায়ণ হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে আবদুস সালামের প্রকাশভঙ্গি বিমূর্ত প্রকাশবাদী ঘরানার হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর চিত্রতল নির্বস্তুক নয়। পরিচিত আকার-আকৃতি কিংবা চিহ্নের মধ্যে চেনা কোনো রূপবন্ধ, বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনো সংখ্যা বা লেখা ইত্যাদিও যুক্ত করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় *পরিত্যক্ত-১০* (২০০২) ছাপচিত্রটির কথা। এ সমস্ত ছাপচিত্র সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য হলো–

> আমাদের বর্তমান সময় এক অবক্ষয় অসহিষ্ণু জংধরা সমাজে পরিণত হচ্ছে যেখানে মানুষের মন রুচি, কার্যকলাপ স্থবিরতায় পর্যবসিত, রাজনৈতিক পটভূমি নৈরাজ্যকর, অধঃপতনের শেষ সীমায় আমাদের নৈতিক অবস্থান, ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরার লজ্জাজনক অভিপ্রায় আমাদের রাষ্ট্রজীবন, প্রতি নিয়ত মিথ্যার উপর অধিষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক জীবন, আদর্শ পুরুষরা নির্বাসিত হয় মনন থেকে। সামাজিক, সংস্কৃতি ভেঙ্গে চুরে গড়ে উঠছে এক যান্ত্রিক অবকাঠামো। একান্নবর্তী পরিবারগুলো স্বার্থপরতায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে গড়ে উঠছে এক মেকী সম্পর্ক যা দৃশ্যমান সৌন্দর্য। কিন্তু অন্তঃনির্হীত অন্ধকারে সম্পর্ক গুলো অসাবধানতায় খসে পড়ে চারদিকে শুধুই ভাঙ্গা গড়ার এক নগ্ন খেলা, ক্রমাগত চলমান স্রোতে পড়ে থাকে কিছু পরিত্যক্ত কাঠামো যা আমাকে আহত করে উজ্জিবিত করে উৎসাহিত করে সৃষ্টির বিষয়

> হিসেবে। এই অবলোকন ও অনুধাবন থেকেই আমার এই সিরিজের ছাপাইগুলো যা আমার অন্তরের ভাষা বেদনা ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশের একমাত্র ভাষা।[৬৩০]

বলা যায়, আবদুস সালামের এসব ছবি প্রধানত একটি জীর্ণ অবকাঠামো কিংবা ক্ষয়িষ্ণু আকৃতির উপস্থাপন, যা তৎকালীন সমাজ-রাজনীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ছবি। অধিকাংশ কাজে তিনি দুই বা ততোধিক বিভাজিত আকার বা আকৃতিকে সমন্বয় করেছেন। আর সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন সিটকিনি, হুক, শিকল ইত্যাদি। কিন্তু এসব সংযুক্তির জন্য কোনো স্ক্রু ব্যবহার না করে তাকে আলগা রেখেছেন, যা সামগ্রিক সম্পর্কের অস্থায়িত্বকে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে তিনি ভেঙেছেন ছবির গতানুগতিক চৌকোনাকৃতিও। রঙের ব্যবহারে থেকেছেন স্বল্প এবং মলিন রং-ঘনিষ্ঠ। নষ্ট সময় এবং তার অভিঘাত বোঝাতে সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেছেন উজ্জ্বল রঙের আভা। তাঁর করণকৌশলও কিছুটা ব্যতিক্রমী। ছাপচিত্র নির্মাণের জন্য অন্য সবার মতো তিনি সমতল ধাতব পাতের ব্যবহার এড়িয়ে চলেছেন। পরিবর্তে ব্যবহৃত পাতকে প্রথমে দুমড়ে নিয়ে পরে সোজা করে তা থেকে কেটে নিয়েছেন ইপ্সিত আকৃতি। ফলে এর প্রভাব খুব সহজেই পরিত্যক্ত আবহ দান করেছে। আবার এলোমেলো রেখার নির্মিতির জন্য বহুলব্যবহৃত সুঁই-জাতীয় উপকরণের সাথে শিরীষ কাগজ, হ্যাক্সো ব্লেড, নুড়ি-পাথর ইত্যাদিও ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু কেবল নানাবিধ অপ্রচলিত উপকরণ ব্যবহার করে ছাঁচ নির্মাণ আর তা থেকে ছাপ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেননি আবদুস সালাম। তাঁর সতত গহনসন্ধানী মন নিরন্তর নিরীক্ষায় নিমগ্ন থেকেছে নতুনত্বের সন্ধানে। শুধু সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাটকীয় পরিসর তৈরি নয়, বরং জাগতিক নাটকীয়তায় সৃষ্ট পরিসরের সন্ধান এবং তা থেকে ছাপ নেওয়ার ব্যতিক্রমী কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। অবশেষে তাঁর চেষ্টার সিদ্ধিলাভ হয় বর্তমান শতকের শূন্য দশকের প্রথমার্ধেই। এ সময় তিনি ‘সারফেস প্রিন্ট’ শিরোনামের এক বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। এ পদ্ধতিতে একই পরিসরের সকল গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখে একাধিক ছাপ নেওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো, এতে শিল্পীকে সরাসরি ছাঁচ তৈরি করতে হয় না। তবে পূর্বে মনুষ্য-নির্মিত অথবা প্রকৃতিসৃষ্ট কোনো স্বল্প বা বিরাট পরিসরের কোনো নির্দিষ্ট অংশ হতে ছাপ নেওয়া হবে, তা শিল্পীকেই পছন্দ করতে হয়। তারপর নির্ধারিত অংশ থেকে কিছুটা ‘চায়নিজ রাবিং’ পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যধর্মী রীতিতে (কখনো কখনো প্রচলিত রিলিফ পদ্ধতিতেও) ছাপ তোলা হয়। মাত্র কয়েক দিন আগেও এ পদ্ধতিতে একমাত্র আবদুস সালামই ছাপচিত্র নির্মাণ করছিলেন। বর্তমানে পাশ্চাত্যের কিছু উৎসাহী তরুণও মাধ্যমটির চর্চা শুরু করেছেন।

---

[৬৩০] মোহাম্মদ অবদুস সালাম, *ছাপচিত্র (সমকালিনতা, আমাদের উত্তরণ) ও আমার শিল্প ভাবনা*, অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৪২

শিল্পী আবদুস সালাম এই পদ্ধতিতে দেশে এবং বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার স্থান ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা, পরিসর কিংবা বস্তুর ছাপ গ্রহণ করেছেন। যেমন: ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের অমর একুশের গ্রন্থমেলা চলাকালে বাংলা একাডেমির উল্টো দিকের ফুটপাতে উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হন কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)। সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনার অকুস্থলের কয়েকটি টাইলের ছাপ এই সারফেস প্রিন্ট পদ্ধতিতে নিয়ে তৈরি করেছেন ছাপাই ছবি *হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)*, যা দেখতে অনেকটা লক্ষ্যানুশীলনের প্রতীক-সদৃশ (চিত্র ১৪৮)। আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার শহিদদের গণকবরের বুকে গজিয়ে ওঠা ঘাসের ছাপ নিয়েছেন **১৯৭১** (২০০৫) ছাপচিত্রে। এখানে ঘাসের প্রতিটি ছাপ যেন শহীদের এককেটি আত্মার প্রতিচ্ছবি। একইভাবে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর দুষ্কৃতিদের চালানো গ্রেনেড হামলার স্থলে গ্রেনেডের আঘাতে ফুটপাতে সৃষ্ট গর্তের ছাপ নিয়ে নির্মাণ করেছেন *বোমা বিস্ফোরণ* (২০০৫)। জাপানে এক মন্দিরে ঢোকার পথে বিছানো পাথরের ছাপ দিয়ে *শান্তির পথ* (২০০৭), ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ফুকোয়াকার এক রাস্তার ছাপ নিয়ে *ফুকোয়াকায় ভূমিকম্প* (২০০৭) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গুলির আঘাতে ধ্বংস হওয়া এক চৌকাঠের ছাপ নিয়ে *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত-২* (২০০৭) (চিত্র ১৪৯) নির্মাণ করেছেন। এ ছাড়া *ইন্টারথুর শহর* (২০০৯), *পানাম শহর* (২০১০), *সিউল শহর* (২০১০) ইত্যাদি এ মাধ্যমে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের এ সমস্ত শিল্পকর্মে বিষয়ের গতানুগতিক সাযুজ্য বা ধারাবাহিকতা না থাকলেও এগুলোর শিল্পমান সম্পর্কে শিল্পবোদ্ধাদের সন্দেহের অবকাশ কম। সেইসাথে এ ধরনের ছাপের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিষয়টিও অস্বীকার করা চলে না।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ছাপচিত্রচর্চা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশে সবচেয়ে বেশি চর্চিত হয়েছে কাঠ খোদাই মাধ্যমটি। কিন্তু বহুলচর্চিত হলেও এ মাধ্যমে নিরন্তর চর্চা করে যাওয়া শিল্পীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কম। শিল্পী আনিসুজ্জামান (১৯৭২) সেই স্বল্পসংখ্যক শিল্পীদের অন্যতম, যাঁরা নিরন্তর পরিশ্রম স্বীকার করে নব্বইয়ের দশক থেকে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে এ মাধ্যমের চর্চা করে চলেছেন। কাঠ খোদাই মাধ্যমে তাঁর এই নিরন্তর সাধনা এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে তাঁকে যেমন অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে, তেমনি এ দেশের ছাপচিত্রকে বিশ্ব-আসরে সম্মানের আসনও দান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের তামা আর্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ছাপচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আনিস। ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র থাকা অবস্থায় নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধেই এ দেশীয় চিত্রবোদ্ধা, দর্শক ও সমালোচকদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হন। সেই থেকে সময় যত গড়িয়েছে, দেশে-বিদেশে শিল্পী আনিসুজ্জামানের অর্জনের পাল্লা শুধু ভারীই হয়েছে। ছাপচিত্রের মতো পরিশ্রমসাধ্য এবং দ্বিমাত্রিক

মাধ্যমে তাঁর বিষয় উপস্থাপনের অনুপুঙ্খতা, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক বিভ্রম সৃষ্টির অনবদ্য দক্ষতা এবং বিশাল আয়তনের শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা অত্যন্ত তরুণ বয়েসেই তাঁকে এ মাধ্যমের বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফ ইত্যাদিসহ ছাপচিত্রের অন্যান্য মাধ্যমেও তাঁর ঈর্ষণীয় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একজন অসামান্য কাঠ খোদাই শিল্পী হিসেবে তিনি দেশে এবং বিদেশে সমধিক পরিচিত। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে কাঠ খোদাই মাধ্যমে করা কিছু ভূ-দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনচিত্র এ মাধ্যমে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ্য করে। *অনুশীলন*-১ (১৯৯৩), *অনুশীলন*-২ (১৯৯৩), *নিসর্গ*-১ (১৯৯৩), *নিসর্গ*-২ (১৯৯৪), *ফিগার কম্পোজিশন* (১৯৯৪), *ফিগার কম্পোজিশন* (১৯৯৫) ইত্যাদি শিল্পকর্ম তাঁকে প্রাথমিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

অনুশীলন-১ ও *অনুশীলন*-২ ক্ষুদ্রাকৃতির দুটি কাঠ খোদাই চিত্র। প্রথোমোক্তটিতে একটি দালানবাড়ির পাশ দিয়ে তার প্রবেশদ্বার ও অন্যটিতে একটি কুয়ো পেরিয়ে একজনকে হাতে ভারী কিছু বহন করে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। অত্যন্ত ছোট আয়তনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আলোছায়ার সাথে বাস্তবধর্মী রীতিতে বিষয়ের অনুপুঙ্খ উপস্থাপন মনোযোগ আকর্ষণ করে। খানিকটা একই ধরনের বিষয়বিন্যাস কিছুটা বড় আকৃতির ছবি *নিসর্গ*-১ ও *নিসর্গ*-২-তেও। আবার চুলকাটা ও সস্তা হোটেলে পরোটা তৈরির মতো অত্যন্ত সাধারণ বিষয় উঠে এসেছে *ফিগার কম্পোজিশন* দুটিতে। বেশ বড় আয়তনের এ দুটি কাজে আলোছায়ার নাটকীয়তা, রেখার সূক্ষ্মতা এবং পরিসর বিভাজনের দক্ষতা নজরকাড়া। এসব ছবিতে কিছুটা অনুশীলনধর্মী রীতিতে দৃশ্যজ বাস্তবতার সরাসরি উপস্থাপন থাকলেও বিষয় উপস্থাপনে শিল্পীর যথাযথ ও অনুপুঙ্খ থাকার প্রবণতা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কাঠ খোদাইয়ের মতো কঠিন মাধ্যমেও তিনি প্রত্যেকটি উপকরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। খেজুর গাছ, নারকেল গাছ, ছনের ছাউনি, মাটির দেয়াল, চাঁচের বেড়া, পুরনো কাপড়ের পর্দা ইত্যাদি নির্মাণে তাঁর মনোযোগ এবং দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। পটে আলোছায়ার বিন্যাস, পরিপ্রেক্ষিত, উপকরণের সমাবেশ– ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। আবার কয়েক স্তরে উপকরণ যোগ করে পরিসরের গভীরতাও নির্মাণ করেছেন অনবদ্যভাবে। তাঁর প্রথম দিকের এ সমস্ত কাজের রং-বিন্যাস কোমল ও শীতল। রাশিয়ান শিল্পগুরুদের শিল্পকর্মের রং তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এ সময়। তাঁদের সৃষ্টিকে মাথায় রেখে নিয়ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছেন নিজের অভীষ্টকে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য–

> রাশিয়ান ওল্ড মাস্টারদের কাজ আমার দারুণ পছন্দ ছিল। তাঁদের করা বইয়ের বিভিন্ন অলংকরণ, ব্যবহৃত রং নিজের ছাপচিত্রে আনার চেষ্টা করেছি একসময়। ওঁদের মতো রং বানানোর চেষ্টা করতে গিয়ে একসময় নিজের মতো আলাদা করে রং তৈরি করতে শিখে গেলাম।[৬৩]

নমিত রঙের এই বিন্যাসের সাথে বুনটের সুদক্ষ ব্যবহারও তাঁর ছাপাই ছবির এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। কাঠের ছাঁচে ভিন্ন ভিন্ন বুনটের কাপড় যোগ করে প্রথম দিকের এ সমস্ত কাজে তৈরি করেছেন অসামান্য অভিনব বুনট।

আনিসুজ্জামান কোনো বিষয়ের ওপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে কিংবা একটি বিষয় বা মাধ্যমে নিজের সীমাবদ্ধতাকে উৎরাতে সাধারণত নিরন্তর পরিশ্রমে সেই মাধ্যম বা বিষয়ের ওপর একাধিক চিত্র বা সিরিজচিত্র নির্মাণ করে থাকেন। কাঠ খোদাই মাধ্যমের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরক্তি থাকলেও নব্বইয়ের দশকের শেষ নাগাদ (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করার সময়) লিথোগ্রাফিতেও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। *শরতের আনন্দ* (১৯৯৭), *শিরোনামহীন* (১৯৯৭), এবং *সতী* (১৯৯৮) ও *পেঁচা* (১৯৯৮) সিরিজ এর মধ্যে অন্যতম। আনিসুজ্জামানের এই *সতী*র ধারণা প্রচলিত সামাজিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। তাঁর সতীরা সমাজস্বীকৃত এক পুরুষের অনুগত নয়, বরং জীবিকার তাগিদে বহুগামী। কারণ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো কোনো সম্বল তাদের নেই। জীবনযুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামক্লিষ্ট, নিগৃহীত ও পরাজিত এই মানবাত্মাদের শ্রম আর ঘামের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন শিল্পী তাঁর *সতী* সিরিজের মাধ্যমে। চারপাশের উৎস থেকে সংগৃহীত নিগৃহীত নারীর প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশ পাথরে সরাসরি স্থানান্তরের মাধ্যমে গড়েছেন পট। কোমল রঙের বিন্যাস আর বুনটের সহযোগে তা কখনো হেসে উঠেছে উচ্ছল আনন্দে, আবার পরক্ষণেই বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রুদ্র-রুক্ষ জীবনের সংগ্রামক্লিষ্টতা। অন্যদিকে আমাদের সমাজে সক্রিয় অসৎ ও দুষ্ট লোকেদের দিকে ইঙ্গিত করে নির্মিত তাঁর *পেঁচা* সিরিজও একটি শক্তিশালী নির্মাণ। এখানে পেঁচার রূপকের আড়ালে রাজাকার, আলবদর, আলশামসের মতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তি ও উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। পেঁচার পীড়নকর মলিন ও বিষণ্ন মুখ এবং ভীতিপ্রদ ভঙ্গি যেন অশান্তি এবং ধ্বংসের প্রতীক। আর শিল্পী তার সাথে মিলিয়েছেন উগ্র মৌলবাদীদের ভয়ংকর প্রতিকৃতিকে। বিষয়ের ত্রিমাত্রিক বিভ্রম ও অনুপুঙ্খ নির্মাণের দিকে শিল্পী আনিসুজ্জামানের আগ্রহ থাকলেও এখানে কখনো কখনো খুব সরল রূপবন্ধে ও দ্বিমাত্রিকতায় গড়েছেন তল। এ সময়ের আরও কিছু কাজেও প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সংগ্রামমুখরতা ও নানাবিধ সামাজিক অসংগতিকে তিনি তুলে ধরেছেন ব্যতিক্রমী উপস্থাপনে। পান্তা ভাতের থালায় লঙ্কা-পেঁয়াজের উপস্থাপনে দারিদ্র্যের কর্কশ জীবনাভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করেছেন। ক্ষয়ে

---

[৬৩] জাফরিন গুলশান, 'বহুবর্ণিল জটিলতার সরল স্বীকারোক্তি', *সাহিত্য সাময়িকী* (দৈনিক প্রথম আলোর শুক্রবারের ক্রোড়পত্র), ২২ জুন ২০১২, পৃ ৫

যাওয়া দেয়ালের ফাটলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণ-বুনটে উদ্ভাসিত করেছেন শরতের আনন্দ। United, Union, Unity প্রভৃতি তত্ত্বের বাস্তবিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন ভাঙা ইটের রূপকের আড়ালে।

শুরুর দিকে আনিসের মনোযোগ-কেন্দ্রে ছিল কিছুটা রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখা এ দেশের প্রকৃতি এবং দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামের নানা দিক। এরপর বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় তাঁর শিল্পে নতুন লক্ষণ সূচিত হয়। মাধ্যম হিসেবে কাঠ খোদাইকে আবার গ্রহণ করেন লিথোগ্রাফের পরিবর্তে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষান্তে ছাপাই মাধ্যমের চর্চা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং উপস্থাপিত বিষয়ের কোনো কোনোটির সমতলীয় গঠন এ সময় মাধ্যম ও বিষয়ে পরিবর্তিত হওয়ার পেছনে প্রভাবক হিসেবে কিছুটা ভূমিকা পালন করে। *জটিলতা* (চিত্র ১৫০) শিরোনামের এই কাজগুলোতে বিষয় হিসেবে আসে নির্মাণসামগ্রী, নাগরিক উন্নয়নে নির্মাণাধীন নানা অবকাঠামো, এলোমেলো পড়ে থাকা কাঠের তক্তা, বাঁশের ফালি, লোহার রড, লোহার সিঁড়ি, বিদ্যুতের খুঁটিতে জড়ানো তার, বাঁশের সাঁকো ইত্যাদি। সময় যত গড়িয়েছে, অন্যান্য অনুষঙ্গকে সরিয়ে আনিসের চিত্রপটে ততই দৃঢ় হয়েছে সু-উচ্চ দালানের ভিত্তি। নাগরিক নির্মাণের এ সমস্ত অনুষঙ্গকে তিনি দেখেছেন রেখা, রং আর পরিসরের চমৎকার সমাবেশ হিসেবে। ইট, কাঠ আর কংক্রিটের ফাঁক গলিয়ে ছককাটা জ্যামিতির মতো কখনো দেখেছেন অপরিসর আকাশ, আবার কখনো ঘিঞ্জি এলোমেলো আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভূ-ভাগ। এসবের আড়ালে সামাজিক ও পরিপার্শ্বিক জটিলতার দিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য–

> The theme of my recent works is complexity. Through these works I have tried to express the entire complicated problems of our society in a symbolic manner and take in the surroundings as well. Construction is a necessity but what we get in reality is much more complicated, by and large. Sometimes it is unplanned, sometimes it is kaleidoscopic.[৩৩২]

পরিসরের বাস্তবধর্মী উপস্থাপনের নিমিত্তে চিত্রপটে কখনো উলম্ব, কখনো আনুভূমিক, আবার কখনো তীর্যক সমাবেশ রচনা করেছেন বিষয়ের। *জটিলতা-৫* (২০০০), *জটিলতা-৮* (২০০১), *জটিলতা-৯* (২০০১), *জটিলতা-১১* (২০০১), *জটিলতা-১৮* (২০০২), *জটিলতা-২০* (২০০৩), *জটিলতা-২১* (২০০৩) ইত্যাদি শিল্পকর্মে ঢাকার মতো বিশৃঙ্খল ও কোলাহলপূর্ণ ঘিঞ্জি শহরে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট জটিল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার যথাযথ রূপ ফুটে উঠেছে।

---

[৩৩২] Anisuzzaman, '*These I remember …*', ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারিতে আয়োজিত *বহুবর্ণিল জটিলতা* শিরোনামের প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুযোগ হয় ইংল্যান্ডের গ্লাসগো প্রিন্ট স্টুডিও ও লন্ডন প্রিন্ট স্টুডিওতে ছয় মাসের জন্য কাজ করার। এ সময় থেকেই তাঁর চর্চা একটি পরিশীলনের দিকে যাত্রা শুরু করে (চিত্র ১৫১)। বিষয়বস্তু একই থাকলেও প্রকাশভঙ্গি হয়ে ওঠে আরও পরিপাটি, নিকোনো। [*জটিলতা*-৩৩ (২০০৪), *জটিলতা*-৩৭ (২০০৪), *জটিলতা*-৩৯ (২০০৪), *জটিলতা*-৪০ (২০০৪), *জটিলতা*-৪১ (২০০৪) ইত্যাদি] তৃতীয় বিশ্বের ঘিঞ্জি ও অপরিকল্পিত নির্মাণপ্রক্রিয়ার বিপরীতে পাশ্চাত্যের সু-উচ্চ দালান সংস্কারের পরিপাটি প্রক্রিয়াই হয়তো তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে পরিশীলিত করে তুলেছে। এ সময় তাঁর রং নির্বাচনও অভিজ্ঞ দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কারণ শিল্পী আনিসুজ্জামানের ছবির রং সবসময়ই অনুচ্চ। কিন্তু এই ইংল্যান্ড পর্বে তাঁর ব্যবহৃত রঙের ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে। সোনালি হলুদ, রক্তলাল, গাঢ় সবুজ আর নীল রঙের পরিপাটি ব্যবহারের সাথে পরিকল্পিত বুনটের সুশৃঙ্খল ব্যবহার তাঁর ছবিকে করে তুলেছে জাঁকালো ও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু আনিসের শিল্পসম্ভারের বর্তমান যে রূপ তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে, তা তিনি লাভ করেছেন জাপান থেকে। জাপানের শিক্ষা তাঁর পরিশীলিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। জাপানি শিল্পের প্রয়োগ-কৌশল ও নন্দনতত্ত্বের সাথে বাংলাদেশ, ভারত এবং ইংল্যান্ডে অর্জিত দক্ষতাও তাঁকে নিজস্ব আঙ্গিকে উত্তরণে সহায়তা করেছে। এই জাপান-পর্বেও ছবির বিষয় নির্বাচনে তিনি থেকেছেন পূর্বের মতো স্থাপত্যিক কাঠামোনির্ভর। ক্রমবর্ধমান শহরের বিকাশ ও তার কাঠামোগত জটিল রূপের নান্দনিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি এতে। সাথে যোগ হয়েছে নগরজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন অনুষঙ্গ। তবে তার উপস্থাপনভঙ্গি হয়েছে পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিশীলিত, পরিপাটি। মোটা-চিকন রেখা, শান্ত জমাট পরিসর আর আলোছায়ার কোমল ও বাস্তবধর্মী প্রয়োগে নির্মাণ রূপলাভ করেছে। আঙ্গিকে জটিলতা থাকলেও ঢাকার বিশৃঙ্খল, ঘিঞ্জি ও কর্কশ কোলাহলযুক্ত পরিসরের পরিবর্তে এ সময়ের পরিসর যেন নমিত, স্নিগ্ধ এবং শান্ত। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> জঙ্গম অবস্থা থেকে শিল্পী শোধিত সুন্দর দৃষ্টিনন্দন প্রেক্ষাপটে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একসময় নির্মাণাধীন দালানের কর্কশ বৃত্তান্ত তিনি তুলে ধরতে চাইতেন। কর্ণবিদারী অতিনিনাদিত এই অসহ নগরীর ধ্বনিরাশির চিত্রল প্রকাশ যেন তাঁর নির্মাণাধীন দালান। ...কর্কশ কোলাহলময় সে-অবস্থা থেকে সুখদায়ক কম্পমানতার স্নায়ুর গ্রাফিক্স হয়ে উঠেছে তাঁর কাজ। একপ্রস্থ জমাট অঞ্চল এবং তারই পাশে আলপিনের মতো সরু রেখা এবং এই রেখার ছায়া যেন দূরাগত অনুচ্চ স্বরের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।[৩৩৩]

নাগরিকজীবনে সমূহ-বিরক্তি উদ্রেককারী নির্মাণ প্রক্রিয়ার জটিল এসব বিষয় কতটা নান্দনিক অভিব্যক্তিময় হয়ে উঠতে পারে, তারই মূর্ত প্রকাশ আনিসুজ্জামানের এ সময়কার ছবি। তাঁর ছবিতে ইট-পাথরের জড়-জঙ্গল যেন জীবন লাভ করে, বাড়ে, হাসে আবার আকাশে মাথা ঠেকিয়ে রোদও পোহায়। কংক্রিটের জটিল-জঙ্গম পথে তাঁর এই যাত্রা কখনো গিয়ে পৌঁছায় সরল কোনো প্রান্তে। অর্থাৎ

---

[৩৩৩] মইনুদ্দীন খালেদ, 'আনিসের ছাপচিত্রে দালানের ব্যবচ্ছেদ', *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ ১১০

কখনো কখনো স্থাপত্যিক কাঠামোর কোনো কোনো অংশকে এমন সরলতায় উপস্থাপন করেছেন যে, বিমূর্ততার বোধকে উসকে দেয়। আবার বস্তুর সাদৃশ্যময়তা থেকে সরে এসে নিছক জ্যামিতিক কাঠামো-বিন্যাসে তল নির্মাণ করে থাকলেও তাও যেন বাস্তবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। এ সময় রঙের ব্যবহারেও ফিরে এসেছে তাঁর পূর্বের শীতলতা। হালকা সবুজাভ রঙে ছড়িয়েছেন স্নিগ্ধ হিমেল পরশ। পূর্বের *জটিলতা* সিরিজটির সাথে এ সময় নতুন করে শুরু করেছেন *বহুবর্ণিল জটিলতা* (চিত্র ১৫২)। উপর্যুক্ত জটিলতা নির্মাণের, কিন্তু বহু বর্ণসহযোগে তিনি চিত্রতলকে বর্ণিল করে তোলেননি, থেকেছেন এক রং-বিশিষ্ট। দৃশ্যত এক রঙের উপর্যুপরি প্রয়োগ আর বিচ্ছুরিত আলোছায়ার অপূর্ব বিন্যাসে নাগরিকজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্থাপত্যের নির্মাণ-জটিলতাই তুলে ধরেছেন তিনি। *বহুবর্ণিল জটিলতা-৩* (২০০৭), *বহুবর্ণিল জটিলতা-৪* (২০০৭), *বহুবর্ণিল জটিলতা-৫* (২০০৯), *বহুবর্ণিল জটিলতা-৬* (২০০৯), *বহুবর্ণিল জটিলতা-৭* (২০০৯), *বহুবর্ণিল জটিলতা-১৫* (২০১০), *বহুবর্ণিল জটিলতা-১৬* (২০১০), *বহুবর্ণিল জটিলতা-১৭* (২০১০) ইত্যাদি এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। এ ছাড়া একই সময়ে করা *জটিলতা-৫০* (২০০৬), *জটিলতা-৫১* (২০০৭), *জটিলতা-৫২* (২০০৭), *জটিলতা-৫৩* (২০০৭), *জটিলতা-৫৫* (২০০৭), *জটিলতা-৫৬* (২০০৭), *জটিলতা-৫৭* (২০০৭), *জটিলতা-৫৮* (২০০৮) ইত্যাদি শিল্পকর্মগুলোও উপস্থাপনভঙ্গি, বিষয়-বিন্যাস এবং রং নির্বাচনের দিক থেকে একই রকম নমিত ও হৃদয়গ্রাহী (চিত্র ১৫৩)। তাঁর এ সময়ের কাজ নিয়ে যথার্থই বলেছেন সমালোচক–

> দালানের গায়ে বিভিন্ন অনুষঙ্গের শক্তরূপ ও তার হালকা ছায়া– এই দুইয়ে মিলে কড়িকোমলে দৃশ্যমান তার উডকাট। লম্বমান, আনুভূমিক, তীর্যক এসব রেখার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভারসাম্য শিল্পিত রূপ পেয়েছে তার কাজে। আর্দ্র ও শুষ্ক, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এবং সর্বোপরি জমাট কাঠামোর ওপর ছায়ার বিলিকাটা এবং দ্বিমাত্রিক পটে তা থেকে গভীরতার জন্ম নেওয়ার ঘটনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন শিল্পী।
>
> ...দ্বিমাত্রিক জমিনে রেখার সুবিন্যাস কোন গভীর সঙ্গীতের কথা বলে। জমাট কাঠামো আর রেখার বিন্যাস আর বিন্দুর বুনটে যে টেক্সার সৃষ্টি হয় তা দিয়েই শিল্পী সংগীতকে দৃশ্যমান করেছেন। রেখাগুলো তার হয়ে উঠেছে নানা কম্পনাঙ্কের সাক্ষী। আর শিল্পী এসব উদ্ধার করেছেন কাঠের দেহ ছেনে অন্তরে ঢুকে। কাঠের গভীরে যে বিচিত্র বিন্যাস রয়ে গেছে আর তাই যে স্থাপত্যের সঙ্গীতেও রূপান্তরিত হতে পারে তার প্রমাণ আনিসের কাজ। অবশ্য তার কাজকে উডকাট-গীতিকাও বলা যেতে পারে।[৬৩৪]

করণকৌশলগত দিক থেকেও এই জাপান পর্বের কাজ পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় আলাদা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বুনটের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। শিল্পী-জীবনের একেবারে শুরু থেকেই তাঁর ছবিতে বুনটের নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও জাপানে শিক্ষাকালে তা উৎকর্ষ লাভ করে। শুরুতে

---

[৬৩৪] মইনুদ্দীন খালেদ, 'উডকাট গীতিকা', *কালের খেয়া* (দৈনিক সমকালের শুক্রবারে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র), ১৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ ১১

তিনি একটি ছাঁচ ব্যবহার করে ছাপচিত্র নির্মাণ করতেন এবং বুনট তৈরির জন্য কাঠের আঁশের সাথে নানা ধরনের দ্রব্যও সংযুক্ত করতেন। তখন ছবিতে কাঠের আঁশের বুনটগুলো ছিল একমুখী। কিন্তু জপানের শিক্ষা তাঁকে এ ক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা দান করে। এ সময় থেকে তিনি ছাঁচ নির্মাণের জন্য কাঠের আঁশের বহুমাত্রিক ব্যবহার শুরু করেন। অর্থাৎ একটি সমতল কাঠের ফালি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী আঁশের দিক ঠিক রেখে দরকারি খণ্ডগুলো কেটে একাধিক ছাঁচের সমন্বয়ে ছবি ছাপা শুরু করেন। কাঠের বুনটকে শুধু বুনট হিসেবে ব্যবহার না করে একে ব্যবহার করা শুরু করেন বিষয়ের উপাদান, আয়তন, গভীরতা– ইত্যাদি নির্দেশক টোন হিসেবে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন প্রবীণ জাপানি শিল্পগুরু ফুমিয়াকি ফুকিতা। ফুকিতার উদ্ভাবিত এই করণকৌশলকে স্বকীয় ঢঙে নিজের কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেন তিনি। কাঠের আঁশের এই পরিকল্পিত ও বহুমাত্রিক ব্যবহার বংলাদেশও প্রথম দেখল তাঁর কাজে। কাঠের বুনটকে অক্ষত রেখে এ দেশে এর আগে অনেকেই কাজ করেছেন, তবে বুনটের এমন সুপরিকল্পিত ব্যবহার আনিসের হাতেই শুরু। প্রকৃতপক্ষে দেশ-বিদেশের শিক্ষা আর নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার ছাপ শিল্পী আনিসুজ্জামানের সারা জীবনের শিল্পকৃতির পরতে পরতে উপলব্ধ হয়। তাই এ-কথা বলা সংগত যে, বাংলাদেশের ছাপচিত্রচর্চায় কাঠ খোদাই মাধ্যমে নান্দনিক ও কৌশলগত অভিনবত্ব এনেছেন শিল্পী আনিসুজ্জামান। আর এ অবস্থানে তিনি এসেছেন নিরলস শ্রম ও পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টাতেই।[৬৩৫] সূক্ষ্ম সরু রেখা, উপকরণের জমাট সন্নিবেশ, মিহি বুনটমুখর তল– এসব আনিসের ছবির বৈশিষ্ট্য। সু-উচ্চ কাঠামো বা তার খানিকটা অংশ একপাশে জমাটভাবে উপস্থাপন করে অন্য অংশে সামান্য দু-একটি তার কিংবা রঙের উপস্থিতিতে অসাধারণভাবে করেছেন পটের ভারসাম্য-বিধান। আর কোমল ও সংবেদনশীল রং-বিন্যাস প্রশান্তির বোধকে জাগ্রত করে। রং ব্যবহারের এ দক্ষতা ও পরিমিতিবোধ শিল্পীর পরিণত মানসিকতার প্রতীক। তবে এই স্নিগ্ধতার মাঝেও মানুষের অনুপস্থিতি বড় প্রকট। বস্তুত প্রথম থেকে শিল্পী আনিসুজ্জামানের কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে উদ্ভিদ-প্রধান প্রকৃতি। মাঝখানে খুব স্বল্প সময়ের জন্য (ভারতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার সময়) মানুষ এবং সামজিক জীবনচিত্র তাঁর বিষয় হলেও খুব দ্রুতই তা তিরোহিত হয় এবং স্থাপত্যিক নকশা এবং নির্মাণ অনুষঙ্গ সে স্থান দখল করে। তাই বলা যায়, আনিসের চিত্রপটে মানুষের জীবনানুষঙ্গের নানা দিক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় উপস্থাপিত হলেও মানুষ-প্রধান হয়ে ওঠেনি কখনোই।

সামগ্রিকভাবে বংলাদেশের ছাপচিত্র শিল্পের উত্তরণে যে স্বল্পসংখ্যক শিল্পী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, শিল্পী আনিসুজ্জামান নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। সফল ছাপচিত্রী হিসেবে তিনি

---

[৬৩৫] জাফরিন গুলশান, 'বহুবর্ণিল জটিলতার সরল স্বীকারোক্তি', *সাহিত্য সাময়িকী* (দৈনিক প্রথম আলোর শুক্রবারের ক্রোড়পত্র), ২২ জুন ২০১২, পৃ ৫

যেমন নিজেকে সতত নিয়োজিত রেখেছেন কাঠ খোদাই মাধ্যমে নতুনত্ব যোগ করার প্রচেষ্টায়, তেমনি শিল্পের একজন শিক্ষক হিসেবে ছাপাই মাধ্যমের বিস্তার ও প্রসারেও নিরন্তর সচেষ্ট এই শিল্পী।

এ ছাড়া এ প্রজন্মের সাইদুল হক জুঁইস (১৯৬০), মোখলেসুর রহমান (১৯৬১), সেলিনা চৌধুরী মিলি (১৯৬২), অশোক বিশ্বাস (?), মোস্তফা জামান (১৯৬৮) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাপচিত্র মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্প রচনা করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ছাপচিত্রকলার চর্চা চল্লিশের দশকে শুরু হলেও নানা সীমাবদ্ধতায় ষাটের দশক পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সত্তরের দশকের প্রথমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই মাধ্যমের প্রকৃত কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। এ সময় থেকে ধীরে ধীরে নানামাত্রিক পৃষ্ঠপোষকতার সাথে নিরবচ্ছিন্ন চর্চা ছাপাই মাধ্যমকে এ দেশের শিল্প-ইতিহাসে গুরুত্বের আসনে আসীন করে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এসে তা নানামুখী নিরীক্ষা ও চর্চায় নতুন নতুন আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে প্রকৃত বৈচিত্র্য অর্জন করে। এর ফলশ্রুতিতে এ দেশের ছাপাই ছবির উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক পরিসরেও অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা। শুরুতে শিল্পীদের ছাপাই ছবির বিষয় নির্বাচনে রোমান্টিকতা প্রসূত প্রকৃতিবাদিতার সাথে যে দেশজতা ও সমাজকেন্দ্রিক বিষয়লগ্নতা আভাসিত হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা তিরোহিত হতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির জটিল প্রকাশক্ষেত্র হয়ে ওঠে (শুরুর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অদ্যাবধি বর্তমান অনেকের আঙ্গিকে)। একই কথা প্রযোজ্য মাধ্যমের ধারাবাহিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও। প্রথম দিকের শিল্পীদের মধ্যে মাধ্যমের বিশুদ্ধতার পক্ষে যে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের হাতে তা আরও সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। ছাপচিত্রকে শুধু ছাপচিত্র হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তাঁরা এর উপস্থাপন করেছে। ফলে ধাতব পাত, কাঠ, পাথর, লিনোলিয়াম প্রভৃতি উপকরণ ছাড়িয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক বিভিন্ন কৌশলও ছাপাই ছবির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিসর বা ছাঁচ নির্মাণ কিংবা মূল প্রতিরূপ নির্মাণের বাধ্যবাধকতাকে সরিয়ে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিসর বা স্থাপনাও সরাসরি হয়ে উঠেছে (ছাপচিত্রের) ছাঁচ। সেখানে দ্বিমাত্রিক তলে পরিসর নির্মাণে করণকৌশলের মুনশিয়ানা ছেড়ে ছাপচিত্র মুক্তিলাভ করেছে যুক্তি ও ভাষ্যে। বর্তমান শতকেও এ দেশের ছাপচিত্র চর্চার ধারায় যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। পূর্ববর্তী সময়ে অনেক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দেখা গেলেও বর্তমান শতকে দেশে ছাপাই মেশিন তৈরির ক্ষেত্রে রীতিমতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো স্টুডিও নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজন করছে ছাপচিত্র মেলা, কর্মশালা, প্রদর্শনীর। ফলে ছাপচিত্র সম্পর্কে শিল্পানুরাগী ও সাধারণ মানুষের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের জন্য শুভ ফলদায়ী। তাই

একথা বলাই যায় যে, পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে ছাপচিত্র চর্চার এই সামগ্রিক পরিবেশ নতুন নতুন চর্চাকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও এই মাধ্যমের চর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর এই শিল্পমাধ্যম ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার

ছাপ তথা মুদ্রণের মাধ্যমে ভাবনা প্রকাশের ধারণা মানুষ আদিকালেই অর্জন করেছিল। এরপর সময়ের স্রোতে অনিবার্যভাবে একটু একটু করে পরিশীলিত হতে হতে সেই আদিম ছাপের ধারণা থেকেই বিকশিত হয় আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি। মুদ্রণের ধারণা প্রাচ্যে উৎপত্তি লাভ করলেও পাশ্চাত্যেই এর ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয় এবং পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের হাত ধরেই অষ্টাদশ শতকে বাংলায় আগমন ঘটে মুদ্রণের আধুনিক প্রযুক্তির। বাংলার নিজস্ব ছাপ পদ্ধতির সাথে আধুনিক এই প্রযুক্তির সম্মিলনে খুব দ্রুতই বিকাশ লাভ করে এখানকার মুদ্রণ সংস্কৃতি। আর এই মুদ্রণ সংস্কৃতির হাত ধরে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায়ও ছাপচিত্রের প্রাথমিক বিকাশ সাধিত হয়, বটতলার ছাপচিত্র যার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। তবে বাংলায় আধুনিক সৃজনশীল ছাপচিত্রের ধারণার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশ্বভারতীর কলাভবন। এর সাথে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষা, এ দেশীয় নিম্নবর্গীয় শিল্পীদের শিল্পপ্রচেষ্টা এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় বাউহাউস শিল্পীদের প্রদর্শনী। ১৯৪৭ এর দেশ বিভক্তির পর তরুণ ও উদ্যমী কয়েকজন শিল্পীর দ্বারা কলকাতার এই শিল্প উত্তরাধিকার বাহিত হয় অধুনালুপ্ত পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'গভ: ইনস্টিটিউট অব আর্টস' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে ছাপচিত্র চর্চার সুযোগ রাখা হয়, আর এর মাধ্যমেই মূলত আজকের বাংলাদেশের সৃজনশীল ছাপচিত্র চর্চার সূচনা।

শুরুতে ইউরোপীয় মানবতাবাদী দর্শনের সাথে বাস্তববাদিতা, বাংলার লোকজ শিল্প আঙ্গিক ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে এ দেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের (হবিবর রহমান, জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ) ছাপচিত্র সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়গত দিক দিয়ে এ সময়কার ছাত্রদের ছাপাই কর্মেও এই প্রভাব দৃশ্যমান। তবে আঙ্গিকগত দিক থেকে এ সমস্ত শিক্ষার্থী শিল্পীদের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাদের শিক্ষক শিল্পীদের অনেকের উপর (জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান) যেমন সমসাময়িক একাডেমিক রীতি খুব বেশি প্রভাব বিস্তারী হয়নি, (ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে) তেমনি মুর্তজা বশীর, হামিদুর রাহমান, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ ছাত্রদের উপর শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদের প্রভাবও খুব দৃঢ় নয়। তবে কারো কারো (আমিনুল ইসলাম, শামছুল কাদের প্রমুখ) উপরে তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই তা অপসারিত হয়। বস্তুত এইসব ছাত্রশিল্পীর ছাপছবির চর্চা ভিক্টোরীয় একাডেমিক রীতির না হয়ে বরং সমকালীন আন্তর্জাতিক রীতিপদ্ধতি অনুবর্তী হয়েছে, বিশেষত অভিব্যক্তিবাদী প্রবণতামুখী। এতে আলোছায়ার বিন্যাস থাকলেও আকার-আকৃতির

Dhaka University Institutional Repository

রূপায়ণ সরলতাপন্থী, যা অনেকটাই নন্দলাল (সহজ পাঠের অলংকরণ), বিনোদবিহারী কিংবা চিত্তপ্রসাদের চর্চিত শিল্পের সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং অভিব্যক্তিমুখী বলে অনুমিত হয়। তবে শুরুর এই দেশজতা ও সমাজবাস্তবতা কেন্দ্রিক শিল্প স্বল্প সময়েই কার্যত ভিন্ন পথে চালিত হয়। পঞ্চাশের শেষ থেকে ষাটের দশকে তরুণ শিল্পীদের (মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, কিবরিয়া প্রমুখের) কাজে দেখা যায় পাশ্চাত্য উদ্ভূত বিমূর্ততার উদ্ভাস। আর ষাটের দশকে নিতুন কুন্ডু, কিবরিয়া প্রমুখ শিল্পীর হাতে তা বিশুদ্ধ বিমূর্ত হয়ে ওঠে। শুধু এই শিল্পীরাই নন বরং পঞ্চাশের সামগ্রিক শিল্প পরিবেশ এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চাশের নবীন শিল্পীদের ব্যাপকভাবে বিশ্বশিল্পের সমসাময়িক প্রবণতার সংস্পর্শে আসার ফলে পশ্চিমকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পসংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা মনে করতে শুরু করার সাথে সাথে আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক ধারার প্রতি উন্নাসিকতা এবং বামঘনিষ্ঠতার কারণে বেঙ্গল স্কুলের রীতির প্রতি অনীহাও পঞ্চাশের বিমূর্ততার সূত্রপাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে থাকতে পারে। তবে এ কথাও সত্যি যে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের পর থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ছাপচিত্র চর্চার ধারা ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল এবং এ সময়ে সফিউদ্দিন আহমেদ ও মো. কিবরিয়া (ষাটের দশক থেকেই ছাপাই ছবির চর্চা শুরু করেন) ছাড়া আর কেউ ছাপাই মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারেননি। পাঠ্যক্রমে ছাপচিত্রের অল্প ক্লাস থাকার ফলে ছাপচিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব, একাডেমির বাইরে মুদ্রণ যন্ত্র না থাকা, চিত্রকলারমতো গ্রহণযোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব তৈরি না হওয়াই এর প্রধান কারণ। আবার ছাপাই মাধ্যমের করণকৌশল ও মাধ্যমের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদের কঠোর মনোবৃত্তিও এ ক্ষেত্রে প্রভাবক হয়ে থাকতে পারে। তবে ষাটের দশকে ছাপচিত্র শাখায় মো. কিবরিয়ার যোগদানের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সাথে মাধ্যমের নানামুখী নিরীক্ষার বিষয়টি পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয় এবং পূর্বোল্লেখিত অবকাঠামো এবং মাধ্যমগত উত্তরণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাপচিত্র সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, যার ফলাফল লক্ষ করা যায় সত্তরের দশকে এসে।

চল্লিশের দশকের শেষ লগ্নে শুরু হলেও ষাটের দশক পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি এ দেশের সৃজনশীল ছাপচিত্রকলার চর্চা। সত্তরের দশকের শুরুতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই মাধ্যমের প্রকৃত কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। এ সময় থেকেই মূলত ছাপাই মাধ্যমের চর্চায় নিয়োজিত প্রকৃত পরবর্তী প্রজন্মের দেখা পাওয়া যায়। রফিকুন্নবী, মনিরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার প্রমুখরা হলেন এই নতুন প্রজন্মের অন্যতম শিল্পী। রফিকুন নবী ও আবদুস সাত্তার বিদেশে ছাপাই মাধ্যমের শিক্ষান্তে দেশে ফিরে রঙিন ও বৃহৎ আকৃতির কাঠ খোদাই চিত্রকে নতুন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেন। মনিরুল ইসলামও কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে তাঁর অধীত ও লব্ধ জ্ঞানকে নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেন, যা সার্বিকভাবে এ দেশের ছাপচিত্র মাধ্যমের বৈশ্বিক হয়ে ওঠার পথকে সুগম করে। স্বাধীনতাত্তর প্রজন্মের এ সমস্ত শিল্পীর সাথে পূর্ববর্তী প্রজন্মের (কামরুল হাসান, মুর্তজা বশির, রশিদ চৌধুরী,

Dhaka University Institutional Repository

দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ) শিল্পীর ছাপচিত্রেও শুরুতে বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক বিষয়, স্ব-কাল ও স্ব-দেশ ভাবনা আশ্রয় নিলেও বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অতিদ্রুতই তা পরিবর্তিত হয়ে রোমান্টিকতা উদ্ভূত নিজস্ব আঙ্গিকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বস্তুত দশকের শুরুতে অনেক রক্ত-অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা সকলকে আবেগাপ্লুত করলেও অল্প কালের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শের বিচ্যুতি, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইত্যাদি কারণে স্বদেশি আবেগ আর শিল্পীদের তাড়িত করেনি, বরং নিজস্ব শৈলীর খোলসে আবদ্ধ হয়ে পড়ে সবাই। পঞ্চাশের সামাজিক বিষলগ্নতা ও লোকজ আধুনিকতা যেমন পথ হারিয়েছিল স্বল্প সময়েই তেমনি স্বাধীনতাত্তর এই স্বদেশ ভাবনাও মিলিয়ে যায় অল্প কালেই। অথচ এই দুটি ধারার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, আঙ্গিক ও বিষয়গত বৈচিত্র্যে এ দেশের ছাপচিত্র তথা সামগ্রিক শিল্পকে হয়তো দিতে পারত নিজস্ব কোনো পরিচিতি।

সে যাই হোক, আশির দশকেও (সফিউদ্দিন, কালিদাস কর্মকার ও আবদুস সাত্তার) বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়েছে। আবার এ সময় কারো কারো (কিবরিয়া, মাহমুদুল হক, আবুল বারক্ আলভী, এ কে এম আলমগীর হক প্রমুখ) কাজে গুরুত্বপূর্ণভাবে চর্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ বিমূর্ততাও। বস্তুত ষাট থেকে শুরু করে নব্বই পর্যন্ত প্রতিটি দশকেই ছাপাই মাধ্যমে কম বেশি চর্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ বিমূর্ততা। তবে সামগ্রিকভাবে আমাদের শিল্পে বিশুদ্ধ বিমূর্ততা যতটা পরিসর ও গুরুত্ব নিয়ে চর্চিত হয়েছে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তা অনেক কম। কারণ এ দেশের শিল্পে বিমূর্ততার উত্থান পর্বে দু-একজন ভিন্ন ছাপচিত্র মূলত শিক্ষার্থীদের হাতে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার অনুশীলনধর্মী মাধ্যম ছিল। আর ছাপচিত্রের চর্চা যখন ব্যাপকতা লাভ করেছে তত দিনে বিশুদ্ধ বিমূর্ত শিল্পের চর্চা নানামুখী প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং তরুণদের শিল্প প্রবণতা নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ফলে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তা অতটা পরিসর কখনোই পায়নি। তবে বিমূর্তার কিছু চর্চা হলেও আশির মূল সুরটি ছিল রোমান্টিকতা উদ্ভূত বিষয়নির্ভর ও সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা উদ্ভূত প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক। এই দশকে স্বদেশে ছাপচিত্র মাধমে বিশেষায়িত শিক্ষা শুরুর ফলে ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক পরিসর বৃদ্ধি পায়। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীর সাথে স্বদেশে বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীদের নিরন্তর চর্চার সাথে বিদেশি ছাপচিত্রীদের কাজ দেখার সুযোগ এবং বিদেশে নিজেদের কাজ প্রদর্শনের মাধ্যমে আশির দশকেই মূলত সামগ্রিকভাবে এ দেশীয় ছাপচিত্রের বৈচিত্র্যময় বিকাশ শুরু হয়। সাথে সাথে বাড়ে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সাথে বাজারমূল্যও। আবার এই সময় থেকেই আমাদের ছাপাই ছবি স্বদেশের সাথে বিশ্ব পরিসরেও গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবাদে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন জার্নালেও বাংলাদেশের ছাপচিত্র সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বিভিন্ন মন্তব্যও করেন অনেক সমালোচক। তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে এ দেশের ছাপাই ছবি আরও গুরুত্বে আসীন হয় নব্বইয়ের দশকে (এবং তৎপরবর্তী সময়ে)। এ সময়ে ছাপচিত্রের এই উত্থান বাংলাদেশের জন্য বহির্বিশ্বে ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ও সম্মান বয়ে এনেছে নিঃসন্দেহে। বস্তুত নব্বইয়ের দশক ছাপাই ছবি চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজেদের কাজ প্রদর্শন আর চর্চার ব্যাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, ছাপচিত্র মাধ্যমের বিকাশের পূর্ববর্তী ধারাকে আরও বেগবান করে। এই দশকে এসে পূর্ববর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ সদস্য নিজস্ব আঙ্গিকে খোলসবদ্ধ হয়ে পড়লেও এ প্রজন্মের তরুণ শিল্পীদের কাজে সাহসী নিরীক্ষা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাতে ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির জটিল প্রকাশ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি রোমান্টিকতা উদ্ভূত বিষয়লগ্নতার সাথে কারো কারো (রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী, আবদুস সালাম প্রমুখ) কাজে আবার গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দুর্নীতি ও অবিচারের দিকটিও। আবার স্বল্প পরিসরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিও বিষয় হয়ে এসেছে দু-একজনের কাজে। আশির দশকের কারো কারো কাজে দেখা গেলেও নব্বইয়ের দশকেই প্রকৃত প্রস্তাবে মাধ্যমের বিশুদ্ধতার প্রশ্নটি অনেকাংশে অপসারিত হয় এবং এ সময়ের অনেকের হাতে তা আরও সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ছাপের মাধ্যমে ছবির তল তৈরি করে তাতে সরাসরি হাতে বিষয় যোগ করার মতো উত্তরণ এ প্রজন্ম এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মের অনেকের কাজেই লক্ষণীয় এ সময়। ছাপচিত্রকে শুধু ছাপচিত্র হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তাঁরা এর উপস্থাপন করেছে। ফলে ধাতব পাত, কাঠ, পাথর, লিনোলিয়াম প্রভৃতি উপকরণ ছাড়িয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক বিভিন্ন কৌশলও ছাপাই ছবির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিসর বা ছাঁচ নির্মাণ কিংবা মূল প্রতিরূপ নির্মাণের বাধ্যবাধকতাকে সরিয়ে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিসর বা স্থাপনাও সরাসরি হয়ে উঠেছে (ছাপচিত্রের) ছাঁচ। সেখানে দ্বিমাত্রিক তলে পরিসর নির্মাণে করণকৌশলের মুনশিয়ানা ছেড়ে ছাপচিত্র মুক্তিলাভ করেছে যুক্তি ও ভাষ্যে। এ প্রসঙ্গে আবদুস সালামের 'স্পেস প্রিন্ট' পদ্ধতির কথা বলতেই হয় বিশেষভাবে, যা আমাদের ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে তো বটেই ছাপাই ছবির বিশ্বপরিসরেও নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ।

এই ছয় দশকের নাতিদীর্ঘ পথচলায় উপর্যুক্ত অনেক উপলক্ষ আমাদের গৌরবান্বিত করলেও কিছু সীমাবদ্ধতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উপর্যুক্ত সময়ে আমাদের ছাপচিত্র চর্চার ধারায় মাধ্যম ও উপকরণগত নিরীক্ষা ও এ বিষয়ে উৎকর্ষ যতটা যোগ হয়েছে আঙ্গিক ও বিষয়গত নিরীক্ষা ও পরিবর্তন ততটা হয়নি, যদিও ছাপাই ছবির বিশ্ব পরিসরের ক্ষেত্রেও চিত্রটি অনেকটা একই রকম। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো, আমাদের শিল্পীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর জীবনধারণ ও শিল্পী হওয়ার পথেও রয়েছে তাঁদের নিয়ত সংগ্রাম। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাজে এসব সংগ্রাম অনুপস্থিত। কারো কারো কাজে সামাজিক রাজনৈতিক পটপ্রেক্ষিত, নানা ধরনের বৈষম্য, ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ উঠে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দেশের ছাপাই ছবির সামগ্রিক ধারায় একধরনের

Dhaka University Institutional Repository

রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পরিদৃশ্যমান হয়। আবার মুদ্রণের সংস্করণ বিশুদ্ধতার ব্যাপারটি আজো শিল্পী, সংগ্রাহক, দর্শক সকলের কাছেই উপেক্ষিত থাকার ফলে ছাপচিত্রের মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি যথাযথ হচ্ছে না। এতে সংগ্রাহকের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিল্পী নিজেও এবং সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ দেশের ছাপচিত্র শিল্প ও তার বিকাশ। ফলে ছাপচিত্রের গ্রহণযোগ্যতাও হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত। আর ছাপচিত্রের গ্রহণযোগ্যতা, অর্থনৈতিক ও শিল্পমূল্য চিত্রকলার মতো না হওয়ায় (যদিও তা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে, তবুও তা চিত্রকলার সমান হয়নি আজো) এ দেশের ছাপচিত্র শিল্পের প্রায় সাত দশক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ছাপচিত্র চর্চাকারীর সংখ্যা আজো হাতে গোনার মধ্যেই থেকে গেছে।

তবে আজ একথা বলাই যায় যে পূর্বের কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশে ছাপচিত্র চর্চার পরিবেশ, গ্রহণযোগ্যতা, গুরুত্ব এবং পরিসর বেড়েছে নিঃসন্দেহে। তবুও এখনো রয়েছে নানাবিধ সীমাবদ্ধতাও। ছাপচিত্র অত্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর একটি শিল্পমাধ্যম হওয়ায় এতে ব্যবহৃত উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, না হলে প্রাপ্ত ফলাফলে তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে অদ্যাবধি ছাপাই ছবির প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন উপকরণ প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাপচিত্র চর্চার বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হলেও সবাইকে সমানভাবে পর্যাপ্ত পরিসর, দক্ষ শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা দেওয়াও সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণভাবে ছাপচিত্রের চর্চা হলেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা মাঝেমধ্যেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ছাপচিত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে সে ধরনের উদ্যোগের বেশ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানের ছাপচিত্র স্টুডিওটি বন্ধ থাকার ফলে ছাপাই ছবি চর্চার পরিসরকে তা কিছুটা সংকুচিত করে তুলেছে। তাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার এই স্টুডিওটি পুনরায় চালু করে এবং বার্ষিক অথবা মাসিক বৃত্তিসহ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী কিছু শিল্পীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বরাদ্দ দিয়ে এ মাধ্যমে কাজ করার পরিসরকে আরও বাড়ানো যায়। শিল্পকলা একাডেমি সমন্বিতভাবে বেশ কয়েকটি বার্ষিক ও আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেও এককভাবে ছাপচিত্রের যৌথ বা একক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ নিলে দর্শক সংগ্রাহকদের কাছে ছাপচিত্রের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে, যা সার্বিকভাবে ছাপচিত্রের জন্য শুভ ফলদায়ী হবে। আবার ছাপচিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মানসম্পন্ন উপকরণ সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে ও বাণিজ্যিকভাবে দেশে উৎপাদন কিংবা আমদানি করে এর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপচিত্র বিভাগের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং এ বিভাগসমুহকে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে ভূমিকা রাখতে পারে। তা ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে চালিত কর্মশালাগুলোকে রাষ্ট্রায়াত্ত করে নেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে কিংবা মাসিক অথবা বাৎসরিক ভর্তুকির মাধ্যমে সহযোগিতা করা সম্ভব হলে এ দেশের ছাপচিত্র নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ হবে। কারণ শুধু ছাপচিত্র চর্চাই নয়, যেকোনো ধরনের শিল্পের চর্চা নিরবচ্ছিন্ন, ব্যাপক ও সমৃদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনোভাবেই শিল্পের কোনো মাধ্যমেই চরম উৎকর্ষে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়, শিল্পের দীর্ঘ ইতিহাস এর সাক্ষী। তাই বাংলাদেশের ছাপচিত্র শিল্পের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ, বেগবান ও এ মাধ্যমে উৎকর্ষের শীর্ষে উপনীত হতে হলে এ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা আরও বাড়াতে হবে, আর সে ক্ষেত্রে সরকার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি উদ্যোগ ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ছাপচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুখ্যাতি বিশ্বপরিসরে যে আরও বাড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দিয়েও যারা এ দেশের ছাপচিত্র জগৎকে এতটা ফলবান করে তুলতে পারে, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে যে তাঁরা আরও ভালো করবে সেকথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। একইসাথে একথাও স্মর্তব্য যে, ছাপচিত্র একটি গণমুখী-মাধ্যম বলে এর ব্যাপক জনসম্পৃক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি শিল্পমুখী সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থাবলি

- অনিন্দিতা ঘোষ। 'বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস'। দ্র. অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাঙালির বটতলা* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩।
- অনির্বাণ ব্যনার্জী। 'বাংলার আমসত্ত্ব ও সন্দেশের ছাঁচ'। দ্র. বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, *লোকজ শিল্প*। কলকতা, পারুল, ২০১১।
- অশোক ভট্টাচার্য। *বাংলার চিত্রকলা*। পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২।
- আবুল মনসুর। 'গ. ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- আবুল মনসুর। *রশিদ চৌধুরী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩।
- আশফাকুর রহমান গৃহীত নিতুন কুণ্ডুর সাক্ষাৎকার। 'পেইন্টিং তো চিন্তার একটি ফসল-নিতুন কুণ্ডু'। দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুণ্ডু স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা, নিতুন কুণ্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭।
- আবুল মনসুর। 'নিতুন কুণ্ডুর তিনটি মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য'। দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুণ্ডু স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা, নিতুন কুণ্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭।
- আবুল মনসুর। 'বাংলাদেশের চিত্র-ভাস্কর্য : একটি অবলোকন'। *শিল্পকথা শিল্পীকথা*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬।
- আবুল মনসুর। 'মুর্তজা বশীর'। দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩।
- আবদুস সাত্তার। 'শিল্পী আব্দুস সাত্তার-এর "শিল্পে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং মূর্ত-বিমূর্ত বিতর্ক" বিষয়ক অভিমত'। দ্র. *আব্দুস সাত্তার-এর শিল্পকর্ম*। ঢাকা, সাজু আর্ট গ্যালারি, ২০০২।
- আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ। ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭।
- আমিনুল ইসলাম। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

- আশিষ খাস্তগীর। 'বটতলার বইয়ের বাজার'। দ্র. অদ্রীশ বিশ্বাস এবং অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাঙালির বটতলা* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩।
- এম, এ, কাইয়ুম। *আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি*। ঢাকা, মুক্তচিন্তা, ২০১২।
- কবীর চৌধুরী। 'রফিকুন নবী'। *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৩০*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪।
- কমলকুমার মজুমদার। 'বঙ্গীয় গ্রন্থ-চিত্রণ'। দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা, ২০১১।
- কমল সরকার। 'বাংলা বইয়ের ছবি'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- কামরুল হাসান। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*। ঢাকা, প্রথমা, ২০১০।
- কামাল আহমদ। *শিল্পকলার ইতিহাস*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- কামাল আহমদ। *ইউরোপের একশ দু'জন চিত্রশিল্পী*। ঢাকা, বাংলা একডেমি, ২০০১।
- গোলাম মুরশিদ। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ৩য় মুদ্রণ। ঢাকা, অবসর, ২০০৮।
- গোলাম মুরশিদ। *বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি পর্ব (১৭৭৭-১৮১৭)*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
- গৌতম ভদ্র। *ন্যাড়া ক'বার বটতলায় যায়?*। কলকাতা, ছাতিম বুকস্, ২০১১।
- গৌতম দাশ। *বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার*। কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০০।
- চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বোলটসের বিচল হরফ'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- জেমস টেলর। *কোম্পানী আমলে ঢাকা*। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮।
- জেমস ওয়াইজ। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*। ফওজুলকরিম অনূদিত। ঢাকা, আই সি বি এস, ১৯৯৮।
- ডক্টর সুশীলা মণ্ডল। *বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: প্রথম পর্ব)*। ঢাকা, অরিত্র, ২০০৪।
- ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান। *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*। ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।
- ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস : প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি.)*। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
- ড. মোহাম্মদ হাননান। *বাঙালির ইতিহাস*। ঢাকা, অনুপম, ১৯৯৮।

- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরন (১৮১৮-১৮৮৭)*। কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৭।
- ড. আব্দুস সাত্তার। *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩।
- ড. রফিকুল আলম। *উপমহাদেশের শিল্পকলা*। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।
- ড. আবু তাহের। *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮।
- ড. হীরা সোবাহান। *ছাপচিত্রকলা*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশন, ২০১৭।
- ড. মোহাম্মদ হাননান। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*। ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২।
- ঢালী আল মামুন। 'চ. মুর্তজা বশীর'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- তোফায়েল আহমদ। *আমাদের প্রাচীন শিল্প*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪।
- নজরুল ইসলাম। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯।
- নলিনীকান্ত ভট্টশালী। *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*। মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত। ঢাকা, আই সি বি এস, ১৯৯৭।
- নাসিরুদ্দিন চৌধুরী। 'অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১'। দ্র. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, ২০১৩।
- নাসিম আহমেদ নাদভী। 'মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান খান'। *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৪১*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৮।
- নির্ম্মল কুমার ঘোষ। *ভারত শিল্প*। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ফার্মা কে এল এস, ১৯৮৩।
- নির্মাল্য নাগ। *শিল্প চেতনা*। কলকাতা, দীপায়ণ, ১৯৮৭।
- নিসার হোসেন। 'সমকালীন শিল্পকলায় প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- নীহার রঞ্জন রায়। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০।
- নীলমনি সেনগুপ্ত। 'ছবি ছাপার কলা কৌশল'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- প্রদ্যোৎ গুহ। *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*। কলকাতা, অয়ন, ১৯৭৮।
- পূর্ণেন্দু পত্রী। *শিল্প সংক্রান্ত*। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।
- ফজলে রাব্বি। *ছাপাখানার ইতিকথা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭।

- ফয়েজুল আজিম। *চারুকলার ভূমিকা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২।
- ফয়েজুল আজিম। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০।
- বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবি বর্ম্মা'। দ্র. শোভন সোম ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৮৬।
- বরুণ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলা মুদ্রণের চার যুগ'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- বুলবন ওসমান। *শিল্পকলা দেশে দেশে*। ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ২০০২।
- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। 'এই হচ্ছে নিতুন কুণ্ডু'। দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুণ্ডু স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা, নিতুন কুণ্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭।
- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। *দেশজ আধুনিকতা : সুলতানের কাজ*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র'। দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭।
- বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। *চিত্র শিল্পের কাহিনী*। কলকাতা, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৮
- মতলুব আলী। 'আমাদের শিল্পকলায় একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ'। *শিল্পী ও শিল্পকলা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'বাসনার রক্তিম রূপায়ণ'। *জামাল*। ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০১০।
- মইনুদ্দীন খালেদ। *দশ বাঙালি শিল্পী*। ঢাকা, প্যাপিরাস, ২০০৩।
- মইনুদ্দীন খালেদ। *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*। ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০০।
- মতলুব আলী। 'আবু তাহের-এর অর্জন'। দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আবু তাহের*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯।
- মুর্তজা বশীর। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৪।
- মুনতাসীর মামুন। 'কামরুল হাসানের স্মৃতি'। দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*। ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০।
- মুনতাসীর মামুন। *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।
- মুনতাসীর মামুন। *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা*। ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৬।
- মনিরুল ইসলাম। 'প্রেরণার উৎস'। দ্র. মতিউর রহমান সম্পাদিত, *প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা*। ঢাকা, মিডিয়াস্টার লিমিটেড, নভেম্বর ২০০২।

- মন্দিরা ভাদুড়ী। 'ক্রিমসন রেডঃ শিল্পীর রোজনামচা'। দ্র. *ক্রিমসন রেড*। ঢাকা, সোসাইটি ফর প্রোমোশন অব বাংলাদেশ আর্ট (এসপিবিএ), ২০১৪।
- মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। 'মাহমুদুল হক'। *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৪০*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৮।
- মাহমুদ আল জামান। *শফিউদ্দিন আহমেদ*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০২।
- মাহমুদ আল জামান। *কাজী আবদুল বাসেত*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪।
- মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। 'রতন মজুমদার'। *কন্টেম্পরারী আর্ট সিরিজ অব বাংলাদেশ-৩২*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪।
- মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। *চকবাজারের কেতাবপট্টি*। ঢাকা, ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০।
- মুহাম্মদ মালিক খসরু। 'সাক্ষাৎকার', দ্র. সাঈদ আহমদ সম্পাদিত, *হামিদুর রাহমান*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭।
- মাহমুদুল হোসেন। 'খ. মোহাম্মদ কিবরিয়া'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মুহম্মদ সিদ্দিক খান। 'মুদ্রণ ও প্রকাশন'। দ্র. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- মুহম্মদ রেজাউল হক। *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯।
- যতীন্দ্রমোহন রায়। *ঢাকার ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*। ঢাকা, বইপত্র, ২০০৭।
- রশীদ আমিন। 'ছাপচিত্র'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- রঘুনাথ গোস্বামী। 'দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- রফিক হোসেন। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা, ইত্যাদি, ২০০৭।
- রফিক হোসেন। *বাংলাদেশের চিত্রকলা*। ঢাকা, ভূমিকা, ২০১৪।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড*। পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড*। পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫।
- রবিউল হুসাইন। 'দেবদাস চক্রবর্তী'। দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৯৩।

- রবিউল হুসাইন। 'হাসি চক্রবর্তী'। *কনটেম্পরারি আর্ট সিরিজ অব বাংলাদেশ-২৪*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮২।
- রফিকুন নবী। 'বৈরী সময়ের আমি'। দ্র. সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *Rafiqun Nabi Quest for Reality*। ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৩।
- রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। 'ছাপাখানা: চীন থেকে চিনসুরা'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *বিশ্বকোষ* (দশম খণ্ড)। পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। দিল্লী, বি আর পাবলিশিং, ১৯৮৮।
- শওকত আলী। 'রাসা'। *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ*-৩৭। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৭।
- শামসুর রাহ্মান। 'কামরুল হাসান : তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র'। দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*। ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০।
- শোভন সোম। 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- শুভেন্দু দাশগুপ্ত। *শিল্পকথামালা*। কলকাতা, সহজপাঠ, ২০১৩।
- শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *শ্রীকান্ত*। ঢাকা, আজকাল, ২০০৪।

- শোভন সোম। 'গ. সফিউদ্দিন আহমেদ'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।

- শোভন সোম। *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*। নিউ দিল্লী, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮।
- শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। *বেথুন সোসাইটি*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৭।
- শ্রীপান্থ। *বটতলা*। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
- শ্রীপান্থ। *যখন ছাপাখানা এল*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬।
- শ্রীপান্থ। 'তলোয়ার বনাম কলম : প্রথম শতবর্ষে'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- শাওন আকন্দ। 'গ্রাফিক ডিজাইন'। দ্র. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, *চারু ও কারু কলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৯।
- শিশির কুমার দাশ। 'সাহেবদের ঠাকুর'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।

- সমরজিৎ রায় চৌধুরী। 'আমাদের নিতুনদা'। দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুণ্ডু স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা, নিতুন কুণ্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭।
- সন্তোষ গুপ্ত। *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প : স্বরূপের সন্ধান*। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৯৭।
- সন্তোষ গুপ্ত। 'শিল্পী কামরুল হাসানের ঠিকানা'। দ্র. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *কামরুল হাসান*। ঢাকা, থিয়েটার, ১৯৯০।
- সনৎকুমার সাহা। 'মুক্তিযোদ্ধার শিল্পরূপ'। দ্র. কাইয়ুম চৌধুরী এবং আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *নিতুন কুণ্ডু স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা, নিতুন কুণ্ডু স্মৃতি পরিষদ, ২০০৭।
- সুকুমার সেন। *বটতলার ছাপা ও ছবি*। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।
- সুকুমার সেন। 'বটতলার বই'। দ্র. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
- সুকুমার সেন। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (১৮০১-১৮৮০)*। প্রথম আনন্দ সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০১।
- সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান। *উয়ারী বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*। ঢাকা, প্রথমা, ২০১২।
- সোমব্রত সরকার। *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, নিউ এজ, ২০১৫।
- সোফিয়া রহমান। 'প্রকাশিকার কৈফিয়ৎ'। দ্র. রাজিয়া খান রচিত, *বটতলার উপন্যাস*। ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৫৯।
- সৈয়দ আজিজুল হক। *কামরুল হাসান*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩।
- সৈয়দ আলী আহসান। 'আবদুস সাত্তার'। *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ*-২৯। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। *মোহাম্মদ কিবরিয়া*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪।
- সৈয়দ আমজাদ আলী। 'চিত্র শিল্প'। আব্দুল হক অনূদিত। দ্র. শেখ মোহাম্মদ ইকরাম সম্পাদিত, *পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*। করাচি, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ১৯৫৪।
- স্বপন বসু। 'ভূমিকা'। দ্র. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭।
- হাশেম খান। *জয়নুল আবেদিনের সারাজীবন*। ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৩।
- হাসনাত আব্দুল হাই। *মুর্তজা বশীর : তাঁর জীবন ও সৃষ্টি*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪।

- হাসনাত আব্দুল হাই। *মুর্তজা বশীর : তাঁর জীবন ও সৃষ্টি*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪।
- হাসি চক্রবর্তী। *রেখা ও লেখায়*। ঢাকা, মুক্তধারা, ২০১৩।

ইংরেজি গ্রন্থাবলি

- Appasamy, Jaya. *Abanindranath Tagore and the art of his times*. New Delhi, Lalit Kala Academi, 1968.
- Ambedkar, B. R.. *Pakistan or the Partition of India*. (Third Edition). Bombay, Thacker & Co. Ltd., 1946.
- Asuncion, Josep. *The Complete Book of Papermaking*. NewYork, Lark Books, 2001.
- Bamber, Gascoigne. *How to Identify Prints*. Reprinted edition. Spain, Thames and Hudson, 1991.
- Colin, Gale. *Printmaking Handbook Etching and Photopolymer intaglio Techniques*. Reprinted edition. Great Brtain, A & C Black, 2009.
- Chamberlain, Walter. *The Thames and Hudson Manual of etching and engraving*. Reprinted edition. London, Thames and Hudson, 1992.
- Chamberlain,Walter. *The Thames and Hudson Manual of Woodcut Printmaking and related techniques*. London, Thames and Hudson, 1978.
- Coomarswamy, Ananda K.. *History of Indian and Indonesian Art*. New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1972.
- De La Croix, Horst, Richard G. Tansey and Diane Kirkpatrick edited, *Art through the Ages*. Ninth edition. New York, Harcourt Brace College Publishers, 1991.
- Denvir, Bernard. 'Impressionism'. in David Britt edited, *Modern Art*. London, Thames and Hudson, 1974.

- Devnir, Bernard. 'Fauvism and Expressionism'. in David Britt edited, *Modern Art*. London, Thames and Hudson, 1974.
- Eichenberg, Fritz. *The Art of the Print*. London, Thames and Hudson, 1976.
- Griffiths, Antony. *Prints and Printmaking An introduction to the history and techniques*. London, British Museum Press, 1996.
- Gombrich, E. H.. *The Story of Art*. Sixteenth edition. New York, Phaidon Press, 1995.
- Ghosh, G.K.. and Shukla Ghosh. *Indian Textiles: Past and Present*. New Delhi, APH Publishing, 1995.
- Honour, Hugh & John Fleming. *A World History of Art*. Third edition. London, Laurence King, 1984.
- Haque, Syed Azizul. 'A pilgrim's quest for art'. in Rosa Maria Falvo (ed.), *Safiuddin Ahmed*. Italy, Skira and Bengal foundation, 2011.
- Havell, E. B.. *Indian Sculpture and Painting*. London, John Murray, 1908.
- Interviews by Karim, Ziaul. 'Mohammad Kibria: A leader of Modernism'. in Islam Sayed Manzoorul & Azra J Ahamed edited, *Contemporary Art in Bangladesh Special Volume: Arts & The Islamic World*. No 34, Autumn 1999.
- Islam, Sayed Manzoorul. 'Abul Barq Alvi'. in *Bangladesh Art Collection of Contemporary Paintings*. Dhaka, Society for Promotion of Bangladesh Art, 2003.
- Interviews by Karim, Ziaul. 'Rokeya Sultana: A Truly Female Voiace'. in Islam Sayed Manzoorul & Azra J Ahamed edited, *Contemporary Art in Bangladesh Special Volume: Arts & The Islamic World*. No 34, Autumn 1999.

- Ishida, Mosaku. *Japanese Buddhist Prints*. New York, Harry N. Abrams,1964.
- Islam, Mustafa Nurul. *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in The Bengali Press 1901-1930*. Dhaka, Bangla Academy, 2003.
- James, Philip. *English Book Illustration 1800-1900*. London, The King Penguin, 1947.
- Kleiner, Fred S.. *Gardner's Art through The Ages A Global Histroy*. Thirteen edition. New York, Thomson Wards worth, 2009.
- Khan, Mofakhkhar Hussain. *The Bengali Book History of Printing and Bookmaking*. Dhaka, Bangla Academy, 2001.
- Kowshik, Dinkar. *Blossoms of Light Some Reflections on Art in Santiniketan*. Calcutta, Visva-Bharati, 1980.
- Mukhopadhyay, Amit and Nirmalendu Das. 'Graphic Art in India : 1850 to 1950 (A Brief Background and History)'. *Graphic Art in India Since 1850*. New Delhi, Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan, First edition-September 1985.
- M. Hind, Arthur. *An Introduction to a History of Woodcut*. NewYork, 1963. vol-1.
- Mockintosh, Alastair. 'Symbolism and Art Nouveau'. in David Britt edited, *Modern Art*. London, Thames and Hudson, 1974.
- Mitter, Partha. *Indian Art*. New York, Oxford University Press, 2001.
- Mitter, Partha. *Art and Nationalism in Colonial India1850-1922: Occidental Orientations*. New York, Cambridge University Press, 1994.
- Neumayer, Erwin. and Christine Schelberger. *Popular Indian Art Raja Ravi Varma and The Printed Gods of India*. New Delhi, Oxford University Press, 2003.
- N. Gajjar, Irene Ph. D.. *Anciant Indian Art and the West*. Bombay, D. B. Taraporevala, 1971.

- Ray, Pranabranjan. 'Early Graphic Arts in Bengal'. in Jaya Appasamy edited, *Lalit Kala Contemporary-18*. New Delhi, Lalit Kala Akademi.
- Rayner, John. *A Selection of engravings on wood by Thomas Bewick*. London and New York, The King Penguin Books, 1947.
- Rothenstein, Michael. *Relief Printing*. New York, Watson-Guptill Publications, 1970.
- Report- Publications issued and Registered in the several provinces of British India. during the year 1887, 1889, 1894 & 1898. Culcatta: Office of the Superintend of Government Printing, India.
- Ray, Pranab Ranjan. 'Print making by wood block up to 1901: A social and Technological History'. in Ashit Paul edited, *Woodcut Prints of Nineteenth century Calcutta*. Calcutta, Seagull Books, 1983.
- Schwarte, P. R.. *Printing on cotton at Ahmedabad India in 1678*. Ahemadabad, Calico Museum of Textiles, 1969.
- Shaw, G.W.. 'Printing and Publishing in Dhaka1849-1900'. in Sharif uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future*. Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1991.
- Swann, Peter. *Art of China Korea and Japan*. London, Thames and Hudson, 1963.
- Verhoogt, Robert. *Art in Reproduction, Ninteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tedma, Jozef Israels and Aryscheffer*. Netherland, Amsterdam University Press, 2007.
- Wilson, Simon. 'Pop'. in David Britt edited, *Modern Art*. London, Thames and Hudson, 1974.

সংবাদ-সাময়িকী, অপ্রকাশিত রচনা ও প্রদর্শনীর ক্যাটালগ

- অধ্যাপক শোভন সোম। ‘সাকিন কলকাতা পটের পিছনে পটুয়া’। দ্র. নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, *ঐকতান*। ৫ম বর্ষ, শারদসংখ্যা, ১৯৯১।
- অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী। ‘পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি’। *মাহে-নও*, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৪।
- অমিয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী। ‘প্রথম চিত্র-কলা প্রদর্শনী’। *দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭।
- অসীম রায়। ‘প্রদর্শনী’। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৬ অক্টোবর ’৭৯।
- আবুল মনসুর। ‘বাঙাল শিল্পীর সৃজন-উদ্যম রূপ-রূপান্তরের ছয় দশক’। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।
- আবুল মনসুর। ‘রণজিতের চিত্রকর্ম : পশ্চাৎভূমি ও অবয়বের সম্পর্কসূত্র’। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৯।
- আবুল মনসুর। ‘নির্বস্তুকতার ভিতর-বাহির’। *কালি ও কলম*, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০১৩।
- আবুল মনসুর। ‘সুন্দরের সম্মোহন আর ভাবরাজ্যের দয়াল শিল্পী’। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।
- আবুল মনসুর। ‘সর্বশেষ কুলপতির প্রস্থান’। *কালি ও কলম* (সফিউদ্দিন আহমেদ সংখ্যা), ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১২।
- আল মাহমুদ। ‘সৈয়দ জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী’। *সমকাল*, ২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫।
- আল মাহমুদ। ‘সৈয়দ জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী’। *সমকাল*, ২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫।
- আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। ‘চিত্র প্রদর্শনী’। *মাসিক দিলরুবা*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩৫৮।
- আজরা জামান। ‘সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা’। *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২।
- আজরা জামান। ‘সমসাময়িক পাকিস্তানী চিত্রকলা’। *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৫২।
- আব্দুল মতিন সরকার। ‘একজন শিল্পীর প্রতিকৃতি : শফিউদ্দীন আহমেদ’। *শিল্পকলা*, ৬ষ্ঠ-১০ম বর্ষ (যুক্তভাবে), ১ম-২য় সংখ্যা (সকল বর্ষের যুক্তভাবে), ১৩৮৯-১৩৯৪।
- আব্দুল্লাহ আল-মুতী। ‘শিল্পী জয়নুল আবেদীন’। *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫২।
- আবদুল্লাহ আল-মুতী। ‘শিল্প-প্রদর্শনী আমি এবং আরও অনেকে’। *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭।
- আব্দুর রশীদ খান এম. এ.। ‘পূর্ব-পাকিস্তানের পুস্তক প্রকাশনা’। *মাহে-নও*, ১১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬০।

- আবুল আহসান চৌধুরী। "এডিটর মহাশয়' কাঙাল হরিনাথ'। দ্র. রিদওয়ান আক্রাম সম্পাদিত, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ২০১৭।
- আহমদ ছফা। 'বাঙালী মুসলমানের মন'। *সমকাল*, ১৮শ বর্ষ, নবপর্যায় : ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮২।
- আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'ঢাকা গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী'। *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭।
- আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। 'চিত্র প্রদর্শনী'। *মাসিক দিলরুবা*, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮।
- ইনাম আল হক। 'এর চেয়ে সহজ সম্ভব আর কিছু দেখেছি কি?'। *কালি ও কলম*, '৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৭।
- এছলামাবাদী। 'আলোচনা (সাহিত্যের গতি)'। *আল-এছলাম*, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭।
- এনায়েত আলম। 'চট্টগ্রামে জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী'। *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪।
- ওয়াকিলুর রহমানের বক্তব্য। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি কায়ায় অনুষ্ঠিত 'ওমিশন অ্যান্ড এডিশন' শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- কসিমউদ্দীন মোল্লা। 'মুসলমান সমাজ ও পাকিস্তান আন্দোলন'। দ্র. আবদুল করিম সম্পাদিত, *ইতিহাস পত্রিকা*, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৪।
- কাজী নজরুল ইসলাম। 'যৌবনের ডাক'। *সওগাত*, ৫৪শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩৭৮।
- কামরুল হাসান। 'পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা'। *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪।

- কামরুল হাসান। 'পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা'। *সমকাল*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৪।

- খান মাহাবুব। 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের পথচলা'। *দৈনিক ইত্তেফাক* ৩১ জানুয়ারি ২০১৪, অনলাইন সংস্করণ।
- চানক্য বাড়ৈ। 'ছাপচিত্রের যাত্রাপথ'। *মাসিক উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৯ (নব পর্যায়), চৈত্র সংখ্যা ১৪১৬।
- চারুবাক। 'নবীনের কারুকাজ'। *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৬ আগস্ট ১৯৯১।
- চিত্রদর্শী। 'পাকিস্তানী চিত্রশিল্পীদের সাম্প্রতিক চিত্রকলা'। *মাহে-নও*, ১১বর্ষ, ১ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫৯।
- চিত্রপ্রিয়। 'স্বপন চৌধুরী : চিত্রশিল্পে নতুন কণ্ঠস্বর'। *রোববারের দৈনিক বাংলা*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩।
- চিত্রবাক গৃহীত মুর্তজা বশীরের সাক্ষাৎকার। 'শিল্পী মুর্তজা বশীর ও বাংলাদেশের রমণী'। *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৯৭৪।
- চিত্র-দর্শী। 'চিত্র প্রদর্শনী'। *সমকাল*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৫।

- ‘জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী’ ১৯৭৬’। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪র্থ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৫ মার্চ ১৯৭৬।
- জাফরিন গুলশান। ‘বহুবর্ণিল জটিলতার সরল স্বীকারোক্তি’। *সাহিত্য সাময়িকী* (দৈনিক প্রথম আলোর শুক্রবারের ক্রোড়পত্র), ২২ জুন ২০১২।
- জালালউদ্দীন আহমদ। ‘ চিত্রকলা : তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠী’। *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬২।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘সাদাকালোর আলো-আঁধার’। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৬।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘বর্ণনিরপেক্ষতার নিবিড় প্রকাশ’। *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘অচেনালোকের অচিন শিল্পকলা’। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৬।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘কিংবদন্তি নিয়ে শিল্পের পথচলা’। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘শিল্পে বর্ণে ঐকতান’। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘বাস্তবানুগ ছবির অনন্য জগৎ’। *শিল্পসাহিত্য* (দৈনিক প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র), ২২ এপ্রিল, ২০১৬।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘জি. এস. কবিরের একক’। *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৯ অক্টোবর ১৯৯০।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘আদিগন্ত নিসর্গে নির্জনতার আলো’। *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮।
- জাহিদ মুস্তাফা। ‘ধ্রুপদী গতির শাহাবুদ্দিন’। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।
- ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ। ‘কাল-বিভাগের ধারা’। *প্রবাসী*, ৪৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫১।
- ড. বজলুর রশীদ খান (রশীদ আমিন)। ‘বাংলাদেশের ছাপচিত্রঃ উৎস-কথা ও পরম্পরা’। *ফাইন আর্ট*, ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৫।
- ঢালী আল মামুন। ‘বাস্তবতা যেন উপাখ্যানের সমান্তরাল’। *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৫।
- *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি, ২০১৫।
- নজরুল ইসলাম। ‘কামরুল হাসানের চিত্রকলায় নারী’। *সংবাদ*, ৪৫শ বর্ষ, ২৫৬ তম সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

- নজরুল ইসলাম। 'মোহাম্মদ কিবরিয়া : শ্রদ্ধাঞ্জলি'। *কালি ও কলম*, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১।
- নজরুল ইসলাম। 'আমি নিজে শিল্পকর্ম করে যত আনন্দ পাই, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই শিল্পকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, জীবনে প্রবিষ্ট হতে দেখলে: শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার'। *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ মার্চ '৭৪।
- নজরুল ইসলাম। 'সমকালীন নন্দন চৈতন্যে আত্ম অন্বেষা : দ্বাদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ১৯৯৬। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১৭ জানুয়ারি '৯৬।
- নজরুল ইসলাম। 'শৈল্পিক শক্তিমত্তায় "জয় বাংলা"'। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯।
- নাজির আহমেদ। *আমার ছাপচিত্রের জগৎ*। অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- নাসিমা হক। 'মনিরুল ইসলাম সংবেদনশীলতা মূর্ত যাঁর ক্যানভাসে'। *কালি ও কলম* (চিত্রকলা সংখ্যা), ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।
- নাসিমুল খবির। 'প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সমকালীন ভাস্কর্য'। *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- নাসিমুল খবির। 'আঁধারের রূপ সন্ধান হামিদুজ্জামান খানের বিংশতম শিল্পকর্ম-প্রদর্শনী'। *কালি ও কলম*, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০১০।
- নাসিমুল খবির ডিউক। 'যোগ ও বিয়োগের যুগলবন্দী'। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৯।
- নাহীদ আখতার। 'শহিদ কবীরের চিত্র-প্রদর্শনী'। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৮।
- নিসার হোসেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- নিসার হোসেন। 'প্রতিস্বিকতার শিখরে: রফিকুন নবীর উডকাট'। দ্র. মো: জহিরুদ্দিন সম্পাদিত, *ছাপাই ছবির চার পথিকৃত*। ঢাকা, গ্যালারি চিত্রক, ২০০৩।
- প্রণবরঞ্জন রায়। 'জিজ্ঞাসায় কিবরিয়ার ছবি'। *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১।
- প্রণব রঞ্জন রায়। 'বাংলাদেশর চারুকলা'। *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
- ফখরুজ্জামান চৌধূরী। 'পূর্ব পাকিস্তানের চিত্রকলা'। *মাহে-নও*, ১৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬২।
- ফখরুজ্জামান চৌধূরী। 'সাম্প্রতিক চিত্রপ্রদর্শনী'। *মাহে-নও*, ১৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩।

- ফখরুজ্জামান চৌধূরী। 'সফিউদ্দিন আহমেদ'। *মাহে-নও*, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৭০।
- ফজলুল করিম। 'আবদুস সাত্তার ও তার সাম্প্রতিক চারুকলা'। *দৈনিক বার্তা*, রাজশাহী, ৪ঠা পৌষ, ১৩৮৩।
- ফয়েজুল আজিম। 'রশিদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রামে শিল্পান্দোলন'। *শিল্পকলা*, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২।
- বদরুদ্দীন উমর। 'পর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসনের প্রথম অধ্যায়'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮০।
- বদরুদ্দীর উমর। 'বাঙলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা'। *সংস্কৃতি*, ডিসেম্বর, ১৯৮৩।
- বদিউল আলম মজুমদার। 'হরতাল নয়, প্রয়োজন সংলাপ ও সমঝোতা'। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ২০১৫।
- বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। 'চিত্রকলার তিন বছর'। *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১।
- বুলবন ওসমান। 'চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় : রজত জয়ন্তীতে'। *বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৫ মার্চ'৭৪।
- বুলবন ওসমান। 'চারুকলা প্রদর্শনী- ১৯৭৬ : একটি সমীক্ষা'। *সমকাল*, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮২।
- বুলবন ওসমান। 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত'। *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'চেতনার এক রাঙা ভাষণ'। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত *ওয়াকিল* শীর্ষক ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'নিঃসঙ্গতার জ্যামিতি'। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত *ইমেজ অব লাইফ অ্যান্ড টাইম* শীর্ষক একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'বর্ণের মধু ও কাগজের আর্তনাদ'। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'আনিসের ছাপচিত্রে দালানের ব্যবচ্ছেদ'। *কালি ও কলম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।
- মইনুদ্দীন খালেদ। 'উডকাট গীতিকা'। *কালের খেয়া* (দৈনিক সমকালের শুক্রবারে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র), ১৪ আগস্ট ২০০৯।

- মইনুদ্দীন খালেদ। ‘কিবরিয়ার শিল্প মানব-অস্তিত্বের পুরাতত্ত্ব’। *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১।
- মইনুদ্দীন খালেদ। ‘শহিদ কবির : বিদ্রোহী, মরমি, ইন্দ্রিয়প্রবণ’। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *তোমার পরে ঠেকাই মাথা* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- মতলুব আলী। ‘রঙ ও রেখায় আলমগীরের শিল্প-অন্বেষা’। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সাজু আর্ট গ্যালারিতে শিল্পীর ১২১টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ক্যাটালগ।
- মতলুব আলী। ‘প্রত্যাখ্যান’। *শিল্পতরু*, ৩য় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯১।
- মতলুব আলী। ‘ঐতিহ্যের পটভূমিতে আবেদিনের চিত্রশিল্প : জলরঙে তাঁর উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকসমূহ’। *শিল্পকলা*, ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৩।
- মতিউর রহমান। ‘আমাদের কাইয়ুম ভাই’। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ নভেম্বর, ২০১৫।
- মনসুর-উল-করিম। কলকাতার চিত্রকূট গ্যালারিতে আয়োজিত ‘লাবণ্য এ বাংলায়’ শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- মার্টিমার হুইলার। ‘চার হাজার বছর আগে পাকিস্তান’। *মাহে-নও*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৪৯।
- *মাসিক দিলরুবা*, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭।
- মাসুম সায়ীদ। ‘এপারের বটতলা’। দ্র. ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদিত, *অবসরে*। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
- মাহমুদ আল জামান। ‘শান্তির অন্বেষায় শিল্পী’। *কালি ও কলম*, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।
- মাহবুব জামাল জাহেদী। ‘ঢাকা আর্ট ইনষ্টিটিউট’। *মাহে-নও*, ১৩বর্ষ, ৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬১।
- মাহবুব জামাল জাহেদী। ‘সমকালীন চিত্রকলা’। *মাহে-নও*, ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬২।
- মাহমুদ শাহ কোরেশী। ‘রশিদ চরিত-কথা’। *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, অক্টোবর ’৮৭-মার্চ, ১৯৮৮।
- মিজারুল কায়েস। ‘কালিদাস কর্মকার : নিমগ্ন নিরন্তর’। *কালি ও কলম* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৯।
- মুনতাসীর মামুন। ‘প্রদর্শনী’। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি ’৮০।
- মুনতাসীর মামুন। ‘প্রদর্শনী’। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৭ মার্চ ’৮০।
- মুর্তজা বশীর। ‘চিত্র পরিকল্পনা’। *ইত্তেফাক সাময়িকী* (দৈনিক ইত্তেফাকের শুক্রবারের ক্রোড়পত্র), ২৯-০৭-২০১৬।
- মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্। ‘আমাদের সাহিত্য’। *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮।

- মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। 'হৃদয়ের মাঝে নিয়েছে ঠাঁই'। *দৈনিক বাংলা*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
- মোহাম্মদ আকরম খাঁ। 'চিত্রকলা ও এছলাম'। *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৩৩৭।
- মোহাম্মদ আবদুস সালাম। *ছাপচিত্র (সমকালিনতা, আমাদের উত্তরণ) ও আমার শিল্প ভাবনা*। অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মো. আবদুস সোবাহান। *বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : সফিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮-২০০৮)*। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)।
- মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। '"সওগাত" এর ইতিবৃত্ত'। *সওগাত*, ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। 'ইস্‌লাম ও মিশন'। *আল্‌-এস্‌লাম*, ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫।
- মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌। 'মুসলমান বাংলার জাগরণ : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ'। *মাহে-নও*, ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭২।
- মোহাম্মদ হেদায়েত্‌ উল্লা। 'ভারতীয় কার্পাসশিল্প'। *প্রবাসী*, ৫ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১২।
- রনি আহমেদ। 'নারীর বিনির্মাণ'। *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৫।
- রনি আহম্মেদ। 'রঙের উৎসবে রং'। *কালি ও কলম*, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৫।
- রনি আহম্মেদ। 'প্রকৃতির মানচিত্র'। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৬।
- রফিকুল হক রফিক। *একই আলিঙ্গনে ছবি আর কবিতা : আমার ছাপচিত্র*। অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- রফিকুল ইসলাম। 'বাংলাদেশের নারীশিল্পী'। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।
- রফিকুন নবী। 'বর্ণান্বেষী কবির অন্তর্ধান'। *কালি ও কলম* (মোহাম্মদ কিবরিয়া সংখ্যা), ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১১।
- রবিউল হুসাইন। 'সাদা-কালোর চিত্রকাব্য'। *কালি ও কলম*, ৪র্থ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮।
- রবিউল হুসাইন। 'শিশিরের রৈখিক ভ্রমণ গীতল দৃশ্যকাব্য ও তার প্রতিরূপ'। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০০৮।
- রবিউল হুসাইন। 'অবাস্তব বাস্তবতার রূপকার'। *কালি ও কলম*, ৮ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২।
- রশিদ চৌধুরী। 'এ যুগে শিল্পকলার ব্যবহার'। *বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী* '১২। চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটালগে প্রকাশিত।
- রশীদ আমিন। 'কে পারে মনে অতল গহীন ছুঁতে কে পারে আপনারে চিনিতে .....'। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আয়োজিত একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।

- লায়লা শার্মিন। *আমার ছাপচিত্র : লিথোগ্রাফ ও উডকাঠ*। অপ্রকাশিত এমএফএ অভিসন্দর্ভ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- শাহমান মৈশান। 'সমকালীন শিল্পের ঐকতান'। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৬।
- 'শিল্পকলা'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪র্থ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৪ মে '৭৬।
- শোভন সোম। 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়'। *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২।
- শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 'বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র'। *প্রবাসী*, ৩৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।
- শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা। 'কলা বিদ্যা'। *প্রদীপ*, ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।
- শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'খোদাই-চিত্রে বাঙালী'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬।
- শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'চিত্রকলা শিখতে বিলাত যাত্রা'। *প্রবাসী*, ৪১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮।
- শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। 'ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা'। *প্রবাসী*, ৩৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪।
- শ্রীসজনীকান্ত দাস। 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫।
- শ্রীসজনীকান্ত দাস। 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২)'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৫।
- সন্তোষ গুপ্ত। 'সমসাময়িক চিত্রকলা ও কয়েকজন শিল্পী'। *মাহে-নও*, ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৬।
- সন্তোষ গুপ্ত। 'আমাদের চিত্রশিল্পের গতি-প্রকৃতি'। *মাহে-নও*, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৬৬।
- সন্তোষ গুপ্ত। 'কয়েকজন বিদ্রোহী শিল্পী ও শিল্প-চেতনা'। *মাহে-নও*, ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৭।
- সন্তোষ গুপ্ত। 'দুটি চিত্র প্রদর্শনী (একটি বিপন্ন বিস্ময় : মূর্তজা বশির)'। *মাহেনও*, ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ১৯৬৭।
- সরোয়ার জাহান চৌধুরী লিখিত বেঙ্গল গ্যালারি অব্ ফাইন আর্টসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *রোকেয়া* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- সলিমুল্লাহ খান। 'প্রদর্শনী'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১১ জুলাই, ১৯৮৬।

- সলিমউল্লাহ খান। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জাতীয়তা না সাম্প্রদায়িকতা?'। *আজকের কাগজ*, ২১-১২-১৯৯১।
- সাঈদ আহমদ। 'বাংলাদেশের চিত্রকলা'। *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৪।
- সাদত আলী আখন্দ। 'বাঙ্গালী'। *সওগাত*, ৫৪শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৮।
- সাদেক খান। 'তরুণ শিল্পী সম্প্রদায়ের রোজনামচার এক অধ্যায়'। *সমকাল* ১ম বর্ষ, ৭-৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৪।
- সালাহ্উদ্দীন আহমদ। 'বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ'। দ্র. মতিউর রহমান সম্পাদিত, *শিল্পসাহিত্য* (দৈনিক প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র)। ২ অক্টোবর, ২০১৫।
- সিরাজুল ইসলাম। 'চিত্রকলা-প্রদর্শনী প্রসঙ্গে'। *সওগাত*, ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯।
- সিরাজুল ইসলাম কাদির। 'স্বল্প প্রদর্শনীর বছর'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৮ জানুয়ারি '৮৮।
- সিরাজুল ইসলাম কাদির। 'প্রদর্শনী'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৪ আগস্ট '৮৯।
- সিরাজুল ইসলাম কাদির। 'নবম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী : রফিকুন নবীর একাডেমীর পুরষ্কার লাভ'। *বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৫ ডিসেম্বর '৮৯।
- সিরাজুল ইসলাম কাদির। 'প্রদর্শনী'। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২২ ডিসেম্বর '৮৯।
- সেলিম এম রফিক। 'ঝরাপাতা আমি তোমারই দলে'। *কালি ও কলম*, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে ২০০৬।
- *সৌরভ*, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।
- সৈয়দ আজিজুল হক। *কামরুল হাসানের শিল্প ও শিল্পচেতনা*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩।
- সৈয়দ আজিজুল হক। 'সফিউদ্দীন আহমেদ : চারুশিল্পের এক অনন্য সাধক'। *শিল্পরূপ*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'আমাদের চিত্রকলায় নারীভাবনা'। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'নিসর্গের সঙ্গে প্রাণের খেলা'। *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০৮।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'কিবরিয়া স্মরণে'। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল শিল্পালয় আয়োজিত 'শ্রদ্ধার্ঘ্য কিবরিয়া' শীর্ষক একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।

- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'কামরুল হাসানের চিত্রকলা'। *শিল্প ও শিল্পী*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- হামিদুর রাহমান। 'আর্ট ও পূর্ব-পাকিস্তান'। *অগত্যা*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৯৫০।
- হাসান হাফিজ। 'মাহমুদুল হকের ছাপচিত্র'। *রোববার*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২।
- ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস।
- ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগ।
- ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিয়র।
- ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে কিবরিয়া ছাপচিত্র মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা।
- Ahsan, Syed Ali. 'Art in Bangladesh : A short note'. *Shilpakala*, Vol. 3, 1980.
- Ahmad, Shadab. 'An artist for whom technique is not important'. *The Frontier Post.* 1988.
- Ahmad, Sayeed. 'An Inner Gaze'. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আলিয়ঁস ফ্রঁসেস, ঢাকায় অনুষ্ঠিত রতন মজুমদারের একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Alam, Mahboob. 'eurpean artists in Bengal (1760-1824)'. in Luva Nahid Chudhury edited, *Jamini*. Vol. 2, No. 3, 2005.
- Al-Mamun, Dhali. 'Towards Simplicity'. ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যেটে ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত *ওয়াকিল* শীর্ষক ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Anisuzzaman. '*These I remember ...*'. ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারিতে আয়োজিত *বহুবর্ণিল জটিলতা* শিরোনামের প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Bose, Melia Belli. 'A mother's Love, A Woman's Journey: the Art of Rokeya Sultana'. ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত *রোকেয়া* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Ghosh D. P.. 'The copper-plate engravings of ancient Bengal and the source of south east Asian art'. in Enamul Haque edited, *Bangladesh Lalit Kala*. Vol. 1, No. 1, Dacca, Dacca Museum, January 1975.
- Haque, Fayza. 'A Pageant of Unforgettable Prints', *The Star* (a weekly publication of daily star), vol 13, issue 606, Dhaka, 2 january, 2009.

- Haque, Rafi. 'Some Words About Work and Technique'. ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Hossain, Md. Mosharraf. 'Recent discovery of a hord of punch-marked coins at Mahasthangarh'. in Enamul Haque edited, *Journal of Bengal Art*. ঢাকা, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, 1999, Vol. 4.
- Husain, Rabiul. 'A pleasant visual world of Rafi Haque'. ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Islam, Nazrul. 'Contemporary Art in Bangladesh'. *Shilpakala*, Vol. 4, 1981.
- Jalil, Javed. 'Lifted Shadows and Broken lines'. ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি ২১-এ অনুষ্ঠিত *Deep Print* শিরোনামের ছাপচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Jahangir, B. K.. 'Portrait of a Painter : Kalidas Karmakar'. *Alluvial Diary* শিরোনামের একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।
- Rashid Amin. 'Pioneers of Printmaking in Bangladesh'. ২০১২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালারি চিত্রক আয়োজিত *Eminent Printmakers of Bengal* শিরোনামের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় প্রকাশিত।
- Rashid, M. H.. 'Murtaja Baseer : The odyssey of a lonely soul'. *Shilpakala*, Vol. 2, 1979.
- Shifa, Farhana. 'Print-making Department'. *Art*, Vol. 4. No. 2. October-December, 1998.
- Sultan, Rokeya. 'Words on Fata Morgana'. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত *ফাতা মরগানা* শীর্ষক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত।

<u>অন্তর্জাল সূত্র</u>

- http://www.douglasetaylor.net/html/about_printmaking.htm
- https://www.researchgate.net/publication/273042625_Sexual_Dimorphism_in_European_Upper_Paleolithic_Cave_Art

- http://www.villageprint.com/wood-blocks-3d-printg-brief-history-print/
- http://www.chinatravel.com/facts/china-engraved-block-printing-technique.htm
- http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMzFfMTRfNF8yNF8xXzEwNTE3MQ==
- http://old.dhakatimes24.com/2014/10/01/38902
- https://tokyoandjapan.wordpress.com/tag/okomura-masanobu-and-suzuki-harunobu/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bois_Protat
- https://en.wikipedia.org/wiki/Godefroy_Engelmann
- https://en.wikisource.org/wiki/Hullmandel,_Charles_Joseph_(DNB00)
- http://www.pablopicasso.org/picasso-and-chagall.jsp
- http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
- http://www.kaliokalam.com/2013/10/12/ঢাকা-স্মৃতি-বিস্মৃতির-নগ/
- http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx
- www.shilpaoshilpi.com/?P=484
- http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=printmaking-in-the-city-of-joy&iid=23&artieleid=597
- http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=under-the-banyan-tree-the-woodcut-prints-of-19th-century-calcutta&iid=34&articleid=101
- http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23&articleid=593
- http://www.shilpaoshilpi.com/নভেরা-আহমেদ/
- http://www.shilpaoshilpi.com/সমরজিৎ-রায়-চৌধুরী-তাঁর-পর/
- http://www.shilpaoshilpi.com/রফিকুন-নবীর-সাক্ষাৎকার/
- http://arts.bdnews24.com/?p=6324

- http://www.bd-pratidin.com/various/2015/08/21/101256
- http://www.shilpaoshilpi.com/মনিরের-চিত্রশিল্প-রং-ও-রে/
- http://www.shilpaoshilpi.com/রফিকুন-নবীর-সাক্ষাৎকার/
- http://www.prothom-alo.com/life-style/article/375082/কাল-থেকে-কালিদাস-কর্মকারের-‘পাললিক-আত্মা’
- http://www.bengalfoundation.org/?review=নারীর-পজিটিভ-পাওয়ার-আমাক

চিত্রাবলি

চিত্র ১: আজ থেকে প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে ফ্রান্সের চাওভেট গুহায় মনুষ্য নির্মিত হাতের ছাপ

চিত্র ২: অদ্যাবদি প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রিত পুঁথির নমুনা 'হীরক সূত্র', কাঠ খোদাই, ৮৬৮

চিত্র ৩: কাৎসুসিকা হকুসাই, *টাগো বে*, ২৪.৮ x ৩৬.৮ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৮৩০-৩১

চিত্র ৪: পঞ্চদশ শতকে কাঠ খোদাই মাধ্যমে মুদ্রিত খেলার তাস

চিত্র ৫: আলব্রেচ ডুরার, *চার অশ্বারোহী* (অ্যাপোক্লিপস্), কাঠ খোদাই, ১৪৯৮

চিত্র ৬: রেমব্রান্ডট ভন রিজন, *খ্রিস্টের ধর্ম প্রচার*, ২৮ x ৩৯.৪ সেমি., এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৬৪৬-৫০

চিত্র ৭: ফ্রান্সিসকো ডি গইয়া, *যুদ্ধের বিপর্যয়*, ১৪ x ১৬.৭ সেমি., এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৮১০

চিত্র ৮: এদগার দেগা, *অন দ্য ব্যারে*, ২৬.৫ x ২০.৫ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৮৮৮-৮৯

চিত্র ৯: পল গগ্যাঁ, *মরুরু (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উৎসর্গ)*, কাঠ খোদাই, ১৮৯৩-৯৪

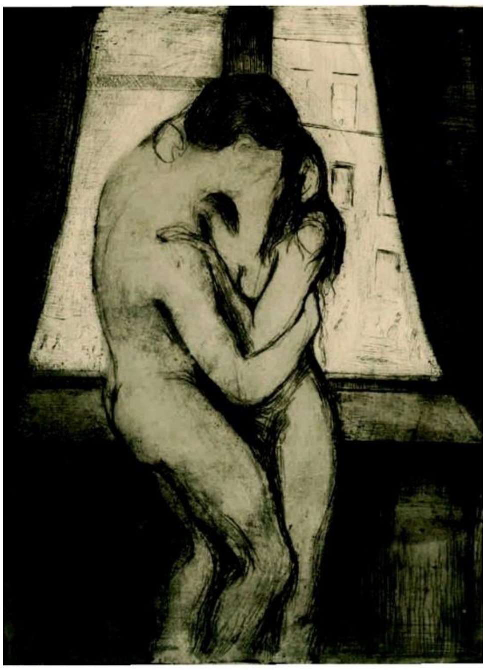

চিত্র ১০: এডওয়ার্ড মুঙ্খ, *দ্য কিস্*, ৫৫.৮ x ৪৪.১ সেমি., এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৮৯৫

চিত্র ১১: হেনরি দ্যা তুলুজ লুত্রেক, *La Goulue, Meulin Rouge*, ১৯১ x ১১৭ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৮৯১

চিত্র ১২: ক্যাঁথে কোলউয়িথস, যুদ্ধ, ৪৭.৬ x ৬৫.৯ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯২৩

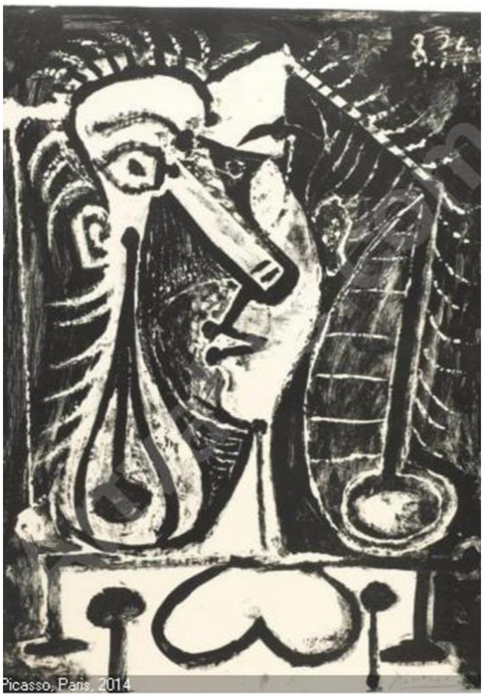

চিত্র ১৩: পাবলো পিকাসো, *Figure composée. I,* ৬৫ x ৫০ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৪৯

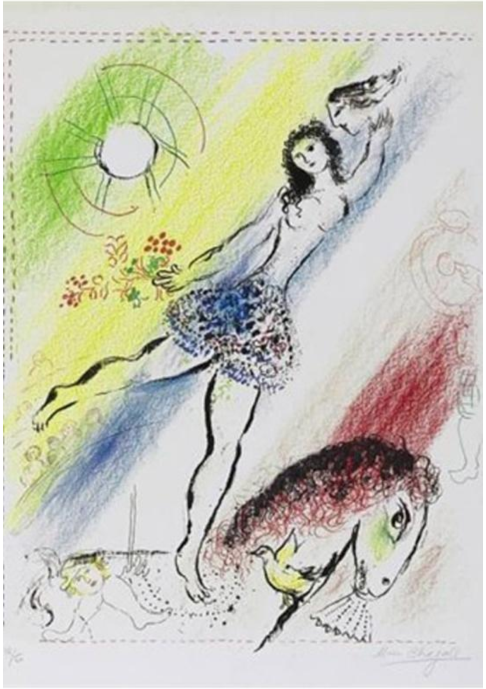

চিত্র ১৪: মার্ক শাগাল, *সার্কাস গার্ল রাইডার*, ৭৫.৭ x ৫৬.১ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৬৪

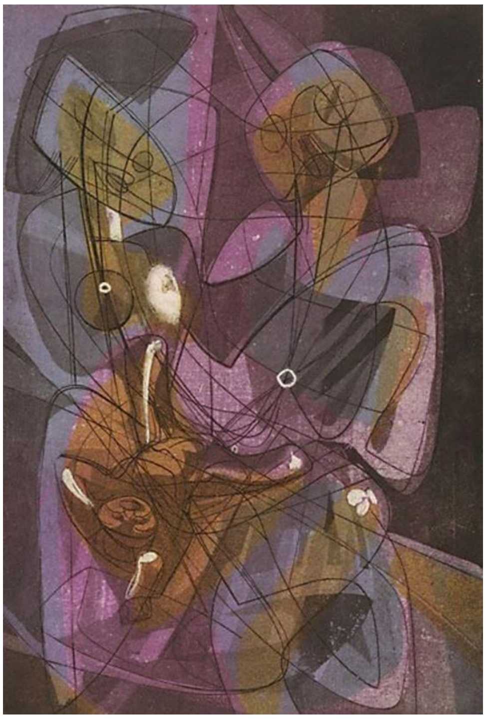

চিত্র ১৫: উইলিয়াম হেইটার, *জাপানি পরিবার*, ৩৫.৯ x ২৪.৩ সেমি.,ধাতু খোদাই ও সফ্‌ট গ্রাউন্ড এচিং, ১৯৫৫

চিত্র ১৬: রবার্ট রাউশ্যান বার্গ, *শিরোনামহীন*, ১৫২.৪ x ১০১.৬ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৯০

চিত্র ১৭: অ্যান্ডি ওয়ারহোল, *ওয়ারহোল এবং জাগার* ১৯৭৫, ১১০.৫ x ৭৪.৯ সেমি., সেরিগ্রাফ, ১৯৭৫

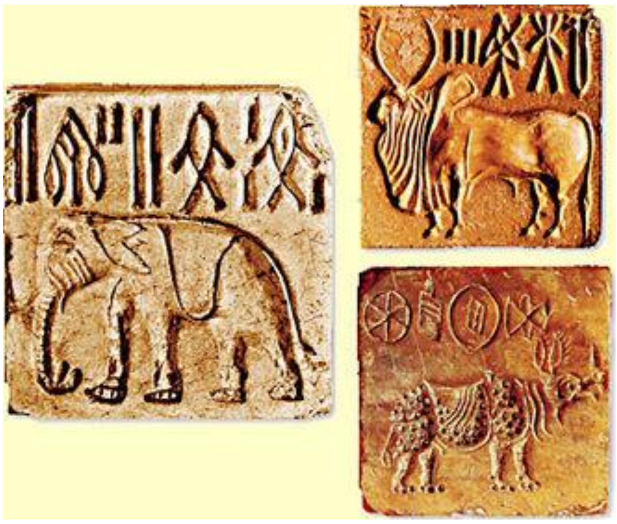

চিত্র ১৮: সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত ষাঁড়, হাতি এবং গন্ডারের সিল, ২৫০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

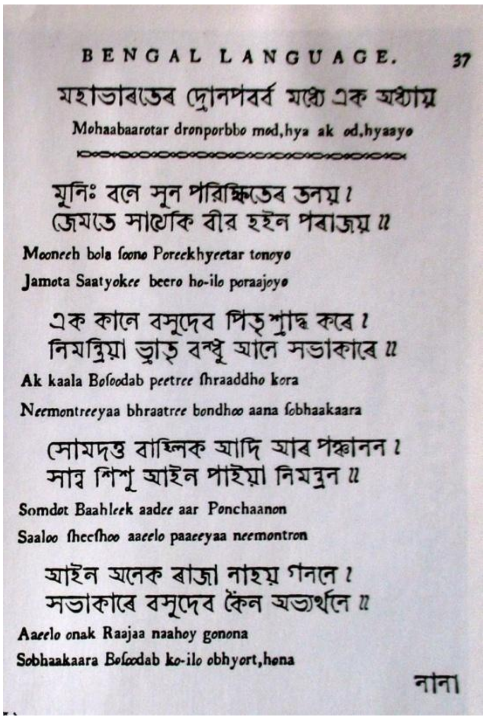

BENGAL LANGUAGE. 37

মহাভারতের দ্রোনপর্ব্ব মধ্যে এক অধ্যায়

Mohaabaarotar dronporbbo mod,hya ak od,hyaayo

মুনিঃ বলে সুন পরিক্ষিতের তনয় ।
জেমতে সাত্যকি বীর হইল পরাজয় ॥

Mooneeh bola foono Poreekhyeetar tonoyo
Jamota Saatyokee beero ho-ilo poraajoyo

এক কালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে ।
নিমন্ত্রিয়া ভ্রাতৃ বন্ধু আনে সভাকারে ॥

Ak kaala Bofoodab peetree fhraaddho kora
Neemontreeyaa bhraatree bondhoo aana fobhaakaara

সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন ।
সাল্ব শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রন ॥

Somdot Baahleek aadee aar Ponchaanon
Saaloo fheefhoo aaeelo paaeeyaa neemontron

আইল অনেক রাজা নাহয় গননে ।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥

Aaeelo onak Raajaa naahoy gonona
Sobhaakaara Bofoodab ko-ilo obhyort,hona

নানা

চিত্র ২০: হ্যালহেড রচিত *গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ*-এর একটি পৃষ্ঠা, ১৭৭৮

চিত্র ১৯: উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, ৬০০-২০০ খ্রি.পূর্ব

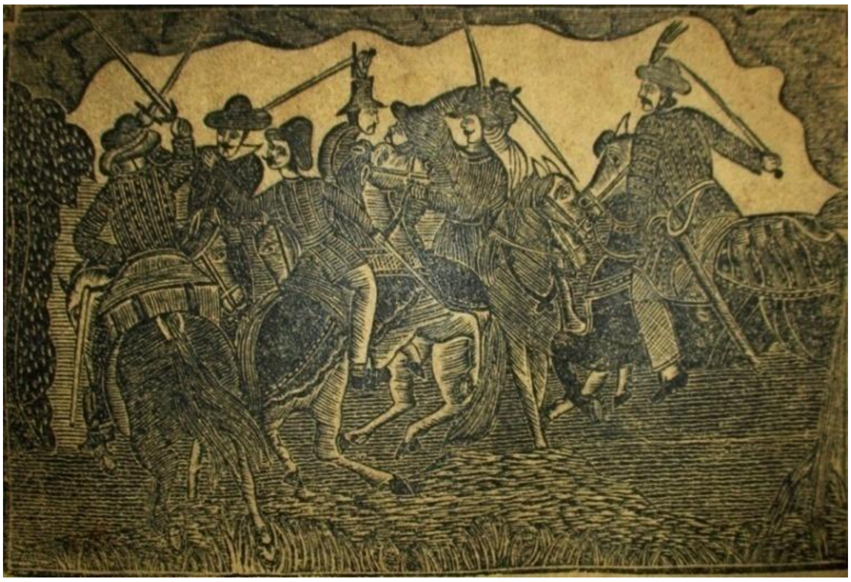

চিত্র ২১: কবি মোক্তাল হোসেনের 'ছহি বড় জঙ্গ নামা'র একটি চিত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

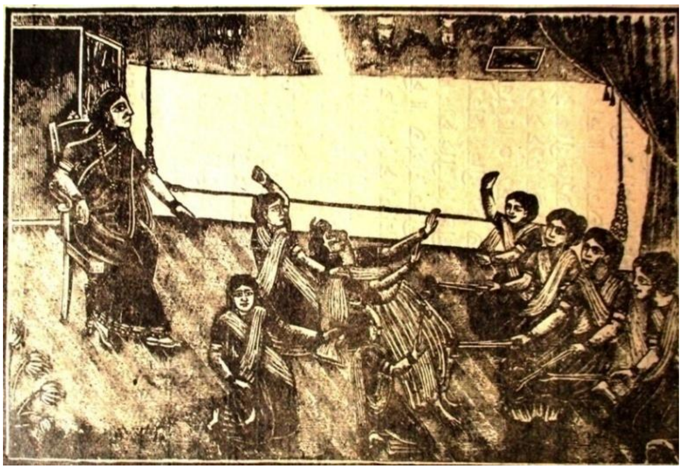

চিত্র ২২: ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সচিত্র আদি ও আসল বড় সোনাভান-এর অলংকরণ

চিত্র ২৩: চার্লস ডয়েলি, ঢাকা নগরীর অভ্যন্তরের কিয়দংশ, ধাতু খোদাই, ১৮১৪

চিত্র ২৪: অন্নদামঙ্গল-এর অলংকরণ 'সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা', ১৮১৬

চিত্র ২৫: পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও অবনত ভক্ত-এর ধাতু খোদাই চিত্র, ১১৯৬

চিত্র ২৬: কৃষ্ণচন্দ্র কৃত 'নূতন পঞ্জিকা'র অলংকরণ

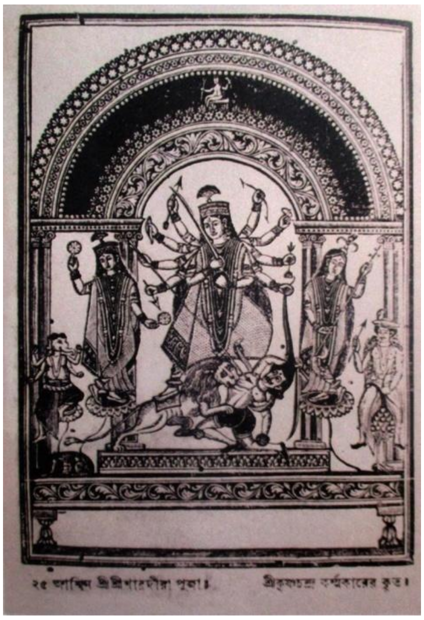

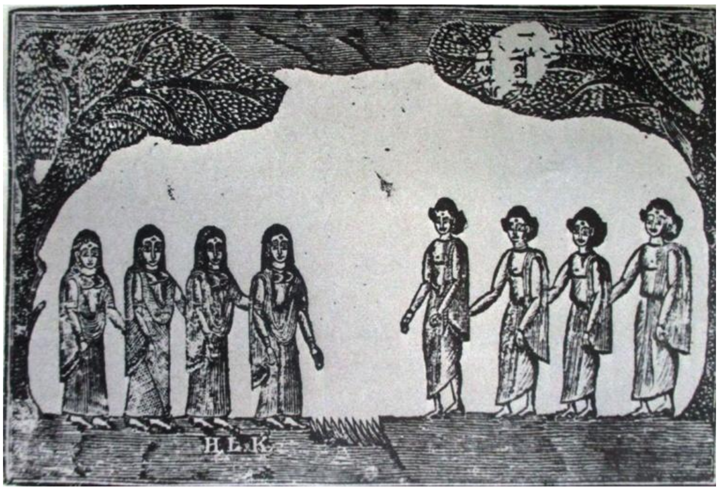

চিত্র ২৭: বটতলা থেকে প্রকাশিত 'রসমঞ্জরী'র একটি অলংকরণ

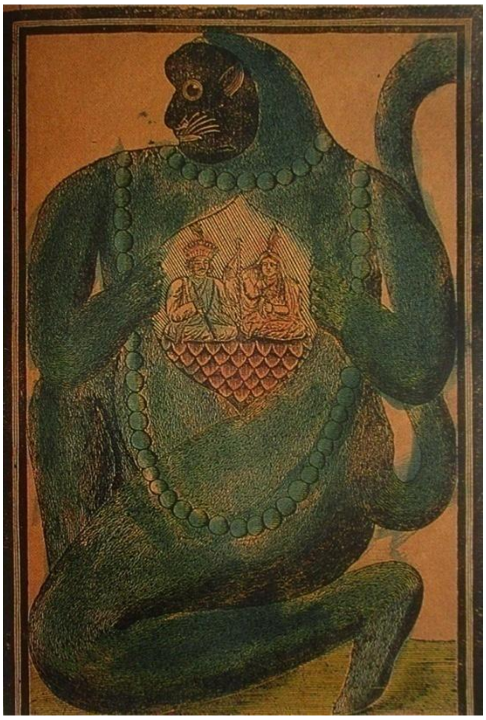

চিত্র ২৮: বটতলার পৌরাণিক ছবির নমুনা, অজ্ঞাত শিল্পী, *রামভক্ত হনুমান*, ২৫ x ৩৯ সেমি., কাঠ খোদাই

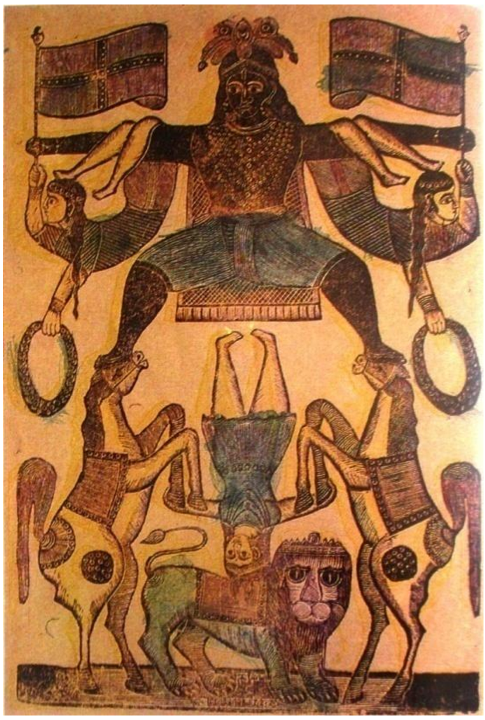

চিত্র ২৯: বটতলার ঐতিহাসিক ছবির নমুনা, শ্রী নৃত্যলাল দত্ত, *সার্কাস*, ২৬ x ৩৯ সেমি., কাঠ খোদাই

চিত্র ৩০: বটতলার সামাজিক ছবির নমুনা, অজ্ঞাত শিল্পী, *চিংড়িমাছ, লাউ এবং অন্যান্য মাছ*, ২৫ x ৪৮ সেমি., কাঠ খোদাই

চিত্র ৩১: কালীঘাটের পটচিত্র

চিত্র ৩২: কালীঘাট পট (বামে) দ্বারা প্রভাবিত বটতলার কাঠ খোদাই চিত্র (ডানে)

চিত্র ৩৩: ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও থেকে ছাপা *দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি*, ২৫ x ৩৩.৫ সেমি., লিথোগ্রাফ

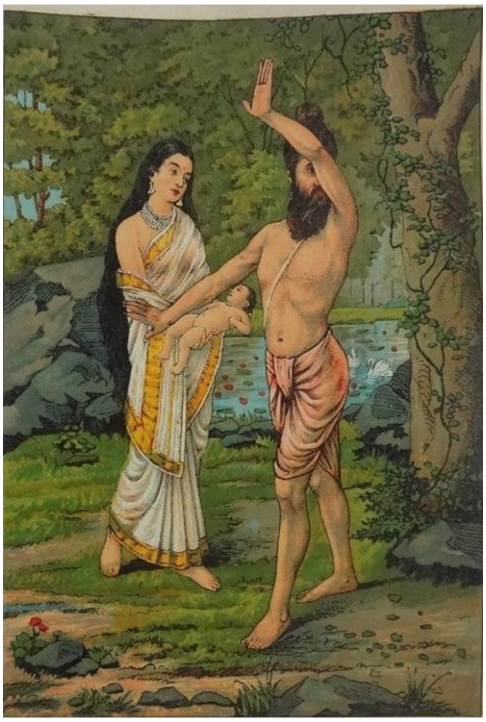

চিত্র ৩৪: রবিবর্মা, *শকুন্তলার জন্ম*, ১৮ x ২৫.৫ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৮৯৪

চিত্র ৩৫: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথের বিমান যাত্রা*, লিথোগ্রাফ, ১৯২১

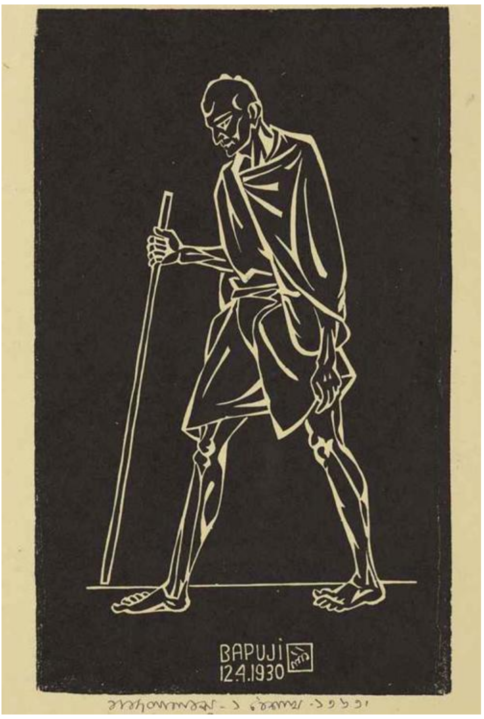

চিত্র ৩৬: নন্দলাল বসু, *বাপুজি*, ২৯.২ x ২০ সেমি., লিনো খোদাই, ১৯৩০

চিত্র ৩৭: বিনোদবিহারী, *ম্যাসাজ বয়*, ১৯ x ১২.২ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৪৪

চিত্র ৩৮: রামকিংকর বেইজ, শিরোনাম অজানা, এচিং

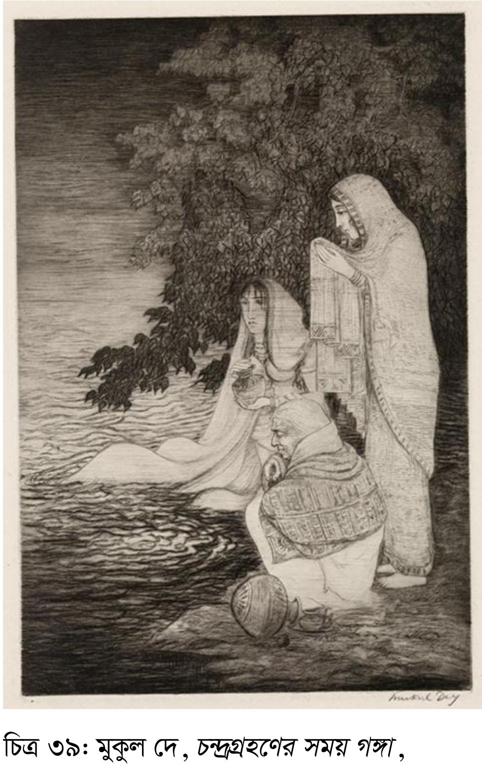

চিত্র ৩৯: মুকুল দে, *চন্দ্রগ্রহণের সময় গঙ্গা*, ৩০.৪৮ x ২০.৩২ সেমি., ড্রাইপয়েন্ট, ১৯২৫

চিত্র ৪০: হরেন দাস, *জল সেচনের কৌশল*, ১৫.৮ ২২.২ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৫০

চিত্র ৪১: সোমনাথ হোড়, *কৃষকদের সভা*, কাঠ খোদাই, ১৯৫১

চিত্র ৪২: জয়নুল আবেদিন, *দুর্ভিক্ষ চিত্র*, ৪২ x ৫৮.৫ সেমি., কালো কালি, ১৯৪৩

চিত্র ৪৩: সফিউদ্দিন আহমেদ, *কালো-১৯*, চারকোল কালি ও জলরং, ১৯৯৫

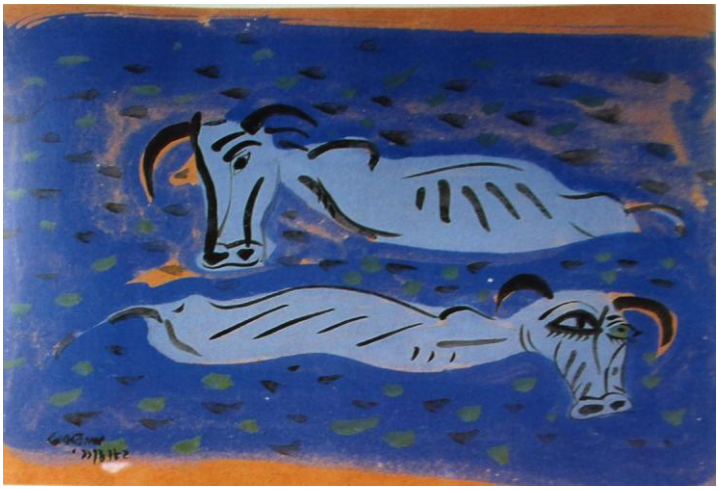

চিত্র ৪৪: কামরুল হাসান, *যুগল*, গোয়াশ, ১৯৮২

চিত্র ৪৫: মো. কিবরিয়া, *শিরোনামহীন-১১*, তেলরং, ১৯৯৯

চিত্র ৪৬: আবদুর রাজ্জাক, *পেইন্টিং ইন ব্ল্যাক*, তেলরং, ২০০২

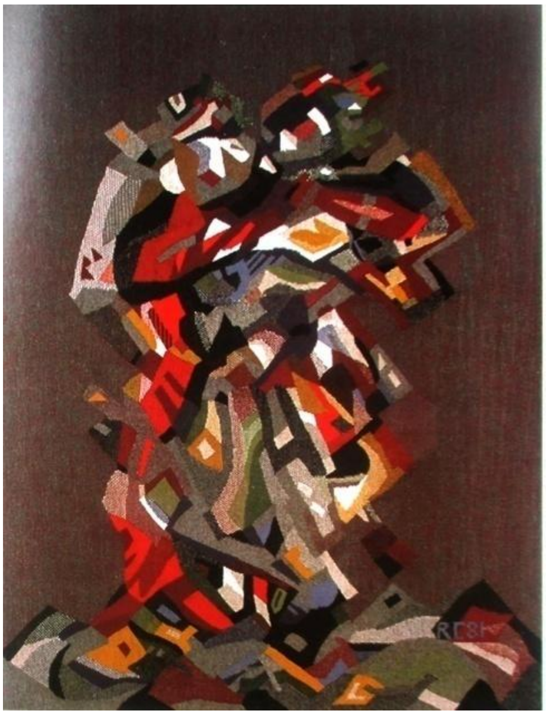

চিত্র ৪৭: রশিদ চৌধুরী, *যাযবর-৩*, ট্যাপেস্ট্রি, ১৯৮১

চিত্র ৪৮: মুর্তজা বশীর, *দেয়াল-৪৮*, ১২১ x ৮৮ সেমি., তেলরং, ১৯৬৭

চিত্র ৪৯: নিতুন কুন্ডু, *উৎসবের রূপ-২*, তেলরং, ১৯৯

চিত্র ৫০: রফিকুন নবী, *বিশ্রামরত জেলেরা*, তেলরং, ২০০৬

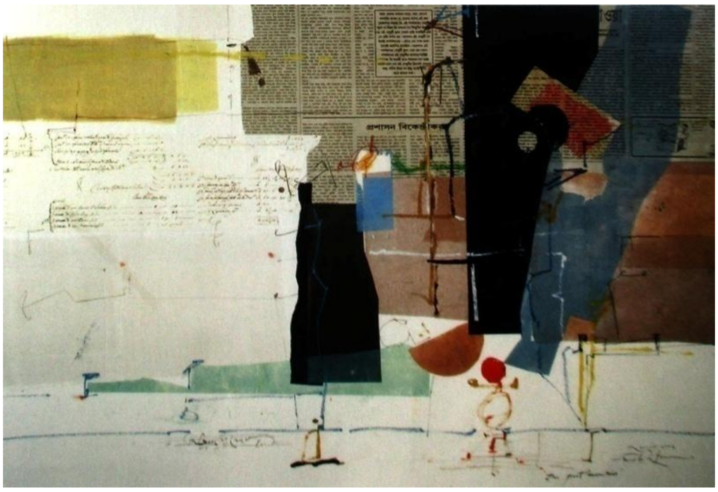

চিত্র ৫১: মনিরুল ইসলাম, *অতীত স্মৃতি*, কোলাজ ও মনোপ্রিন্ট, ২০০২

চিত্র ৫২: মাহমুদুল হক, *চিরন্তন প্রতীক্ষা*, তেলরং, ১৯৯৭

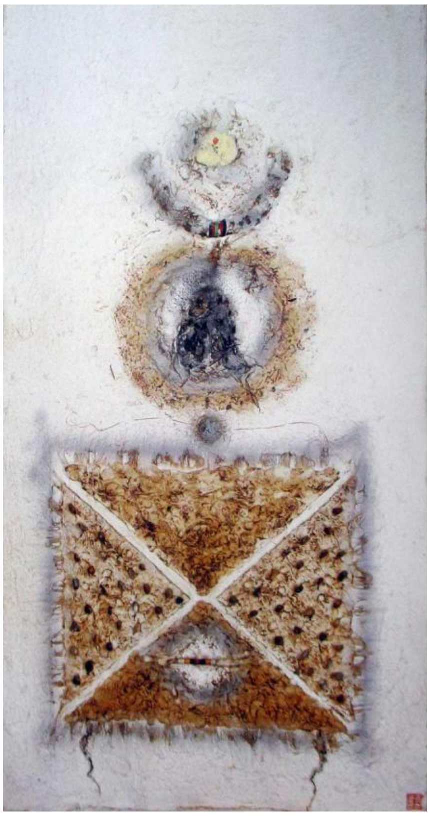

চিত্র ৫৩: কালিদাস কর্মকার, *পবিত্র প্রতীক*, মিশ্র মাধ্যম, ১৯৯০

চিত্র ৫৪: শহিদ কবির, *একটি ফুটন্ত চায়ের পাত্র*, তেলরং, ১৯৯৮

চিত্র ৫৫: আবদুস সাত্তার, *ফুল হাতে নারী*, অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৯

চিত্র ৫৬: সৈয়দ আবুল বারক্ আলভী, *শিরোনামহীন*, গোয়াশ, ১৯৯৫

চিত্র ৫৭: এ কে এম আলমগীর হক, *শিরোনামহীন-৬০*, ৭৬ x ৫৬ সেমি., অ্যাক্রেলিক, ১৯৯৭

চিত্র ৫৮: রোকেয়া সুলতানা, *সম্পর্ক-২০*, ৯২ x ৬১ সেমি., টেম্পেরা, ২০০৫

চিত্র ৫৯: দিলারা বেগম জলি, *তাহাদের কথা-১*, ৯০ x ১৮০ সেমি., অ্যাক্রেলিক, ২০০৮

চিত্র ৬০: ওয়াকিলুর রহমান, *শিরোনামহীন*, ৭৯.৫ x ৫২.৫ সেমি., মিশ্র মাধ্যম, ১৯৯৮-২০০৭

চিত্র ৬১: লায়লা শার্মিন, *দত্তা দয়াদভাম দমায়াটা : শান্তি শান্তি শান্তি-২*, ৪০ x ৬০ সেমি., মিশ্র মাধ্যম, ২০১৫

চিত্র ৬২: হবিবর রহমান, *সান্ধ্যভোজন*, কাঠ খোদাই

চিত্র ৬৩: জয়নুল আবেদিন, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত লিনো খোদাই (শিরোনাম অজানা)

চিত্র ৬৪: জয়নুল আবেদিন, *দুর্ভিক্ষ*, ২১.৫ x ১৭ সেমি., লিনোকাট, ১৯৪০ দশক

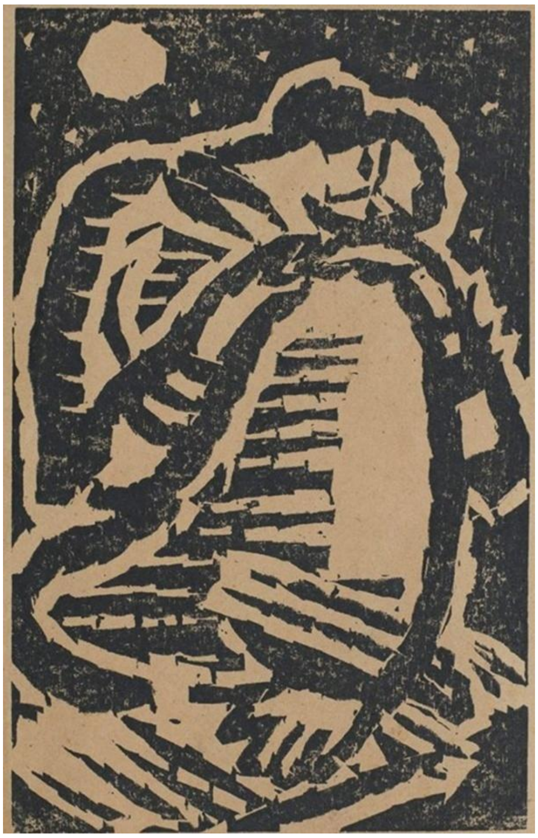

চিত্র ৬৫: জয়নুল আবেদিন, *চন্দ্রালোকে অনুধ্যায়ী*, ১৫ x ৯.৫ সেমি., লিনো খোদাই, ১৯৫০ দশক

চিত্র ৬৬: কামরুল হাসান, *পলিটিক্যাল প্রিজনার্স*, কাঠ খোদাই, ১৯৪৬

চিত্র ৬৭: কামরুল হাসান, *রূপকল্প-৭৪*, ৫৫ x ২২ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৭৪

চিত্র ৬৮: কামরুল হাসান, *রূপকল্প-৭৪*, ৫৫ x ২০ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৭৪

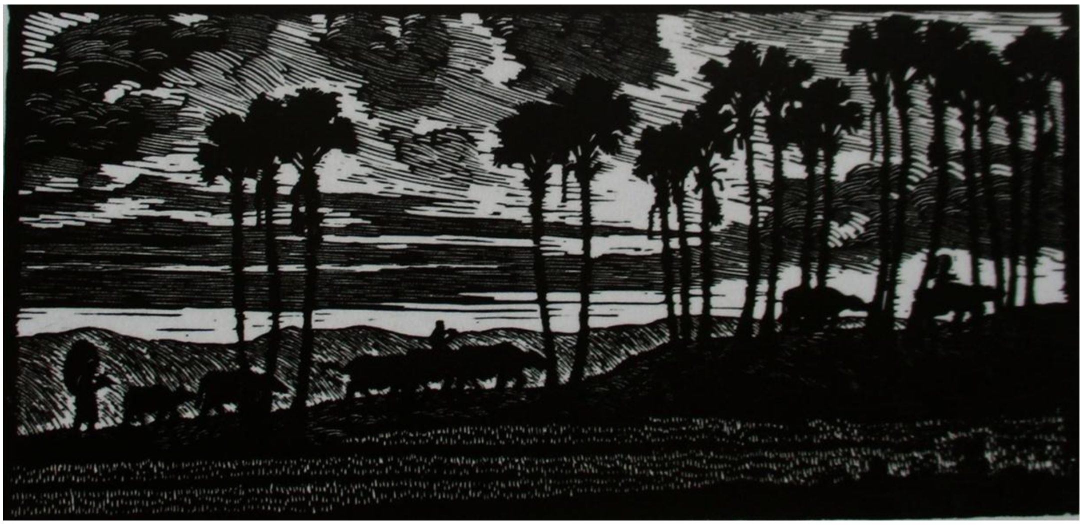

চিত্র ৬৯: সফিউদ্দিন আহমেদ, বাড়ির পথে, ০৯ x ১৯ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৪৪

চিত্র ৭০: সফিউদ্দিন আহমেদ, *ক্রুদ্ধ মাছ*, ২৬ x ৪৬ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৬৪

চিত্র ৭১: সফিউদ্দিন আহমেদ, *জলের নিনাদ*, ২৫ x ৫০ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট ও ধাতু খোদাই, ১৯৮৫

চিত্র ৭২: সফিউদ্দিন আহমেদ, *স্মৃতি একাত্তর*, ৩২ x ২০ সেমি., ধাতু খোদাই, ১৯৮৮

চিত্র ৭৩: মো. কিবরিয়া, *ফুল হাতে বালক*, ৪৬ x ৬০ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৫৯

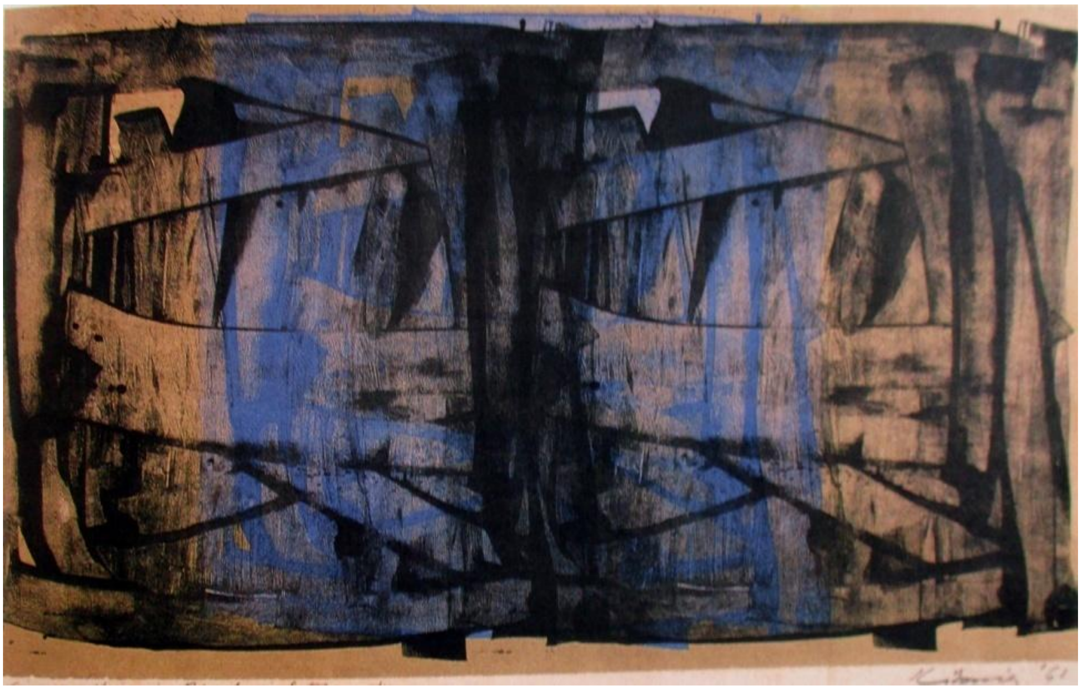

চিত্র ৭৪: মো. কিবরিয়া, *কম্পোজিশন কালো ও নীল*, ৩৮ x ৬৪ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৬১

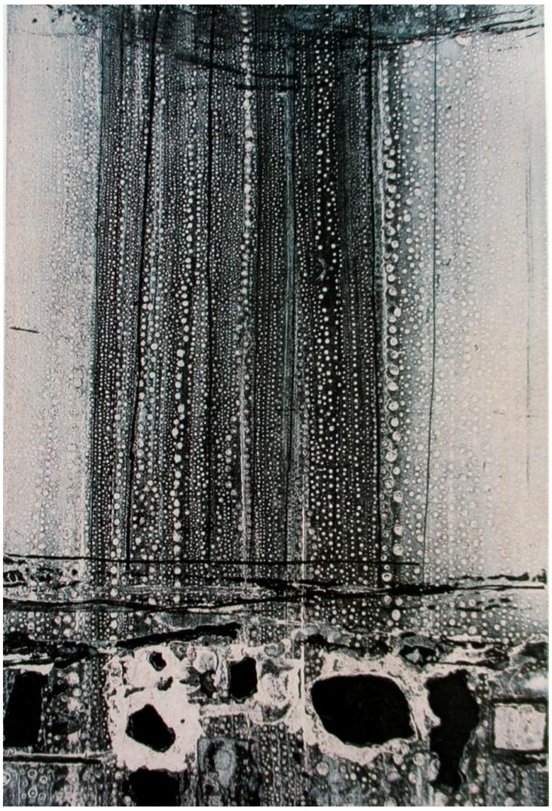

চিত্র ৭৫: মো. কিবরিয়া, *এচিং-৭*, ৫৪ x ৩৯ সেমি., এচিং, ১৯৭৯

চিত্র ৭৬: মো. কিবরিয়া, *শিরোনামহীন*, ৭৫ x ৫৫ সেমি., লিথোগ্রাফ, ২০০৩

চিত্র ৭৭: রশিদ চৌধুরী, *বাংলায় বিদ্রোহ*, ৩৮ x ৪৯ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৭১

চিত্র ৭৮: রশিদ চৌধুরী, *পুতুল নাচ*, ৩০ x ২১ সেমি., এচিং, ১৯৭৮

চিত্র ৭৯: আবদুর রাজ্জাক, *স্বর্ণকার*, ২১ x ১৬ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৫২

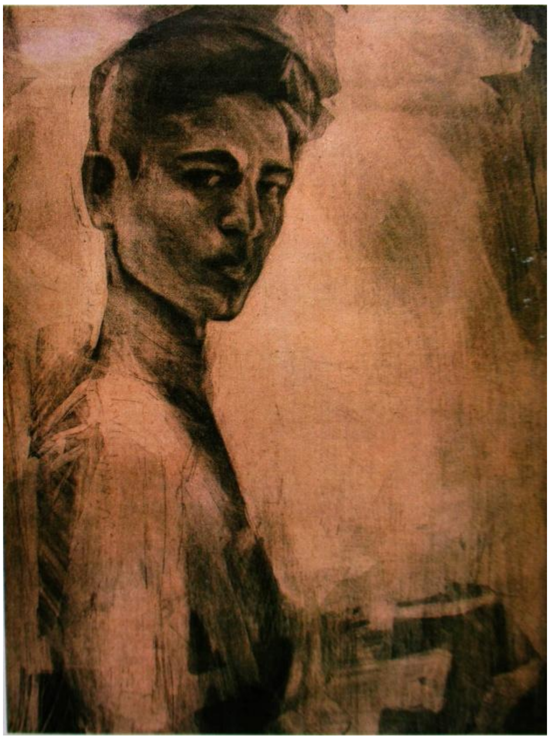

চিত্র ৮০: আবদুর রাজ্জাক, *আত্মপ্রতিকৃতি*, ৪৫ x ৬১ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৫৫

চিত্র ৮১: আবদুর রাজ্জাক, *কম্পোজিশন*, ৪৬ x ৬১ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৭৩

চিত্র ৮২: মুর্তজা বশীর, *ওভার টাইম*, ১৮ x ২৬ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৫১

চিত্র ৮৩: মুর্তজা বশীর, *দেয়াল*, ২৬.৭৬ x ২০.৭৫ সেমি., এচিং, ১৯৭৩

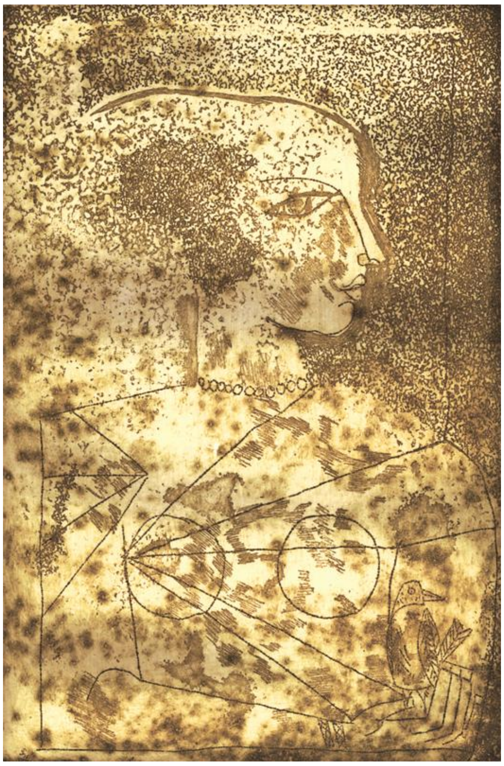

চিত্র ৮৪: মুর্তজা বশীর, *পাখিসহ বালিকা*, ১৮.২৫ x ১২.২৫ সেমি., এচিং, ১৯৭৯

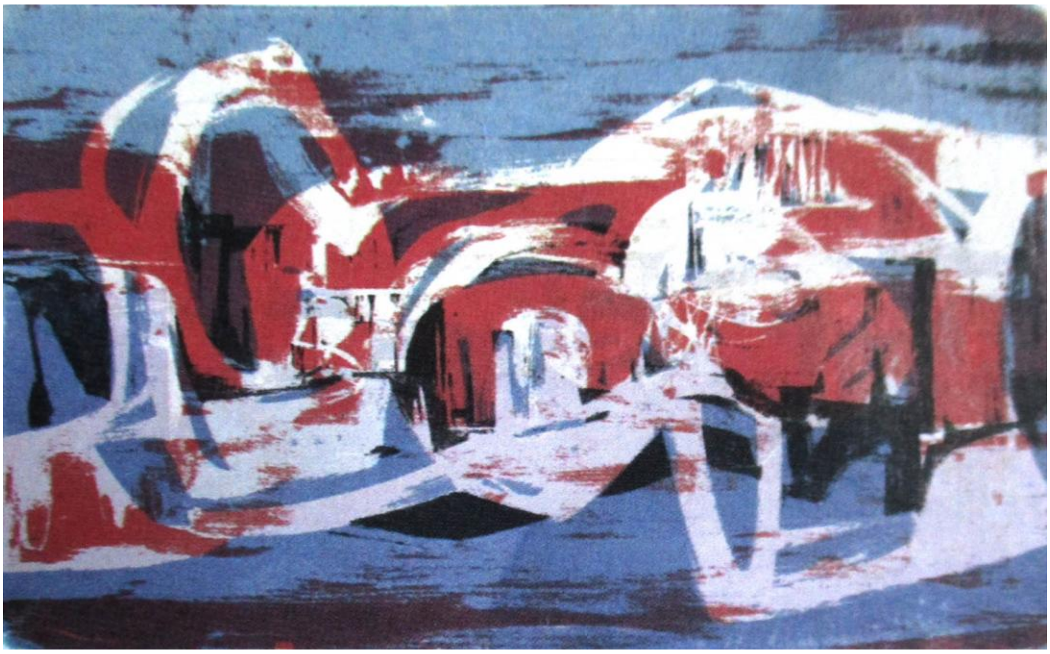

চিত্র ৮৫: নিতুন কুন্ডু, *সাঁকো*, সেরিগ্রাফ, ১৯৬৩

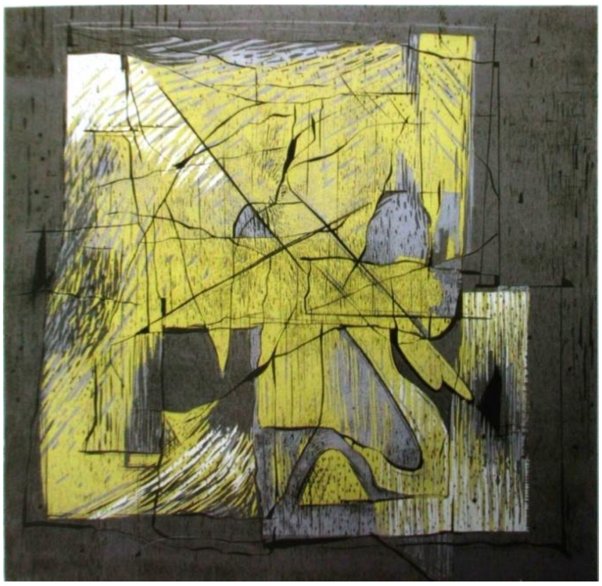

চিত্র ৮৬: নিতুন কুণ্ডু, *শিরোনামহীন*, ৫০ x ৫০ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০০৬

চিত্র ৮৭: মো. হুসনে জামাল, *মা ও শিশু*, ৪৯ x ৯৮ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৬৭

চিত্র ৮৮: রঞ্জিত নিয়োগী, *গাছের নিচে নৌকা*, লিথোগ্রাফ, ১৯৬৩

চিত্র ৮৯: নাসির বিশ্বাস, *নূরজাহান*, ৪৫ x ৩৩ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৬৪-৬৬?

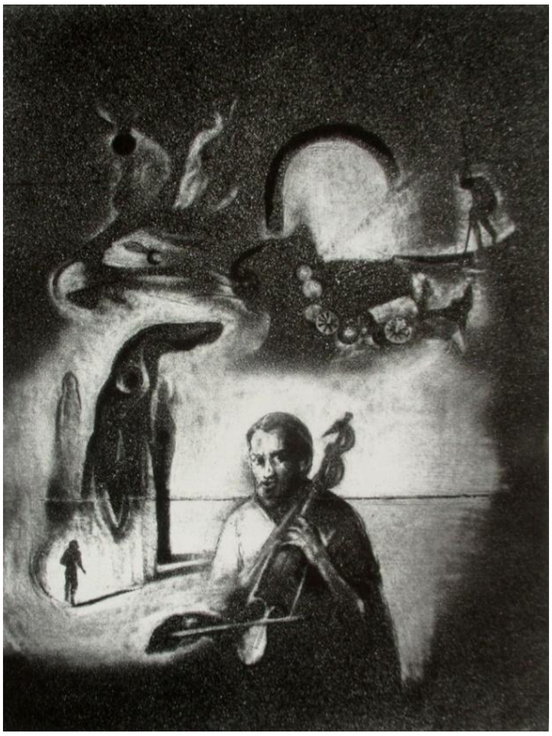

চিত্র ৯০: মনিরুল ইসলাম, *ফরাজী*, ৩১ x ২৪ সেমি., মেজোটিন্ট, ১৯৭০

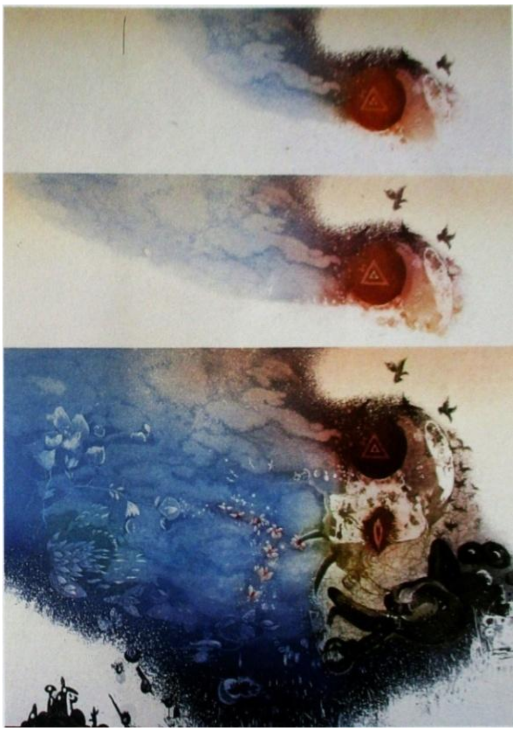

চিত্র ৯১: মনিরুল ইসলাম, *ক্রিয়েশান অব নেচার*, ৬২ x ৪৯ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮০

চিত্র ৯২: মনিরুল ইসলাম, *ইনসার্চ অব লাইট*, ২০.৫ x ১৫.৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮৫

চিত্র ৯৩: মনিরুল ইসলাম, *ফরেস্ট ডান্স*, ৭৬ x ১১৩ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট এবং জলরং, ২০১১

চিত্র ৯৪: রফিকুন নবী, *বাঙ্গেলিস*, ৫২ x ৪২ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৭৪

চিত্র ৯৫: রফিকুন নবী, *উপবিষ্ট মানুষ*, ৬৬ x ৩৩ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৭৬

চিত্র ৯৬: রফিকুন নবী, *ভিখারির স্বপ্ন*, ৯৩ x ১০৩ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৮২

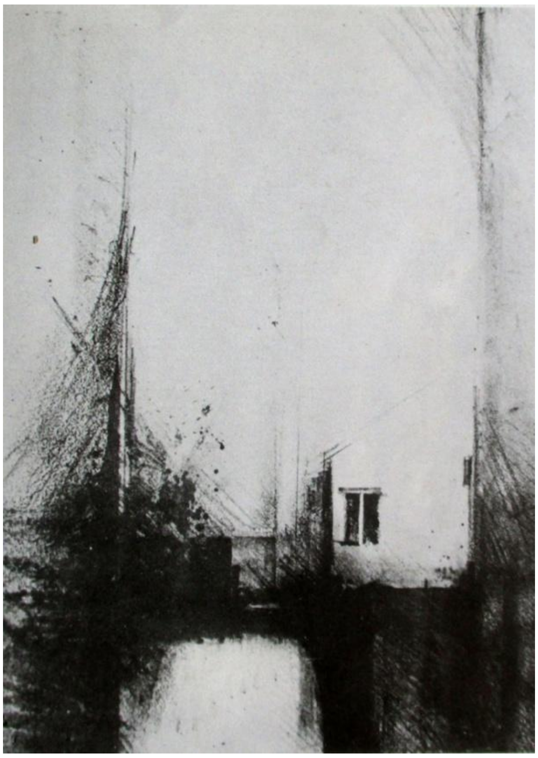

চিত্র ৯৭: মিজানুর রহিম, *কম্পোজিশন*-২, ৫০ x ৪০ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৮০

চিত্র ৯৮: মিজানুর রহিম, *ইমেজ*-২, ৫০ x ৪০ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৯০ দশক

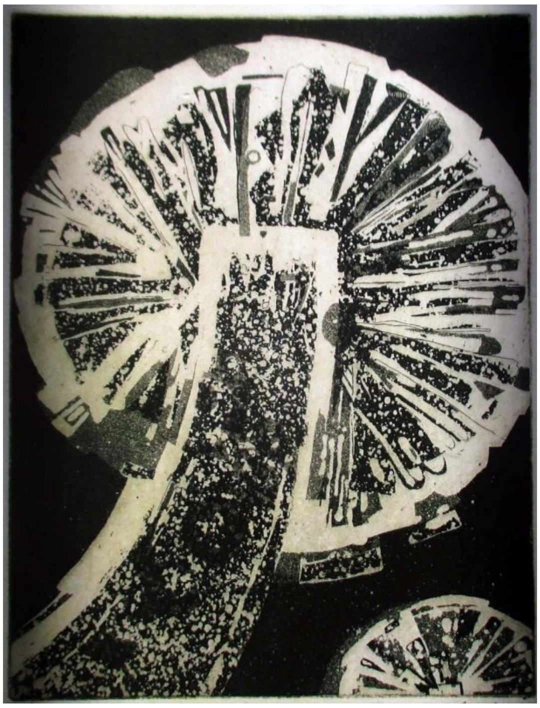

চিত্র ৯৯: মাহমুদুল হক, *ছাপ-২৯*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮২

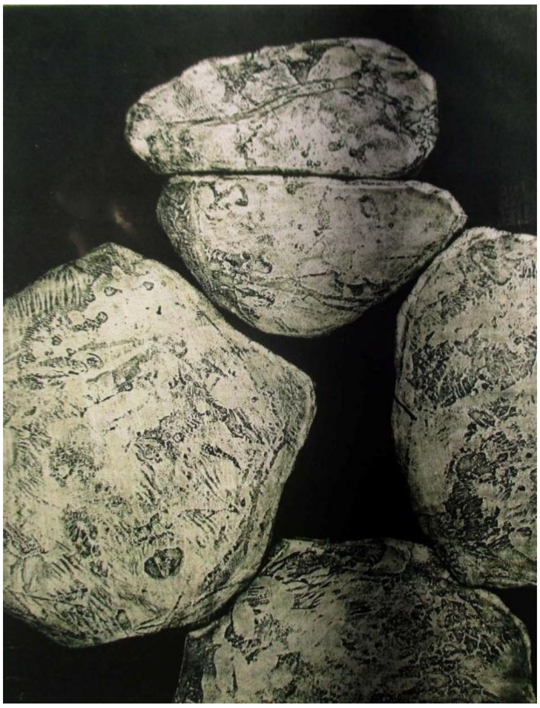

চিত্র ১০০: মাহমুদুল হক, *পাথরের উপরে পাথর*, মেজোটিন্ট, ১৯৮৪

চিত্র ১০১: মাহমুদুল হক, *ছাপ-৯০*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ২০১৫

চিত্র ১০২: কালিদাস কর্মকার, *শ্রদ্ধার্ঘ্য-১*, ৩৩ x ২৫ সেমি., এচিং, ১৯৭৮

চিত্র ১০৩: কালিদাস কর্মকার, *ইমেজ-৬*, ৭০ x ৮৫ সেমি., এচিং, ১৯৮২

চিত্র ১০৪: কালিদাস কর্মকার, *ইমেজ-১০*, ১২০ x ৮০ সেমি., মিশ্র ছাপ পদ্ধতি, ১৯৯০

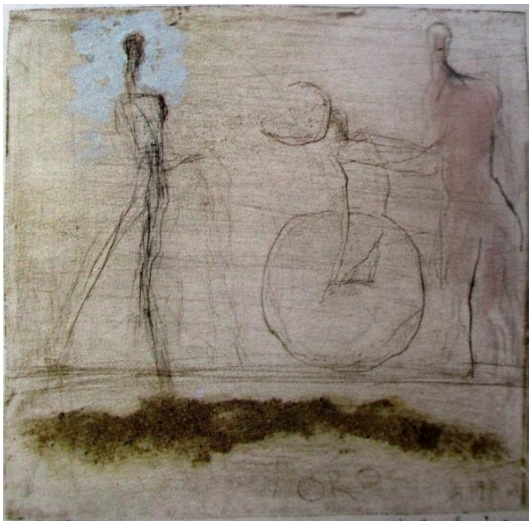

চিত্র ১০৫: শহিদ কবির, *মেলিটিলা*, ৩৫.৫ x ৪৪ সেমি., ড্রাইপয়েন্ট ও হ্যান্ডটাচ, ১৯৯০

চিত্র ১০৬: শহিদ কবির, *স্পেনীয় ভূ-দৃশ্য-১*, ৪৫ x ৩৮ সেমি., এচিং, ২০০২

চিত্র ১০৭: আবদুস সাত্তার, *সাঁওতাল রমণী*, ৪১ x ২৮ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৭৫

চিত্র ১০৮: আবদুস সাত্তার, *পোড়াকাঠ-১*, ৬১ x ৬১ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৮০

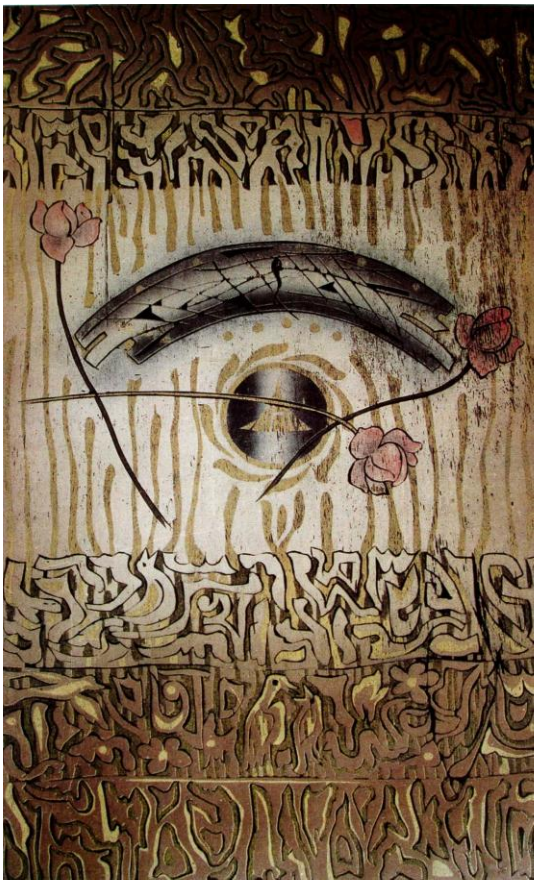

চিত্র ১০৯: আবদুস সাত্তার, *গোলাপসহ প্রিন্ট-১*, ৫২ x ৮৬ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৯৮

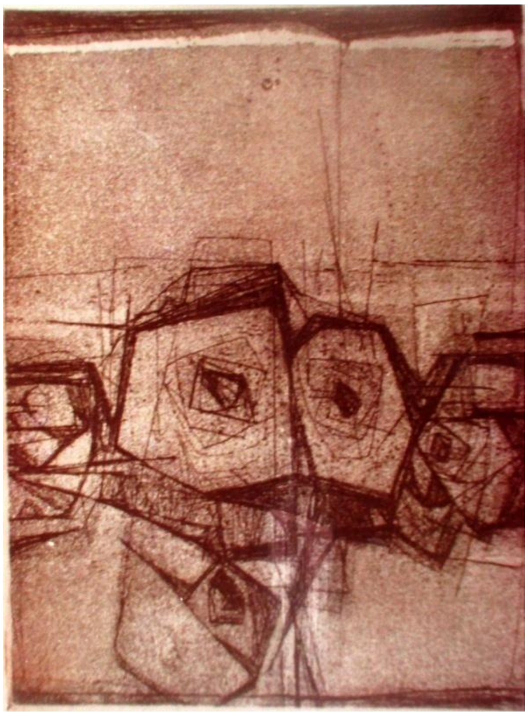

চিত্র ১১০: আবুল বারক্ আলভী, *কম্পোজিশন*, এচিং, ১৯৭৯

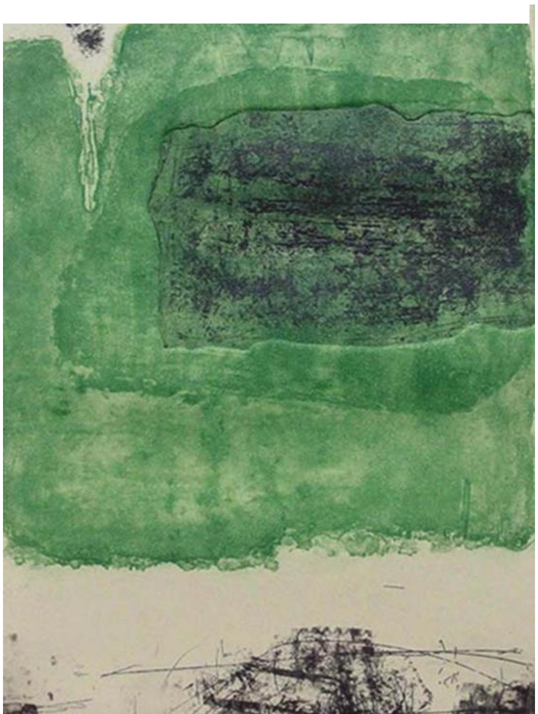

চিত্র ১১১: আবুল বারক্ আলভী, *সবুজ ও ধূসর*, ১৯ x ৩০ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮৭

চিত্র ১১২: আবুল বারক্ আলভী, *কম্পোজিশন*, ২৩ x ৩৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ২০০৮

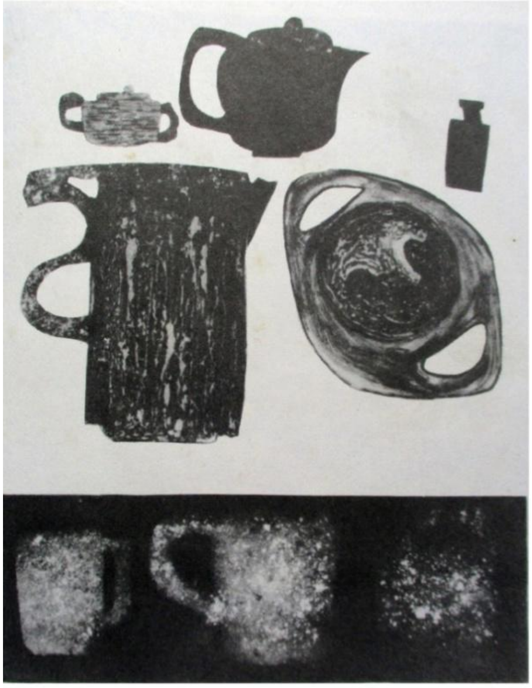

চিত্র ১১৩: এ কে এম আলমগীর, *রন্ধনশালা-৩*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮২

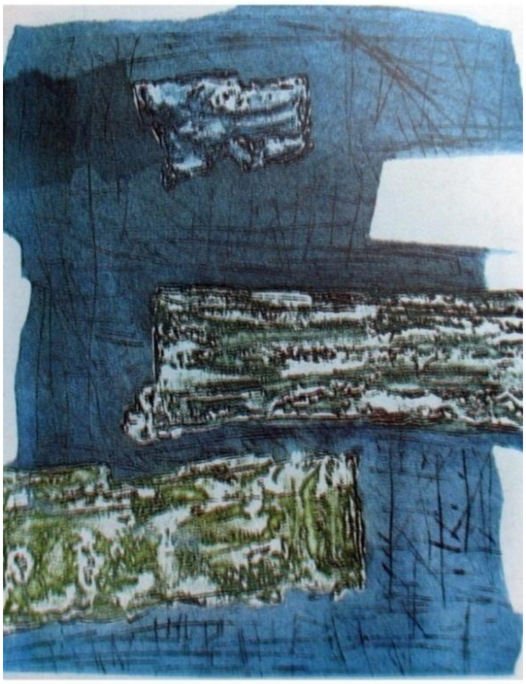

চিত্র ১১৪: এ কে এম আলমগীর, *ফরম অ্যান্ড স্পেস-৪*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৮২

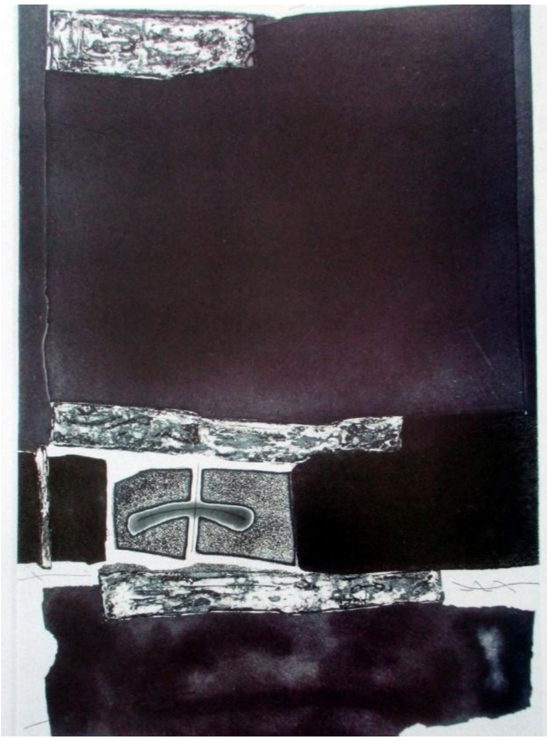

চিত্র ১১৫: এ কে এম আলমগীর, *ছাপ-১০*, ৪৪.৫ x ৩০.৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৩

চিত্র ১১৬: এ কে এম আলমগীর, *গভীর জলের নিচে শস্যক্ষেত্র*, ৫৮.৫ x ৪৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১১৭: রতন মজুমদার, *নগ্নতার স্বাদ*, ৫৯ x ৭০ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৭৭

চিত্র ১১৮: রতন মজুমদার, *বিভক্ত সমাজ-১*, ৬৩ x ৭৪ সেমি., কাঠ খোদাই, ১৯৮০

চিত্র ১১৯: রোকেয়া সুলতানা, *রিক্সায় ম্যাডোনা*, ৩০ x ৩৬ সেমি., সফট্ গ্রাউন্ড ও অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৫

চিত্র ১২০: রোকেয়া সুলতানা, *সম্পর্ক*, ৫০ x ৩৫ সেমি., ড্রাইপয়েন্ট, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২১: রোকেয়া সুলতানা, *ভেনাস ক্রসিং দ্য মুন*, ২৯ x ২১ সেমি., ইউনিক প্রেসার প্রিন্ট, ২০১৩

চিত্র ১২২: দিলারা বেগম জলি, *অ্যাকুরিয়াম*, ৩০ x ৪১ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৯০-৯১

চিত্র ১২৩: দিলারা বেগম জলি, *ক্যাকটাস-২*, ২৫ x ৩৩ সেমি., লিথোগ্রাফ, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

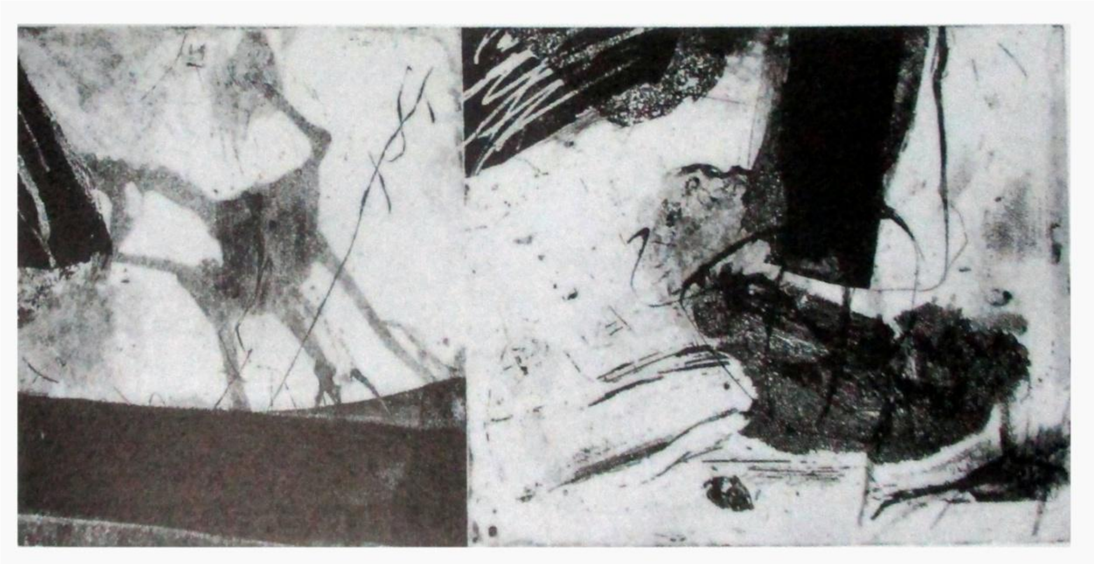

চিত্র ১২৪: ওয়াকিলুর রহমান, *মরা নদী-২*, ৩৯ x ৮৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৩

চিত্র ১২৫: ওয়াকিলুর রহমান, *পথে-২০*, ২৭ x ১২৯ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৬

চিত্র ১২৬: ওয়াকিলুর রহমান, *শব্দ-৬*, ৭৬ x ৫৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৯৯৮

চিত্র ১২৭: ওয়াকিলুর রহমান, *ওটি*, ৫০ x ৫০ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট ও ড্রাইপয়েন্ট, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২৮: মুসলিম মিয়া, *কলঙ্কিত কাঠ*, কাঠ খোদাই, ১৯৮৩

চিত্র ১২৯: মুসলিম মিয়া, *অচিন পাখি-১*, ৫৪ x ৩৮ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০০৩

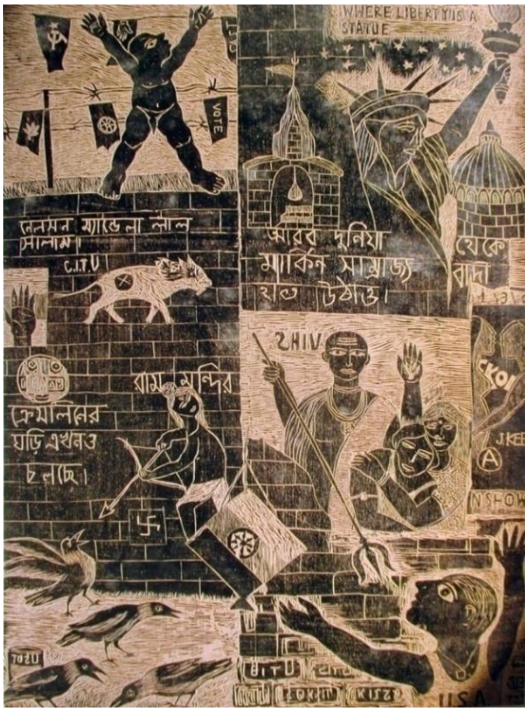

চিত্র ১৩০: আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী, *দেখে যেন মনে হয়*, কাঠ খোদাই, ১৯৯২

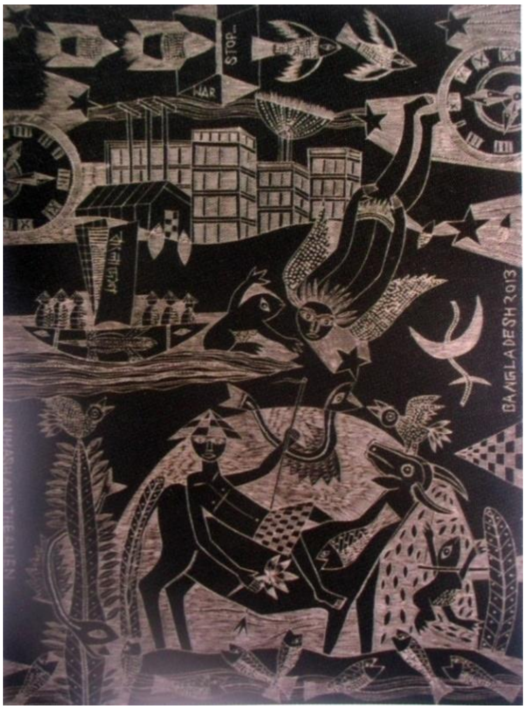

চিত্র ১৩১: আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ-১*, ১২০ x ১৫০ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩২: লায়লা শার্মিন, *লেস ফ্লেয়িওর দ্যো মল-২*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৩

চিত্র ১৩৩: লায়লা শার্মিন, *টানবাজারের ড্যাফোডিলগুলো*, এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৫

চিত্র ১৩৪: লায়লা শার্মিন, *সত্য সুন্দর ও আমি*, মিশ্র মাধ্যম, ২০০৮

চিত্র ১৩৫: আহমেদ নাজির, *যুদ্ধনথি*, ৪৫ x ৬৫ সেমি., মিশ্র মাধ্যম, ২০০১

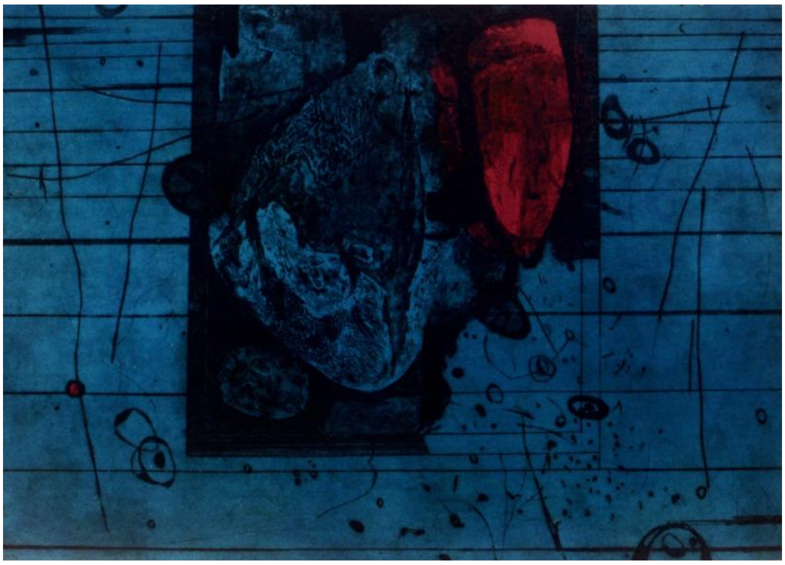

চিত্র ১৩৬: আহমেদ নাজির, *যুদ্ধনথি-৪৮*, ৬৫ x ৯৫ সেমি., ডিজিটাল প্রিন্ট, ২০০৯

চিত্র ১৩৭: রফি হক, *যেভাবে আমি তাকে স্মরণ করি-৩*, এচিং ও লিথোগ্রাফ, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩৮: রফি হক, ***অন্তর্দহন***, এচিং ও কোলাজ, ১৯৯৫-২০০০

চিত্র ১৩৯: রফি হক, ***আর যুদ্ধ নয়***, ৫০ x ৩৪ সেমি., লিথোগ্রাফ, এচিং ও হ্যান্ডটাচ, ২০০০

চিত্র ১৪০: রশীদ আমিন, *কম্পোজিশন উইথ নেচার-২*, ১৮ x ৫১ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৪১: রশীদ আমিন, *স্প্রিং-১*, ৬৪ x ১৬৫ সেমি., এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট, ২০০৭

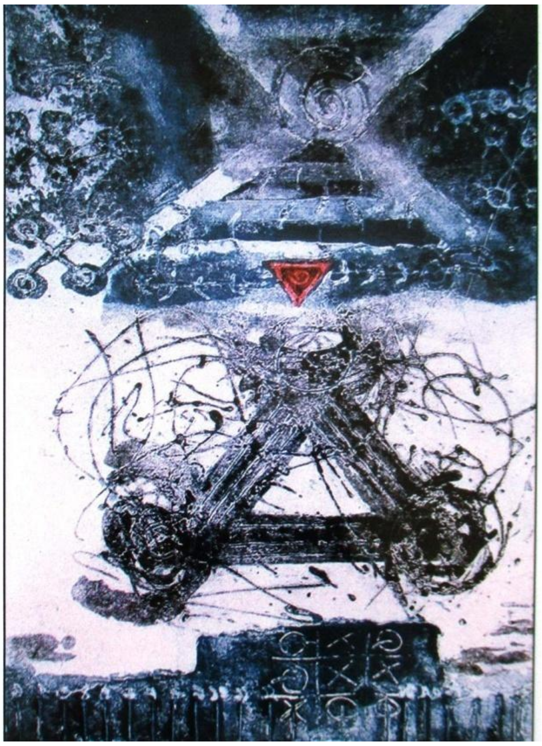

চিত্র ১৪২: জসিম উদ্দীন, *ট্রপিক্যাল গার্ডেন*, ৫৫ x ৭৮ সেমি., কলোগ্রাফ, ১৯৯৮

চিত্র ১৪৩: জসিম উদ্দীন, *অ্যানানসিয়েশন*, ১২০ x ১০০ সেমি., এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৪৪: আবদুস সোবহান হীরা, *জীবন ও সময়ের রূপকল্প-১৫*, ৫০ x ৯৪ সেমি., এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট, ১৯৯৮

চিত্র ১৪৫: আবদুস সোবহান হীরা, *সময়ের রূপকল্প-১৯*, ৪০ x ৬০ সেমি., ড্রাইপয়েন্ট, ২০১৫

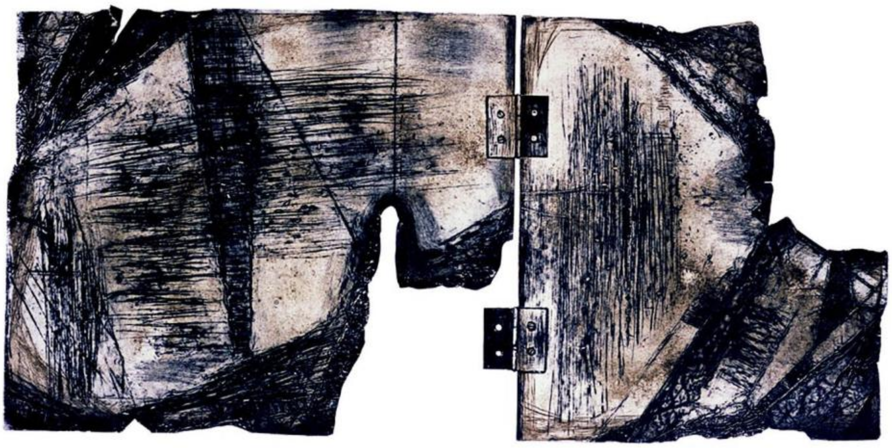

চিত্র ১৪৬: আবদুস সালাম, *পরিত্যক্ত-১*, ৭০ x ১০০ সেমি., ড্রাইপয়েন্ট, ১৯৯৮

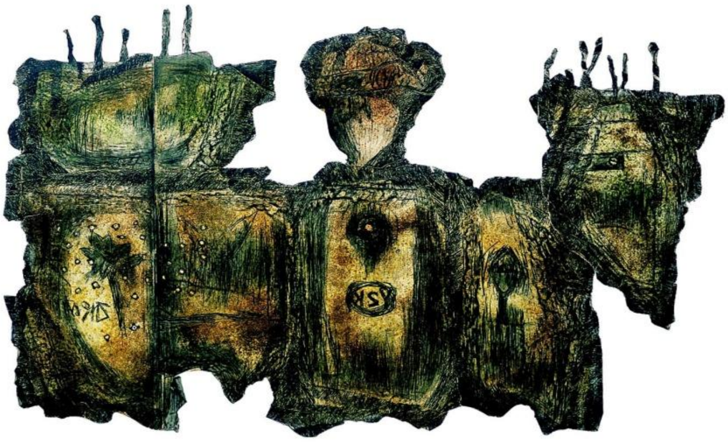

চিত্র ১৪৭: আবদুস সালাম, *পরিত্যক্ত-৪*, ৭০ x ১০০ সেমি, ড্রাইপয়েন্ট, ২০০০

চিত্র ১৪৮: আবদুস সালাম, *হুমায়ুন আজাদ* (ফুটপাথের টাইল এবং ছাপ), স্পেস প্রিন্ট, ২০০৫

চিত্র ১৪৯: আবদুস সালাম, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত-২* (চৌকাঠ এবং ছাপ), স্পেস প্রিন্ট, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৫০: আনিসুজ্জামান, *জটিলতা-১৮*, ২০ ও২১, ১০৫ x ১২০ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০০৩

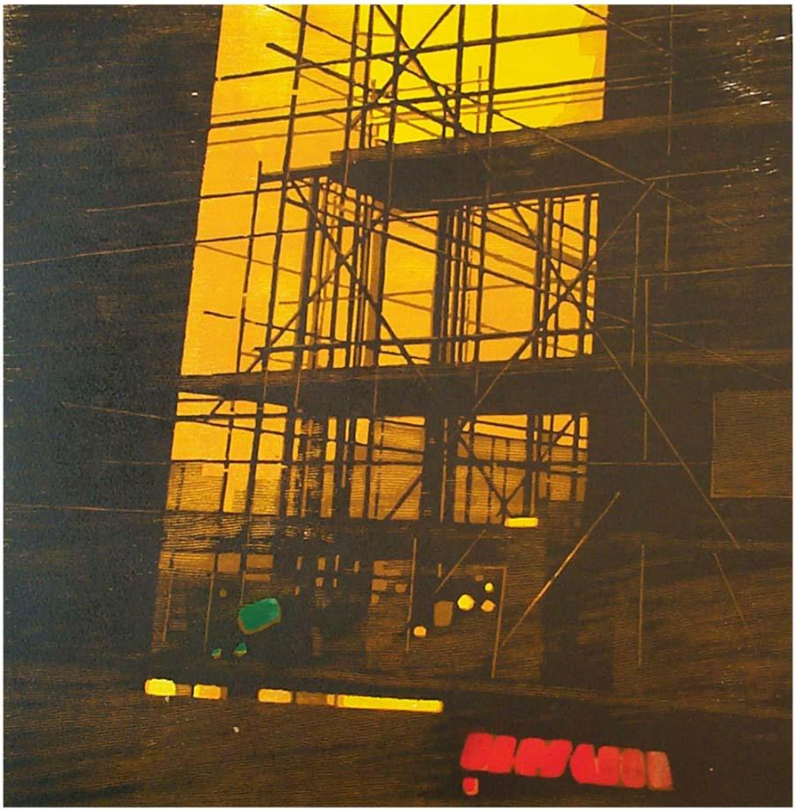

চিত্র ১৫১: আনিসুজ্জামান, *জটিলতা-৪০*, ৪০ x ৪০ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

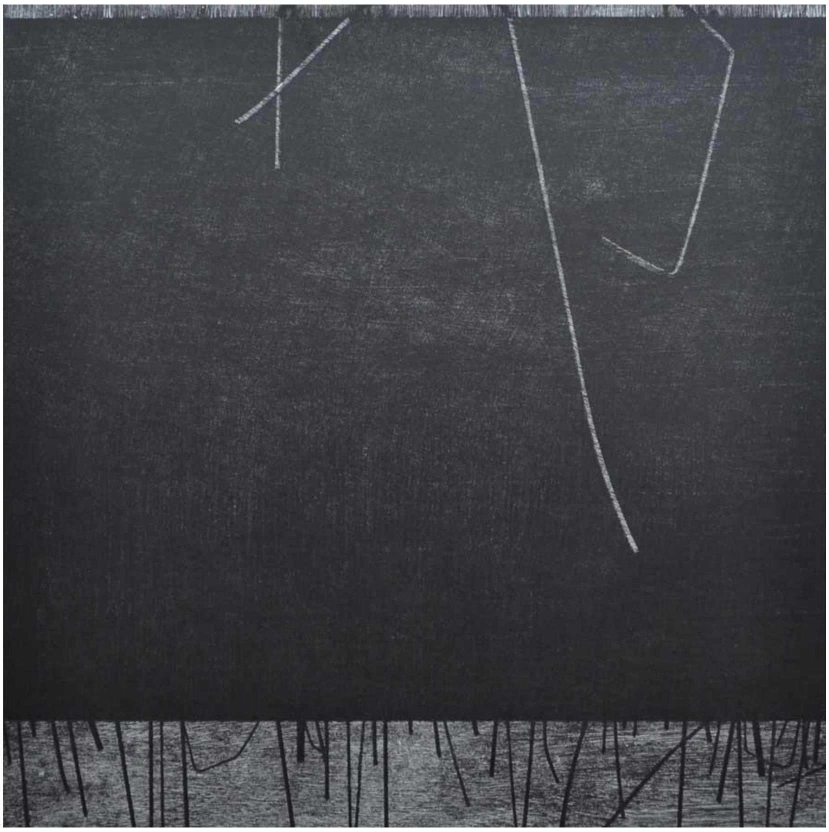

চিত্র ১৫২: আনিসুজ্জামান, *বহুবর্ণিল জটিলতা-১৬*, ৯০ x ৯০ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০১০

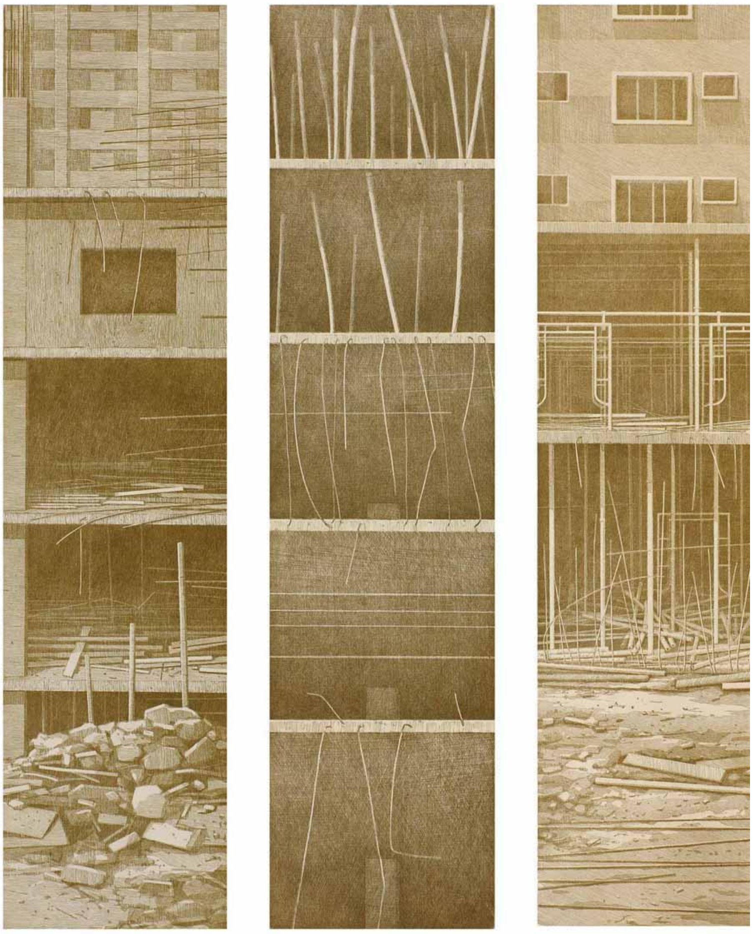

চিত্র ১৫৩: আনিসুজ্জামান, *জটিলতা-৫৫*, ৫৬ ও ৫৭, ৯০ x ১২২ সেমি., কাঠ খোদাই, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository